মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায়

এবং

ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার

উপদেশ ও মতামত

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৯

প্রকাশ ১১ মাঘ ১২৮৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ৭ মাঘ ১২৯৬
তৃতীয় সংস্করণ ৮ মাঘ ১৩০৩
চতুর্থ সংস্করণ ?
[পঞ্চম সংস্করণ ১৯২৮]

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীভূমি মুদ্রণিকা
৭৭ লেলিন সরণী। কলিকাতা ১৩

প্রকাশকের নিবেদন

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের দ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হইল। বস্তুত ইহা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবিতকালের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। এই সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যায় নাই।

বর্তমান গ্রন্থ মুদ্রণকালে পরবর্তী একটি সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায় যাহার আখ্যাপত্রে আছে: "...স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। / ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, বিবিধ সন্দর্ভ ও থিওডোর পার্কারের জীবনচরিত / ইত্যাদি পুস্তকের রচয়িতা। / পঞ্চম সংস্করণ/পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত।/১৯২৮"।

চতুর্থ সংস্করণের একটি দুষ্প্রাপ্য কপি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অলোক রায় আমাদের প্রেস কপি হিসাবে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সৌজন্যে রামমোহন রায়ের রঙিন চিত্রের ব্লকটি প্রাপ্ত।

বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণব্যাপারে শ্রীযুক্ত স্বপনকুমার মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সুবিমল লাহিড়ী বিশেষ আনুকূল্যবিধান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রকাশিত হইল। এ কাল পর্য্যন্ত পুস্তক বা পত্রিকাদিতে তাঁহার জীবনী সম্বধে যাহা কিছু প্রকাশ হইয়াছে, এবং প্রাচীন ব্যক্তিগণ ও তাঁহার আত্মীয়দিগের নিকট হইতে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, এই পুস্তকে যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হইল।

আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান, পরিশ্রম, ও যত্ন করিয়াছি। সত্বরে প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে; সাধারণের নকট উৎসাহ লাভ করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সে সকল সংশোধিত হইবে।

কলিকাতা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১১ই মাঘ, ১২৮৮ সাল।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

তিন বৎসরের অধিক কাল হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত সমুদায় বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। নানা কারণে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। এক্ষণে ইহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হইল। এবার ইহাতে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক নূতন কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ন বিষয়ে আমি অনেক সদাশয় ব্যক্তির সাহায্যলাভ করিয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকটে রামমোহন রায়ের জীবনীসম্বন্ধীয় কোন কোন ঘটনা অবগত হইয়াছি। রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিতপ্রণেতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আমি সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের লিখিত, কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কুমারী কার্পেণ্টারের লিখিত রাজার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত (The Last Days in England of Rajah Ram Mohun Roy) হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্যলাভ করিয়াছি।

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছি। প্রথমবার মুদ্রিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে, উহা বঙ্গীয় পাঠকের নিকটে যেরূপ আদৃত হইয়াছিল, আশা করি, এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রতিও সেইরূপ তাঁহাদের অনুগ্রহদৃষ্টি পড়িবে। ইতি।

কলিকাতা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৭ই মাঘ, ব্রাহ্মাব্দ ৬০

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ, পাইকা অক্ষরে, ডিমাই আটপেজি, ঊনবিংশতি ফরমা। দ্বিতীয় সংস্করণ, স্মল পাইকা, ডিমাই বারপেজির পঞ্চবিংশতি ফরমা। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিগুণ হইবে। তৃতীয় সংস্করণ, স্মল পাইকা অক্ষরে, ডিমাই আটপেজি প্রায় সপ্তসপ্ততি ফরমা হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা তিন গুণেরও অধিক বড় হইয়াছে। ইহা যেরূপ বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত ও বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে একখানি নূতন গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এবারে রাজার জীবনী সম্বন্ধীয় অনেক নূতন কথা প্রকাশিত হইল। এতদ্ভিন্ন, কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়ে রাজার মতামত আমরা যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই তৃতীয় সংস্করণে রাজার অধিকাংশ গ্রন্থের সারমর্ম্ম দেওয়া হইল। রাজার গ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিয়া থাকেন। সুতরাং উহার মধ্যে যে কি অমূল্য রত্ন রহিয়াছে, তাহা অধিকাংশ লোকেই জানিতে পারেন না। আমাদের ভরসা হইতেছে যে, রাজার জীবনচরিত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রাজার অমূল্য গ্রন্থ সকলের সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকেই তৃপ্তি লাভ করিবেন।

রাজার বাঙ্গালা গ্রন্থ সকলের ভাষা, বর্ত্তমান সময়ের লোকের বোধসুলভ ও রুচি-সঙ্গত নহে বলিয়া এখনকার লোক তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না। সেইজন্য অনেক-স্থলে, আমরা রাজার রচনা, আধুনিক বাঙ্গলায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু ভাষা পরিবর্ত্তিত করিলেও রাজার অভিপ্রায় ও ভাব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা তিন প্রকারে কার্য্য করিয়াছি। প্রথম, কোন কোন স্থলে বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়া রাজার লেখা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। দ্বিতীয়, রাজার ভাষা, যে সকল স্থলে আধুনিক বাঙ্গলা হইতে ভিন্ন, কেবল সেই সকল স্থল পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়, কোন কোন স্থলে রাজার অভিপ্রায় ও ভাব আমরা নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তৃতীয় সংস্করণ রচনাকালে, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনী-লেখক, রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় রাজার জীবন-সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিষয় আমাকে অবগত করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ লিখিবার সময়েও বিদ্যানিধি মহাশয় রাজার জীবনীসম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঘটনা আমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

রাজার জীবনচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, রচনাকালে আর একজন মহোদয়ের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম. এ. মহোদয়, রাজার জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমাকে তাঁহার নিকটে চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে। ব্রজেন্দ্রবাবুর বিশেষ সাহায্যেই রাজার বাঙ্গালা ও ইংরেজী গ্রন্থনিচয়ের সারমর্ম্ম প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, এই পুস্তকের সপ্তদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার গ্রন্থাদি বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ব্রজেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায়। দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা এই তৃতীয় সংস্করণের যে পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর সাহায্য ব্যতীত কখনই সম্পন্ন হইতে পারিত না। এজন্য তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যেরূপ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভরসা করি, এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণের প্রতিও, তাঁহারা সেইরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন। ইতি।

কলিকাতা, **শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়**
৮ই মাঘ, ১৩০৩ সাল
৬৭ ব্রাহ্মাব্দ।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। এবারেও ইহা অনেক পরিমাণে, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এবার রাজার জীবনবৃত্তান্ত কালানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোভাগে, উহাতে কোন্ সাল হইতে কোন্ সাল পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনা সকলের বিবরণ আছে, তাহা লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে রাজার কোন কোন অমূলক অপবাদ খণ্ডনে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এবারে কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে, সে অংশ পরিত্যক্ত হইল। সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ ভাবী বংশীয়দিগের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া কখনই উচিত বলিয়া বোধ হয় না। সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারক মহাপুরুষদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কুসংস্কারান্ধ লোকে যে অনেক প্রকার অমূলক অপবাদ রটনা করিতে সঙ্কুচিত হয় না, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। মহাত্মা মার্টিন লুথারের পবিত্র চরিত্রে, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণ কলঙ্কারোপ করিতে নিরস্ত হয় নাই। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে প্রদর্শন করিয়াছি যে, রাজার নামে যে অপবাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল, বাস্তবিক তাহার কোন মূল নাই। কিন্তু আর প্রয়োজন নাই।

আমার লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশের পরে, কুমারী কলেটের লিখিত রাজার জীবনী প্রকাশ হইয়াছে। কুমারী কলেট যখন উক্ত পুস্তক লিখিতেছিলেন, তখন রাজার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার পত্র লেখা চলিত। তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, আমার পুস্তক হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতেছেন। এরূপও লিখিয়াছিলেন যে, কোন কোন স্থান অনুবাদ করিতেছেন। তাঁহার পত্রের উত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম যে, তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হইলে, তাহাতে রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে কিছু নূতন কথা থাকিবে, তাহা আমিও আমার গ্রন্থের ভাবী সংস্করণে, অবশ্য গ্রহণ করিব। তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক কথা লইয়াছি।

আক্ষেপের বিষয় যে, কুমারী কলেট তাঁহার পুস্তক সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। পুস্তকের কতক অংশমাত্র লিখিয়া, তাঁহার সংগৃহীত ঘটনা সকল কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। কলেটের সেই সুবিজ্ঞ বন্ধু তাঁহার পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন।

কুমারী কলেটের পুস্তক ভিন্ন, কোন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নূতন ঘটনা পাইয়াছি। যথাস্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ, সুপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ সময়ে,

যেরূপ সাহায্য দ্বারা এই পুস্তকের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এই চতুর্থ সংস্করণ সম্বন্ধেও সেইরূপ পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা ইহার অনেক উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছিলাম যে, পুস্তকের সপ্তদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে, রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার গ্রন্থাদি বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা সমস্তই ব্রজেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায়। ভাষা আমার। বর্ত্তমান সংস্করণে অধ্যায় সকলের পরিবর্ত্তন হওয়ায় বলিতে হইতেছে যে, ষোড়শ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায়, ভাষা আমার। অর্থাৎ তৃতীয় সংস্করণের সপ্তদশ ঊনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়, বর্তমান সংস্করণে ষোড়শ, অষ্টাদশ, ও ঊনবিংশ অধ্যায়রূপে পরিণত হইয়াছে।

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ক্রমশঃ উন্নতি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও, এই চতুর্থ সংস্করণ, তৃতীয় সংস্করণ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বড় হইয়াছে।

এ দেশ রাজার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ। তিনি এ দেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা অপরিশোধ্য। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আক্ষেপ করিয়াছেন যে, এরূপ হিতকারী মহাজনের একটি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক উপযুক্ত স্মরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইল না।

তিনি স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন:—"স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না?" অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের এই আগ্রহপূর্ণ বাক্যেও কোন উপযুক্ত ব্যক্তি রাজার জীবনী লিখিতে যত্ন করিলেন না। শুনিয়াছি, এক সময়ে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় রাজার জীবনবৃত্তান্ত লিখিবেন, মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল না।

এক দিবস ভক্তিভাজন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহিত এক স্থানে বসিয়া আছি: এমন সময় কথা উঠিল যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আনন্দ-মোহনবাবু রাজনারায়ণবাবুকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি এই মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। রাজনারায়ণবাবু বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতা জন্য উহা অস্বীকার করিলেন; কিন্তু আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, আমি রাজার জীবনচরিত লিখিবার ভার গ্রহণ করি। আমি আপনাকে এই মহৎ কার্য্যের অনুপযুক্ত জানিয়াও, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সুখের বিষয় এই যে, রাজনারায়ণবাবুর জীবদ্দশাতেই রাজার জীবনী প্রকাশিত হয়, এবং তিনি তাহা পাঠ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের প্রতি যেরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণের প্রতিও সেইরূপ করিলে আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব। ইতি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মোপাসকের লৌকিক জ্ঞান থাকে না, সুতরাং গৃহস্থ ব্রহ্মোপাসক হইতে পারেন কি না? ২৬ ; শাস্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে ; অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য কি না? ২৭ ; বেদের অনুবাদ শুনিলে শূদ্র পাপগ্রস্ত হয় কি না? ২৭ ; দ্বারবানের সাহায্যে যেরূপ রাজার নিকটে যাওয়া যায়, সেইরূপ সাকার উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি না? ২৮ ; বেদান্তভাষ্যের হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ ২৮ ; বেদান্তসার ও উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ ২৯ ; ব্রহ্ম কি, কেমন তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না ৩০ ; জগৎকে উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ হয় ৩০ ; বেদ নিত্য নহে ৩১ ; আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৩১ ; প্রাণবায়ু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৩১ ; জ্যোতিঃ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৩১ ; প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৩১ ; অণু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৩২ : জীব হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৩২ ; পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৩২ ; সূর্য্য হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৩২ ; নানা দেবতার জগৎকর্ত্তৃত্ব কথন আছে, কিন্তু জগৎকর্ত্তা এক ৩২ ; বেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা দেবতা ও আকাশ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম শব্দে বলা হইয়াছে ; কিন্তু ব্রহ্ম অপরিচ্ছেদ্য ও সর্ব্বব্যাপী ৩৩ ; ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ৩৩ ; ব্রহ্ম কোনমতে সবিশেষ নহেন ৩৩ ; ব্রহ্ম অরূপী নিরাকার ৩৪ ; ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু তিনি বিচিত্র শক্তি ৩৪ ; দেবতারা আপনাদিগকে জগতের কারণ ও উপাস্য কহিয়াছেন, সেইরূপ মনুষ্যও আপনাকে বলিতে পারে ; কিন্তু উহারা কেহই জগতের কারণ ও উপাস্য নহে ৩৪ ; ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদানকারণ ৩৪ ; ব্রহ্ম আপনি নামরূপাদির আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মসংকল্পই কারণ ৩৫ ; নশ্বর নামরূপের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায় না ৩৫ ; এই ব্রহ্মোপাসনাতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নানা উপাসনাতে অধিকার, কিন্তু তাহারা আপনার কিছুই করিতে পারে না, তাহারা সেই সকল উপাসিত দেবতার তুষ্টিসাধক, ভোজ্য অন্নস্বরূপ ৩৫ ; বেদে এককেই উপাসনা করিতে বলে ৩৬ ; ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে অন্য উপাসনা কর্ত্তব্য নয় ৩৬ ; ব্রহ্মোপাসনায় মনুষ্যের ও দেবতার তুল্য অধিকার ৩৬ ; ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য দেবতার পূজ্য ৩৬ ; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয় ৩৬ ; মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবে ৩৬ ; শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য ৩৭ ; ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ৩৭ ; যতির যেরূপ, গৃহস্থের সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ৩৭ ; ব্রহ্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, না করিলে পাপ নাই ৩৭ ; জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য ৩৭ ; বর্ণাশ্রমাচার না করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে ৩৮ ; অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ৩৮ ; যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেইখানে উপাসনা করিতে পারা যায় ৩৮ ; মৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই ৩৮ ; ব্রহ্মজ্ঞানী জন্মমৃত্যু হ্রাসবৃদ্ধি হইতে মুক্ত হয়েন ৩৮ ; ওঁতৎসৎ ৩৮ ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে বেদান্তমতের ব্যাখ্যা ৩৯ ; 'বেদান্ত-প্রবেশ' ও রামমোহন রায় ৪০ ; উপনিষদ্ প্রকাশ ৪০ ; সাকার উপাসনা কাহাদের জন্য? ৪২ ; ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব কি না? ৪৪ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন, সুতরাং পরমাত্মার উপাসনা কর্ত্তব্য ৪৪ ; ব্রহ্মোপাসনায় গৃহস্থের অধিকার ৪৫ ; শাস্ত্রে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ থাকিলেও, সাকার উপাসনা এ দেশে কেন পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে ৪৭ ; বিশ্বাস থাকিলেই উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় কি না? ৪৭ ; পুরুষানুক্রমিক প্রথা বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত ৪৭ ; পঙ্ক চন্দন, চোর সাধু ইত্যাদিকে সমান জ্ঞান কর না কেন? ৪৮ ; তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত কি কর্ম্ম কর? ৪৯ ; হিন্দুসমাজে আন্দোলনের প্রবণতা ৫১।

পঞ্চম অধ্যায়

সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাদ্রিসাহেবের সহিত বিচার

সপ্তম অধ্যায়

চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ

নবম অধ্যায়

সামাজিক আন্দোলন

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

স্বর্গারোহণ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের

জীবনচরিত

উপক্রমণিকা

ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী। তিনি অনেক পুরুষ-রত্নের জননী। স্বাধীন হিন্দু-রাজত্বকালের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই ; যে সময়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ গম্ভীর বেদগানে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেন, যে সময়ে ব্যাস ও বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতি বিধাতা-প্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বীণাধ্বনিতে ইন্দ্রজালের ন্যায় ভুবন বিমোহিত করিতেন, যে সময়ে কপিল ও গৌতম দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সকল ভেদ করিয়া মানববুদ্ধির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে সময়ে আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য প্রাকৃতিক তত্ত্বের জ্ঞান-পিপাসু হইয়া গগনমণ্ডল পর্য্যটন করিতেন, যে সময়ে অতুলপ্রতিভ পুরুষসিংহ শাক্যসিংহের সুগভীর গর্জ্জনে বৈদিকধর্ম্ম একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যে সময়ে সেই মহাপুরুষ মনুষ্যশক্তির অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ পৃথিবীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে সময়ের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সময়ে ভারতের গৌরবরবি অস্তগত হইল, যে সময়ে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে মুসলমানসম্রাট্ অধিষ্ঠিত হইলেন, যে সময়ে মুসলমানের প্রতাপে সমগ্র ভারত বিকম্পিত, তখনও বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিগণ এবং নানক ও গুরুগোবিন্দ, দাদু ও কবির, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবার যখন মুসলমানের প্রতাপসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল, যখন ইংরেজের বিজয়-নিশান সুদূরপ্রসারিত ভারতক্ষেত্রে উড্ডীন হইতে লাগিল, যখন বৃটিস্-সিংহের ভীষণ কবলে হিন্দু ও মুসলমানের প্রভাব পরাভব মানিল, সেই বৃটিস্-অধিকার কালেও ভারতমাতা পুরুষরত্নস্বরূপ পুত্ররত্নলাভে বঞ্চিত হন না। কিন্তু এই শেষোল্লিখিত

মহাত্মাদিগের মধ্যে নিঃসংশয়ে সর্বোচ্চস্থানীয় কে? যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের নাম এই প্রবন্ধের শিরোভূষণ হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অগ্রণী। তিনি বৃটিস্-অধিকারকালে ভারতাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

রামমোহন রায়ের জন্মকালে স্বদেশ ও বিদেশের অবস্থা

একশতাব্দী পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্যজ্ঞানের বিমলরশ্মি অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, যখন একসীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ভারতভূমির সর্ব্বত্র অশেষ অনিষ্টকর কুসংস্কার নিচয়ের একাধিপত্য লেশমাত্র বিচলিত হয় না, যখন ধর্ম্মের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আমোদ ও আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যানুষ্ঠানের পরাক্রম প্রতিহত হয় নাই, যখন দরিদ্র, ধনীর অত্যাচার এবং স্ত্রীলোক, পুরুষের অত্যাচার বংশপরম্পরায় বহুদিন হইতে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, যখন ভাগীরথীর উভয় তীর আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত চিতানল, অনাথা বিধবানারীর জীবন্ত দেহ ভস্মসাৎ করিত, সেই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী অনলরাশির ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে ইংলণ্ডীয় মহাসভায় চ্যাথাম্, বর্ক, ফক্স্ প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মীগণের অগ্নিময় বক্তৃতা, ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, যে সময়ে আমেরিকা-নিবাসীগণ পরাধীনতারূপ কঠোর নিগড় ভেদ করিবার জন্য প্রাণগত যত্ন করিতেছিলেন এবং ফ্র্যাঙ্ক্লিন্, ওয়াসিংটন্ প্রভৃতি মহাত্মারা উক্ত মহদুদ্দেশ্যসাধন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে সময়ে "সভ্যতার রত্নখনি" ফরাসীভূমিতে প্রবল ঝঞ্ঝাঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ-স্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইতেছিল ;—ভল্‌টেয়ার ও রুশোর ঐন্দ্রজালিক লেখনী স্বাধীনতা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণাপূর্ব্বক জাতীয় মহাবিপ্লবের দিন নিকটতর করিতেছিল, যে সময়ে ভারতবর্ষে, ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের বুদ্ধিচাতুর্য্য ও প্রবল প্রতাপে বৃটিস্‌সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকৃত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাঢ়ভূমির গৌরব

রাঢ়ভূমি বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্মস্থান। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও ন্যায়দর্শনের গৌরববিকাশের জন্য যে নবদ্বীপ চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা রাঢ়ভূমির অন্তর্গত। যে সকল মহাত্মাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশ ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবাসী। "ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত"লেখক* বলেন, "আদি কবি বিদ্যাপতি, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, চৈতন্য চরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চণ্ডীকাব্যরচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, মহাভারতের অনুবাদকর্তা কাশীরাম দাস, শিবসংকীর্ত্তনরচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ অন্নদামঙ্গলরচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি সকল কবিগণই ভাগীরথীর পশ্চিম-পারবাসী। ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে কেবল চৈতন্যমঙ্গলকাব্যরচয়িতা বৃন্দাবন দাস,

* কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

† কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করেন নাই। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না। বোধ হয়, কথক প্রভৃতির মুখে শুনিয়া তিনি পদ্য রচনা করিতেন। তিনি নিজে বলিতেছেন :—"শ্রুতিমাত্র লিখি আমি রচিয়া পয়ার।"

রামায়ণকাব্য রচয়িতা কৃত্তিবাস, এবং বিদ্যাসুন্দর, কালী ও কৃষ্ণকীর্ত্তনরচয়িতা রামপ্রসাদ সেন প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু এই তিন জন কবির মধ্যেও প্রাচীন কবি বৃন্দাবন দাসের পিতার বাসস্থান ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ছিল। নবদ্বীপনিবাসী শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বঙ্গভাষায় গদ্য লিখিবার যে বিশুদ্ধ প্রণালী চলিত হইয়াছে, তাহাও পরপারবর্ত্তী প্রদেশবিশেষের মহোদয়গণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ইহার সূত্রপাত করেন ; পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরা ইহার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা করিয়া তুলেন। এই প্রদেশবাসীরাই চণ্ডীর গান, যাত্রা, কীর্ত্তন, গাছরামায়ণ প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শন করেন। অঙ্কবিদ্যার জ্যোতিঃও ঐ পার হইতে এই পারে বিকীর্ণ হয়। কারণ, এ প্রদেশে যে সকল পাঠশালা ছিল তাহার গুরুমহাশয়েরা প্রায়ই পশ্চিমপারবাসী ছিলেন।" রাজা রামমোহন রায় ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী রাঢ়ভূমির অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে একখানি পত্রে, নিতান্ত সংক্ষেপে, আত্মচরিত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই পত্রখানি অনুবাদ করিয়া দিলাম।

রামমোহন রায়ের স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী

"প্রিয়বন্ধু,

"আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিবার জন্য আপনি আমাকে সর্ব্বদাই অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে আমি আহ্লাদের সহিত আমার জীবনের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিতেছি।

"আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিকধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে ; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতি লাভ, কখনও বা পতন ; কখন ধনী, কখন নির্ধন ; কখন সফলতালাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ-বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজক-ব্যবসায়ী ; এবং উক্ত ব্যবসায়িগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীস্থ অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা, তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।

"আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান-রাজসরকারে কার্য্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ-বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই ; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত।

"ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত

হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিস্‌শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন ;—আমি পুনর্ব্বার তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান্, অধিকদৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম ; তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাদিগের শাসন, বিদেশীয় শাসন হইলেও, উহাদ্বারা শীঘ্র দেশবাসিগণের অবস্থোন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কারবিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল ; এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনর্ব্বার বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই তিন জন স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌বাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত তাঁহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

"আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্ত্বেও, আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দের বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবাসিগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুবৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন, ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে, ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারী-

দের নিকট আবেদন করিবার জন্য, তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন। আমি তদনুসারে, ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে, ইংলণ্ডে আসিয়া উত্তীর্ণ হই।

"আমি আশা করি, এই বৃত্তান্তটি সংক্ষিপ্ত হইল বলিয়া আপনি ক্ষমা করিবেন; কেননা এখন বিশেষ বিবরণ সকল লিখিবার আমার অবকাশ নাই।

রামমোহন রায়।"

কুমারী কার্পেণ্টর অনুমান করেন, রামমোহন রায় এই পত্রখানি তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধু গর্ডন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ফরাসিদেশে যাইবার অব্যবহিত পূর্বে ইহা লিখিত হয়। প্রথমে ইহা এথিনিয়ম ও লিটারেরি গেজেট পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে উহা হইতে অন্যান্য সংবাদ পত্রেও উদ্ধৃত হইয়াছিল।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের

জীবনচরিত

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্বপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল

বংশ ও জন্মবৃত্তান্ত

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, হুগলি জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকের শেষভাগে (১৭৭৪ খৃীঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন।* উপক্রমণিকায় যে পত্রখানির অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন, "আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন।" অত্যাচারী বাদশাহ আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রপিতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন।† মুরশিদাবাদ জিলার অন্তঃপাতি শাঁকাসা গ্রামে ইঁহার আদি নিবাস ছিল। ইনি তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রই শাঁকাসা গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধানগরে বাস করেন। বাসস্থান পরিবর্ত্তনের কারণ এইরূপ কথিত আছে।—নবাব তাঁহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী মহাশয়দিগের জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। লোকে তাঁহাকে শিকদার বলিত। অদ্যাবধি তথায় শিকদারপুকুর নামে একটি

* খৃীষ্টের উপদেশ সঙ্কলন করিয়া রামমোহন রায় যে পুস্তক প্রকাশ করেন, কয়েক বৎসর গত হইল, তাহা তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে যে, তিনি ১৭৮০ খৃীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ চরিতাখ্যায়ক ১৭৭৪ খৃীঃ অংকে জন্মবৎসর বলিয়াছেন; এবং অনুসন্ধানে তাহাই ঠিক বলিয়া প্রতীত হইল।

† লিওনার্ড সাহেব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যের শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষ। আমরা অনুসন্ধানদ্বারা জানিয়াছি যে, এ কথার কোন মূল নাই।

পুষ্করিণী আছে। স্থান মনোনীত হওয়াতে "পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র, এই স্থানে সুবিখ্যাত
অভিরামগোস্বামীপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের শ্রীপাট সন্নিকট, রাধানগর নামক গ্রামে
বাসস্থাপন করেন।" কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম অমরচন্দ্র, মধ্যম হরিপ্রসাদ
কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ। ব্রজবিনোদ রায় সম্পত্তিশালী, দেবভক্ত এবং পরোপকারী ছিলেন
ব্রজবিনোদ নবাব সিরাজুদ্দৌলার অধীনে মুরশিদাবাদে কোন সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন
কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে
আসিয়া অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পিতৃকুল বৈষ্ণব এবং মাতামহকুল শাক্ত মতাবলম্বী। এই
বৈষ্ণব ও শাক্ত বংশের পরস্পর কুটুম্বিতা সংঘটন সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গল্পটি
এই:—ব্রজবিনোদ রায় অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরা
নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য
সম্ভ্রান্তবংশীয়। ইঁহারা দেশগুরু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজবিনোদ রায় তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ
করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, শ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই আজ্ঞা
করুন যে, আপনার কোন একটি পুত্রকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি।" শ্যাম
ভট্টাচার্য্য শাক্ত ও ভঙ্গকুলীন; সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে সহজেই অসম্মতি হইবার কথা
কিন্তু ব্রজবিনোদ রায় কি করেন? তিনি ভাগীরথী সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহা
কামনা পূর্ণ করিবেন। সুতরাং অস্বীকার করা অসম্ভব হইল। তিনি তখন আপনার
পুত্রগণের প্রত্যেককে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে ক্রমে ক্রমে
ছয় জন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার পঞ্চম পুত্র রামকান্ত আহ্লাদপূর্ব্বক
পিতৃসত্য পালনে অঙ্গীকার করিলেন। এই রামকান্তের ঔরসে ও শ্যাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা
তারিণী দেবীর গর্ভে তিনটি সন্তান প্রসূত হয়। প্রথম, একটি কন্যা। ঐ কন্যার নাম
জানা যায় নাই। দ্বিতীয় পুত্র, নাম জগন্মোহন। তৃতীয়, রামমোহন। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়
নামক এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সহিত কন্যাটির বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের
পিতা ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পুত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায়
রামমোহন রায়ের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। তিনি তাঁহার মাতুলকে অতিশয় ভালবাসিতেন
রামমোহন রায়ের জননী তারিণীদেবীকে পরিবারস্থ সকলে ও অন্যান্য লোকে 'ফুল
ঠাকুরাণী' বলিত। রামকান্ত যেন পিতৃভক্তি ও স্বার্থত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ রামমোহন
রায়রূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। রামলোচন নামে তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন
রামমোহন ও জগন্মোহন উভয়ের অপেক্ষা তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ।

মাতার সদ্‌গুণ

মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতার চরিত্র ও সদ
গুণ অনেকেরই মহত্ত্ব ও অসাধারণত্বের মূল। নেপোলিয়ান, ওয়াসিংটন্, ম্যাট্‌সি
থিয়োডার্ পার্কার প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। রামমোহন রায়ের জননী যার পর না
সদ্‌গুণশীলা রমণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী বিরল ছিল
কোন প্রকার মিথ্যা বা কুৎসিত ব্যবহার তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। দেশপ্রচলিত ধর্মে
তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহা
শেষাবস্থায় তিনি জগন্নাথদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট স্বীকার
করিয়া যাইতে হয়, এই বিশ্বাসবশতঃ, সাংসারিক অবস্থা ভাল থাকা সত্ত্বেও, তিনি সঙ্গে

।কজন দাসী পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই ; এমন কি, পথে তাঁহার সুবিধা ও সুখের জন্য কান প্রকার উপায় করিতেও দেন নাই ; দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিয়াছলেন। পরলোকগমনের পূর্ব্বে, এক বৎসরকাল, দাসীর ন্যায় জগন্নাথদেবের মন্দির ম্মার্জ্জনীর দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কৃত করিতেন। আবার এরূপও কথিত আছে যে, তিনি ত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে, রামমোহন রায়কে বলিয়াছিলেন, "রামমোহন! তোমার মতই ঠক। আমি অবলা স্ত্রীলোক, এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছি ; সুতরাং যে সকল পৌত্তলিক নুষ্ঠানে আমি সুখ পাইয়া থাকি, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে পারি না!" অনেক রলবিশ্বাসী সাকারবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন। রাজা রামমোহন ায়ের মাতার সেই প্রকার ভাব বলিয়াই মনে হয়।

একটি গল্প

ফুলঠাকুরাণীর শাক্তবংশে জন্ম হইলেও তিনি স্বামীগৃহে আসিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা ন। এস্থলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট একটি গল্প বলিব। ফুলঠাকুরাণী একবার কান উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া পিতৃভবনে আসিয়াছিলেন। ।কদিন শ্যাম ভট্টাচার্য্য ইষ্টদেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনকে পূজোপকরণ বিল্বদল দান করেন। ফুলঠাকুরাণী আসিয়া দেখেন যে, রামমোহন বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতেছেন। দখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিতা ফুলঠাকুরাণীর বড়ই ক্রোধ হইল। তিনি সন্তানের মুখ হইতে বল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন ; এবং তজ্জন্য পিতাকে তিরস্কার রিলেন। কন্যাকর্তৃক তিরস্কৃত হওয়াতে শ্যাম ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ ইয়া তিনি কন্যাকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে, "তুই অহঙ্কার করিয়া আমার পূজার বল্বপত্র ফেলিয়া দিলি ; তুই এই পুত্র লইয়া কখনও সুখী হইতে পারিবি না। এই পুত্র ালে বিধর্ম্মী হইবে।" পিতার মুখে অভিসম্পাত শুনিয়া ফুলঠাকুরাণী একান্ত কাতর ইয়া পড়িলেন। শাপান্ত হইবার জন্য পিতার চরণে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমার বাক্য অব্যর্থ : তবে তোমার পুত্র রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক ইবে।" পাঠকবর্গ এ গল্পটি বিশ্বাস করিতে অবশ্যই বাধ্য নহেন। আমরাও তদ্বিষয়ে াঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে পারি না। তবে উহা সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে পারে। য়ে তো কিছু মূল ছিল, রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী জীবন দেখিয়া লোকে কল্পনাবলে সই মূলটিকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী বশুরালয়ে গিয়া স্বামীকে অভিসম্পাতের কথা বলিলেন, এবং উভয়ে আপনাদিগের বিশ্বাস ও সংস্কারানুসারে পুত্রের ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে যত্নশীল হইলেন।

রামকান্ত রায় ও লাঙ্গুলপাড়ায় বাস

রামকান্ত রায়ও, পিতৃদৃষ্টান্তানুসারে, প্রথমে মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে কর্ম্ম রেন। কিন্তু তাঁহারও প্রতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার হওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধানগরে আসিয়া অবস্থিতি করেন।

রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানাধিপতির জমিদারীর অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বর্দ্ধমানরাজের সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই কলহ হইত। রাজার অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে রামকান্ত রায় বিষয়কর্ম্মে অত্যন্ত উদাসীন ইয়াছিলেন। একটি তুলসীর উদ্যানে বসিয়া সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিতেন। সময়মত

বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। রামকান্তের প্রতি এই প্রকার অসদ্ব্যবহারবশতঃ রায়বংশীয়েরা বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। কথিত আছে, রামমোহন রায় যৌবন-কালে একবার রাজা তেজচন্দ্রের সমক্ষে তাঁহার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের মৃত্যুর পর, কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের সঙ্গে বর্দ্ধমানরাজ মহাতাবচন্দ্রের সদ্ভাব হইয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রায়বংশ বহুবিস্তৃত হওয়াতে, রামকান্ত সপরিবারে লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

অল্প বয়সে রামমোহন রায়ের প্রচলিত ধর্ম্মে নিষ্ঠা

নিতান্ত অল্প বয়সেই প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি রামমোহন রায়ের আন্তরিক আস্থা জন্মিয়াছিল। তিনি গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দকে যার পর নাই ভক্তি করিতেন। শুনা যায় যে, তাঁহার বিষ্ণুভক্তি এত প্রবল ছিল যে, তিনি বাটীতে কখন মানভঞ্জন যাত্রা হইতে দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার চরণে ধরিয়া কাঁদিবেন, শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে, "ইহা ভারতের ভাবী ধর্ম্মসংস্কারের চক্ষুশূল ছিল।" কথিত আছে যে, এক সময়ে তিনি ভাবগতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এরূপ গল্প আছে যে, তিনি বহু অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক ষ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মভাব যার পর নাই প্রবল ছিল। ১৮২৬ সালে তাঁহার বন্ধু উইলিয়ম আড্যাম সাহেব তাঁহার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প তাঁহার প্রবল হয়। তাঁহার মাতার কাতর মিনতিতেই তিনি উহা হইতে নিবৃত্ত হন।

বাল্যশিক্ষা ও মত পরিবর্ত্তন

ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় রামমোহন রায়ের বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী এবং মৌলবীদিগের পারসী ও আরবী শিক্ষার স্থান, এই তিন প্রকার শিক্ষার স্থান ছিল। শৈশবকালেই তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি সম্বন্ধে আশ্চর্য্য গল্প সকল প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি পিতৃগৃহেই পারস্য ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু উক্ত ভাষায় বিশেষ উন্নতি ও আরবী শিক্ষার জন্য, নবম বৎসর বয়সে, রামকান্ত রায় তাঁহাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় দুই তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়া আরবী ভাষায় ইউক্লিড্ ও আরিষ্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। এই উভয় গ্রন্থ পাঠে, তাঁহার স্বভাবতঃ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি বিশেষরূপে সম্মার্জ্জিত হয়, এবং যে তর্কশক্তি উপধর্ম্মনিচয়ের ভিত্তিমূল বিকম্পিত করিয়াছিল, তাহা প্রথমে এইরূপেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এমনও বোধ হয় যে, আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠ জন্য ও মুসলমান মৌলবীদিগের সংস্রবে আসাতে, তাঁহার মনে এই সময়েই একেশ্বরবাদের ভাব প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুফীদিগের গ্রন্থপাঠে তিনি অত্যন্ত আসক্ত হন। এই আসক্তি যাবজ্জীবন প্রবল ছিল। পরিণত বয়সে, তাঁহার প্রিয় হাফেজ্, মৌলানারুমি, শামী তাব্রিজ্ প্রভৃতি সুফী কবিগণের গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি কবিতা উৎসাহের সহিত আবৃত্তি করিতেন। সুফীদিগের মত, বেদান্তধর্ম্ম ও প্লেটোর মতের অনুরূপ। সুতরাং ইহাও তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের একটি বিশেষ কারণ বলিয়া বোধ হয়।

উপধর্ম্মের প্রতিবাদ ও দেশভ্রমণ

পাটনায় পারসী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বিশেষরূপে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ করিবার উদ্দেশে, রামকান্ত রায় তাঁহাকে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে, কাশীতে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় অল্পকালের মধ্যে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রে আশ্চর্য্যরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। গৃহপ্রত্যাগমনের পর, তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মসম্বন্ধে চিন্তা করিতেন, এবং তজ্জন্য প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইত। প্রথমতঃ মুসলমান শাস্ত্রের একেশ্বরবাদ ও তৎপরে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান, এই উভয়ই তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে পিতা পুত্রে মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইত। রামকান্ত রায় পুত্রের ভিন্ন মতি দেখিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। বিরক্তির কারণ ক্রমে অনেকগুণে বৃদ্ধি হইল।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে আড্যাম সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহার পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া অথচ ঈষৎ হাস্যের সহিত আমাকে বলিলেন যে, আমার পিতা আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, "আমি আমার মতের স্বপক্ষে যে কোন যুক্তি বলি, তুমি প্রথমে একটি 'কিন্তু' বলিয়া তাহার উত্তর আরম্ভ কর।" সচরাচর তিনি ধৈর্য্যের সহিত পুত্রের কথা শুনিতেন, কিন্তু উক্ত দিবস বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। কখন কখন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত।

রামমোহন রায় এই সময়ে (প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়সে) প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। যখন পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে সমগ্র দেশ নিমজ্জিত, যখন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার একটি রশ্মিও সেই অন্ধকার ভেদ করে নাই, যখন সমুদয় দেশের মধ্যে একটিও ইংরেজী বিদ্যালয় বা তদনুরূপ বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ, কেবল-মাত্র পারসী ও সংস্কৃতজ্ঞ, এক ষোড়শবর্ষীয় হিন্দু বালক পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিল! ইহারই নাম প্রতিভা! তখন অবশ্য সেই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার সুবিধা ছিল না ; রামমোহন রায় কেবল উহা রচনা করিয়াছিলেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে সদ্ভাবের আর কোন সম্ভাবনা থাকিল না।

রামমোহন গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। উপক্রমণিকায় তাঁহার যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি নিজে বলিতেছেন যে, তাঁহার বয়স তখন প্রায় ষোড়শ বৎসর। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণকালে, তত্রত্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা শিখিয়াছিলেন। সেই জন্য, পরিণত বয়সে, অনেক সময় তাঁহাকে নানক, কবির, দাদু প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের গ্রন্থ হইতে কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত। পরিশেষে হিমগিরি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তিব্বত দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপক্রমণিকায় প্রকাশিত পত্রে, তিনি নিজে বলিতে-ছেন যে, বিদেশীয় অধিকারের প্রতি ঘৃণাবশতঃ তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যান। কিন্তু তাঁহার জীবনবৃত্ত লেখকগণ তাঁহার তিব্বতযাত্রার একটি বিশেষকারণ বলেন ; —বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় অনুসন্ধান। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাভাবিক অসাধারণ মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে তাঁহার জীবনের এই একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইল। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষ কুসংস্কার-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যখন পাশ্চাত্য-জ্ঞানের একটিও রশ্মি সেই তিমিরজাল ভেদ করে নাই, যখন ভারতে ইংরেজীশিক্ষা, বক্তৃতা,

সংস্কার এ সকলের সূত্রপাতমাত্রও হয় নাই, তখন প্রায় ষোড়শবর্ষীয় এক বালক দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়া পিতৃগৃহ হইতে বিদূরিত হইল! কেবল তাহাই নহে। যখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, রেলওয়ে ছিল না, এক দিবসে প্রয়াগ-যাত্রা উপন্যাসের কথা ছিল, সর্ব্বত্রই দস্যু তস্করের ভয়, সেই সময়ে, এক জন বাঙ্গালী বালক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল! কেবল তাহাই নহে। যে সময়ে হিমাচলকে পৃথিবীর সীমা বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, যে সময়ে সাত শত বৎসরের কঠোর নিষ্পেষণে স্বাধীনতার ভাব দেশবাসিগণের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে সময়ে চিরপ্রচলিত কুসংস্কারে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিমজ্জিত, যে সময়ে বিদেশভ্রমণ বঙ্গবাসীর পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর ও কষ্টকর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই সময়ে প্রায় ষোড়শবর্ষীয় এক বাঙ্গালীর সন্তান, বিদেশীয় শাসনের প্রতি আন্তরিক ঘৃণাবশতঃ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব সকল অবগত হইবার জন্য, সম্পূর্ণরূপ সহায়সম্বলবিহীন অবস্থায়, তিব্বত দেশে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং এই অসাধারণ বালক সেই বন্ধুহীন দেশে কিছুকাল বাস করিল!

স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা

রামমোহন রায় এখানে মধ্যে মধ্যে বিপদে পড়িতেন। তিব্বতবাসিগণ লামা উপাধি-ধারী জীবিত মনুষ্যবিশেষকে এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। লামার মৃত্যু হইলে তাহারা কতকগুলি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত একটি বালককে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করে। মনে করে যে, লামা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীরান্তর গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। তিব্বৎ দেশে অবতারবাদ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বিদূরিত হইয়াছেন, তাঁহার উহা সহ্য হইবে কেন? তিনি সেই বন্ধুবিহীন দেশে মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতেন। তদ্দেশবাসী পুরুষগণ এই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইত, এবং তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তিনি কোমল-হৃদয়া রমণীকুলের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। রাজা রামমোহন রায় চিরদিন নারীজাতির পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে, বন্ধুবান্ধবসন্নিধানে, স্বদেশে বা বিদেশে সর্ব্বত্র, তিনি নারী-চরিত্রের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেন। তিব্বতবাসিনী রমণীগণের সদ্ব্যবহার তাঁহার তরুণহৃদয়ে এই নারীভক্তির বীজ বপন করিয়া দেয়। কুমারী কার্পেণ্টর বলেন, "রামমোহন রায়ের সুকোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয়, চল্লিশ বৎসর পরেও, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই সময়ের ঘটনা সকল স্মরণ করিত। তিনি (রামমোহন রায়) নিজে বলিয়াছেন যে, তিব্বতবাসিনী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।"

তিনি হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী আরও কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন ; কিন্তু আমরা তাহার বিশেষ বিবরণ কিছু বলিতে পারি না। যদি তিনি তাঁহার এই সকল ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন, নিশ্চয়ই উহা একটি অতি উপাদেয় পদার্থ হইত। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর, তিনি "সংবাদ কৌমুদী" নামক একখানি পত্রিকা প্রচার করেন। তাহাতে বাল্যভ্রমণসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও কৌমুদী এক্ষণে কোথাও পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন, শাস্ত্রচর্চ্চা, পুনর্ব্বর্জ্জন ও বিষয়কর্ম্ম

গৃহপ্রত্যাগমন

রামমোহন রায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিবার জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে লোক প্রেরণ করিলেন। বিংশতি বৎসর বয়সে, চারি বৎসরকাল বিদেশভ্রমণ করিয়া, প্রেরিত লোকের সঙ্গে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রামকান্ত রায় যার পর নাই আদরের সহিত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। রামকান্ত রায় বলিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ যেরূপ ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার রামের শোকে তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, সন্তানবৎসলা ফুলঠাকুরাণী হারাধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

বিবাহ

রামমোহন রায়ের তিন বিবাহ। অল্প বয়সেই তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার পিতা ক্রমে এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একটি বিবাহ দেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর এক বৎসর মধ্যেই এই বিবাহ দেওয়া হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায় নয় বৎসর। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কুড়মন পলাশি গ্রামে তাঁহার একটি বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী উমাদেবীর পিত্রালয় কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ভবানীপুরে। ইঁনি মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। মহাত্মাদিগের জীবনও যে সাময়িক কুসংস্কার ও কুপ্রথার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না, পুরাবৃত্ত তদ্বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্যদান করিতেছে। রামমোহন রায়ের জীবন এ নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। তাঁহার জীবনেও বহুবিবাহরূপ কলঙ্কস্পর্শ হইয়াছিল। কিন্তু অল্পবয়সে, প্রায় নয় বৎসর মাত্র বয়সে, পিত্রাদেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নহে।

পিতাকর্ত্তৃক পুনর্ব্বর্জ্জন

বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর, রামমোহন রায় অত্যন্ত পরিশ্রমসহকারে, একাগ্রচিত্তে, সংস্কৃতশাস্ত্রের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে, অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই সময় হইতেই প্রকৃষ্টরূপে তাহার আয়োজন করিতেছিলেন। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে তাঁহার পিতার সহিত তর্ক বিতর্ক হইত। এই সকল তর্ক বিতর্কে, রামকান্ত রায় পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, যার পর নাই দুঃখিত হইতেন ; কিন্তু তিনি তজ্জন্য স্পষ্টভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন না। সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে প্রকারান্তরে তাঁহার প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিতেন মাত্র। রামকান্ত রায় মনে করিয়াছিলেন যে, তিন চারি বৎসর বিদেশে অসহায় অবস্থায় বহু কষ্ট পাওয়াতে

রামমোহন রায়ের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। তিনি এখন শান্ত শিষ্ট হইয়া সাংসারিক সুখে মন দিবেন ; পৈতৃক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবেন না। কিন্তু তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাহসের সহিত সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে গৃহ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতেন। ১৮২৬ সালে, রামমোহন রায়ের বন্ধু আড্যাম সাহেব বলেন যে, রামমোহন রায় এই সময় ১২।১৩ বৎসর কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি তথায় সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন। রাজার দেহত্যাগের পর, ১৮৩৩ সালে লণ্ডন নগরে, একটি বক্তৃতায় ডবলিউ জে ফক্‌স সাহেব বলেন যে, এই সময়ে রামমোহন রায়ের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার পিতার ক্রুদ্ধ মুখ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। সম্ভবতঃ তিনি এ কথা রামমোহন রায়ের নিজ মুখে শুনিয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগ, পিতৃসম্পত্তি, মোকদ্দমা ও ফুলঠাকুরাণী

রামকান্ত রায়, ১৭২৫ শকে, বাঙ্গালা ১২১০ সালে, ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর সময়, রামমোহন রায়, তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি আড্যাম সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে তাঁহার পিতা এরূপ ভক্তির সহিত রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হওয়া অসম্ভব। রামমোহন রায়ের একজন জীবনীলেখক বলেন, "রামকান্ত রায় মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনার সমুদয় সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন।" কিন্তু রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুর অনেক দিন পর পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর, ১৮২৩ খৃীঃ অব্দে কিস্তিবন্দি বন্ধকের পাওনা টাকার জন্য, কলিকাতা প্রভিন্‌শ্যাল কোর্টে তাঁহার নামে নালিশ করেন। তিনি তাহার এই উত্তর দেন যে, তিনি পৈতৃক বিষয় গ্রহণ করেন নাই বলিয়া হিন্দুব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে পিতৃঋণের জন্য দায়ী নহেন। কোন কোন ব্যক্তির এ প্রকার সংস্কার আছে যে, পিতৃঋণের জন্য দায়ী হইতে হইবে বলিয়া, অথবা অন্য কোন কারণে, তিনি পিতৃসম্পত্তি আদবেই গ্রহণ করেন নাই। একথা সত্য নহে। তাঁহার বন্ধু আড্যাম সাহেব, তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে, তাঁহার বিষয়ে বিলাতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় প্রকাশ্যরূপে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে, তাঁহার জননী তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া, তৎকালীন আইনানুসারে, তাঁহাকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার জন্য সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে বিধর্ম্মী বলিয়া, কখনই স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষগণও তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া আদালতে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, উপক্রমণিকায় তাঁহার যে পত্রখানি অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন ;—"আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল" ; ইত্যাদি।

রাজা রামমোহন রায়ের পৈতৃক বিষয়াধিকার সম্বন্ধে তাঁহার প্রদৌহিত্র আর্য্যদর্শন পত্রে লিখিয়াছেন :—"প্রচলিত আইনানুসারে যদিও তিনি পিতৃধনের সম্পূর্ণ অধিকারী, তথাপি পার্থিবসুখে বীতরাগ বিনয়ী রামমোহন, আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে সমস্ত গ্রহণ করিতে বিরত হন। যাহা হউক, সকলই পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাঁহার মাতার অধীনে রহিল। তিনি জমিদারী কার্য্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অতি সুচারুরূপে

কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন। এদেশীয় জমিদারী কার্য্যনিচয় যেরূপ জটিল ও তাহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক্, অনেক সময় কত পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটি বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধিমত কার্য্যসম্পাদন কতদূর কঠিন বিষয়, তাহা বলা যায় না। কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী, গৃহদেবদেবী রাধাগোবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জমিদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।"

পিতার মৃত্যুর পর, তিনি পুনর্ব্বার গৃহে আসিয়া বাস করিলেন। তাঁহার জ্ঞানানুরাগ তখনও সমভাবে প্রবল ছিল। শাস্ত্রাধ্যয়নে তাঁহার আশ্চর্য্য আসক্তি দেখিয়া পরিবারস্থ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ অবাক্ হইয়াছিলেন।

পাঠাসক্তি বিষয়ে গল্প

তাঁহার পাঠাসক্তি সম্বন্ধে রায়বংশীয়দিগের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদিন তিনি প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক একটি নির্জ্জনগৃহে বসিয়া সংস্কৃত বাল্মীকী রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে কখন তিনি উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই ; সুতরাং বিশেষ আগ্রহাতিশয়সহকারে পাঠারম্ভ করিলেন। ক্রমে অধিক বেলা হইল, দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, অথচ তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল না। পরিবারবর্গকে তিনি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন কখন তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত উপস্থিত না করে। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অথচ কাহারও সাহস হইল না যে, গম্ভীর-প্রকৃতি রামমোহনের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার করিলেন, রামমোহন অধ্যয়নে নিমগ্ন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইল। পুত্র অনাহারী থাকিতে জননী ফুলঠাকুরাণী কেমন করিয়া আহার করেন! তখন রামমোহন রায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন রাধানগরনিবাসী একব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক তাঁহার গৃহদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় বুঝিতে পারিয়া আর একটু প্রতীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া আহারাদি করিলেন। কথিত আছে, তিনি এই এক দিনের মধ্যে একাসনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

সতীদাহ নিবারণের প্রতিজ্ঞা

মহাজনগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এক একটি ঘটনায়, (হয় তো অতি সামান্য কোন ঘটনায়) অনেক সময়ে, তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিধাতার অঙ্গুলি সেই সকল ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে নূতন সত্য ও কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করে। জীবনে শত শত দিন কে না শ্মশানে শব লইয়া যাইতে দেখে? কিন্তু কপিলবস্তুর রাজকুমার উহা দেখিয়া সিংহাসন চরণে ঠেলিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক অর্দ্ধজগদ্ব্যাপী অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর শত শত লোক কি বজ্রাঘাতে মৃত্যু দেখে নাই? কিন্তু মার্টিন লুথর তজ্জন্যই সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন্ শিশু না ক্ষুদ্র ইতর জন্তুদিগকে প্রহার করে? কিন্তু চারি বৎসর বয়স্ক থিওডোর পার্কার, একটি কূর্ম্মকে মারিতে গিয়া বিবেকের গূঢ় কার্য্য দেখিতে পাইলেন। সেইরূপ, রামমোহন রায়ের সময়ে চিতানলে জীবিত সতীর মৃত্যু কে না দেখিত? কিন্তু তন্মধ্যে তিনিই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর সহমরণব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতকাল বাঁচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা সমূলোৎপাটিত করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবেন। তিনি তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত

করিবার জন্য অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। "চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্যভান্ড বাজিতেছে, সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিতেছে ; এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কান্ড দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না সহমরণ প্রথা রহিত হয়, সে পর্য্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তিনি কখনই বিরত হইবেন না।" * ১৮১১ সালে এই সতীদাহ

ইংরেজী শিক্ষা

যে সকল গুণ ও ক্ষমতা থাকিলে নবাব সরকারে কর্ম্ম পাওয়া যায়, রামকান্ত রায় পুত্রকে তদুপযোগী শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃপিতামহ সকলেই নবাব সরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার করাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সে সময়ে আদালতে পারস্য ভাষা চলিত ছিল। ১৭৭৪ সালে সুপ্রিমকোর্ট সংস্থাপিত হওয়া অবধি ইংরেজীর চর্চা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখনও অন্যান্য সর্ব্বত্র পারস্য ভাষারই চলন ছিল। সুতরাং রামমোহন রায় দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষা কিছুই জানিতেন না। ঐ সময়ে তিনি প্রথম ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি উহা মন দিয়া শিক্ষা করেন নাই। সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় লিখিত শাস্ত্র সকল অধ্যয়নেই তিনি বিশেষ অভিনিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। সুতরাং সাতাশ আটাশ বৎসর বয়সেও, তিনি সামান্য সামান্য বিষয়ে কোন প্রকারে ইংরেজী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন মাত্র। ইংরেজী রচনা প্রায় কিছুই পারিতেন না।

এই সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৮০৩ কিংবা ১৮০৪ সালে, রামমোহন রায় মুর্শিদাবাদে বাস করেন। তথায় তহফত-উল-মুওয়াহিদ্দীন নামক এক খানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকের নামের অর্থ, একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার। (পরিশিষ্ট দেখ।)

গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ ও আত্মসম্মান রক্ষা

এই সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। মুসলমান রাজশাসনের যতই কেন দোষ থাকুক্ না, উহার একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদ লাভেও হিন্দু, মুসলমান উভয় জাতির সমান অধিকার ছিল। কেবল প্রধানমন্ত্রীত্ব নহে, প্রধান সেনাপতির পদ পর্য্যন্ত হিন্দুরা লাভ করিতে পারিতেন। কঠোরহৃদয় অত্যাচারী বাদশাহ আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত সিং, একজন হিন্দু। সুসভ্য ইংরেজ জাতির অধীনে আমাদের সে সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে। সিবিল সর্‌ভিসের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত বটে, কিন্তু তাহাতেও কত বাধা ও অসুবিধা। তথাচ, বর্ত্তমান সময়ে

* রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা। রাজনারায়ণবাবু তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন

যাহাই কেন হউক না, রামমোহন রায়ের সময়ে এতদপেক্ষা শতগুণে শোচনীয় অবস্থা ছিল। সে সময়ে জজের ও কালেক্টরের সেরেস্তাদারি, (তখন দেওয়ানি বলিত) দেশীয়দিগের পক্ষে উচ্চতম পদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং রামমোহন রায়ের ভাগ্যেও তদপেক্ষা উচ্চতর পদ জুটে নাই। কিন্তু তাহাও তিনি একেবারে পান নাই। দেওয়ানি পাইবার আশায়, প্রথমে তাঁহাকে সামান্য কেরাণীর কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে অনেকে, আমলাদিগের প্রতি যে প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। তাঁহারা ভদ্রসন্তানের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান লাভ করা দূরে থাকুক্, কখন কখন গো অশ্বের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে কেবল সাহেবদিগের দোষ, এমন বোধ হয় না। আমাদিগের স্বদেশীয় যে সকল ভ্রাতৃগণ আমলার কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার যে প্রকার নিন্দনীয়, তাহাতে সহজেই তাঁহারা প্রভুর অশ্রদ্ধাভাজন হন ; সুতরাং উপযুক্ত সম্মানলাভে বঞ্চিত হন। আমলারা যদি আপনার সম্মান আপনি রক্ষা করিয়া চলিতে জানিতেন, যদি তাঁহারা স্বাধীনচিত্ত ও সত্যপ্রিয় হইতেন, তাহা হইলে সকল স্থলে না হউক, অনেক স্থলেই সিবিলিয়ান্ সাহেবেরা তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। এখন অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে, অনেক স্থলেই আমলা ও সিবিলিয়ান্ সাহেবের সম্বন্ধ অতি জঘন্য ছিল। এক দিকে তোষামোদ, হীনতা ও অসত্যপ্রিয়তা ; অপর দিকে ঔদ্ধত্য, অভদ্রতা ও অশিষ্টাচার। সুতরাং রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন স্বাধীনচিত্ত, উন্নতমনা লোক যে, কর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে সতর্ক হইবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

তিনি সিবিলিয়ান্ জন ডিগ্‌বি সাহেবের অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্মের জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। সাহেব তাঁহাকে কর্ম্ম দিতে অঙ্গীকার করিলে, তিনি তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি এই মর্ম্মে একটা লেখাপড়া করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিন যে, যখন তিনি কার্য্যের জন্য তাঁহার সম্মুখে আসিবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে. এবং সামান্য আমলাদিগের প্রতি যে প্রকারে হুকুমজারি করা হয়, তাঁহার প্রতি সে প্রকার করা হইবে না। তিনি কেবল মুখের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া উক্ত বিষয়ে একটি দলিল লিখিয়া দিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মানুগত আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা রামমোহন রায়ের অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার জীবনের ভূরি ভূরি ঘটনা, তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করে। ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত মর্ম্মের এক দলিল স্বাক্ষর করিয়া দিলেন ; রামমোহন রায়ও কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

রামমোহন রায় এ প্রকার যত্ন ও উৎসাহ সহকারে কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, সাহেব তাঁহার প্রতি দিন দিন অধিকতর সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরেই রামমোহন রায় দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইলেন। ডিগ্‌বি সাহেব. রামমোহন রায়ের বিদ্যাবুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা ও কর্ত্তব্যশীলতার পরিচয় যতই পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ও ডিগ্‌বি সাহেবের ভদ্রতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ইংরেজী ও দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন, এবং তদ্বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন।

রংপুরে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার

রামমোহন রায়, ডিগ্‌বি সাহেবের অধীনে রামগড়, ভাগলপুর ও রংপুর এই তিন স্থানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ডিগ্‌বি সাহেব, রামগড়ে, ১৮০৫ হইতে ১৮০৮ ; ভাগলপুরে, ১৮০৮ হইতে ১৮০৯ ; এবং রংপুরে ১৮০৯ সালের ২০শে অক্‌টোবর হইতে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত কর্ম্ম করেন। বর্দ্ধমান মহারাজার সহিত মোকদ্দমার জবানবন্দীতে রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি রামগড়, ভাগলপুর ও রংপুরে বাস করিয়াছিলেন।

রংপুরে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থিতি কালেও তিনি আপনার জীবনের প্রধান কার্য্য বিস্মৃত হন নাই। সন্ধ্যার পর, আপনার বাসাবাটীতে ধর্ম্মালোচনার জন্য সভা আহ্বান করিতেন। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে পৌত্তলিকতার অসারত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতেন। তত্রত্য মাড়োয়ারী বণিক্‌দিগের মধ্যে অনেকে সভার সভ্য হইয়াছিলেন। এই সকল মাড়োয়ারীগণের জন্য তাঁহাকে কল্পসূত্র প্রভৃতি জৈনধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। শীঘ্রই তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। ইনি তত্রত্য জজ্‌ আদালতের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার নাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে "জ্ঞানাঞ্জন" নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাঙ্গালা ১২৪৫ সালে (ইং ১৮৩৮ সালে) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকখানিতে জানিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায় রংপুরে পারসী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের অনুগত ছিল। তিনি তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি

রামমোহন রায় তাঁহার প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ও কেনোপনিষদের চূর্ণক, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ডিগ্‌বিসাহেবের সম্পাদকীয়তায় উহা প্রকাশ হয়। সাহেব উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—"বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষা না করাতে, পাঁচ বৎসর পরে, যখন আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, তখন সামান্য সামান্য বিষয়ে, তিনি ইংরেজীতে কথা বলিলে বোধগম্য হইত মাত্র। কিন্তু উক্ত ভাষা কিছুমাত্র শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিতেন না। যে জিলায় আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সর্‌ভিসে পাঁচ বৎসর কালেক্টর ছিলাম ; তথায় তিনি, পরিশেষে, দেওয়ান, অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার চিঠিপত্র সকল মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া এবং ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত পত্রাদি লিখিয়া ও আলাপ করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় এ প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বিলক্ষণ শুদ্ধরূপে ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন।" উক্ত ভূমিকায় ডিগ্‌বি সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, ইয়োরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ করা রামমোহন রায়ের অভ্যাস ছিল। তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিষয় পড়িতে অধিক ভালবাসিতেন। নেপোলিয়ান্‌ বোনাপার্টির ক্ষমতা ও বীরত্বের অতিশয় প্রশংসা করিতেন, এবং তাঁহার পতন হইলে, তিনি একান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের প্রথম বেগ চলিয়া গেলে, তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি শেষে বলিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান্‌কে তিনি পূর্ব্বে যেমন প্রশংসা করিতেন, এখন সেইরূপ অশ্রদ্ধা করেন।

কর্ম্মত্যাগ

রামমোহন রায় ১৮০৫ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিয়াছিলেন। রামগড় জিলায় অবস্থিতিকালে তিনি সহরঘাটিতে বাস করিতেন। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাতরা হইতে গয়া যাইবার পথে এই সহরঘাটি। অবশেষে বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন।

পুত্রের বিবাহ ও দলাদলি

রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আন্দোলনকারিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হুগলি জিলার অন্তর্গত ইড়পাড়া গ্রামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাধাপ্রসাদকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

গ্রামে উৎপাত

কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে, রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হন। রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যুষে আসিয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুটধ্বনি করিত ; এবং সন্ধ্যার পর, তাঁহার অন্তঃপুরে গো-হাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত। তাহারা এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা পরিবারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈর্য্য কিছুতে পরাভব মানিল না। কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই সদ্ভাবদ্বারা অসদ্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার মিষ্টকথায় ও সদুপদেশে, তাহারা ভুলিবার লোক ছিল না : বরং তাঁহাকে একান্ত ধৈর্য্যশীল দেখিয়া উৎপাত আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরিশেষে আপনা আপনি সকল থামিয়া গেল।

মাতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রঘুনাথপুরে গৃহনির্ম্মাণ

বাহিরের লোকের উৎপাত থামিলে কি হয়? এদিকে মাতা ফুলঠাকুরাণী পুত্রের প্রতি দিন দিন বিরক্ত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় লোককে প্রচলিত পৌত্তলিকতার অসারত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা যতই বুঝাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মাতার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। রামমোহন রায়ের পত্নীদ্বয় ও তাঁহার নব পুত্রবধূকে তিনি গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। রামমোহন রায় ভাবিলেন যে, মাতার বাটীর নিকটে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামেই সপরিবারে বাস করিবেন। কিন্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর মাতার জমিদারী, সেখানে তিনি বিধর্ম্মী সন্তানকে স্থান দিবেন কেন? ফুলঠাকুরাণী মনে করিয়াছিলেন, পুত্রকে সপরিবারে কৃষ্ণনগর হইতে বিদূরিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। রামমোহন রায় লাঙ্গুড়পাড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক তন্নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে এক শ্মশানভূমির উপর বাটী প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রদৌহিত্র 'আর্য্যদর্শন'-পত্রে লিখিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বাটীর সম্মুখে এক মঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহার চতুষ্পার্শ্বে 'ওঁ তৎসৎ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং এই কয়েকটি বাক্য খোদিত করিয়াছিলেন। ঐ মঞ্চটি তাঁহার উপাসনাস্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি কলিকাতা হইতে বাটী গিয়া এবং বাটী হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় সর্ব্ব প্রথমে ঐ মঞ্চটি প্রদক্ষিণ করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতা-বাস

কলিকাতা আগমন ও সংস্কারকার্য্যে জীবনসমর্পণ

রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃীষ্টাব্দে) বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এখন হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। তাঁহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, জন্মভূমির হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার অন্য কার্য্য ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না।

ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দিবারাত্র পরিশ্রমেও কাতর ছিলেন না।

হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থা

রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন, তৎকালীন হিন্দুসমাজের অবস্থাবিষয়ে "রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য" স্বাক্ষরকারী, ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না· কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদিদ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাকহবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহার কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের

প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহবা অখ্যাতির ভয়ে, কেহবা প্রশংসালাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান্ রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক্, কাহারও বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয়কর্ম্মের উপযোগী পত্র লেখা ও অঙ্ক জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যিনি ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তিনি বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ ; এ সকলই পদ্যের ; গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না।* বুলবুলি ও ঘুড়ীর খেলা কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন্, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল, এবং তাঁহারা দোলের আবির খেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকীপ্রসূতীর প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপদেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না। পৌত্তলিকতা ছাড়িতে চান না, কিন্তু আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে তখনকার লোকেরা বাধিত হইয়াছিলেন" ইত্যাদি।

আন্দোলন

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় লোয়ার্ সার্কিউলার্ রোডে একটী বাটী ইংরেজী প্রণালীতে সজ্জিত করিয়া তথায় বাস করেন। উহা তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামলোচন রায় তাঁহার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।† বহুকাল হইতে তাঁহার আশা

* বোধহয়, লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ ; 'লিপিমালা' ১৮০২ : রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত' ১৮০২ খৃষ্টাব্দে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত পুস্তক সকলের রচনা অতি কদর্য্য এবং উহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই।

† ১১৩ নম্বর বাটী। উক্ত বাটীতে এখন পুলিস আছে।

ছিল যে, বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া স্বদেশের উদ্ধারকল্পে জীবনসমর্পণ করিবেন। এতদিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। পৌত্তলিকতা ও সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের রণভেরী এই স্থান হইতে বাজিয়া উঠিল। কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেবল কলিকাতায় কেন,—সমুদয় বঙ্গভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিল। বাবুদিগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে,—যেখানে সেখানে রামমোহন রায়ের কথা। অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট থাকিল না।

রামমোহন রায়ের সদ্‌গুণ

রামমোহন রায় অনেকগুলি লোককে বশীভূত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সে সময়ের কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক ছিলেন। বাস্তবিক তিনি যে প্রকার সদ্‌গুণশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে এ প্রকার হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। রামমোহন রায়ের "একজন অনুগত শিষ্য" তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছেন ;—"তাঁহার শরীরে যেমন বল, মনেও তেমনি বীর্য্য ছিল। তাঁহার উজ্জ্বলজ্ঞানে যাহা কিছু প্রকাশ পাইত, তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা তাহা তন্ন তন্ন করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও পাণ্ডিত্যবলে লোক যেমন তাঁহাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইত, তিনি তেমনি আপনার সুশীলতা, নম্রতা ও বিনয়গুণে তাঁহাদের মনের প্রণয়-ভাব আকর্ষণ করিতেন। তিনি বলবিক্রমে, বিদ্যাবিনয়ে, জ্ঞানবুদ্ধিতে, একজন অসামান্য পুরুষ ছিলেন। শাস্ত্রবিচারে তাঁহার শ্রান্তিমাত্র ছিল না। সত্যেতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ঈশ্বরেতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, পরকালে দৃঢ়বিশ্বাস, লোকের প্রতি অসামান্য দয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। তিনি যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে উৎসাহী ছিলেন, তেমনি লোকের উপকার সাধনে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, আর একদিকে তেমনি সহমরণ নিবারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু হিতৈষী ডেভিড্‌ হেয়ার সাহেব ছিলেন, তাঁহার আর এক বন্ধু ঈশ্বরপরায়ণ পাদ্‌রী আদম সাহেব। তিনি অতি সৎপুরুষ, মহাপুরুষ ছিলেন।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৭ শক)

রামমোহন রায়ের সংগী ও শিষ্যগণ

তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, গভীর বিদ্যা ও মধুর ব্যবহারে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। *গোপীমোহন ঠাকুর ; ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র, সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা এবং স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ। *বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ; ইনি জষ্টিস্ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, হিন্দু কলেজের একজন সংস্থাপক, এবং উক্ত কলেজের প্রথম সম্পাদক। ইনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ হিন্দুকলেজ সংস্থাপনরূপ কার্য্য হইতে সুমহৎ ফল উৎপন্ন হইবে। *জয়কৃষ্ণ সিংহ ; কলিকাতার রাজার বাগান, তাঁহার বাগান ছিল। *কাশীনাথ মল্লিক ; ইনি আন্দুলের মল্লিকবংশীয়। *বৃন্দাবন মিত্র ; ইনি রাজা পীতাম্বর মিত্রের পুত্র, ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ। *গোপীনাথ মুন্সী। রাজা বদনচন্দ্র রায় ; ইনি রাজা নরসিংহের সম্পর্কীয়। *রঘুরাম শিরোমণি, *হরনাথ তর্কভূষণ, *দ্বারকানাথ মুন্‌সী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন।

তদ্ভিন্ন, ৺চন্দ্রশেখর দেব (ইনি বর্দ্ধমানাধিপতির রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন মেম্বর ছিলেন), ৺তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ইনিও বর্দ্ধমানরাজের রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদাভিষিক্ত ছিলেন ; ৺রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেককে লইয়া ইঁহাদের একটি রাজনৈতিক দল ছিল। সেই দলটি তারাচাঁদ বাবুর সংস্রব হেতু Chakrabarti Faction বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ৺নন্দকিশোর বসু ; ইনি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা। ৺ভৈরবচন্দ্র দত্ত ; ইনি বেথুন স্কুলের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 'অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা'—এই সঙ্গীতটি ইঁহার রচিত। ৺নিমাইচরণ মিত্র ; গড়পাড়ে ইঁহার নিবাস ছিল। ৺ব্রজমোহন মজুমদার ; জোড়াসাঁকোনিবাসী ছিলেন। ইনি 'পৌত্তলিকপ্রবোধ' গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।* ৺রাজনারায়ণ সেন। ৺রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়। ৺হলধর বসু ; লোকে আমোদ করিয়া বলিত যে, ইনি অষ্টবসুর একজন। ৺মদনমোহন মজুমদার। ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পাড়ার খ্যাতনামা জমিদার। টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার ৺কালীনাথ রায় প্রভৃতি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা ভিন্ন ৺নীলরতন হালদার ; সল্‌ট্‌ বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন ; 'জ্ঞানরত্নাকর' গ্রন্থের সংগ্রাহক। উক্ত পুস্তক ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ৺রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল ; ইনি খিদিরপুর ভূকৈলাসের রাজবংশের একজন পূর্ব্বপুরুষ। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর ; ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন দুই তিনজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। 'রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য' বলেন,—"রামমোহন রায় যখন ১৭৩৪ শকে রংপুরের বিষয়-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে আপনার সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তীর্থস্বামী দেশপর্য্যটন করতঃ রংপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চা ও উদারভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করেন ; এবং তীর্থস্বামীও তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ছায়াবৎ তাঁহার সংসর্গে থাকেন ; তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন ; এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মোপাসক ছিলেন।

অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম নন্দকুমার ছিল।† তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যিনি ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত প্রথম আচার্য্য ছিলেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে রামমোহন রায়ের নিকটে আনিয়া সমর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহার একজন প্রধান সহযোগী হইয়া উঠিলেন।‡ রামমোহন রায়ের নিকটে শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ থাকিতেন ; তাঁহার সহিত তিনি উপনিষদের আলোচনা করিতেন।"

* 'পৌত্তলিকপ্রবোধ' পুস্তকের পূর্ব্বনাম 'মুখচপেটিকা'। পরে উক্ত পুস্তক যখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হয়, তখন উহার এই কঠোর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'পৌত্তলিকপ্রবোধ' নাম দেওয়া হইয়াছিল।

† পরিশিষ্ট দেখ।

‡ ইঁহার নিবাস মালপাড়া গ্রামে ছিল। ইনি পরে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

যে সকল ব্যক্তির নাম করা হইল, ই'হারা সকলেই যে ধর্ম্মানুসন্ধানে তাঁহার নিকট আসিতেন, এরূপ নহে। বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্যও কেহ কেহ আসিতেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের প্রবল প্রতিবাদের জন্য তাঁহারা কেহ কেহ আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং গোপীনাথ মুন্সী তাঁহাকে কখন ত্যাগ করেন নাই।

শত্রুবৃদ্ধি

দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার শত্রু হইল। অনেকেই নানাপ্রকারে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিত। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি লোক ছিলেন, যাঁহারা রামমোহন রায়ের সাক্ষাতে আত্মীয়তা প্রকাশ করিতেন, অথচ গোপনে গোপনে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। এই শ্রেণীর জীব বর্ত্তমান সময়েও সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রচারার্থ অবলম্বিত উপায়

ধর্ম্মপ্রচারের জন্য রামমোহন রায় চতুর্ব্বিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম, কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক ; দ্বিতীয়, বিদ্যালয় সংস্থাপনদ্বারা ও অন্য প্রকারে শিক্ষাদান ; তৃতীয়, পুস্তকপ্রচার ; চতুর্থ, সভাসংস্থাপন।

চতুর্থ অধ্যায়

বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ। ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

(১৮১৬—১৮১৭ সাল)

রামমোহন রায় দেখিলেন যে, পুস্তকপ্রচার, সত্যপ্রচারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থ সকল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে, ১৭৩৭ শকে, বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশক, উক্ত গ্রন্থের বিষয়ে বলিয়াছেন ;—"ইহার অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র, শারীরক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মসমাপ্ত এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্য্যদিগের মধ্যে ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ ঐ দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তিনি ঐ সকল বিচারোদ্বোধক কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহুকালের পর, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পূর্ব্বক, ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, উক্ত বেদান্তসূত্রগ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্ব্বলোকমান্য শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে, তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্রদ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে, একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি ৫৫৮ সূত্রসমন্বিত সমগ্র বেদান্তসূত্রের উক্ত ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রচার করিলেন, এবং তৎসম্পর্কে আপনার যাহা বক্তব্য, তাহা ঐ গ্রন্থের ভূমিকা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি নামে প্রকাশ করিলেন। বেদব্যাসকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যান কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না ; সুতরাং এই সম্পর্কে তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত রামমোহন রায়ের বিচার চলিল। পরে তিনি যত বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বেদান্তসূত্রের প্রমাণ সকল তাঁহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। ১৭৩৭ শকে, রামমোহন রায়ের সকল বিচারের ভিত্তিস্বরূপ এই প্রথম গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ হয়। ইহার প্রথম মুদ্রাঙ্কণের অক্ষর সকল অতি প্রাচীন, এমন কি, ছাপার অক্ষর বলিয়াই বোধ হয় না।

"এই গ্রন্থের তিন ভাগ। ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে এদেশীয়দিগের যে সকল সাধারণ আপত্তি আছে, গ্রন্থকার ইহার ভূমিকাতে তাহার উল্লেখ-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, (১) সদ্রূপ পরব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য। (২) রূপ ও গুণবিহীন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারা যায় না, এমন নয়। (৩) পরমার্থ-

সাধনের পূর্ব্বাপর এক বিধি নাই, অতএব বিচারপূর্ব্বক উত্তম পথ আশ্রয় করাই শ্রেয়। (৪) ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্র, সুগন্ধি দুর্গন্ধি আদি লৌকিকজ্ঞান থাকে না, তাহা নহে। (৫) পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার বিধি আছে, তাহা দুর্ব্বল অধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। বস্তুতঃ ব্রহ্মোপাসনাই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ।

"গ্রন্থকার ইহার অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে চলিত ; আর বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ প্রচলিত ভাষায় বিবৃত করাতে দোষ নাই। পরন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যেতে কোন প্রগাঢ় রচনা হয় নাই ; এ জন্য গ্রন্থকার এই অনুষ্ঠানপত্রে গদ্য রচনা পাঠের বৈয়াকরণিক কয়েকটি নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন।" *

রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকাদিতে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভূমিকাতে সাকারবাদীদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ,—সাকারবাদিগণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে এই একটি আপত্তি করেন যে, যিনি জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম, তিনি বাক্য মনের অগোচর ; সুতরাং তাঁহার উপাসনা সম্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য কোন সাকার পদার্থকে জগতের কর্ত্তাজ্ঞানে উপাসনা না করিলে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় এই কথার উত্তরে বলেন ;—যদি কোন ব্যক্তি শৈশবকালে শত্রু হস্তে পতিত হইয়া দেশান্তরে নীত হয়, তাহা হইলে সে আপনার পিতার সংবাদ কিছুই জানিতে পারে না। সে যুবা হইলে, যে কোন পদার্থকে সম্মুখে দেখিবে, তাহাকেই পিতা বলিয়া গ্রহণ করিবে, এরূপ হইতে পারে না। সে যদি পিতার উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করে, অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করে, তবে সে সময়ে সে ব্যক্তি বলিবে যে. যিনি জন্মদাতা, তাঁহার শ্রেয়ঃ হউক। সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় না হইলেও জগতের স্রষ্টা, পাতা সংহর্ত্তারূপে তাঁহার উপাসনা করা যাইতে পারে। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি ও যদ্দ্বারা আমাদের জীবনের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সে সকলেরও যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না। সুতরাং যে পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ কিরূপে জানা যাইতে পারে? কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনা ও নিয়ম সকল দেখিয়া পরমেশ্বরকে কর্ত্তা ও নিয়ন্তারূপে নিশ্চয় জানা যায়, এবং এই-রূপেই তাঁহার উপাসনাবিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। সামান্য বিবেচনায় বুঝা যায় যে, যিনি এই দুরবগাহ্য নানাপ্রকার কৌশলবিশিষ্ট জগতের কর্ত্তা, তিনি এই জগৎ অপেক্ষা অবশ্য অধিকতর ব্যাপক ও শক্তিমান্ হইবেন। এই জগতের একটি অংশ কিংবা ইহার অন্তর্গত কোনও বস্তু এ জগতের কর্ত্তা কিরূপে হইতে পারে? যাঁহারা বলেন যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কোনও মতে হইতে পারে না, তাঁহাদের কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেক লোকই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, যখন ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কোনও ক্রমেই হইতে পারে না? †

---

* রামমোহন রায় গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ সকল পুস্তকের রচনা অতি কদর্য্য ও অস্পষ্ট। উহা সিবিলিয়ান সাহেবেরা পড়িতেন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। তখন লোকে রীতিমত গদ্য পাঠ করিতে জানিত না। তিনি সেই জন্য গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়া, গদ্য পাঠের কতকগুলি বৈয়াকরণিক নিয়ম লিখিয়া দিয়াছিলেন।

† 'রাজনারায়ণ বসু দ্বারা প্রকাশিত রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের আট ও নয় পৃষ্ঠা দেখ।

পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়গণের মতের বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য কি না ?

দ্বিতীয়তঃ,—সাকারবাদীদিগের আর একটি আপত্তি এই যে, পিতা পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার বিপরীত আচরণ করা কখনই উচিত নহে। রাজা রামমোহন রায় এই কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বপুরুষ ও স্ববর্গের প্রতি লোকের অত্যন্ত স্নেহ ; সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া ঐ কথাটিকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ কথার সাধারণ উত্তর এই যে, পশুরাই স্বজাতীয় পশুর ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। মনুষ্যের সৎ অসৎ বিচারবুদ্ধি আছে। মানুষ কিরূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া কেবল স্বজনেরা করেন বলিয়া ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন? যদি সকল স্থানে ও সকল কালে এই মত প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু-জাতির মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত উৎপন্ন হইতে পারিত না। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যে, একজন বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শাক্ত হইতেছে, আর এক ব্যক্তি, শাক্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে ; পৈতৃক মতেই বদ্ধ হইয়া থাকিতেছে না। এখনও একশত বৎসর অতীত হয় নাই, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। যাবতীয় পরমার্থ কর্ম্ম, স্নান দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্ব্বমত হইতে ভিন্ন, নূতন মতে সম্পন্ন হইতেছে। লোকে পৈতৃক আচরণ পরিত্যাগ না করিলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন না। সকলে বলেন যে, পঞ্চব্রাহ্মণ যে সময়ে এ দেশে আসেন, তাঁহাদের পায়ে মোজা এবং গায়ে জামা ইত্যাদি ছিল এবং তাঁহারা গো-যানে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন। পরে, সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না। ব্রাহ্মণের পক্ষে যবনের দাসত্ব করা, যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্রপাঠ করান, এই সকল কি পূর্ব্বকালপ্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য? অতএব আত্মীয় স্বজনের উপাসনাপ্রণালী ও ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন প্রকার উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন, এবং পূর্ব্ব নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ, লোকে চিরদিনই করিয়া আসিতেছে। তবে কেন পরমার্থ বিষয়ে উত্তম পথ অবলম্বন করিবার সময় আপত্তি করা হয় যে, উহা স্ববর্গের অবলম্বিত নহে ও পৈতৃক ধর্ম্মবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা গ্রহণ করা অনুচিত?

ব্রহ্মোপাসকের লৌকিক জ্ঞান থাকে না ; সুতরাং গৃহস্থ ব্রহ্মোপাসক হইতে পারেন কি না ?

তৃতীয়তঃ,—সাকারবাদিগণ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মোপাসনা করিলে লোকের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এবং অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না। অতএব গৃহস্থলোকে কিরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে? রাজা রামমোহন রায়, এ কথার উত্তরে, তাঁহার প্রতিপক্ষ সাকারবাদীদিগকে বলিতেছেন যে, কি প্রমাণে তাঁহারা এ কথা বলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। সাকারবাদীরাই স্বীকার করেন যে, নারদ, জনক, সনৎকুমারাদি, শুক, বশিষ্ঠ, ব্যাস, কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন ; অথচ তাঁহারা অগ্নিকে অগ্নি, ও জলকে জলরূপে ব্যবহার করিতেন, গার্হস্থ্যকর্ম্ম ও রাজকার্য্য করিতেন, এবং শিষ্য সকলকে যথাযোগ্যরূপে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতেন। তবে কিরূপে বিশ্বাস করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রজ্ঞান কিছুই থাকে না? লোকে কেমন করিয়া এরূপ কথার আদর করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি বল, সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞান ও ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেমন করিয়া থাকিবে? তাহার উত্তর এই যে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম্ম, চক্ষু, কর্ণ,

হস্তাদির দ্বারা অবশ্যই করিতে হইবে। পুত্রের সহিত পিতার কর্ম্ম এবং পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে; যেহেতু এই সকল নিয়মের কর্ত্তা ব্রহ্ম।

শাস্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে ; অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য কি না ?

চতুর্থতঃ,—সাকারবাদীরা বলেন যে, পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে। অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে, সেইরূপ জ্ঞানপ্রকরণে ঐ সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, উহা ব্রহ্মের রূপকল্পনা মাত্র। মনের দ্বারা যে প্রকার রূপ কল্পিত হইয়া উপাস্য হয়, মন অন্য বিষয়ে নিযুক্ত হইলে, সেইপ্রকার রূপ ধ্বংস হইয়া যায়। হস্তের দ্বারা যেপ্রকার রূপ নির্ম্মিত হয়, হস্তাদির দ্বারাই তাহা কালে নষ্ট হয়। অতএব নানারূপবিশিষ্ট বস্তু সকল নশ্বর। কেবল ব্রহ্মই জ্ঞেয় ও উপাস্য হয়েন। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের সাকার বর্ণন, কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সাকার বর্ণন করিয়া, পরে, উহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, উহা অজ্ঞানীর মনোরঞ্জনের জন্য।

রাজা রামমোহন রায় আরও বলিতেছেন যে, যাঁহারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে, ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেন, কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে ঐ সকল বস্তুর পূজাদি করেন? ইহার উত্তরে, তাঁহারা ঐ সকল বস্তুকে কখনই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতে পারিবেন না। যেহেতু, ঐ সকল বস্তু নশ্বর, এবং প্রায় তাঁহাদের নিজের নির্ম্মিত কিম্বা অধীন। অতএব যে বস্তু নশ্বর এবং মনুষ্যের নির্ম্মিত, কিরূপে তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে পারেন? ঐ সকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বলিতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইবেন। যেহেতু, ঈশ্বর অপরিমিত ও অতীন্দ্রীয় ; তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, তিনি যেমন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিও তদনুযায়ী হইবে ; কিন্তু এস্থলে তাহার বিপরীত দেখা যায়। ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি, উপাসক মনুষ্যের সম্পূর্ণ অধীন। এই আপত্তির উত্তরে কেহ যদি এরূপ বলেন যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময়, ঐ সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হয়, এই জন্য ঐ সকল বস্তুর উপাসনা করিতে হয়। এ কথার উত্তর এই যে, ব্রহ্মকে সর্ব্বময় জানিলে, বিশেষ বিশেষ রূপেতে তাঁহার পূজার প্রয়োজন হইত না। এ স্থলে কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব অধিক, তাহাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয়। এ কথার উত্তর এই যে, যে পদার্থ ন্যূনাধিক্য এবং হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা পরিমিত, তাহা ঈশ্বরপদের যোগ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক, কোন স্থানে অল্প আছেন, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। ইত্যাদি।

বেদের অনুবাদ শুনিলে, শূদ্র পাপগ্রস্ত হয় কি না ?

রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তগ্রন্থের ভূমিকার পর, 'অনুষ্ঠান' শিরোনামাঙ্কিত একটি অংশ আছে। তাহাতেও তিনি সাকারবাদীদিগের কয়েকটি আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বেদান্তশাস্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে। উহা শুনিলে শূদ্রের পাতক হয়। এই আপত্তির উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—যাঁহারা এরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, যখন তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি,

জৈমিনিসূত্র, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান, তখন বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন কিনা, এবং ছাত্রেরা সেই ব্যাখ্যা শুনেন কিনা? ইহা ভিন্ন, মহাভারত, যাহাকে পঞ্চম বেদ ও সাক্ষাৎ বেদার্থ বলা হয়, তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কিনা? তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝাইয়া দেন কিনা? শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস লইয়া পরস্পর কথোপকথন করেন কিনা? ইহা ভিন্ন, শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রের নিকট ঐ সকল উচ্চারণ করেন কিনা? যখন সর্ব্বদাই এইরূপ করিতেছেন, তখন বেদান্তের বাঙ্গালা অনুবাদ করাতে কিরূপে দোষোল্লেখ করিতে পারেন? কোন্‌টি সত্য শাস্ত্র, আর কোন্‌টি কাল্পনিক পথ, ইহার বিবেচনা সুবোধ লোকে অবশ্যই করিতে পারিবেন।

দ্বারবানের সাহায্যে যেমন রাজার নিকটে যাওয়া যায়, সেইরূপ সাকার উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি না ?

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, পরমেশ্বরের নিকটে যাওয়া, রাজার নিকটে যাওয়ার সদৃশ। রাজার নিকটে যাইতে হইলে, তাঁহার দ্বারবানের উপাসনা করিতে হয়। সেই-রূপ, ব্রহ্মপ্রাপ্তি জন্য, রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা আবশ্যক। এই আপত্তির উত্তরে রাম-মোহন রায় বলিতেছেন যে, একথা উত্তরযোগ্য নহে, তথাচ লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত উত্তর দিতেছি। যে ব্যক্তি রাজার নিকটে যাইবার জন্য, দ্বারবানের উপাসনা করে, সে দ্বারবানকেই সাক্ষাৎ রাজা বলে না। কিন্তু এস্থলে, তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপগুণবিশিষ্টকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার উপাসনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজা অপেক্ষা রাজার দ্বারবানের নিকটে যাইতে পারা সুসাধ্য, এবং রাজা অপেক্ষা রাজার দ্বারবান্‌ নিকটস্থ ; সুতরাং দ্বারবানের সাহায্যে, রাজার নিকটে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এস্থলে অন্য প্রকার দেখিতেছি। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ; আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারবান বলিতেছেন, তিনি মনের দ্বারা অথবা হস্তের দ্বারা নির্ম্মিত। কখনও তিনি থাকেন, কখনও থাকেন না। কখনও নিকটস্থ, কখনও দূরস্থ। অতএব কিরূপে এরূপ বস্তুকে অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা অপেক্ষা নিকটস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া উহাকেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় বলেন। তৃতীয়তঃ, যে বস্তু চৈতন্যাদি রহিত জড়মাত্র, তাহা কিরূপে, এরূপ মহৎ কার্য্যের সহায়তা করিতে পারে?

বেদান্তভাষ্যের হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ

রামমোহন রায়ের সুপ্রশস্ত হৃদয় কেবল বঙ্গভূমির মধ্যে বদ্ধ ছিল না। উহা সমগ্র ভারতের জন্য ক্রন্দন করিত। সুতরাং বেদান্তসূত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ ভারতের সকল প্রদেশবাসীর বোধগম্য হইবে না বলিয়া তিনি শীঘ্রই একখানি হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। পরে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, বেদান্তসূত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন।

এই শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি বলিয়াছেন ;—"আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের (যাঁহাদের সাংসারিক সুখ, বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালীর উপর নির্ভর করে) তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন অধিক হউক না, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখিবেন, হয় ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অন্ততঃ এই পথ হইতে আমাকে [illegible]

বঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে, আমার আন্তরিক অভিপ্রায় সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্য, যিনি গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।" মহাত্মন্! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা তোমার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততিরা তোমাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছেন!

উপরি-উক্ত পুস্তকের ভূমিকাতে তিনি আরও বলিতেছেন যে, বেদান্তসূত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিবার তাঁহার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা প্রকৃতির পরমেশ্বরের একত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব চিন্তা করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন আরও অভিপ্রায় এই যে, ইয়োরোপীয়েরা বুঝিতে পারেন যে, যে সকল কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্মকে বিকৃত করিয়াছে, তাহার সহিত উহার বিশুদ্ধ আদেশনিচয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপন্ন করিতেছে, সকল বিচারগ্রন্থে ইহাই প্রদর্শন করা রামমোহন রায়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লিখিয়াছেন ;—"উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমাত্র, সর্ব্বব্যাপী, আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়, আর নামরূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদিগের উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি প্রমাণ? আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহে? তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমানের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। তবে, পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে ; কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনি পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনা দ্বারা চিত্তস্থির রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।"

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত বেদান্তগ্রন্থে এই কয়েকটি বিষয় আছে। বেদান্তগ্রন্থে চারিটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে এই চারিটি বিষয় আছে:—(১) ব্রহ্মবোধক শ্রুতির সমন্বয়, (২) উপাস্য ব্রহ্মবাচক শ্রুতির সমন্বয়, (৩) জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির সমন্বয়, (৪) অব্যক্তাদি পদ সকলের সমন্বয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চারিটি বিষয় আছে:—(১) সাংখ্য ইত্যাদির সহিত বেদান্ত মতের বিরোধ পরিহার, (২) সৃষ্টি ও ব্রহ্মবিষয়ক নানা মতের বিচার, (৩) মহাভূত ও জীববিষয়ক শ্রুতিবিরোধ ভঞ্জন, (৪) ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও জীবের সম্বন্ধবিচার। তৃতীয় অধ্যায়ে এই চারিটি বিষয় আছে:—(১) জীবের জন্মাদি প্রকরণ, (২) জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আদি অবস্থা এবং শুভাশুভ ভোগ, (৩) নানা প্রকার উপাসনা, (৪) জ্ঞানসাধনের শ্রেষ্ঠত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে চারিটি বিষয় আছে:—(১) ব্রহ্মোপাসনার প্রকরণ, (২) মৃত্যু, (৩) মরণোত্তর জীবের গতি, (৪) মুক্তির অবস্থা।

বেদান্তসার* ও উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ

ইহার পরে তিনি "বেদান্তসার" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে যে বেদান্তসূত্র ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অতি বিস্তৃত ও কঠিন গ্রন্থ।

* বেদান্তসার নামে সংস্কৃতে যে একখানি গ্রন্থ আছে, ইহা সে গ্রন্থ নহে। ইহা রাজা রামমোহন রায়ের নিজের রচিত।

উহা সাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। যদিও তিনি অতি পরিষ্কাররূপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তথাচ পাছে সকলে তত বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, এই জন্য, তিনি উহার সারসঙ্কলনপূর্ব্বক 'বেদান্তসার' নামে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। কোন্ শকে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক্ জানিতে পারি নাই। কিন্তু বোধ হয় যে, বেদান্তসূত্রের সঙ্গেই, অথবা অল্পকাল পরেই উহা প্রকাশ হইয়াছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হয়। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক সাহেবেরা উহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, এবং রচয়িতার পরিচয় ইয়োরোপে প্রচার করিয়াছিলেন।

বেদান্তদর্শনকে মূলভিত্তি করিয়া রাজা রামমোহন রায়, হিন্দু পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য, তাঁহার শাস্ত্রবিচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইলে, তাঁহার লিখিত বেদান্তভাষ্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কিন্তু উহা বৃহৎ গ্রন্থ। সেই জন্য, আমরা তাঁহার রচিত 'বেদান্তসার' নামক ক্ষুদ্র পুস্তককে বিশেষ বিশেষ ভাগে বিভক্ত করিয়া, পাঠকবর্গের নিকট উহার তাৎপর্য্য যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

ব্রহ্ম কি, কেমন, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না

সমুদয় বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তের প্রথম সূত্রে ইহার উল্লেখ করিয়া শ্রুতি এবং শ্রুতিসম্মতবিচারের দ্বারা দেখিলেন যে, ব্রহ্মের স্বরূপ কোন মতেই জানিতে পারা যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, ও কেমন তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রুতি কহিতেছেন ;—ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। মুণ্ডক। অদৃষ্টোদ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থূলমনণু। বৃহদারণ্যক। অবাঙ্মনসগোচরং। অশব্দং অস্পর্শং। কঠবল্লী। চক্ষুদ্বারা কিম্বা চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা, অথবা তপের দ্বারা কিম্বা শুভ-কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহা জানা যায় না। মুণ্ডক। ব্রহ্ম কাহারও দৃষ্ট নহেন, অথচ সকলকে দেখেন ; কাহারও শ্রুত নহেন, অথচ সকল শ্রবণ করেন ; ব্রহ্ম স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন। বৃহদারণ্যক। বাক্য ও মনের অগোচর, শব্দাতীত এবং স্পর্শাতীত।

জগৎকে উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মনির্দ্দেশ হয়

বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করিতে চেষ্টা না করিয়া তটস্থরূপে তাহার নিরূপণ করিতেছেন। অর্থাৎ একবস্তুকে অন্য বস্তুর দ্বারা বুঝাইতেছেন। যেমন সূর্য্যকে দিবসের নির্ণয়কর্ত্তা বলিয়া নিরূপণ করা হয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২ সূত্র। ১ পদ। এক অধ্যায়। এই জগতের জন্মস্থিতিনাশ যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই জগতের নানাবিধ আশ্চর্য্য পদার্থ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ দেখা যাইতেছে। অতএব যেমন ঘট দেখিয়া কুম্ভকারের নির্ণয় হয়, সেইরূপ এই জগতের যিনি কর্ত্তা তাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দে উল্লেখ করা হইতেছে। শ্রুতি সকলও এইরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের বর্ণন করেন। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। তৈত্তিরীয়। যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম। কৌষীতকী। যাঁহা হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, তিনি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়। যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা ও যাঁহার কার্য্য এই জগৎ, তিনি ব্রহ্ম। কৌষীতকী।

বেদ নিত্য নহে

বাচা বিরূপনিত্যয়া। বেদবাক্য নিত্য। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বেদকে স্বতন্ত্র নিত্য বলিতে পারা যায় না ; ইহার কারণ এই যে, শ্রুতিতে বেদের জন্মের কথা বলা হইতেছে। ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ঋক্ সকল ও সাম সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং বেদান্তের তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন যে, বেদের কারণ ব্রহ্ম। শাস্ত্রয়ো নিত্বাৎ। ৩।১।১। শাস্ত্র অর্থাৎ বেদের কারণ ব্রহ্ম, অতএব জগতের কারণ ব্রহ্ম। বেদে কহেন ;—

আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই

আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য। আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না যে, আকাশ জগতের কারণ। যে হেতু শ্রুতি কহিতেছেন ;— এতস্মাদাত্মন আকাশ সম্ভূতঃ। এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ। ১৪।৪।১। সকলের কারণ ব্রহ্ম। অতএব শ্রুতির পরস্পর বিরোধ হয় না। যেহেতু সকল বেদে ব্রহ্মকে আকাশাদির কারণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাণবায়ু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই

অথ সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি। ঋ। এই সকল সংসার প্রাণেতে লয় হয়। এই শ্রুতিদ্বারা প্রাণবায়ুকে জগতের কর্ত্তা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু বেদে বলেন,—এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল আর পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ। ৮।২।১। ভূমা-শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হন, প্রাণ প্রতিপাদ্য হন না ; যেহেতু শ্রুতিতে প্রাণবিষয়ে উপদেশের পর, ভূমা-শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইয়াছেন, এরূপ উপদেশ আছে।

জ্যোতিঃ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। মুণ্ডক। যিনি সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ তিনি জগতের কর্ত্তা। এই শ্রুতিদ্বারা কোন জ্যোতিঃ বিশেষকে জগতের কারণ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু বেদ বলেন,—তমেব ভান্তমনুভাতি। মু। সকল তেজস্মান্, সেই প্রকাশ-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অনুকরণ করিতেছেন। অনুকৃতেস্তস্য চ। ২২।৩।১। বেদ বলেন যে, ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্তি পাইতেছে, অতএব ব্রহ্মই জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা প্রতিপন্ন হন, এবং সেই ব্রহ্মের তেজদ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়।

প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই

অনাদ্যনন্তং মহতং পরং ধ্রুবং নিচার্য্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। ঋক্। আদ্যন্ত-রহিত নিত্যস্বরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকে জানিলে, মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পায়। শ্রুতি। স্বভাব এব সমুত্তিষ্ঠতে। স্বভাব স্বয়ং প্রকাশ পায়। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা স্বভাবকে জগতের স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলা যায় না। যেহেতু, বেদ বলেন,—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ। কঠ। আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ত্বমেবৈকং জানাথ। মু। সেই আত্মাকেই কেবল জান। ঈক্ষতের্নাশব্দং। ৫।১।১। শব্দে অর্থাৎ বেদে, স্বভাবকে জগৎকারণ বলেন নাই ; যেহেতু

চৈতন্যব্যতীত সৃষ্টির সঙ্কল্প হয় না ; সেই চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম, চৈতন্য স্বভাবের ধর্ম্ম নহে ; যেহেতু, স্বভাব জড় ; অতএব স্বভাব জগতের স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে না।

অণু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই

সৌম্যেষোঽনিম্নঃ। হে সৌম্য! জগৎকারণ অতি সূক্ষ্ম। ইহাদ্বারা পরমাণুর জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না ; যেহেতু পরমাণু অচেতন ; এবং পূর্ব্বলিখিত সূত্রের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, অচৈতন্য হইতে এতাদৃশ জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না।

জীব হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই

জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা। ঋ। পরে জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় রূপেতে জীব বিরাজ করেন। গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। কঠ। ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে জীব এবং পরমাত্মা প্রবেশ করেন। এই সকল শ্রুতিদ্বারা জীব স্বতন্ত্র কারণ এবং অন্তর্যামী বলিয়া প্রতিপন্ন হন না। যেহেতু বেদ বলিতেছেন,—য আত্মনি তিষ্ঠন্। মাধ্যন্দিন। যে ব্রহ্ম জীবেতে অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। এই জীব ব্রহ্মসুখকে পাইয়া আনন্দযুক্ত হন। শারীরশ্চোভয়েপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে। ২০।২।১। জীব অন্তর্যামী নহেন। যেহেতু, কান্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয়ে উপাধি অবস্থাতে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন।

পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ। বৃ। যিনি পৃথিবীতে থাকেন এবং পৃথিবী হইতে অন্তর, অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানেন না, এই শ্রুতিদ্বারা পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পৃথিবীর অন্তর্যামী বলিতে পারা যায় না। যেহেতু, বেদ বলিতেছেন,—এষোঽন্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃ। এই আত্মা অন্তর্যামী এবং অমৃত। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ। ১৮।২।১। বেদে আধিদৈবাদি বাক্য সকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী বলিয়া বুঝাইতেছে ; যেহেতু, অমৃতাদি বিশেষণ দ্বারা বেদে অন্তর্যামীর বর্ণন দেখিতেছি।

সূর্য্য হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই

অসৌ বা আদিত্যঃ। ইত্যাদি অনেক শ্রুতিতে সূর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সূর্য্যকে জগৎকারণ বলিতে পারা যায় না ; যেহেতু, শ্রুতি বলিতেছেন,—য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরঃ। বৃ। যিনি সূর্য্যেতে অন্তর্যামীরূপে থাকেন, তিনি সূর্য্য হইতে ভিন্ন। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ। ২১।১।১। সূর্য্যান্তর্যামী পুরুষ, সূর্য্য হইতে ভিন্ন ; যেহেতু বেদে আছে যে, সূর্য্য হইতে সূর্য্যান্তর্যামী ভিন্ন।

নানা দেবতার জগৎকর্ত্তৃত্ব কথন আছে, কিন্তু জগৎকর্ত্তা এক

এইরূপ, বেদ স্থানে স্থানে নানা দেবতাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন হয় না ; যেহেতু, বেদ পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন,—সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ; সকল বেদ একের কথা বলেন। অতএব, এক ভিন্ন অনেক কর্ত্তা হইলে, বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায়। আর বেদ বলেন যে,—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। কঠ। ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয়রহিত। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা। বৃ। ব্রহ্ম

বিনা আর কেহ ঈক্ষণ-কর্ত্তা নাই। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। বৃ। সংসারে ব্রহ্মবিনা অপর কেহ নাই। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। ছা। ব্রহ্ম নামরূপ হইতে ভিন্ন। নামরূপে ব্যাকরবাণি। ছা। নামরূপবিশিষ্ট সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি আছে।

বেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা দেবতা ও আকাশ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম শব্দে বলা হইয়াছে ; কিন্তু ব্রহ্ম অপরিচ্ছেদ্য ও সর্ব্বব্যাপী

এইরূপ, ভূরি ভূরি শ্রুতিদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, যাঁহারা নানারূপবিশিষ্ট, তাঁহারা নিত্য এবং জগৎকর্ত্তা হইতে পারেন না। বেদেতে নানা দেবতাকে, এবং অন্ন, মন আকাশ, চতুষ্পাদ্, দাস, কিতব ইত্যাদিকে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। শ্রুতি চতুষ্পাৎ কচিৎ কচিৎ ষোড়শকলঃ। ঋ। কোথায় ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, কোথায় ষোড়শকলা। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম হন, এই উপাসনা করিবে। কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম। বৃ। ব্রহ্ম ক স্বরূপ এবং খ স্বরূপ। ব্রহ্ম দাসাঃ ব্রহ্ম কিতবাঃ। অথর্ব্ব। ব্রহ্ম দাস সকল এবং কিতব সকল হন। ব্রহ্মকে জগৎস্বরূপে রূপক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ। ইত্যাদি। মুণ্ডক। অগ্নি ব্রহ্মের মস্তক এবং চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষু। ব্রহ্মকে হৃদয়ের ক্ষুদ্রাকাশরূপে বর্ণন করিয়াছেন। দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশে। ছা। অনীয়ান্ ব্রীহের্যবাদ্বা। ছা। ব্রীহি এবং যব হইতেও ব্রহ্ম ক্ষুদ্র হন। এই সকল নানা রূপে এবং নানা নামে বলাতে, ঐ সকল বস্তুর স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ।৩৮।২।৩। বেদ বলেন, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত। ঐ সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্ব বর্ণিত হওয়াতে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রুতি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তদাত্মমিদং সর্ব্বং। ছা। সমুদায় সংসার ব্রহ্মময়। সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ। ছা। ব্রহ্ম সকল গন্ধ এবং সকল রস। অতএব নানা বস্তুতে এবং নানা দেবতাতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিয়া ব্রহ্ম বলাতে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয়। নানা বস্তুর স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। সকল দেবতার এবং সকল বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় ; এবং এই জগতের স্রষ্টা বলিয়া অনেককে মানিতে হয়। ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত। নস্থানতোপি পরস্যোভয় লিঙ্গং সর্ব্বত্রহি। ১১।২।৩।

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ

দেহ এবং দেহের আধেয় এই দুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ম, তিনি নানা প্রকার হন না। যেহেতু, বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ ও এক বলিয়াছেন। শ্রুতিঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। আহ হি তন্মাত্রং। ১৬।২।৩।

ব্রহ্ম চৈতন্যময়

বেদে ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র বলিয়াছেন। অয়মাত্মান্তরোবাহ্যং কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনএব। বৃ। এই আত্মা অন্তরে বাহিরে কেবল চৈতন্যময়। দর্শয়তি চাথেহ্যপি চ স্মর্য্যতে। ১৭।২।৩।

ব্রহ্ম কোনমতে সবিশেষ নহেন

বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়া, পরে অথ শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন। নেতি। বৃ। যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা বাস্তবিক ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্ম কোন মতে বিশেষ হইতে পারেন না। স্মৃতিতেও এইরূপ কহিয়াছেন।

ব্রহ্ম অরূপী নিরাকার

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ১৪।২।৩। ব্রহ্ম নিশ্চয় রূপবিশিষ্ট নহেন। যেহেতু, সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া বলিয়াছেন। তৎসদাসীৎ। ছা। শ্রুতি। অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃসশৃণোত্যকর্ণ ।। ইত্যাদি ।। ব্রহ্মের পা নাই, অথচ গমন করেন। হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন। চক্ষু নাই, অথচ দেখেন। কর্ণ নাই, অথচ শুনেন। শ্রুতি। নচাস্য কশ্চিৎ জনিতা। আত্মার কেহ জনক নাই। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। আত্মা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। অস্থূলমনণু। ব্রহ্ম স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন।

ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণস্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু তিনি বিচিত্রশক্তি

যদি বল, ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া এই সকল নানাপ্রকার পরস্পর বিপরীত বিশেষণ-স্বারা কিরূপে তাঁহার বর্ণন করা হয়, সে কথার উত্তর এই যে, আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২৮।১।২। আত্মাতে সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র শক্তি আছে। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্বেতাশ্বতর। এতাবানস্য মহিমা। ছা। এইরূপ ব্রহ্মের মহিমা জানিবে, অর্থাৎ যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা পরমাত্মার অসাধ্য নহে ; বস্তুতঃ পরমাত্মা অচিন্তনীয় ও সর্ব্বশক্তিমান্।

দেবতারা আপনাদিগকে জগতের কারণ ও উপাস্য কহিয়াছেন, সেইরূপ মনুষ্যও আপনাকে বলিতে পারে ; কিন্তু উহারা কেহই জগতের কারণ ও উপাস্য নহে

দেবতারা স্থানে স্থানে আপনাদিগকে জগতের কারণ এবং উপাস্য বলিয়াছেন। উহা আপনাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহিয়াছেন মাত্র। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ। ৩০।১।১। ইন্দ্র আপনাকে উপাস্য বলিয়া যে উপদেশ দেন, উহা কেবল, আপনাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া বলিয়াছেন। স্বতন্ত্ররূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলেন নাই। যেমন, বামদেব দেবতা নহেন ; অথচ ব্রহ্মাভিমানী হইয়া আপনাকে জগতের কর্ত্তারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বামদেবশ্রুতিঃ। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। বৃ। বামদেব আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে কহিতেছেন, আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি। এইরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন। শ্রুতি। তত্ত্বমসি। তুমি সেই পরমাত্মা। ত্বম্বা অহমস্মি। ইত্যাদি। হে ভগবন্ ! যে তুমি, সেই আমি। স্মৃতি। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্ত-স্বভাববান্।। আমি অন্য নহি ; আমি দেবস্বরূপ। আমি শোকরহিত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যমুক্ত ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই। এ নিমিত্ত, তাহাদিগকে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ। যেমন, ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার। ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। যেমন, সত্যরজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদান-কারণ সেই রজ্জু। অর্থাৎ সেই রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায়। আর যেমন, মৃত্তিকা ঘটের উপাদান-কারণ, অর্থাৎ মৃত্তিকাকে ঘটাকারে দেখা যায়। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ। ২৩।৪।১।

ব্রহ্ম আপনি নামরূপাদির আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মসংকল্পই কারণ

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ, এবং প্রকৃতি উপাদানকারণ। যেহেতু, বেদে বলিয়াছেন, এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই দিয়াছেন যে, এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান হয়। যদি জগৎকে ব্রহ্মময় বলা যায়, তাহা হইলেই এ দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয়। বেদে বলেন, ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এই সকল শ্রুতি অনুসারে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ। শ্রুতি। সোঽকাময়ত বহু স্যাং। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন, আমি অনেক হই। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্ম আত্মসংকল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নামরূপবিশিষ্ট পদার্থের আশ্রয় হইয়াছেন। যেমন মরীচিকা (অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের রশ্মিতে যে জল দেখা যায়) সেই জলের আশ্রয় সূর্য্যের রশ্মি। বস্তুতঃ সে মিথ্যা জল, সত্যরূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায়। সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ, ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং। শ্রুতি।

নশ্বর নামরূপের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায় না

নাম আর রূপ যাহা দেখিতেছ, সে সকল কথা মাত্র ; বস্তুতঃ ব্রহ্মই সত্য। অতএব নশ্বর নামরূপের কোন মতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এই ব্রহ্মোপাসনাতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নানা উপাসনাতে অধিকার ; কিন্তু তাহারা আপনার কিছুই করিতে পারে না, তাহারা সেই সকল উপাসিত দেবতার তুষ্টিসাধক, ভোজ্য অন্নস্বরূপ

কৃষ্ণএব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। কৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহার ধ্যান করিবে। ত্র্যম্বকং যজামহে। মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজন করি। আদিত্যমুপাস্মহে। আদিত্যকে উপাসনা করি। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। পুনর্ব্বার পিতৃরূপ বরুণকে উপাসনা করিলাম। তংমামায়ুর মৃতমুপাস্ব। বায়ুবচন। সেই আয়ু আর অমৃতস্বরূপ আমাকে উপাসনা কর। তমেব প্রাদেশ মাত্রং বৈশ্বানরসুপাস্তে। সেই প্রাদেশ অর্থাৎ বিগত প্রমাণ অগ্নির উপাসনা যে করে। মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা করিবে। উদ্গীথমুপাসীত। উদ্গীথের উপাসনা করিবে। ইত্যাদি নানা দেবতার ও নানা বস্তুর উপাসনা, মুখ্য উপাসনা নহে। এই সকল উপাসনার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মোপাসনাতে যাহাদের প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের নানা উপাসনাতে অধিকার। যেহেতু, ব্রহ্মসূত্রে এবং বেদে কহিতেছেন,—ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। ৭।১।৩। শ্রুতিতে যে, দেবতার অন্নরূপে বলিয়াছেন, উহার তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে, জীব দেবতার সাক্ষাৎ অন্ন। উহার তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, সেই জীব দেবতার ভোগের সামগ্রী। যেহেতু, যাহার আত্মজ্ঞান হয় নাই, সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইয়া দেবতার ভোগে আসে। ইহার কারণ এই যে, শ্রুতিতে এইরূপ কহিতেছেন ;—যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন সবেদ যথা পশুরেবং সদেবানাং। বৃ।। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, আর বলে, এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য, উপাস্য উপাসক হই, সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশুমাত্র হয়। সর্ব্ববেদান্ত প্রত্যয়শ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ। ১।৩।৩।

বেদে এককেই উপাসনা করিতে বলে

সকল বেদ একেরই উপাসনা নির্ণয় করিয়াছেন। যেহেতু, বেদে এক আত্মার উপাসনায় বিধি আছে। আর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দের ভেদ নাই। আত্মৈবোপাসীত। বৃ। কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। তমেবৈকং জানথ আত্মা ন মন্যাবাচোবিমুঞ্চথ। কঠ। সেই যে আত্মা, কেবল তাঁহাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর। দর্শনাচ্চ। ৬৬।৩।৩।

ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে অন্য উপাসনা কর্ত্তব্য নয়

বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে, ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে অন্য উপাসনা করিবে না। শ্রুতি। আত্মৈবেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ। এই যে আত্মা, কেবল তাঁহার উপাসনা করিবে। অন্য কোনও বস্তুর উপাসনা, জ্ঞানবান লোকের কর্ত্তব্য নয়।

ব্রহ্মোপাসনায়, মনুষ্যের ও দেবতার তুল্য অধিকার

বেদান্তে দৃষ্ট হইতেছে—তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ। ২৬।৩।১। বাদরায়ণ কহিতেছেন,—মনুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে, সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও আছে। তদ্যোযোদেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এতদভবৎ তথর্ষীণাং তথামনুষ্যাণাং। বৃ। দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদের মধ্যে, মনুষ্যদের মধ্যে, যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট হন, তিনিই ব্রহ্ম হন। অতএব ব্রহ্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্য অধিকার।

ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য, দেবতার পূজ্য

বরঞ্চ, শ্রুতি এমন কহিতেছেন, যে মনুষ্য ব্রহ্মোপাসক হন, তিনি দেবতার পূজ্য হন। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি। ছা। সকল দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্টের পূজা করেন।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়

সেই ব্রহ্মের উপাসনা কিরূপে করিবে, তাহার বিবরণ কহিতেছেন। শ্রুতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তন করিবে এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিবে। সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ। ৪৭।৪।৩। ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিবার ইচ্ছা,—এই তিন কার্য্য ব্রহ্মদর্শনের অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যে সকল বিধি আছে, ইহা তাহার অন্তর্গত। অতএব, শ্রবণ মননাদি জ্ঞানীর অবশ্য কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয়। তৃতীয় বিধি ধ্যান তাবৎ কর্ত্তব্য, যেমন দর্শ-যাগের অন্তর্গত অগ্ন্যাধান বিধি; পৃথক নহে। ব্রহ্মশ্রবণ কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রশ্রবণ কর্ত্তব্য। মনন;—অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যার্থের চিন্তা করা। নিদিধ্যাসন;—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা। অর্থাৎ ঘট পটাদি যে, ব্রহ্মের সত্তাদ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই সত্তাতে চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা করা। এরূপ করিয়া পরে অভ্যাসদ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবে। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। ১।১।৪। সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য। যেহেতু, শ্রবণাদির উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ দেখিতেছি। আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টং।১২।১।৪।

মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবে

মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবে। জীবন্মুক্ত হইলে পরেও আত্মার উপাসনা ত্যাগ করিবে না, যেহেতু বেদে এইরূপ দেখিতেছি। শ্রুতি। সর্ব্বদৈবমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ।

মুক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আত্মার উপাসনা করিবে। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে। জীবন্মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবে।

শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যমনুষ্ঠেয়ত্বাৎ। ২৭।৪।৩। জ্ঞানের অন্তরঙ্গ বলিয়া বেদে শমাদির বিধান আছে ; অতএব শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদি বিশিষ্ট থাকিবে। শম কি?—মনের নিগ্রহ। দম কি?—বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। অর্থাৎ মনে এবং বহিরিন্দ্রিয়ের বশে থাকিবে না ; মন এবং ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিবে। শমদমাদি এই যে আদি শব্দ ইহাদ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্যাদি বুঝাইতেছে। বিবেক কি?—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য কি?—বিষয়ে প্রীতিত্যাগ অতএব ব্রহ্মোপাসক শমদমাদিতে যত্ন করিবেন।

ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়

ব্রহ্মোপাসনা যেমন মুক্তিফল দেন, সেইরূপ অন্য সকল ফল প্রদান করেন। পুরুষার্থোহতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ। ১।৪।৩। বেদে কহিতেছেন,—ব্যাসের এই মত যে, আত্ম-বিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। শ্রুতি। আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতি কামঃ ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি। মু। ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষিত আত্মার উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন। সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। ছা। ব্রহ্মজ্ঞানের সংকল্পমাত্র পিতৃলোক উত্থান করেন। সর্ব্বেঽস্মৈদেবাবলিমাহরন্তি। তৈ। ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল দেবতা পূজা করেন। ন স পুনরাবর্ত্ততে। ন স পুনরাবর্ত্ততে। ছা। ব্রহ্মজ্ঞানীর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম কদাপি নাই।

যতির যেরূপ, গৃহস্থের সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার

যতির যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার, সেইরূপ, উত্তম গৃহস্থেরও অধিকার আছে। কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।৪৮।৪।৩। সকল কর্ম্মে এবং সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে। অতএব, পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবে ; যেহেতু বেদে কহেন, শ্রদ্ধাধিক্য হইলে, সকল উত্তম গৃহস্থ, দেবতা যতিতুল্য হন। শ্রদ্ধাধিক্যাত্তু কৃৎস্নাহ্যেব গৃহিণোদেবাঃ কৃৎস্নাহ্যেব যতয়ঃ। ছা।

ব্রহ্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, না করিলে পাপ নাই

স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমের আচারের অনুষ্ঠান যদি ব্রহ্মোপাসক করেন, তবে উত্তম। না করিলে পাপ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ। ২৬।৪।৩।

জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য

জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করা আবশ্যক। যেহেতু, বেদে যজ্ঞাদিকে চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে কহিয়াছেন। যেমন, যতক্ষণ না গৃহে পোঁছান যায়, ততক্ষণ অশ্বের প্রয়োজন, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের প্রয়োজন।

বর্ণাশ্রমাচার না করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।৩৬।৪।৩। অন্তরা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। বেদে দেখিতেছি, রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। তুল্যন্তু দর্শনং। ৯।৪।৩। কোন কোন জ্ঞানীর যেমন কর্ম্ম এবং জ্ঞান এই দুয়ের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে, সেইমত কোন কোন জ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগ দেখা যায়। এই উভয়ের প্রমাণ পরের দুই শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে। জনকোবৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে। বৃ। জনকজ্ঞানী বহু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। বিদ্বাংসোহগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে। জ্ঞানবান সকল অগ্নিহোত্র সেবা করেন নাই।

অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ

যদ্যপি ব্রহ্মোপাসকের বর্ণাশ্রম ও কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং তাহার ত্যাগে এই দুয়েতেই সামর্থ্য আছে, তথাপি, অতস্তিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ।৩৯।৪।৩। অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, বেদে কহিয়াছেন যে, আশ্রমবিশিষ্ট জ্ঞানীর ব্রহ্মবিদ্যাতে শীঘ্র উপলব্ধি হয়।

যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেইখানে উপাসনা করিতে পারা যায়

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্য কোন তীর্থের কিম্বা কোন দেশের অপেক্ষা করে না। যত্রৈকাগ্রতাতত্রাবিশেষাৎ।১১।১।৪। যেখানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ইহাতে দেশের এবং তীর্থাদির নিয়ম নাই। যেহেতু বেদে কহিতেছেন ;—শ্রুতি। চিত্তস্যৈকাগ্র্যসম্পাদকে দেশে উপাসীত। যেস্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে, উপাসনা করিবে।

মৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই

ব্রহ্মোপাসকের উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পৃথক্ ফল হয় না। অতশ্চায়নেপিদক্ষিণে। ২০।২।৪। দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলেও সুষুম্নাদ্বারা জীব নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্মজ্ঞানী জন্মমৃত্যু হ্রাসবৃদ্ধি হইতে মুক্ত হয়েন

শ্রুতি। এতমানন্দময়মাত্মানমনুবিশ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হ্রসতে ন বর্দ্ধতে ইত্যাদি। জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়া জন্মমৃত্যু হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন।

ওঁ তৎসৎ

স্থিতি সংহার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তিনি সত্তামাত্র হয়েন। বেদের প্রমাণ, মহর্ষির বিবরণ, আচার্য্যের ব্যাখ্যা এবং বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুয়ের কোন ফল হয় না। এই বেদান্তসারের বাহুল্য এবং বিচার যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহারা বেদান্তের সংস্কৃত এবং ভাষাবিবরণে তাহা জানিবেন।

ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে বেদান্তমতের ব্যাখ্যা

রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ; —পরমেশ্বর জগতের আত্মা। (God is the Self of the Universe)। পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা যায় না। তটস্থ লক্ষণদ্বারা, অর্থাৎ তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্য যে জগৎ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহার লক্ষণ বা সগুণভাব জানা যায়। পরমেশ্বরই বাস্তবিক পারমার্থিক সত্তা ; —তাঁহার অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। মায়া কাহাকে বলে, এই বিষয়ে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, মায়া ঈশ্বরের শক্তি বা শক্তির কার্য্য। জগৎ মায়ার কার্য্য, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানও বলা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যানুসারে, মায়া মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণ শক্তি, এবং মায়া গৌণরূপে ঐ শক্তির কার্য্য, অর্থাৎ জগৎ। এই যে মায়া বা জগৎ, ইহা ভ্রমমাত্র। জগৎকে ভ্রম বলার তাৎপর্য্য কি ? বেদান্তদর্শনে দুটি দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎকে ভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। প্রথম, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। দ্বিতীয়, যেমন স্বপ্ন। প্রথম দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, ভ্রমাত্মক সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অর্থাৎ, যেমন রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া ভ্রমাত্মক সর্পের সত্তা , সেইরূপ, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্তাবিশিষ্ট হইয়াছে। জগৎকে স্বপ্ন বলার অর্থ কি ? স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল, যেমন জীবের সত্তার অধীন, জীবকে ছাড়িয়া স্বপ্নের যেমন সত্তা নাই, সেইরূপ, জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন। জগৎ অসত্য, এই কথার অর্থ কি ? যথার্থ সত্তা, —পারমার্থিক সত্তা (absolute existence) কেবল এক পরমেশ্বরের। ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তুই অসত্য। জগতের নিজের স্বাধীন নিরবলম্ব সত্তা নাই।

জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা, বিহিত কর্ম্ম করিতে হইবে। যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধন এবং জনহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান। রাজা রামমোহন রায়, সগুণ এবং নির্গুণ, কর্ম্ম, এবং জ্ঞান, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। যে বৈদান্তিক মতে, জগৎ, মাতাপিতা ইত্যাদি সকলকে মিথ্যা জানিয়া সংসার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করা হয়, রাজা রামমোহন রায়, সেইরূপ মত অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিতেন।

ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে জগতের কর্ত্তা ও নির্ব্বাহকরূপে, বিধাতারূপে জানা যায়। রামমোহন রায় এইরূপে বেদান্ত-দর্শনের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ ভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে বেদান্তমত সমর্থন করিয়াছেন। রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিয়াছেন : কিন্তু সেই শঙ্করোক্ত মিথ্যাত্ব, নিজে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শঙ্করমতে মায়া মানিয়াছেন ; —মায়া অজ্ঞান। ব্রহ্মকে মায়া স্পর্শ করে না। কিন্ত তিনি সেই অজ্ঞান বা মায়ার এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জীবসকল, ঈশ্বর হইতে পৃথক, এইরূপ বোধই মায়া বা অজ্ঞান। রামানুজ মতে পরমেশ্বর মায়ার অধীশ্বর : অর্থাৎ চিৎশক্তি ও মায়াশক্তি বা চিদচিৎ-শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই উপাস্য। নির্গুণ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের মায়াতিরিক্ত স্বরূপ স্বীকৃত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় শঙ্করভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করকে এমনভাবে বুঝিয়াছিলেন, যাহাতে লৌকিক ব্যবহার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও উপাসনাদি সম্ভব হয়। শঙ্কর ভাষ্যেও এ সকল আছে : তবে নির্গুণভাব প্রবল। রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যায় উভয় দিকের সমান প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে।

'বেদান্তপ্রবেশ' ও রামমোহন রায়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁহার রচিত 'বেদান্তপ্রবেশ'-গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বেদান্তভাষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—"মিথিলাতে বেদবেদান্ত ও বেদাঙ্গের অনুশীলন বরং কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ই বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।" ...."তিনি (রামমোহন রায়) ১৭৩৭ শকে, বেদান্তসূত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি তাহার যে প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা যদিও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি বেদান্তের সমুদয় সার তাৎপর্য্যই তদ্দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী না হইলে, কিছুতেই ঐরূপ ভাষ্য করা যায় না। যাঁহারা উহার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা হইতে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন।"

"এ স্থলে মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ব্যক্ত না করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করিতে পারি না। তিনি যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক ছিলেন, এমন নহে। তিনি একজন শাস্ত্রের অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন। বিচারতঃ তাঁহাকে একজন হিন্দু-শাস্ত্রীয় দর্শনকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি বেদ ও অন্যান্য সমুদয় শাস্ত্রের যথাযোগ্য মান্য রাখিয়া শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা আমারদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ইয়োরোপীয় দর্শনকারদিগের শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার এদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু রামমোহন রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয়, শাস্ত্রপ্রিয় ভারতরাজ্য তাঁহার অর্ণবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি যে সহজ প্রণালীতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তেমনি হৃদয়গ্রাহী।"

"রামমোহন রায় একটি অতি সহজ ও সুসংলগ্ন প্রণালী দ্বারা ঐ সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন যে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। ভেদই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। উপনিষদে যে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' কহিয়াছেন, সে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদনার্থে। নানা দেবতাকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সে ব্রহ্মের সর্ব্বত্রে বর্ত্তমানতা দেখাইবার জন্য এবং দুর্ব্বলাধিকারীর হিতের নিমিত্তে। প্রত্যেক পদার্থ বা দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বামদেব, কপিল, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে, আপনা আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, 'অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মাস্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন। ফলে, তাঁহারা যে আপনারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্ম ও বর্ণনার এমত তাৎপর্য্য নহে। রামমোহন রায়ের এইরূপ ব্যাখ্যায় স্থির হইয়াছে যে, জীবাত্মাকে, কোন মনুষ্যকে, বা কোন পদার্থকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলা অদ্বৈতপ্রতিপাদক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে।"

উপনিষদ্ প্রকাশ

বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসার প্রকাশ করিয়া তিনি পাঁচখানি উপনিষদ্, বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। তন্মধ্যে সামবেদের অন্তর্গত তলবকার উপনিষৎ প্রথম প্রকাশ করেন। তলবকারের অপর নাম কেনোপনিষৎ। ১৭৩৮ শকে, ১৭ই আষাঢ়, ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

তলবকার উপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, তিনি ভগবান্ ভাষ্যকারের অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। তৎপরে বলিতেছেন,—"বেদেতে যে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান আছে, তাঁহারা ইহাকে অবশ্যই মান্য এবং গ্রাহ্য করিবেন ; আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সহিত সুতরাং প্রয়োজন নাই।"

শেষোক্ত কথাগুলি তিনি সাকারবাদী হিন্দুদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। সাকারবাদী হিন্দুগণ বেদকে মূলশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং সেই বেদ হইতে যাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, তাঁহাদের তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। উপনিষদ্ বেদের শিরোভূষণ। উপনিষদ্ যে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিতেছেন, হিন্দু হইয়া বেদকে অভ্রান্ত মূলশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া, কেমন করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন? সুতরাং রামমোহন রায় সাকারবাদী হিন্দুদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন, —"যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সহিত সুতরাং প্রয়োজন নাই।"

এ কথার আর একটি দিক্ আছে। যাঁহাদের যে শাস্ত্র, রামমোহন রায় তাঁহাদের জন্য সেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য বাইবেলের ব্যাখ্যা, মুসলমানদের জন্য কোরানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামমোহন রায় নিজে কেবল বেদ মান্য করিতেন, বাইবেল বা কোরান মানিতেন না, ইহা সত্য নহে। অথবা, তিনি বেদ, বাইবেল, কোরান, সকল শাস্ত্রকেই সকলের জন্য, সমান ভাবে, মান্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাও নহে। তিনি হিন্দুদের জন্য বেদ, খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য বাইবেল, মুসলমানদের জন্য কোরান মান্য করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের মত কি ছিল? তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বজনীন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। সকল শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য সেই একেশ্বরবাদ। সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট, তাহার শাস্ত্রকে মান্য করিয়া, তাহা হইতেই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতেন। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীর নিকটে, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তির অনুসরণ না করিয়া, শাস্ত্র ও যুক্তি এই উভয়কেই ধর্ম্মবিচারের ভিত্তি করিয়া লইতেন।

১৭৩৮ শকের ৩১শে আষাঢ়, যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ প্রকাশ করিলেন। ইহার অপর নাম বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। বেদান্তসূত্রের ন্যায় তিনি ইহারও একটি ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছিলেন। উক্ত ভূমিকাতে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। তাঁহার বিপক্ষগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল গ্রন্থ অদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে, এবং শাস্ত্রসিদ্ধ মতকে ব্যক্তিবিশেষের মত বলিয়া অগ্রাহ্য করাও অত্যন্ত অন্যায়।

ঈশোপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন রায় প্রথমতঃ বলিতেছেন যে, নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা বেদান্তের বা উপনিষদের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়তঃ, পুরাণ ও তন্ত্র, শাস্ত্র কি না এবং তাহাতে যে সকল দেবদেবীর পূজার উপদেশ আছে, তাহা প্রামাণ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পুরাণ তন্ত্রাদিও শাস্ত্র ; কেননা তাহাতেও এক নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে প্রদর্শন করিতেছেন যে, পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রে, যে সকল দেবদেবীর পূজার কথা আছে, উহা অজ্ঞানী ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য। যাঁহারা পরমাত্মার উপাসনা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, পরমাত্মার উপাসনা অসম্ভব হইলে শাস্ত্রে উহার উপদেশ থাকিত না। শাস্ত্রে অসম্ভব বিষয়ের উপদেশ কেন থাকিবে? পরিশেষে,

যাঁহারা বলেন যে, পরমাত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর জন্য, এবং দেবতার উপাসনা গৃহস্থের জন্য, রামমোহন রায় অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি নিঃসংশয়িতরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গৃহস্থেরও ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে।

গৃহস্থও ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী, এই সত্য প্রচার করিয়া রামমোহন রায় ভারতে নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। রামমোহন রায় ভারতবাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা মূল্যবান্ সত্য আর কিছু প্রচার করেন নাই। গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মোপাসনাপ্রচার রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের বিশেষত্ব। এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদান্তিক বা ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অপেক্ষা তাঁহার মতের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়। বেদান্তের ভাষ্যে রামমোহন রায় আপনাকে শঙ্করের অনুচর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গৃহীর ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে শঙ্করের সহিত তাঁহার পার্থক্য লক্ষিত হয়। শঙ্কর সন্ন্যাসের পক্ষে, রামমোহন রায় গার্হস্থ্যধর্ম্মের পক্ষপাতী।

সাকার উপাসনা পরম্পরার কারণ কি? —এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কারণ এই যে, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, ব্রত মহোৎসবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের লাভের বৃদ্ধি। দ্বিতীয় কারণ, শূদ্র ও বিষয়কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণের মনোরঞ্জন।

ব্রহ্মোপাসক শীত, উষ্ণ, পঙ্ক, চন্দন সমান জ্ঞান করিবেন, সাকারবাদীদিগের এই কথা রামমোহন রায় খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি প্রাচীন কালের ঋষিদের দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন যে, ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদেরও ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল। উক্ত বিষয়ে রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি প্রদর্শন করিতেছেন যে, শাস্ত্রে দেবতার উপাসকদিগের প্রতিও স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে সর্ব্বময়রূপে দর্শন করিবার উপদেশ আছে। সুতরাং, পঙ্ক-চন্দন সমান জ্ঞান কর না কেন বলিয়া যেমন ব্রহ্মজ্ঞানীকে আক্রমণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ, সাকারোপাসককেও অবিকল ঐ কথা বলা সঙ্গত হইতে পারে। কেননা, সাকারোপাসকের প্রতিও উপদেশ রহিয়াছে যে, তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বময় বলিয়া অনুভব করেন। তাঁহার কোন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত তাঁহাকে এই বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় কি কর্ম্ম কর? তিনি এই কথার উত্তরে আপনার হীনতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতাবলম্বী লোক সম্বন্ধেও ঐ কথা সমানরূপে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকেও বলা যাইতে পারে, শাক্তের ন্যায় কি কর্ম্ম কর? বৈষ্ণবের ন্যায় কি কর্ম্ম কর? ইত্যাদি।

আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা হইতে কয়েকটি স্থান নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক, রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন।

সাকার উপাসনা কাহাদের জন্য?

"এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমাত্র, সর্ব্বত্রব্যাপী, আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন। তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়; আর নামরূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতার উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি অপ্রমাণ? আর, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন? তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন; যেহেতু, পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমনের অগোচর করিয়া

পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। তবে, পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে। কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি, সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত জমদগ্নির বচন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা ।।

জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধিশূন্য, শরীররহিত যে পরমেশ্বর, তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। রূপকল্পনার স্বীকার করিলে, পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ের বচন।

রূপনামাদি নির্দ্দেশবিশেষণ বিবর্জ্জিতঃ।
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং ।।

রূপনাম ইত্যাদি বিশেষণরহিত, নাশরহিত, অবস্থান্তরশূন্য, দুঃখ এবং জন্মহীন পরমাত্মা হয়েন। কেবল আছেন, এইমাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়।

অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামণীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ।।

জলেতে ঈশ্বরবোধ ইতর মনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বরবোধ দেবজ্ঞানীরা করেন, কাষ্ঠমৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্খেরা করে, আত্মাতে ঈশ্বরবোধ জ্ঞানীরা করেন। শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য। কিং স্বল্পতপসাং নৃণামচর্চায়াং দেব চক্ষুষাং দর্শনস্পর্শন প্রশ্ন প্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং। ভগবান শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। তীর্থ স্নানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি যাহাদের, আর প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞান যাহাদের, এমত রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরদেব দর্শন, স্পর্শন, নমস্কার, আর পাদার্চ্চনা অসম্ভাবনীয় হয়।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যেধীঃ।
যত্তীর্থ বুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎজনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ।।

যে ব্যক্তির কফ ও পিত্ত, বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব, আর মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থবোধ হয়, আর এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে না হয়, সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয়। কুলার্ণবে নবমোল্লাসে—

বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতেহ্যবিক্রিয়ে।
কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ।।

ক্রিয়াহীন, বর্ণাতীত, যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা বিদিত হইলে, মন্ত্র সকল, মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে ।।

পরব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন, মলয়ের বাতাস পাইলে, তালের পাখা কোন কোন কার্য্যে আইসে না। মহানির্ব্বাণ—

এবং গুণানুসারেণ রূপানি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ।।

এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ, অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে।

অতএব বেদ পুরাণ, তন্ত্রাদিতে, যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন, তাহার মীমাংসা, পরে এইরূপ শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন।"

ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব কি না ?

যাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য, তাঁহাদের কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন :—

"যদি কহ, ব্রহ্মজ্ঞানে যেরূপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন, সে প্রমাণ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত, তবে, আত্মা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ। আত্মৈবোপাসীত। এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের প্রেরণা থাকিত না। কেননা, অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা, শাস্ত্রে হইতে পারে না। আর, যদি কহ, ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে, কিন্তু কষ্টসাধ্য, বহু যত্নে হয়, ইহার উত্তর এই,—যে বস্তু বহু যত্নে হয়, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয়। তাহার অবহেলা কেহ করে না। তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ, অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক, ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর।"

ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা জন্মমৃত্যুর অধীন,
সুতরাং পরমাত্মার উপাসনা কর্ত্তব্য

নামরূপবিশিষ্ট সকলেই জন্য ও নশ্বর, —ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণও জন্য ও নশ্বর। সুতরাং পরমাত্মার উপাসনা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে রামমোহন রায় বলিতেছেন :—

"পুরাণ এবং তন্ত্রাদি স্পষ্ট কহিতেছেন যে, যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট সকলই জন্য এবং নশ্বর। প্রমাণ, স্মার্ত্তধৃত বিষ্ণুর বচন ;—

যে সমর্থাজগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ।।

এই জগতের যাঁহারা সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা, এবং সমর্থ হয়েন, তাঁহারাও কালে লীন হয়েন। অতএব কাল বড় বলবান। যাজ্ঞবল্ক্যের বচন ;—

গন্ত্রী বসুমতী নাশ মুদধির্দৈবতানিচ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি ।।

পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইবেন। অতএব ফেনার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্যসকল, কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে ভগবতীর প্রতি ব্রহ্মার বাক্য ;—

বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ।।

বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের, যেহেতু, শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ, অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে। কুলার্ণবের প্রথমোল্লাসে ;—

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয় সমাচরেৎ।।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীরবিশিষ্ট বস্তুসকলে নাশকে পাইবেন। অতএব, আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক।

এইরূপ ভুরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে, লক্ষ্য স্থানেও নামরূপবিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া কহিয়া পুনরায় কহেন যে, এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পনামাত্র করা গেল, তবে ঐ পুর্ব্বের লক্ষ্য বচনের সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না। আর, যদি পুরাণ তন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময়, এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতা, এবং দেবতার বাহন, এবং ব্যক্তিসকল, আর অন্নাদি যাবৎ বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া, পুনরায়, পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয়, এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে, বাস্তবিক নামরূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন, তবে তাবৎ পুর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কিনা? যদি কেহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন, আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন, অতএব যাঁহাদিগের অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, তাঁহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন, ইহার উত্তর, —যদি পুরাণাদিকে সত্য করিয়া কহ, তবে, তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে, আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে, সকলকেই সত্য করিয়া মানিতে হইবেক। যেহেতু, যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায়, তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয়। অতএব, পুরাণতন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন, তাহাতে পরস্পর দোষ না হয়। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তবাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জনবাক্যে মগ্ন হই।"

ব্রহ্মোপাসনায় গৃহস্থের অধিকার

যাঁহারা বলেন পরমাত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, এবং দেবতাদের উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—

"এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু, বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে, আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা* কর্ত্তব্য, এরূপ অনেক প্রমাণ আছে। তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। বেদে এবং বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে, তাহা বেদান্তের তিন অধ্যায়ে চারপাদে আটচল্লিশ সূত্রে পাইবেন। অধিকন্তু মনু সকল স্মৃতির প্রধান। তাহার শেষ গ্রন্থে সকল কর্ম্মকে কহিয়া পশ্চাৎ কহিলেন ;—

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।।

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহেতে, আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন।

---

* পরমাত্মার উপাসনা।

ইহাতে কুল্লূকভট্ট মনুর টীকাকার লিখেন যে, এ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি হয়, ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য হয়। এ সকল অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতে অবশ্য হয়, এমত নহে।"

আর, মনুর চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্মপ্রকরণে ;—

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।। ২১।

তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, ঋষিযজ্ঞ, আর দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেক না। ২১।

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি।। ২২।

যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন, তাঁহারা বাহ্যেতে কোনও যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি যে, পাঁচ ইন্দ্রিয়, তাহার রূপ, শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চযজ্ঞকে সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমনরূপ যে পঞ্চযজ্ঞ তাহাকে করেন। ২২।

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণেচ পশ্যন্তোযজ্ঞনির্বৃতিমক্ষয়াং।। ২৩।

আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, পঞ্চযজ্ঞের স্থানে, বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে, আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে, অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে, আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায়, তখন নিশ্বাস থাকে না ; যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায়, তখন বাক্য থাকে না। এই হেতু, কোন কোন গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ স্থানে শ্বাসনিশ্বাসত্যাগ, আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন। ২৩।

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা।। ২৪।

আর, কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা, গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ, শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে, পঞ্চযজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্মাত্মক হয়েন ; অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্ম-জ্ঞানদ্বারা সমুদয় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়। ২৪।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ ;—

ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে।।

সৎপাতিগ্রহাদিদ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জ্জন করেন, আর অতিথিসেবাতে তৎপর হয়েন, নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেতে রত হয়েন, আর সর্ব্বদা সত্যবাক্য কহেন, আত্মতত্ত্ব-ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন, এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন ; অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন, এমত নহে ; কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তি হয়।

অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে, গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন

বিধি আছে, সেইরূপ, কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, অথবা কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারও বিধি আছে। বরঞ্চ, ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না, এমত স্থানে স্থানে পাওয়া যাইতেছে।

শাস্ত্রে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ থাকিলেও, সাকার উপাসনা এদেশে কেন পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে ?

ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয়। তাঁহার উপাসনা বেদবেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান ; সাকার উপাসনা গৌণ উপাসনা তবে, এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে, কেন পরম্পরায় সাকার উপাসনা করিয়া আসিতেছেন, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—

"ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে, আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে। তাহার কারণ এই, পণ্ডিত সকল, যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ-মতে, আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম করিয়া জানিয়া থাকেন ; কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে ; সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি। অতএব, তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ, সর্ব্বদা বাহুল্যমতে করিয়া আসিতেছেন, এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয়কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয়, অর্থাৎ আপনার উপমায় ঈশ্বর, আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে, ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে। আর, ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা, এবং নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয়। তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রমবোধ হয়। অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানাপ্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন ; কিন্তু কোন লোককে স্বার্থপর জানিলে, তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না। অতএব আপনাদের শাস্ত্র আছে, পরমার্থ বিষয়ে কেননা বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়।"

বিশ্বাস থাকিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় কিনা ?

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে সাকার উপাসনার পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেকে বলিতেন যে, বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন ; —"এ স্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে, অতি অল্প দিনের নিমিত্ত, আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে, তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময়, যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন ; আর পরমার্থ বিষয়, যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারী, আর অতিমূল্য হয়, তাহার গ্রহণ করিবার সময়, কি শাস্ত্রের দ্বারা, কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না। আপনার বংশের পরম্পরার মতে, আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয়, সেইরূপ গ্রহণ করেন, এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে, বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাসদ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না। যেহেতু, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে, বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে।"

পুরুষানুক্রমিক প্রথাবিষয়ে রামমোহন রায়ের মত

শাস্ত্রীয় বিচারে রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন করিতে অক্ষমতাপ্রযুক্ত অনেকে প্রচলিত প্রথার দোহাই দিতেন। যাহা পুরুষানুক্রমে হইয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল, এই বলিয়া অনেকেই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিতেন। তিনি তজ্জন্য, তাঁহার ঈশোপনিষদের ভূমিকায়

লিখিয়াছেন ;—"বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসম্মত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্টপরম্পরাসিদ্ধ হয়, কেবল অল্পকাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এবং হাস্য আমোদ জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে, পরম্পরাসিদ্ধ নহে, কিরূপে ইহা করি। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি, পূর্ব্বশিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত, এবং শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার অন্যথা, সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম্ম করেন, সে সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামও করেন না ; যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম ; যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ইংরাজ—যাহাকে স্লেচ্ছ কহেন, তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে, আর কোন্ পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন, তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফর দিয়া বদ্ধ করা পত্র, যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা, কোন্ পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে, যাহাকে স্লেচ্ছ কহেন, তাহাকে নিমন্ত্রণ করা, আর, দেবতার সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরাসিদ্ধ হয়?

"এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম্ম, যাহা অত্যন্ত শিষ্টপরম্পরার বিরুদ্ধ হয়, প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর, শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী, রটন্তী ইত্যাদি পূজা, আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ, এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল? তাহাতে যদি কহ যে, এ উত্তম কর্ম্ম, শাস্ত্রবিহিত আছে, যদ্যপিও পরম্পরাসিদ্ধ নহে, তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর ; শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম, পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও, যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে সর্ব্ব-শাস্ত্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা, যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে, কেবল অতি অল্পকাল কোন কোন দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে, ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়?"

পঙ্ক চন্দন, চোর সাধু ইত্যাদিকে সমান জ্ঞান করনা কেন?

তাহার পর রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—"শুনিতে পাই যে, কোন কোন ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে, তোমরা ব্রহ্মোপাসক, তবে শাস্ত্রপ্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্মবোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন, শীত উষ্ণ, আর, চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর? ইহার উত্তর এক প্রকার বেদান্তসূত্রের ভাষা বিবরণের ভূমিকাতে, ১০ দশের পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে যে, বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন ; আর, রাজনীতি এবং গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাহা যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান্ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুনও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া, বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব, ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন ;—

> বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ।
> কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব।।

বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া, কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জ্জিত হইয়া, আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া, আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া, হে রাম! লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর।

রামচন্দ্রও ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন। আর, দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী, শাস্ত্রপ্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও,

খাদ্যাখাদ্য, পঙ্কচন্দনের, আর শত্রু মিত্রের বিবেচনা কেন করহ, সে ব্যক্তি যদি দেবীর উপাসক হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে, ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, আর কহিতেছ, দেবী মাহাত্ম্যে, "সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে," যে তুমি সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও, তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্কচন্দন শত্রুমিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান? সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে, তোমার বিশ্বাস এই যে, "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ,' যে যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় হয়। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য; "একাংশেন স্থিতো জগৎ," আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়াছি; তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া, বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও, পঙ্কচন্দন শত্রুমিত্রের ভেদ কেন করহ? এইরূপ, সকল দেবতার উপাসকেরে জিজ্ঞাসা করিলে, যে উত্তর তাঁহারা দিবেন, সেই উত্তর প্রায় আমাদের পক্ষ হইবেক।

তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত কি কর্ম্ম কর ?

রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুচরবর্গের সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি বলিতেন যে, তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন, অথচ তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন? এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;— "এ যথার্থ বটে যে, যেরূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের, তাহা আমাদের হইতে হয় নাই ; তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে।

গীতা ;—পার্থনৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্যবিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।

যে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থরূপ যত্ন না করিতে পারে, তাহার ইহলোকে পাতিত্য, পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না। যেহেতু শুভকারীর, হে অর্জ্জুন। কদাপি দুর্গতি জন্মে না।

কিন্তু ঐ পণ্ডিতের দিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকালাবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কি না? বৈষ্ণবের, শৈবের, এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম, তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা করিয়া থাকেন কি না? যদি এ সকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন, তবে আমাদের সর্ব্ব প্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ কেন করেন?

—

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরিচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।।

পরের ছিদ্র সর্ষপমাত্র লোকে দেখেন, আপনার ছিদ্র বিল্বমাত্র হইলে দেখিয়াও দেখেন না।

সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্ন পূর্ব্বক করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে কাহারও উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন, বিধিবৎ চিত্তসুদ্ধি না হইলে, ব্রহ্মোপাসনায় প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে কহেন যথাবিধি চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্তশুদ্ধি ইহার হইয়াছে। যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। তবে সাধনের দ্বারা, অথবা সৎসঙ্গ, অথবা পূর্ব্ব-সংস্কার, অথবা গুরুর প্রসাদাৎ, কি কারণে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কিরূপে কহা

যায়। অধিকন্তু, যাঁহারা এমন প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা উচিত যে, তন্ত্রে দীক্ষা-প্রকরণে লিখিয়াছেন ;—

শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতী।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা।।

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয়, সর্ব্বদা শুচি হয়, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, ধারণাতে পটু, শক্তিমান্, আচারাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, সুন্দর, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সংযত হয় ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলেই দীক্ষার অধিকারী হয়।

কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এইরূপ অধিকারী দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না? যদি আপনারা অধিকারী বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন, তবে অন্যের প্রতি কি বিচারে এ প্রশ্ন তাঁহাদের শোভা পায়।”

বর্ত্তমান সময়ে, পৌত্তলিকতা সমর্থন করিবার জন্য, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রতিমা সকল পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণচিন্তা করিবার জন্য চিহ্নস্বরূপ। পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য প্রতিমূর্ত্তি সকল চিহ্ন ও অবলম্বন মাত্র।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও ঐ কথা উঠিয়াছিল। কোন কোন হিন্দু ইয়োরোপীয়-দিগের নিকট ঐ কথা বলিয়া পৌত্তলিকতা সমর্থন করিতেন। কোন কোন ইয়োরোপীয়ও ঐ প্রকার বুঝিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় উক্ত বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—এদেশে যে সকল প্রতিমা পূজা হইয়া থাকে, উহা যে পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণের পূজার জন্য রূপক চিহ্নস্বরূপ, ইহা হিন্দুগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ দেবতার মূর্ত্তিসংগঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। সাকারবাদীদিগের বিশ্বাসানুসারে, দেবতাদিগের বিশেষ বিশেষ বাসস্থান আছে, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহারা মনুষ্যের সদৃশ। যেমন, শৈবগণ বিশ্বাস করেন যে, শিব একজন সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতা। দেবতাদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্ব প্রধান। হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস নামক পর্ব্বতে তিনি বাস করেন। তাঁহার দুই পত্নী, ও সন্তানাদি আছে। তিনি বহু অনুচরে পরিবৃত।

সেইরূপ, বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, বিষ্ণু সকল দেবতার অধিপতি। তিনি তাঁহার পত্নী ও অনুচরগণের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করেন। শাক্তরাও তাঁহাদের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে উক্তরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দেবতার উপাসক আপনার উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে উক্ত প্রকার বিশ্বাস করেন। প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা আপনাদের উপাস্য দেবতার প্রাধান্য রক্ষার জন্য এতদূর অধ্যবসায়শীল যে, যখন তাঁহারা হরিদ্বার, প্রয়াগ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি প্রভৃতি তীর্থস্থানে একত্র হন, তখন তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা লইয়া ঘোরতর বাক্যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন পরস্পর প্রহার ও অত্যাচার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা কেবল যে, আপনার উপাস্য দেবতাকে চিন্তা করিবার জন্য দেববিগ্রহকে অবলম্বনমাত্র মনে করেন, এমন নহে। প্রতিমূর্ত্তি ক্রয় করিয়া লইয়া, অথবা নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া, অথবা নিজের তত্ত্বাবধানে উহা সংগঠিত করাইয়া উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর উপাসকেরা বিশ্বাস করেন যে, উহাতে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক সময়, পুরুষ জাতীয় কোন দেববিগ্রহের সহিত স্ত্রী জাতীয় কোন দেববিগ্রহের বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। উপাসকদিগের নিজের নিজের সন্তানদিগের

বিবাহে যেরূপ ঘটা হইয়া থাকে, কখন কখন এই সকল দেববিগ্রহের বিবাহে তদপেক্ষা অল্প আড়ম্বর হয় না।

এই সকল দেববিগ্রহকে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে আহার দেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে বায়ুব্যজন করিয়া বিগ্রহের সেবা করা হয়, এবং শীতকালে আরামপ্রদ শয্যায় শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল কথা লিখিয়া শেষে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, দেববিগ্রহ সম্বন্ধে এমন সকল ব্যাপার আছে, যাহা লজ্জাবশতঃ আমি বলিতে পারি না।

এ বিষয়ে, রামমোহন রায় শেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, প্রতিমাকে পরমেশ্বরের চিন্তার জন্য রূপক চিহ্নস্বরূপ বলিলে, যদিও উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না, তথাচ লোকে যে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে। কেননা, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই, এই প্রকার ব্যাখ্যার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

১২২৪ সালের ১৬ ভাদ্র, (খৃঃ অঃ ১৮১৭) যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ করেন। ইহারও প্রথমে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে।

তৎপরে মুণ্ডক উপনিষৎ প্রকাশ হয়। ইহার মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ পৃথক্ দুইখানি গ্রন্থের ন্যায় ছিল।

১২২৪ সালের ২১এ আশ্বিন (খৃঃ অঃ ১৮১৭) বাঙ্গালা অর্থ সহিত মাণ্ডুক্যোপনিষৎ প্রকাশিত হয়। উহার প্রথমে, একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায়, ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে, শাস্ত্রীয় প্রমাণসম্বলিত বিচার রহিয়াছে। তৎপরে, অর্থ সহিত মূল উপনিষৎ এবং উহার শেষভাগে ভাষ্যোক্ত সমাধান বা সিদ্ধান্ত সকল বিবৃত হইয়াছে।

ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৬ সালে, কঠোপনিষদ ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮১৯ সালে, এবং কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

হিন্দুসমাজে আন্দোলনের প্রবলতা

এই সকল এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হওয়াতে হিন্দুসমাজে আন্দোলন যারপর নাই প্রবল হইয়া উঠিল। যে বেদশাস্ত্র ভূদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন মনুষ্যের স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না, রামমোহন রায় তাহা মুদ্রিত করিয়া ম্লেচ্ছের হস্তে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। যে ওঁ শব্দ কোন শূদ্রে উচ্চারণ করিলে তাহার রসনা ছেদন করিয়া দেওয়া উচিত, রামমোহন রায় তাহাই আচণ্ডাল সকলের মুখে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। এতদূর যে করিতে পারে, সে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইবে, কে জানে? আস্থাবান্ পৌত্তলিকেরা যারপর নাই শঙ্কিত হইলেন। ঘোর কলি উপস্থিত! ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ক্রোধের পরিসীমা থাকিল না। বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সভায়, নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, স্মার্ত্ত সকলেই নাসারন্ধ্রে নস্যসংযোগসহকারে রামমোহন রায়ের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই যে, খৃীষ্টিয়ান পাদ্রীগণ বা দেশীয় অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন আন্দোলন উপস্থিত করিলে, উহা হিন্দুসমাজের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে না। রামমোহন রায় জাতীয়ভাবে, দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক স্বমতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উহা হিন্দুসমাজকে বিচলিত করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক লইয়া যে সর্ব্বত্রব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও মূল কারণ এই। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্ম্মপ্রচার, প্রাচীন-তন্ত্রের পৌত্তলিকদিগকেও কম্পিত করিয়াছিল। দেশীয়ভাবে দেশীয় শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াই উহার প্রকৃত কারণ।

পঞ্চম অধ্যায়

সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার

(১৮১৭—১৮২০)

শঙ্করশাস্ত্রীর সহিত বিচার

আমরা বলিয়াছি যে, আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে পুস্তক সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। নিদ্রিত হিন্দুসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই সময়ে "কলিকাতা গেজেট" রামমোহন রায়কে "ধর্ম্মসংস্কারক" বলাতে, শঙ্করশাস্ত্রী, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান ইংরেজী শিক্ষক, "মাদ্রাজ কুরিয়ার" নামক পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ পত্রে লেখেন যে, বেদ বেদান্তে যে একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু রামমোহন রায় যে উহা প্রকাশ করিয়া একটি নূতন মতের সংস্থাপক হইলেন, ইহা সত্য নহে। তিনি আরও লিখিলেন যে, একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা বেদসম্মত হইলেও, দেবদেবীর উপাসনা মিথ্যা নহে। যেমন, কোন রাজার নিকট গমন করিতে হইলে, রাজকর্ম্মচারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, অথবা কোন উচ্চ অট্টালিকায় আরোহণ করিতে হইলে সোপান-পরম্পরায় পদবিক্ষেপ করিয়া উঠিতে হয়, সেই প্রকার পরব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী হইবার পূর্ব্বে দেবদেবীগণের উপাসনা একান্ত আবশ্যক।

শঙ্করশাস্ত্রীর উত্তরে রামমোহন রায় লিখিলেন যে, তিনি কখনই এমন কথা বলেন না যে, তিনি একটি নূতন মতের সংস্থাপনকর্ত্তা। অন্যে এ কথা বলিলে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁহার বিরোধীরাই তাঁহার মত নূতন বলিয়া নিন্দা করিতেছে। পৌত্তলিক পূজাসম্বন্ধে শঙ্করশাস্ত্রী যাহা বলিয়াছিলেন, রামমোহন রায় তদুত্তরে বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, উক্ত মত সম্পূর্ণ অমূলক।

শঙ্করশাস্ত্রী কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করা অতিশয় কঠিন, সেই জন্য সাকারোপাসনা আবশ্যক। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ করা নিশ্চয়ই কঠিন, এমন কি, তাঁহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু যে ব্যক্তি সহজজ্ঞানসম্পন্ন এবং পূর্ব্ব হইতেই যিনি কুসংস্কারশৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন, তাঁহার পক্ষে মনুষ্যের হস্তনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করা যত কঠিন, জগৎকার্য্যে পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করা তত কঠিন নহে।

'কলিকাতা গেজেট' (Calcutta Gazette) নামক সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল যে, প্রধান প্রধান হিন্দুপর্ব্বাহে, রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভা"র অধিবেশন হইয়া থাকে। এই সকল অধিবেশনের উদ্দেশ্য এই যে, "আত্মীয় সভা"র সভ্যগণ পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে যোগ না দেন, এবং তাঁহাদের বেদান্তানুযায়ী নির্ম্মলতর বিশ্বাসকে দৃঢ়ীকৃত করেন। "আত্মীয় সভা"র এই সকল অধিবেশনে পৌত্তলিকদিগের ন্যায় নৃত্যগীত হইয়া থাকে; কিন্তু, তাঁহাদের সকল সঙ্গীতই একেশ্বরবাদীদিগের বিশ্বাস ও মতানুযায়ী। শঙ্করশাস্ত্রী কলিকাতা গেজেটে এই সংবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য সভা করিয়া সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্য করা

কখনই শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য নহে। উহা নিকৃষ্ট আমোদ মাত্র। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে লিখিলেন যে, পরমেশ্বরের উপাসনার সময়ে নৃত্য করা যে শাস্ত্রে নাই, ইহা আমি স্বীকার করি। আমাদের উপাসনাতে কখনই নৃত্য হয় না। কলিকাতা গেজেটে যে, নৃত্যের কথা লেখা হইয়াছে, উহা অমূলক সংবাদ। কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনার সময়ে সঙ্গীত হওয়া যে আবশ্যক, তাহাতে কোন সংশয় নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উপাসনার সময়ে সঙ্গীত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। সঙ্গীতের দ্বারা যে, মনুষ্যের মনে কোন একটি বিশেষ ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য শাস্ত্রে কি মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে ?

শঙ্করশাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র মনুষ্যজাতির মানসিক উন্নতির জন্য শাস্ত্রে প্রতিমূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি নিরাকার পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহাদের জন্য শাস্ত্রে মূর্ত্তি-পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা তিনি স্বীকার করেন ; কিন্তু সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। রামমোহন রায় শঙ্করশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তুরস্ক এবং আরবদেশবাসী উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্য্যন্ত মুসলমানগণ, ইয়োরোপের প্রটেষ্টাণ্ট খৃীষ্টিয়ানগণ এবং কবীর ও নানকের অনেক শিষ্য, মূর্ত্তি ব্যতীত কি পরমেশ্বরের উপাসনা করেন না? যখন তাঁহারা মূর্ত্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, তখন আমরা কেমন করিয়া বলিব যে, সমগ্র মানবজাতি প্রতিমা ভিন্ন পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে অক্ষম?

শঙ্করশাস্ত্রী তাঁহার প্রতিবাদপুস্তক ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাহার উত্তরও ইংরেজী ভাষায় দিয়াছিলেন। শঙ্করশাস্ত্রী আর কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার

ইহার পর, কলিকাতার একজন ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট কলেজের একজন অধ্যাপক, রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন করিবার জন্য 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে পুস্তক প্রচার করিলেন। রামমোহন রায় ১৭৩৯ শকের ১৩ জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮১৭ সাল) উহার উত্তর প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই হইয়াছিল। রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত বিচারগ্রন্থে প্রতিপন্ন করেন যে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মোপাসনাই সার ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

ভট্টাচার্য্য, তাঁহার গ্রন্থে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যে সকল বিদ্রূপ ও দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন, রাজা তাহার উত্তরে লিখিতেছেন;—"আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ বিষয়বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয় ; দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে, দুর্ব্বাক্যকথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই। অতএব, ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তরপ্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।"

পরমাত্মার দেহ আছে কিনা ?

ভট্টাচার্য্য 'বেদান্তচন্দ্রিকা'তে লিখেন যে, পরমাত্মার দেহ আছে। রাজা রামমোহন রায় তদুত্তরে বলিতেছেন,—পরমাত্মাকে দেহবিশিষ্ট বলা, প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাহার কারণ এই, বেদান্তসূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন ;—

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।

বেদান্তসূত্রং।

ব্রহ্ম কোন মতে রূপবিশিষ্ট নহেন ; যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়।

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম।

বেদান্তসূত্রং।

ব্রহ্ম নামরূপের ভিন্ন হয়েন।

আহ হি তন্মাত্রং।

বেদান্তসূত্রং।

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন।

সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে ;—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যাদি। কঠোপনিষৎ।

সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। মণ্ডূকোপনিষৎ।

াপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি, অষ্টম মন্ত্র পর্যন্ত, এই দৃঢ় করিয়া বারম্বার যে, বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচর যিনি, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন। উপাধি-বিশিষ্ট, যাহাকে লোকে উপাসনা করে, সে ব্রহ্ম নহে ; এবং ভবগান্ শঙ্করাচার্য্য, তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে, চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে, স্পষ্টই কহিয়াছেন যে, লোকপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন ; কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমাত্র হয়েন।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে, রামমোহন রায় প্রাচীন শাস্ত্র সকল হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু কেবল শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শাস্ত্রসম্মত অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন। অনন্ত পদার্থ কখন মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না। পরমেশ্বর অনন্ত, সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি থাকিতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে বলিতেছেন ;—"যখন মূর্ত্তিস্বীকার কি ধ্যানে, কি প্রত্যক্ষে করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন।"

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, ইচ্ছা করিলে মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবেন না কেন ?

অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ হইলেও, তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন ইচ্ছা করিলে মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবেন না কেন? ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও, তাঁহার আপনার স্বরূপ নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমন স্বীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম যেমন জগৎকে বিনাশ করিতে পারেন, সেই-রূপ, তিনি আপনাকে আপনি বিনাশ করিতে পারেন, এরূপ কথা বলিলে, ব্রহ্মের নাশের সম্ভাবনা রহিল। কিন্তু যাহার নাশের সম্ভাবনাও আছে, সে কখন ব্রহ্ম নহে। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মূর্ত্তিধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। রামমোহন

রায় এবিষয়ে বলিয়াছেন,—"জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন। এই নিমিত্তই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম, কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না। যেহেতু, সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্যয় অর্থাৎ পরিমাণ, আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক।"

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, যদি পরমেশ্বর রূপ ধারণ করিতে না পারেন, তবে তিনি এই জগৎরূপে কেমন করিয়া প্রকাশ হইলেন? তিনি বিশ্বরূপ; সমুদয় বিশ্ব তাঁহার রূপ প্রকাশ করিতেছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি রূপধারণ করিতে পারেন না? বেদান্তদর্শনের অনুগমন করিয়া রামমোহন রায় এই তর্কের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। সেইরূপ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

রামমোহন রায় বলিতেছেন;—"যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প, সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়; বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে। সেইরূপ, সত্য-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না। এই হেতু, বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্ত্তে, অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়ার দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগ্য, মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাৎ করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে একেন্দ্রিয় যে চক্ষুঃ, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন?"

সগুণ মানিলে সাকার মানিতে হয় কিনা?

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়। যেহেতু, বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে, সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয়, এমত নহে। যেমন, এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায়; অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না। সেইরূপ, পরব্রহ্ম বিশেষরহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন। বাঙ্ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না; কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ।।

"যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে,

মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

"ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে, তটস্থ লক্ষণে, ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার কহা হয়, এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণরূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে, ব্রহ্মের কোন প্রকারে দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায়, সে কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত।"

"যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।" শ্রুতি।

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন।

দর্শয়তি চাথোহ্যপি চ স্মর্য্যতে। বেদান্তসূত্রং।

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন। ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন; স্মৃতিও এইরূপ কহেন।

ব্রহ্মোপাসনা কি ভ্রমাত্মক ?

"বেদান্তচন্দ্রিকায় অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না। যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয়। অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে, যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উত্তর। দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের হানি নাই; কিন্তু উপাসনা-মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্ম্মুখ করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে আমারদিগের, আর অনেকের, সুতরাং হানি আছে। যেহেতু, ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই। জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন; নাম রূপময় জগৎ মিথ্যা হয়; ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণমননের দ্বারা বহুকালে বহুযত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য। এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা; তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ।। শ্রুতি।

"আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন। তাঁহারদিগের লোককে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসুর লোক কহি। সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে। ঐ সকল লোককে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম্ম, অসৎ-কর্ম্মানুসারে, এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন।

ন চেদিহাবেদীম্মহতী বিনষ্টিঃ।

"এই মনুষ্যশরীরে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, যদি ব্রহ্মকে না জানে, তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয়।

"এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রুতি।

আত্মৈবোপাসীত। শ্রুতিঃ।
আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। বেদান্তসূত্রং।"

ভট্টাচার্য্য রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান?" রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;—

"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ।।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদি দেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ।।

ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি, এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি।"

প্রতিমাদিতে দেবতার পূজা কর না কেন ?

ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন ;—"শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেববিগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎপূজাদি কেন না কর, ইহা আমারদিগের বোধগম্য হয় না।" ইহার উত্তর ; কাষ্ঠলোষ্টেষুমূর্খানাং। অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং। ইত্যাদি বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারীর নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি ; কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোকসকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধি সর্ব্ব সাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহারদিগের হইয়াছে, তাঁহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানসদ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

"ভট্টাচার্য্য লেখেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায়, তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এবং মৃৎসুবর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এমত যে কহে, সে প্রলাপভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয়। ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন, আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এস্থলে জানা কর্ত্তব্য যে, আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি এক বাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন" ইত্যাদি।

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই ; সুতরাং যে কোন বস্তুর উপাসনা করিলে ব্রহ্মোপাসনা হয় কি না?

"আর লেখেন যে "ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন, ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে, তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না," উত্তর ; জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই, অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে, তবে এ যুক্তিক্রমে কি দেবতা,

কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী সকলেরই উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া গেল। তবে নিকটস্থ স্থাবরজঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতাবিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব। অতএব, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল, দূরস্থ দেবতা-বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবরজঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্যরূপেই যদ্যপি ঐ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয়, তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেববিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে; অতএব শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর; যদি শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই, সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিকরূপে উপাসনা করিবেক, আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তিনি আত্মার শ্রবণমননরূপ উপাসনা করিবেন। শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।"

সৃষ্টপদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলে প্রকৃত ফললাভ হয় কি না?

অন্য এক স্থলে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করিয়াছেন, "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি না হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বরবোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি অবশ্য হয়। আপনার বুদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না। যেমন, স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদিদর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?" ইহার উত্তর। "ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধি-দোষে ঈশ্বরজ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফলসিদ্ধি হয়। কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে, যদি কেহ সুবোধ থাকেন, তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে, স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফলসিদ্ধি হয়, সেইরূপ ফলসিদ্ধি, এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে, যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়। যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশদ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন, তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয়, আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই, তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।"

পরমেশ্বর রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন কি না?

পরমেশ্বর যে রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপ ধারণ করেন, তদ্বিষয়ে ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন,— "যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর, রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন।" ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন;—"কি রামকৃষ্ণবিগ্রহে, কি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে, পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাদির শরীরে এবং রামকৃষ্ণ শরীরে ব্রহ্মস্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই, কেবল উপাধিভেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায়, সেইরূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন; আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় না, সেইরূপ, ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না; অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মসত্তার তারতম্য নাই।

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃসচরাচরং ।। ভাগবতম্ ।।

হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব, আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে, এমত নহে ; কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সমুদয় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ।। গীতা ।।

হে অর্জ্জুন! হে শত্রুতাপজনক! আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে ; কিন্তু অবিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি ; আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে, এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ।। মুণ্ডকশ্রুতিঃ ।।

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধঃ ঊর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা যাহা নামরূপে প্রকাশ্যমান্ দেখিতেছ, সে সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্ম মাত্র হয়েন, অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য্য ; ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্বব্যাপক হয়েন।"

যদি মন্দির, মস্‌জিদ্ প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের উপাসনা হয়, তবে প্রতিমায় তাঁহার উপাসনা কেন হইবে না ?

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "যদি মন্দির, মস্‌জিদ্ গির্জ্জা প্রভৃতি যে কোন স্থানে, যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন, তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর ;—মস্‌জিদ্ গির্জ্জাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদিতে ঈশ্বরের উপাসনা, এ দুয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন, সে অত্যন্ত অযুক্ত ; যেহেতু মস্‌জিদ্, গির্জ্জাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা ঐ মস্‌জিদ্ গির্জ্জাকে ঈশ্বর কহেন না ; কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন, এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন, তাঁহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ুব্যজন করেন। এই সকল ভোগশয়নাদি ঈশ্বরধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ্, গির্জ্জা, মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই। যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। বেদান্তসূত্রং।

"যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।"

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, হে আগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা, আমরা তোমারদিগকে জিজ্ঞাসি তোমরা কি? ইত্যাদি। রামমোহন রায় এই প্রশ্নের কেমন সুন্দর ও সরস উত্তর দিয়াছেন! "তোমরা কি?" ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন ;—"আমারদিগকে সোপাধিজীব করিয়া বেদে কহেন, ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না ;

এ কারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই। সুতরাং তাহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি। অতএব, আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না, এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয়, এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয়।"

ব্রহ্মোপাসনা কঠিন, অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য কি না ?

"যদি বল, আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন, তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না, অতএব সাকার উপাসনা সুলভ, তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর ;— উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয়, তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না। যেহেতু, তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য। অতএব, অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয়। বরঞ্চ, যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার অর্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ডে, যথাবিধি দেশকাল দ্রব্য অভাবে, কর্ম্ম সকল পণ্ড হয় ; কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাস্থলে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনের প্রতি যত্ন থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, কেবল এই যত্নকরণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ।। মনুঃ।

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন।"

দেবতাপূজা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত *

দেবতাপূজা বিষয়ে রাজার মত অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি হিন্দু-শাস্ত্র মানিয়া লইয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে তিনি দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবতাকে ক্ষমতাশালী জীব বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

জীব বলিলে দুইটি বিষয় বুঝায়। প্রথম, আত্মা বা চৈতন্য, বা ব্রহ্ম ; (Oversoul) দ্বিতীয়, জীবত্ব বা মায়িক উপাধি। এই জীবত্ব বা মায়িক উপাধি জীবের বন্ধনের কারণ। জীব মাত্রেরই, আত্মা বা ব্রহ্মাংশে পূজা, আরাধনা বা উপাসনা করা যাইতে পারে। শাস্ত্রের বিধিই এই যে, আমরা আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনা করি। উপাসনায় 'সোঽহং' আমি অর্থাৎ আমার আত্মা ব্রহ্ম, এইভাবে উপাসনা বিহিত। ঔপাধিক জীবভাব অবশ্য ব্রহ্ম নহে। সুতরাং দেবতাদিগের আত্মাংশের উপাসনায় কোন দোষ নাই। যিনি সর্ব্বময়, অদ্বিতীয় আত্মাকে জানিয়েছেন, তিনি আত্মারই উপাসনা করিবেন। দেবতাদের জীবভাব বা মায়িক উপাধি (বা দেববিগ্রহ), অথবা আমাদের মায়িক উপাধি, অর্থাৎ আমাদের শরীর, মন, এ সকলের কিছুরই উপাসনা করিবেন না।

দেবতাদের এবং দেবতাদের অবতারদিগের জীবত্ব বা মায়িক উপাধি বা বিগ্রহের পূজা করা যাইতে পারে কি না, ইহার বিচার করা আবশ্যক। দেবতাদিগের অথবা তাঁহাদিগের

* রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ৬৮৯-৭০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

অবতারগণের বিগ্রহ, জলস্থলাদির ন্যায়, ঈশ্বরের মায়া বা প্রকৃতির কার্য্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও তাঁহাদের অবতারগণের বিগ্রহ, জন্য, নশ্বর ও পরিমিত।* মায়ার কার্য্য বলিয়া দেববিগ্রহ, আমাদের শরীরের ন্যায়, পারমার্থিক ভাবে মিথ্যা। সুতরাং দেববিগ্রহ উপাস্য নহে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে, নিত্য নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি মানসধ্যানাদিদ্বারা, কিম্বা প্রতিমা অবলম্বন করিয়া, এই সকল দেববিগ্রহের পূজা, আরাধনা বা উপাসনা কখন করিবেন না। মূর্ত্তিধ্যান বা প্রতিমা অবলম্বন করিয়া দেবতার পূজা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যিনি বুঝিয়াছেন যে, প্রতিমা ব্রহ্মের রূপকল্পনা, সুতরাং মিথ্যা, তাঁহারও পক্ষে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ।

কিন্তু যে ব্যক্তি মূর্খ, যে পরমেশ্বরকে অজড় ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ভাবিতে পারে না, তাহার পক্ষে শাস্ত্রের বিধি এই যে, সে দেবতা বা দেবাবতারদিগের বিগ্রহে মনস্থির করিয়া সেই দেবতাকে ঈশ্বর ভাবিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে পূজা করে, এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে। তাহা হইলে, সে ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে, উহা দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য। ইহা বুঝিয়া সে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইবে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলেই তাহাকে দেবোপাসনা ছাড়িয়ে দিতে হইবে।

দেবতাপূজার প্রকারভেদ আছে। প্রথম, হোমপূজা, অথবা বাহ্যপূজা। দেববিগ্রহের প্রতিমাসংগঠন করিয়া পূজাদি। দ্বিতীয়, জপস্তুতি। কল্পিতবিগ্রহের জপ ও স্তুতি। তৃতীয়, ধ্যানধারণা। কল্পিত দেবতা বা দেবাবতারের অবয়বের ধ্যান। দ্বিতীয়, প্রথম অপেক্ষা উন্নত। তৃতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষাও উন্নত।

আরও কয়েকপ্রকার দেবপূজা বা প্রতিমাপূজা আছে। সে সকল কোন অধিকারীর পক্ষেই বিহিত নহে। প্রথম, পরলোকগত আত্মা, পিতৃপুরুষ, মহাবীর বা ধর্ম্মাত্মাগণের পূজা। ইহা জীবভাবে বা পরিমিতভাবে পূজা; ঈশ্বরোদ্দেশবিরহিত পূজা। দেবতাদিগকে শ্রেষ্ঠজীব ভাবিয়া তাঁহাদের পূজা। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান্‌দিগের মধ্যে প্রথমে এইভাবে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জীব ভাবিয়া দেবতাদিগের পূজা প্রচলিত ছিল। তখন তাঁহারা একেশ্বরবাদে উপনীত হন নাই। যখন তাঁহারা এক ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা বলিতেন যে, ঐ সকল দেবতা, সেই একেশ্বরের অন্তর্গত।

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কেবল ঈশ্বরোদ্দেশে দেবতাপূজার বিধি আছে। যিনি যে দেবতার পূজা করিবেন, তিনি তাঁহাকে ঈশ্বর ও সর্ব্বময় ভাবিবেন। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ বিশেষ দেবতাপূজার বিধি আছে। যেমন বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি। সেই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবেন। নিজ নিজ ইষ্ট দেবতাকে সকলের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন।

দ্বিতীয়, জড়োপাসনা। কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি, জলস্থল, বা দেববিগ্রহ যাহাই কেন হউক না, কোন জড়পদার্থকে জীবন্তজ্ঞানে উপাসনা করিলেই উহা জড়োপাসনা। মনসা, তুলসি, বট প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা জড়োপাসনার অন্তর্গত। সর্প, গো, শৃগাল, শঙ্খচীল প্রভৃতি পশু পক্ষীর পূজার সহিত জড়োপাসনার সম্বন্ধ আছে। রাজা বলেন যে, উক্তরূপ জড়োপাসনা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তবে অধিকারী বিশেষে, ঈশ্বরোদ্দেশে বা রূপকভাবে জড়োপাসনার বিধি পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে রূপকভাবে, দেবতাদিগকে ঈশ্বরপূজার চিহ্নস্বরূপ করা হইয়াছে। দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য, তাঁহাদের চেতনবিগ্রহে, (অর্থাৎ যে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে) ঈশ্বরকল্পনা করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে পূজার বিধি আছে। কিন্তু দেবপূজার মধ্যে যে রূপক রহিয়াছে, তাহা আধুনিক হিন্দুরা বুঝেন না।

* রাজার গ্রন্থের ৬৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানেরা যখন একেশ্বরবাদে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহারা দেবতাদিগকে সেই এক ঈশ্বরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দুরাও বলিয়াছেন যে, দেবতারা এক ঈশ্বরের অন্তর্গত। কিন্তু তাঁহাদের এই কথার মধ্যে তিনটি ভাব আছে। প্রথম,—দেবতাদি সমস্ত সংসারই ব্রহ্মময়, কেবল দেবতা নহে। দ্বিতীয়,—দেবতাদের বিগ্রহে, ঈশ্বরকল্পনা করিয়া পূজা করার বিধি আছে। শাস্ত্রকারেরা জানিতেন যে, ইহা কল্পনা। পরমাত্মার বিগ্রহ বা রূপ নাই। তিনি অদ্বিতীয়। দেবতাদিগের বিগ্রহ ও বহুত্ব ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না। তৃতীয়,—বহু দেবতার বহু বিগ্রহে ঈশ্বরভাবে পূজা করিলে, ইহাই বুঝায় যে, ঐ সকল, ঈশ্বরের মায়াশক্তির বহুবিকাশ। অর্থাৎ দেবতারা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, গুণ ও লীলার রূপকস্বরূপ; (অর্থাৎ Symbols or allegorical representations.)

ভট্টাচার্য্য প্রতিমাপূজা সমর্থন করিবার জন্য চারিটি প্রমাণ দিয়াছেন। প্রথমতঃ, শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকর্ম্মাপ্রণীত শিল্পশাস্ত্রদ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থস্থানে প্রতিমার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ, শিষ্টাচারসিদ্ধ। পঞ্চমতঃ, অনাদিপরম্পরাপ্রসিদ্ধ।

রাজা ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;—"শাস্ত্রপ্রমাণ যে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি, দক্ষিণাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি, অঘোরাচারের বিধি, এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহাদিগের প্রতিমাপূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে, এমন নহে। বরঞ্চ, নানাবিধ পশু, যেমন, গো, শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী, যেমন শঙ্খচীল, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি, এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন, অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, তুলসী, প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর এবং ব্যবহারে আইসে, তাহারদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারীবিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী, সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি,

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রান্যশেষতঃ।

অতএব, শাস্ত্রে প্রতিমাপূজার বিধি আছে। কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে, যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, তাঁহারদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।"

দ্বিতীয়তঃ। বিশ্বকর্ম্মার লিখিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি, কি মারণোচ্চাটনাদি, যখন যে বিষয় লেখেন, তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন। তদনুসারে, প্রতিমাপূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন, এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয়, তাহাও লিখিয়াছেন।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতি স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা ।।
কুলার্ণবঃ।

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি, আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি, জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি, হোম ও পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি।"

তৃতীয়তঃ। নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর। যে সকল ব্যক্তি তীর্থগমনের অধিকারী, তাহারাই প্রতিমাপূজার অধিকারী। অতএব,

তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায়, তবে, সুতরাং তাহার-গের তীর্থগমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক না। এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে। অতএব, তাহারাই নানা তীর্থে, নানাবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া ।।
ব্যাপিতঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং ।।"

রূপবিবর্জ্জিত যে তুমি, তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপবর্ণন করিয়াছি, আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব, তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি, আর তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি, হে জগদীশ্বর! আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থতঃ। প্রতিমাপূজা শিষ্টাচারসিদ্ধ যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর। যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন, তাঁহারদিগের অনেকেই প্রতিমাপূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমাপ্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথিমাহাত্ম্যে ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষে, তাঁহারদিগের যে লাভ, তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে, কাহারও জন্মদিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানাপ্রকার লীলাচলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন। ঐ শিষ্টলোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাঁহার কি এদেশে, কি পাশ্চাত্যাদি অন্য দেশে, কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন ; প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।"

পঞ্চমতঃ। প্রতিমাপূজা পরম্পরাসিদ্ধ হয়, যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর। ভ্রম-বশতঃই হউক, বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক, বৌদ্ধ কি জৈন, বৈদিক কি অবৈদিক, যে কোন মত, কতক্ লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না। যদি হয়, তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ, প্রতিমাপূজা প্রথমতঃ কতক্ লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে ; এবং তাহার অবহেলাও কতক্ লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে, এবং তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে ; কিন্তু একাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন, তবে বোধ করি, তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে, ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের একভাগ প্রতিমা, একশত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদয় উনিশভাগ, একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হয়, সেই সেই দেশে, প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।"

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে পরমাত্মার কোনরূপ মূর্ত্তি বা বিগ্রহ স্বীকার করা হয় না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, আগম কোথাও এরূপ বলা হয় নাই যে, পরমাত্মার নিত্যবিগ্রহ আছে। রাজা রামমোহন রায় আরও বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে যেমন পরমাত্মার মূর্ত্তি স্বীকার করা হয় নাই, সেইরূপ পরমাত্মার অবতারের কথাও শাস্ত্রে কোথাও নাই। হিন্দুশাস্ত্রে (পুরাণে) যে সকল অবতারের কথা আছে, তাহা বিষ্ণুশিবাদি

দেবতার অবতার ; আর যে সকল প্রতিমার কথা আছে, তাহাও বিষ্ণু, শিব, গণেশ, দুর্গাদি দেবতার প্রতিমা। পরমাত্মার বিগ্রহ এবং অবতারের মত গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবগ্রন্থেই পাওয়া যায়। রাজার মতে পরমাত্মার মূর্ত্তি ও পরমাত্মার অবতারের কথা, হিন্দুশাস্ত্রে একেবারেই নাই। হিন্দুশাস্ত্রে কেবল কল্পনা বা রূপক বলিয়া দেববিগ্রহে বা দেবাবতারে ঈশ্বর-পূজার বিধি আছে।

অপরদিকে, বিগ্রহমাত্রেরই উপাদান ঈশ্বরের মায়াশক্তি, এবং জীবাত্মা মাত্রেরই চৈতন্য বা আত্মাংশে, ব্রহ্মের সহিত একত্ব আছে। আর, উপাধির তারতম্যানুসারে, জীবে ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা স্বীকার করেন না যে, ঈশ্বরের বিগ্রহ আছে ; অথবা বিশেষ কোন বিগ্রহে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "সে কেমন অদ্বৈতবাদী যে বলে যে, রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাদি ও আকাশ, মন, অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এবং সে সকল ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য নহে।"

ইহার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন,—"আমরা যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না, ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষীরও উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয়, এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি ইহাও লিখিয়াছি। এ সকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন, ইহা জ্ঞানবান্ লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা, কি দেবতার, কি মনুষ্যের, কি অন্নের, কি মনের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বদা নিষেধ করিয়াছি, সে কেবল বেদান্ত মতানুসারে এবং বেদসম্মত যুক্তিদ্বারা। যেহেতু, ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়াকার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায়, মায়িক নামরূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।

'নেতরোঽনুপপত্তেঃ ।।' বেদান্তসূত্রং ।।

ইতর অর্থাৎ জীব, আনন্দময় জগৎকারণ হয়েন না, যেহেতু, জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে, এমত বেদে কহেন নাই ।।

'ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ।।' বেদান্তসূত্রং ।।

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ, সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন, যেহেতু, সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তীর ভেদকথন বেদে আছে।"

ভট্টাচার্য্য বলেন ;—"যদি কেহ বলে যে, বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য, কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য, কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য, যাহাতে অসন্তোষ হইবে, তাহা অকর্ত্তব্য।" রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন ;—"যে ব্যক্তি এমত কহে যে, সকলই ব্রহ্ম তাহাতে অবিহিতের বিভাগ কি? তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশংকা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে, লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই, যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর, সেই ব্রহ্মসত্তাকে কেবল আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু, যে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয় ; যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে, অন্য অঙ্গ পাদরূপে প্রতীত হইতেছে ; যে পাদরূপে প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা গমনক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়, আর যে হস্তরূপে প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা গ্রহণরূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার

দাহিকাশক্তি দেখেন, তাহাকে দাহকর্ম্মে, আর যাহার শৈত্যগুণ পায়েন, তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়ীদিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু, তাঁহার জগৎকে শিবশক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহারদিগের তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ, চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না, এবং যে ব্যক্তি ধ্যান-সময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে, আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগম্যাগমন করিয়াছেন, এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগম্যাদির আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে, বিধিনিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী, সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখরূপ ফল দেন, সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান্ পরমেশ্বরের ত্রাসপ্রযুক্ত, তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।”

উদ্ধৃত অংশটির শেষাংশ পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, রাজা রাম-মোহন রায়ের মতে, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের মধ্যে মনুষ্যের দায়িত্ব, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত রহিয়াছে। পরমেশ্বর ধর্ম্মনিয়মের প্রেরয়িতা, বিধিনিষেধের কর্ত্তা, শুভাশুভ কর্ম্মানুযায়ী ফলদাতা বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং অদ্বৈতবাদ এই বিশ্বাসের বিরোধী না হইয়া প্রত্যুত সমর্থনকারী বলিয়া মনে করিতেন। পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ বিদ্যমান্ জানিয়া তাঁহার নিয়মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতে হইবে, ইহাই রাজার উপদেশ।

গোস্বামীর সহিত বিচার

ভট্টাচার্য্যের পর, একজন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত গোস্বামী, রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করেন। রামমোহন রায় ১২২৫ সালের ২রা আষাঢ় (খৃীঃ অঃ ১৮১৮ সাল) উহার উত্তর পুস্তক প্রকার করিলেন। উক্ত গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বেদার্থ নির্ণয়পক্ষে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেরই প্রাধান্য। ভাগবত শাস্ত্র বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে।

গোস্বামী একটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম যে, সকল বেদের প্রতিপাদ্য ইহা দর্শনকার মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মতে কোন উপাধি দোষ স্পর্শ হইতে পারে না। সুতরাং বেদ সকল, তাঁহাকে কি প্রকারে প্রতিপন্ন করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন.;—“যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন, এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন, অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক ;—

তথাত আদেশো নেতি নেতি।

এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদিরূপে যাবৎ জন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন ; এইমাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন। কিন্তু জগতের সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গ দেখিয়া, আর জড়স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া, এই সকলের কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করেন।”

তৎপরে, রামমোহন রায়, কোন জ্ঞানীগুরুর নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন ;—“যদি এই প্রশ্নের উত্তরকে, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষ

মতে কোন জ্ঞানীর নিকট আপনকার জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রুতি এবং গীতাস্মৃতির অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন।

মুণ্ডকোপনিষৎ শ্রুতি ;—

স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।

সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয়পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেক।

গীতাস্মৃতিঃ—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানীর নিকটে তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবেক।

ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়া জ্ঞান, কুজ্ঞান কি না ?

গোস্বামী লেখেন যে, "তোমাদের যদি কোন বেদান্তভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে কুজ্ঞান।" উত্তর ;—"কেবল ভগবৎ পূজ্যপাদের ভাষ্যেই ব্রহ্মকে আকাররহিত করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে। কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মকে নামরূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্টরূপে এবং প্রসিদ্ধশব্দে সর্ব্বত্র কহেন। এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে ; সুতরাং তাহাতে কাহারও প্রতারণার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কঠবল্লী ;—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং

নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বেদাদি শাস্ত্র, প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে কি না ?

গোস্বামী বলেন যে, বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না। একথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—"যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন, তত্রাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্ম হইয়াছে, অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রুতিঃ—

ব্রাহ্মণেন নিঃকারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ ইতি।

ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে, ষড়ঙ্গবেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন।

ভগবান মনু,—

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদভ্যাসে চ যত্নবান্।

ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন।

বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও, বেদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে, আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই। এই হেতু, বেদের অর্থাবধারণ সময়ে, সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে, এই নিমিত্ত, দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু, ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন।

শ্রুতিঃ—

যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্ভৈ ভেষজং।

যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য; এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্ বেদব্যাস, বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন, এবং ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপনিষদের ভাষ্যে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন। অতএব, বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও, এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন; ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না।

ব্যাস স্মৃতিঃ—

বেদাদ্ যোঽর্থঃ স্বয়ং জ্ঞানস্তত্রজ্ঞানং ভবেদ্ যদি।
ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং ।।

বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে, তবে ঋষিরা যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পারে না।

বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র, প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য নহে; সুতরাং পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। গোস্বামীর এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় আরও বলিতেছেন যে, গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কারবিধি অদ্যাপি বেদমন্ত্রে হইতেছে, পুরাণমন্ত্রে নহে; সুতরাং বেদ অবশ্যই ব্যবহার্য্য। রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—"দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন, তবে আপনারা গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কার প্রভৃতি বেদমন্ত্রে করেন, কি পুরাণ-বচনে করিয়া থাকেন? পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানাপ্রকার নীতিকে ইতিহাসচ্ছলে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুদিগ্যের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন; সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র মান্য; কিন্তু পুরাণ ইতিহাস, সাক্ষাৎ বেদ নহেন, যেহেতু, সাক্ষাৎ বেদ হইলে, শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না; এবং আপনকার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন, সে মতে, পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে, বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে, পুরাণকে কহিয়াছেন, এবং মহাভারতে ভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন, আর আগমে আগমকে, শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন, সে পুরাণাদির প্রশংসামাত্র; যেমন, "ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং" অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন; আর যেমন, পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশত নামের ফলে লিখিয়াছেন; "রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তিশীততাং" এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন, আর, অগ্নি সকল শীতল হন। যদি এ বাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত, তবে এ স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত-প্রদান করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইত না। আর দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয়, এমন স্মৃতিতে কহিয়াছেন। সে নিন্দাদ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা হয়, তবে পূতিকা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে? এইরূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর, কোন স্থানে বা শাসন-পর হয়।

শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য কি না ?

গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, বেদান্তসূত্র অতি কঠিন। ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস লিখিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং

মহাভারতের অর্থস্বরূপ শ্রীভাগবত মহাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। গোস্বামী এ বিষয়ে গরুড় পুরাণের প্রমাণ দিয়াছেন।

তাহা এই ;—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ।।

বৈষ্ণবেরা শ্রীভাগবতকে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এইজন্য চেষ্টা করেন যে, তাহা হইলে শ্রীভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণলীলাদি বৈষ্ণবের বিশ্বসনীয় যাবতীয় বিষয় বেদান্তানুযায়ী বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। গোস্বামীর একথার উত্তরে রামমোহন রায় এমন কথা বলেন নাই যে, ভাগবত পুরাণ নহে। অনেক পণ্ডিত, বৈষ্ণবভাগবতকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বোপদেব-কৃতও বলেন। রাজা শ্রীমদ্ভাগবতকে সেরূপে উড়াইয়া দেন নাই ; পুরাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইহা সামান্য উদারতা নহে। কিন্তু ভাগবত যে, বেদান্তসূত্রের ভাষ্য, ইহা সম্পূর্ণরূপে করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন আমরা তাঁহার যুক্তিগুলির সারমর্ম্ম ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ, গরুড় পুরাণের বচন এবং ঐরূপ অন্যান্য বচন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে, সুতরাং গ্রাহ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী, ভাগবতকে পুরাণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন। ভাগবতকে পুরাণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য, গরুড় পুরাণের এরূপ স্পষ্ট বচন থাকিতে, তিনি ইহা অপেক্ষা অস্পষ্ট বচন সকল সংগ্রহ করিলেন কেন? ইহাতে বোধ হইতেছে, গরুড় পুরাণের বচন প্রক্ষিপ্ত মাত্র।

তৃতীয়তঃ, এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে। এই সুবিধা পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড়-পুরাণের বচনের রচনা করিয়াছেন, আর দুই তিন শত বৎসর মধ্যে যাঁহাদের জন্ম এবং যাঁহারা অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ, যেমন নূতন নূতন ব্যক্তিকে অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণের বচন বলিয়া কল্পিত বচন সকল লিখিয়াছেন, সেইরূপ কোন কোন শাক্ত শ্রীভাগবতকে পুরাণ বলিয়া অপ্রমাণ করিবার জন্য এবং কালীপুরাণকে প্রকৃত ভাগবত-রূপে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে স্কন্দপুরাণীয় বচন প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বচন এই ;—

ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।
কলৌ কচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ।

যে গ্রন্থে নানা অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবত কল্পনা করিবে।

অতএব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবামাত্র যদি পুরাণ বলিয়া মান্য করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং ঐরূপ শাক্তের রচিত বচন, এ দুয়ের পরস্পর বিরোধ হইয়া শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য, অর্থের অনির্ণয় এবং ধর্ম্মের লোপ উপস্থিত হয়। অতএব, যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্বসম্মত টীকা না থাকে, তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে, প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, শ্রীভাগবত যে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে, ইহা যুক্তির দ্বারাও স্পষ্টত বুঝা যাইতেছে। কেননা "অথাত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অবধি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বেদান্তসূত্র রহিয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাগবতের শ্লোক সকল কোন্ সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ, ইহা বিবেচনা করিলেই শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য কি না, অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ;—

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং
ভিনত্তি দ্রব্যলাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ।।
২২ শ্লোক।

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোহয়মাস্তে ।। ২৪ শ্লোক।

২২ অধ্যায়ে ভগবানুবাচ ;—

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ। ।।
১২ শ্লোক ।।

৩৩ অধ্যায়ে ;—

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং ।। ১৪ শ্লোক।

কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন। ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন ; আর চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ করিতেন ; আর আপন খাদ্য ঐ দধি দুগ্ধ বানরদিগ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন, আর না খাইতে পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঙ্গিতেন, আর খাদ্যদ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন। ২২।

এইরূপে, পরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠামূত্রাদি ত্যাগ করিতেন, চৌর্য্যকর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন। ২৪।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্রহরণপূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদিগের প্রতি কহিতেছিলেন, যদি তোমরা আমার দাসী হও, এবং আমি যাহা বলি তাহা কর, তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট ঐরূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। ১২।

নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয়, তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন

গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোন গোপী, তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিতেন। ১৪।

এই সকল সর্ব্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ, বেদান্তের কোন্ শ্রুতিতে এবং কোন্ সূত্রের অর্থ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করিয়া দেখেন? কৃষ্ণনাম ও তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ নাম এবং তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনাতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ। কিন্তু বেদান্তসূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম, কি কৃষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের লেশ নাই; তাঁহার রূপগুণবর্ণনের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত, সেই গ্রন্থে সেই ব্যক্তির বা দেবতার প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণনা বাহুল্যরূপে থাকে। কিন্তু সে গ্রন্থে তাঁহার নাম ও গুণবর্ণনা কিছুই নাই, এমন হইতে পারে না। অতএব, এই সকল বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় হইতেছে যে, বেদান্তসূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক-মাত্র নাই।

কেহ বলিতে পারেন যে, কোন কোন বৈষ্ণবপণ্ডিত ব্যুৎপত্তিবলে বেদান্তসূত্রের অক্ষর সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাদি বেদান্ত-সূত্র হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন;—বৈষ্ণব-পণ্ডিতের ন্যায় কোন কোন শৈবপণ্ডিত ব্যুৎপত্তিবলে বেদান্তসূত্রের শিবপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের অক্ষর ভাঙ্গিয়া শিবের কোচবধূর সহিত লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইরূপ আবার কোন কোন শাক্ত, বিষ্ণুপ্রধান শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যুৎপত্তি বলে, প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে, কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য, তাহা স্থির হইতে পারে না; শাস্ত্রের প্রামাণ্য নষ্ট হইয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, দর্শনকার সকল, আপনার আপনার দর্শনের ভাষ্য নিজে কেহ করেন নাই; অন্যান্য আচার্য্যেরা করিয়াছেন। এই রীতির দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বেদব্যাস নিজে করেন নাই।

ষষ্ঠতঃ, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি দর্শনকারগণ বেদব্যাসের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থে বেদান্তমতকে অদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভাগবতের যিনি প্রতিপাদ্য, তাঁহার পরিমিত রূপ,—তিনি সাকার গোপীজনবল্লভ। তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য, এমন কেহ বলেন নাই।

সপ্তমতঃ, ভগবান্ মনু, বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বেদান্ত-সম্মত অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাগবতের হস্তপাদাদি-বিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই। মনুর অর্থের বিপরীত যে বাক্য, তাহা গ্রাহ্য নহে; সুতরাং ভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য হইতে পারে না। মনুর মতে, অন্যান্য দেবতা যেমন মনুষ্যের এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী, সেইরূপ, বিষ্ণুও এক অংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্র। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্, পদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, বলের অধিষ্ঠাতা শিব, বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি, গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র, ইত্যাদি।

অষ্টমতঃ, অন্যান্য পুরাণ ইতিহাস রচনা করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হওয়াতে শ্রীভাগবত রচনা করিলেন, এ কথার প্রমাণস্বরূপ কোন ঋষিবাক্য নাই। পশ্চাৎ গ্রন্থ লিখিলে, পূর্ব্বের গ্রন্থ লিখিয়া চিত্তের পরিতোষ হয় নাই, এরূপ প্রতিপন্ন হয় না। শ্রীভাগবত পঞ্চম গ্রন্থ। শ্রীভাগবতের পর, নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন। সুতরাং এমনও বলা যাইতে পারিত যে, শ্রীভাগবত রচনা করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচনা করিলেন।

শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ.;—

ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং।
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি ।।

বিষ্ণুপুরাণে :—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।

ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবত পঞ্চম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

নবমতঃ, যদি বল, শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ অপেক্ষা শ্রীভাগবতকে প্রধান বলিয়াছেন, সে কথার উত্তর এই যে, কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন, এমন নহে, প্রত্যেক পুরাণের শেষে সেই সেই পুরাণকে অন্য সকল পুরাণ অপেক্ষা প্রধান বলিয়াছেন। ইহা প্রশংসামাত্র, ইহাতে প্রত্যেক পুরাণের সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

শিব ও শঙ্করাচার্য্য প্রতারণা করিয়াছেন কি না ?

গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, ভগবান্ শিব অসুর-মোহনের নিমিত্ত, নানাপ্রকার পশুপতাদি তন্ত্রশাস্ত্র করিয়াছিলেন, এবং কলিযুগে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া পরমেশ্বরের নিরাকারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া অসুরস্বভাব লোকে সকলকে মোহযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার ভাষ্যদ্বারা ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় এই সকল কথার প্রমাণ-স্বরূপ "ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরাদ্বিষাং" ইত্যাদি বচন সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামমোহন রায় এই সকল কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—যদি ভগবান্ মহেশ্বর বেদবাহ্য কোন শাস্ত্র রচনা করিয়া থাকেন, এবং যদি উহাতে বেদের উক্তির বিপরীত কথা থাকে, তাহা হইলে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন সকল সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে অবশ্য খাটিবে। আর, যদি বল যে ঐ সকল বচনদ্বারা মহেশ্বরকৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে, এক্ষণে এদেশে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে তান্ত্রিকদীক্ষা অবলম্বন করিয়া উপাসনা ও ধর্ম্মসাধন করিতেছে, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। সুতরাং সকলের ধর্ম্মে আঘাত পড়ে, ইত্যাদি।

তাহার পর, রামোহন রায় বলিতেছেন যে, যদি বৈষ্ণবপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া শিবকে প্রতারক ও তন্ত্রশাস্ত্রকে মোহশাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে তান্ত্রিকেরাও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণে বিষ্ণুকে প্রতারক প্রতিপন্ন করিতে পারেন। এই প্রকার পুরাণ ও তন্ত্রের পরস্পর বিরোধে কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না। শিব ও বিষ্ণুর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চাতুর্বর্ণ্যের ধর্ম্মলোপ হয়।

শাস্ত্রের বিরোধ ও তাহার মীমাংসা

শাস্ত্রের এই প্রকার বিরোধ প্রদর্শন করিবার জন্য রামমোহন রায় বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন। কুলাবতী তন্ত্রে আছে—

বেদা বিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ ন স্পৃশেত্তুলসীদলং।
ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ ।। *

গীতায় বিষ্ণুমাহাত্ম্যে ;—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

অর্থাৎ বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন।

দেবীমাহাত্ম্যে ;—

ঐকৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

অর্থাৎ দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন।

শিবমাহাত্ম্যে, মহেশ্বরগীতা ;—

প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোস্তি প্রভুর্জগতি মাংবিনা।

অর্থাৎ মহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন।

ইন্দ্রমাহাত্ম্যে, বৃহদারণ্যক ;—

তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি ইতি।

অর্থাৎ ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন।

প্রাণবায়ু মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ ;—

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্য্যনো
মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবীরয়ির্দেবঃ সদচচামৃতঞ্চযৎ।

অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন।

গরুড় মাহাত্ম্যে, আদিপর্ব্ব ;—

ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুব্রাধ্রুবং ইতি।

অর্থাৎ গরুড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন।

রামমোহন রায় এই সকল পরস্পর বিরোধী বচন সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, এই সকল বচন, কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র। ইহাতে কোন বিশেষ দেবতার প্রাধান্য এবং অন্য দেবতার অপ্রাধান্য প্রতিপন্ন হয় না।

শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য মোহজনক কি না ?

বৈষ্ণবেরা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকে মোহজনক বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, মহাদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আসুরপ্রকৃতি লোকের মোহ ও ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এ কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিতেছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—এরূপ বলা সকলেরই পক্ষে অপরাধজনক। বিশেষ-ভাবে, চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে অত্যন্ত অপরাধজনক। কেননা, কেশব ভারতী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তিনি তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য। সেই কেশব ভারতীর শিষ্য ভারতীয় চৈতন্যদেব ; আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের শিষ্য। শ্রীধরস্বামীর গীতা ও ভাগবতের টীকা, কি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্ব্বথা মান্য। চৈতন্যদেবও শ্রীধরস্বামীর টীকাকে মান্য

* বিষ্ণু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া বেদের নিন্দা করিয়াছেন : সুতরাং হরিনাম গ্রহণ করিবে না ; তুলসীদল স্পর্শ করিবে না, তুলসীপত্রও স্পর্শ করিবে না, শালগ্রামেরও অর্চ্চনা করিবে না।

করিয়াছেন।* শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে, তিনি শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণের মতানুসারেই টীকা লিখিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখিতেছেন ;—

ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগির্স্তথা ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারদিগের মতকে আলোচনা করিয়া যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি।

শ্রীধরস্বামী শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখিতেছেন ;—

সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্ব্বাপর্য্যানুসারত ইত্যাদি।

অতএব, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতকে মোহজনক বলিলে, চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে মুগ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে শ্রীধরস্বামীর যে সকল টীকা লিখিত হইয়াছে, তাহাই বা কেমন করিয়া মান্য হইতে পারে? অতএব, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ হইয়া যায়।

ভগবানের আনন্দনির্ম্মিত সাকারমূর্ত্তি সম্ভব কি না ?

বৈষ্ণবপণ্ডিতগণের মত এই যে, পরব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি। সে আকার মায়িক নহে, আনন্দের মূর্ত্তি। ঐ আনন্দনির্ম্মিত মূর্ত্তি কেবল ভক্তজনের চক্ষুর্গোচর হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত যে গোস্বামী মহাশয়ের বিচার হইয়াছিল, তিনিও ঐ কথা বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং উহা আনন্দনির্ম্মিত। একথার উত্তরে রাজা যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সমুদয় উপনিষদ্ এবং বেদান্তদর্শনানুসারে ব্রহ্মের কোন আকার নাই। শ্রুতি বেদান্তসূত্র ও স্মৃতি হইতে একথার প্রমাণ সকল পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দনির্ম্মিত অপ্রাকৃত আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষুর্গোচর হয়, গোস্বামীর এই কথায় রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ইহা অত্যন্ত অসম্ভাবিত।

একথা শ্রুতি, স্মৃতি অনুভব ও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। যদি কেহ বলেন যে, বন্ধ্যার পুত্র ও শশারুর শৃঙ্গের একটি একটি অপ্রাকৃত রূপ আছে, কিন্তু উহা কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় ; আর আকাশকুসুমের এক প্রকার অপ্রাকৃত গন্ধ আছে, তাহা কেবল যোগীদের ধ্যানগোচর হইয়া থাকে, একথা যেমন অসম্ভব, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দনির্ম্মিত মূর্ত্তি কেবল ভক্তজনের চক্ষুর্গোচর হয়, ইহাও সেইরূপ অসম্ভব। আনন্দের হস্তপদাদি, ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব, এ সকলের রূপক বর্ণন হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ বলিয়া জানিলে ও জানাইলে, নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস এই দুইকে ধন্য বলিয়া মানি যে, অনেকে অনায়াসে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, আনন্দের রচিত হস্তপাদাবিশিষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহার বেশ, ভূষা, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি সকলই আনন্দ-রচিত, এবং ধাম, পার্শ্ববর্ত্তী, প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকলই আনন্দরচিত, ইত্যাদি।

ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক উচিত কি না ?

গোস্বামী বলেন যে, ভগবান্‌কে সাকার বলিলে, অস্থায়ী ও পরিমিত বলা হয়, এবং আনন্দনির্ম্মিতমূর্ত্তি বলিলে উহা অসম্ভব হয়। তর্কের দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, কোন ব্যক্তি শ্রীধরস্বামীর টীকা অগ্রাহ্য করিলে, শ্রীচৈতন্য বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, স্বামীকে যে মানে না সে ব্যভিচারিণী।

বটে, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নয়। রাজা রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই ;—বেদবিরুদ্ধ তর্ক অবশ্য নিষিদ্ধ ; কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থনির্ণয় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শ্রুতি সকল পরমেশ্বরকে অরূপ, অদ্বিতীয়, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদয় পদার্থকে ক্ষুদ্র, নশ্বর ও নিরানন্দ বলিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই বেদের এই অভিপ্রায়কে যুক্তির দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন ; আমরাও তদনুসারে বেদ-সম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সমর্থন করিতেছি। এ বিষয়ে মনু বলিতেছেন ;—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদনেতরঃ ।।

যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদসম্মত তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে, ইতর ব্যক্তি জানে না।

বৃহস্পতি বলিতেছেন ;—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ।।

কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া অর্থের নির্ণয় করিবে না, যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়।

শ্রীকৃষ্ণই কি ব্রহ্ম ? অথবা শাস্ত্রে যাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই কি ব্রহ্ম ?

গোস্বামী বলিয়াছেন যে, গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম বলিতেছেন ; অতএব সাকার কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে যাহা বলিতেছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—যদি শাস্ত্রে, সকল সাকারের মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম বলিতেন, তাহা হইলে একথা গ্রাহ্য হইতে পারিত। কিন্তু বৈষ্ণবেরা যেমন গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবতের প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলেন, সেইরূপ শাক্তেরা দেবীসূক্ত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণানুসারে কালিকাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। কৈবল্যোপনিষৎ, শতরুদ্রী, শিবপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি সকলে ব্রহ্মা, সূর্য্য, অগ্নি, প্রাণ, গায়ত্রী, অন্ন, মন, আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সেইরূপ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে, এবং কালীপুরাণ প্রভৃতিতে, কালিকাকে, এবং শাম্বপুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহাভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; তিনকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অতএব, গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবতের প্রমাণানুসারে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া মানা হয়, তবে ব্রহ্মা, সদাশিব, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিকে বেদ ও পুরাণাদির প্রমাণানুসারে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া কেন না স্বীকার করা হয় ?

যদি বলেন যে, পুরাণাদিতে অন্য সকলের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে অধিক স্থানে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, একথার উত্তর এই যে, যাঁহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ প্রমাণ বলিয়া গণ্য, তাঁহারা এমন বলেন না যে, বেদাদি শাস্ত্রে যাহা বারম্বার বলিবেন, তাহাই মান্য এবং দুই একবার যাহা বলিবেন, তাহা মান্য নহে। যাহার বাক্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, তিনি একবার যে কথা বলেন, তাহাও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য।

গোস্বামীর সহিত বিচারে, রামমোহন রায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন,—"অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্যরূপে কহিয়াছেন, এমত নহে; যেহেতু দশোপনিষৎ বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি। তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়াক্তোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়া মেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি ।। আঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক ঋষি, তেঁহ দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষযজ্ঞকে জানেন তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন। পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন। এই শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ম স্কন্ধে। ৬৯ অধ্যায়ে নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগ্যতং। তথা। ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং। পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ।। ১৯ ।। কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা, তাঁহার ধ্যান করিতেছেন, এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন।"

"বেদে সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিকে বাহুল্যরূপে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। গোপালতাপনী গ্রন্থ অপেক্ষা কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী প্রভৃতি গ্রন্থে শিবপ্রতিপাদক শ্রুতি বাহুল্যরূপে রহিয়াছে। মহাভারতেও কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন অপেক্ষা শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে। পুরাণ ও উপপুরাণাদিতেও কৃষ্ণমাহাত্ম্য অপেক্ষা শিব ও ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবে না।

"যদি বল যে, বেদে ও পুরাণে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং তাঁহাদের হস্তপদাদিও ঐরূপ আনন্দনির্ম্মিত, ইহার উত্তর এই যে, অবয়ববিশিষ্ট প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি সমস্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ যিনি, তিনি এক ভিন্ন অনেক হইতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, বেদে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দময় হস্তপদাদি স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয়। কেননা সূর্য্য, বায়ু অগ্নি, অন্ন ইত্যাদি যাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, তাঁহাদের আনন্দনির্ম্মিত মূর্ত্তি স্বীকার করিলে, সূর্য্যের ও অগ্নির আনন্দময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইত পারিত।

"যদি বল, যে সকল দেবতাদিগকে শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুতঃ এক, সে কথার উত্তর এই যে, পরমাত্মদৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই এক বটে, কিন্তু নামরূপময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে, ঘটপট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদির ঐক্য স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

"যদি বল, যত প্রকার নামরূপবিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সে সকল কি অপ্রমাণ? ইহার উত্তর এই যে, সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ। যেহেতু, তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্তসূত্রে এইরূপ করিয়াছেন;—ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ। ৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬ সূত্র। নামরূপেতে ব্রহ্মের আরোপ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মেতে নামরূপের আরোপ হইতে পারে না। যেহেতু, ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট। আর, উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে, কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না। যেমন রাজার অমাত্যে রাজবুদ্ধি করা যায়, কিন্তু রাজাতে অমাত্যবুদ্ধি করা যায় না। (কেননা নিকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠের অন্তর্গত; কিন্তু শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের অন্তর্গত নহে)। অতএব, নামরূপ সকল যে

সৎস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে।

নামরূপবিশিষ্ট দেবতাদি সকলে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করাতে লোকে মনে করিতে পারে যে, ঐ সকল পদার্থ প্রত্যেকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। এইরূপ ভ্রম-নিবারণের জন্য, শাস্ত্রে যাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আবার তাঁহাদিগকেই পুনঃ পুনঃ জন্য ও নশ্বর বলিতেছেন। রাজা রামমোহন রায় এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দিতেছেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ কোন কোন শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, সেইরূপ আবার কোন কোন শাস্ত্রে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। যেমন "দানধর্ম্মে" আছে ;—

রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেণ জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা।

শিবভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে।

সৌষুপ্তিকে ;—

প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোথ সহস্রশঃ।

মহাদেব হইতে শত শত সহস্র সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন।

দানধর্ম্মে ;—

ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ।

প্রভু মহাদেব, ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা।

নির্ব্বাণ ;—

গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ ।।

কালিকার ভক্তিস্তুতিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ, তিনি কালীপদ প্রসাদে লোকের পালনকর্ত্তা হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করাতে, পাছে লোকের ভ্রান্তি জন্মে যে তিনি ব্রহ্ম, সেই জন্য আবার তদ্বিপরীতভাবে তাঁহার বিষয় বলা হইয়াছে।

"যদি কেহ বলেন যে, শ্রীভাগবতে ও মহাভারতে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা বলিতেছেন, সুতরাং তিনিই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ; এ কথার উত্তর এই যে, ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিল আপনাকে সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ পরমাত্মারূপে বলিয়াছেন ; অথচ, লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও কপিল এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন। কেবল যে কৃষ্ণ ও কপিল ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, এমন নহে ; প্রতর্দ্দনের প্রতি ইন্দ্র আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

"মামেব বিজানীহি" ইত্যাদি। এইরূপে অন্যান্য দেবতা ও ঋষিরাও ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রে ইহার এইরূপ মীমাংসা আছে ;— "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" ;—বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুসারেই বলিয়াছেন। যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মরূপে বলিয়াছেন যে, আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি ;—শ্রুতি, "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি"। অধিক কি বলিব, আমাদেরও আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিবার অধিকার আছে।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ।।

কত দিন পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজা করিবে ?

প্রতিমাপূজার প্রকৃত অধিকারী কে, কত দিন পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজা করিবে, তদ্বিষয়ে রাজা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ;—"নানা প্রকার দারুময় শীলাময় প্রভৃতি প্রতিমাপূজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন। কিন্তু পুনরায় ঐ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন। তৃতীয় স্কন্ধে, ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে, কপিল বাক্য,—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদস্ব হৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ।।

তাবৎ পর্য্যন্ত নানা প্রকার প্রতিমাপূজা বিধিপূর্ব্বক করিবেক, যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করি।

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং ।।

আমি সকল ভূতে আত্মাস্বরূপ অবস্থিতি করিতেছি, এমত রূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাকে পূজার বিড়ম্বনা করে।

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ।।

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তাপ্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব, পরমেশ্বরকে বিভু করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন।

জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বারা মুক্তি হয় ?

গোস্বামী বলিতেছেন যে, জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ের দ্বারাই জীবের মুক্তি হয়। রামমোহন রায় তদুত্তরে বলিতেছেন ;—জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। কঠবল্লী ;—

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্য মুক্তি হয়, তদিতরের মুক্তি হয় না। কেন শ্রুতি ;—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

যে সকল ব্যক্তি ইহজন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের সকল সত্য হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয় ; আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন, তাঁহাদের মহান্ বিনাশ হয়।

জ্ঞানের প্রাধান্য বিষয়ে তিনি মনু হইতে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ;—মনুঃ—

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ ।।

এই সকল ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরমধর্ম্ম হয়েন, তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানিবে ; যেহেতু, সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়।

রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না; কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি ও কর্ম্ম ইত্যাদি। ইহাই ভগবদ্গীতার উপদেশ।

গীতাঃ—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ।।

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ;—যে সকল ভক্ত এইরূপে আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহাদিগকে সেই জ্ঞানরূপ উপায় আমি দি, যাহাদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর, সেই ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ দীপের দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি।

কবিতাকারের সহিত বিচার

তৎপরে কবিতাকারের সহিত বিচার। "এই বিচারগ্রন্থে প্রতিবাদীর আপত্তি এই ছিল যে, রামমোহন রায় বেদার্থের গোপন করিয়াছেন; তিনি শিব, বিষ্ণু ও ব্যাসাদি ঋষির অবমাননা করেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী হয়েন। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিজের পূর্ব্বের উক্তি প্রদর্শনদ্বারা ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। শকাব্দ ১৭৪২; (খৃীঃ অঃ; ১৮২০ সালে) উক্ত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়।"

রাজা রামমোহন রায় কবিতাকারের সহিত বিচার পুস্তকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমুদয় পুস্তকের তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, নশ্বর ও নামরূপবিশিষ্ট পদার্থে ঈশ্বরজ্ঞান না করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের শ্রবণমনন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত। বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সহকারী বটে, কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে।

রামমোহন রায় গ্রন্থ প্রকাশ করাতে মন্বন্তর ও মারীভয় হইতেছে কি না ?

কবিতাকার লেখেন যে, রামমোহন রায়ের মত প্রকাশ হওয়াতে, দেশে অমঙ্গল, মারীভয় ও মন্বন্তর হইতেছে।* রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে যাহা বলিতেছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—লোকের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল আপন আপন কর্ম্মাধীন। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কিম্বা পুত্তলিকাসম্বন্ধীয় পুস্তকের রচনার সহিত তাহার কোন কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশের অনেক পূর্ব্বে, কবিতাকারের রোগ ও মিথ্যা অপবাদের জন্য ধনহানি ও মানহানি হয়। সে বিষয়েও কি কবিতাকার বলিবেন যে, উহা তাঁহার স্বকর্ম্মের ফল নহে, কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার রোগ হইয়াছিল? ইত্যাদি।

রামমোহন রায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন ;—"আমরা এইরূপ সাহস করিয়া কহিতে পারি যে, পরমেশ্বরের সত্যোপাসনাতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সৎ-

---

* ভাগীরথীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ১৮১৭ সালে, কাসিমবাজার অঞ্চলে, মারীভয় উপস্থিত হইয়া উক্ত স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। উক্ত সময়ে যশোহরেও ওলাউঠা রোগে বহুলোকের মৃত্যু হয়। রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। সেই জন্য কবিতাকারের মতে, রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম মারীভয়ের কারণ।

কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সুখী ও নিরোগী আছেন এবং এই সত্যধর্ম্মের প্রচার হইলে দেশ সত্য-কালের ন্যায় হইবেক।"

যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী নির্জ্জনে মৌন থাকেন কি না ?

কবিতাকার বলেন যে, রামমোহন রায় লোককে জানাইতেছেন যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী। যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে মৌন থাকেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে বাহ্যাড়ম্বর ও লোক জানান ভাল নহে, ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ অধ্যাত্মশাস্ত্রের পাঠ, শ্রবণ ও উপদেশ অবশ্য করিবেন। পরমাত্মা হইতে পরাঙ্মুখব্যক্তিকে পরমাত্মনিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উপদেশ দিবেন। এ বিষয়ে তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে প্রমাণ দিতেছেন ;—

স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে ইত্যন্তং।

এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট গৃহস্থ বেদাধ্যায়নপূর্ব্বক পুত্র অমাত্যকে জ্ঞানোপদেশদ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া কালহরণ করেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তি নাই।

এ বিষয়ে তিনি মনু হইতেও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পুস্তক ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করা দোষ কি না ?

কবিতাকার রামমোহন রায়ের প্রতি এই দোষারোপ করেন যে, তিনি পুস্তক ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়া লোককে জ্ঞান দিতে চাহেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে, আমরা শাস্ত্রানুসারেই পুস্তক বিতরণ করিতেছি ; এ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদেতি স বৈ দিবং ।।

যে ব্যক্তি বেদার্থ ও যজ্ঞশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র মূল্যদ্বারা লেখাইয়া দান করে, সে স্বর্গে যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন।

যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করা দোষ কি না ?

কবিতাকার রামমোহন রায়ের প্রতি আর এক দোষারোপ করেন যে, তিনি যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যান। রামমোহন রায় একথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, "ধর্ম্মাধর্ম্ম এ সকল অন্তঃকরণবৃত্তি ; পরিধানাদির সহিত তাহার কি সম্পর্ক আছে ; দ্বিতীয়তঃ, শিল্পবস্ত্রমাত্রই যদি যবনের পোষাক হয়, তবে কবিতাকার এবং তাঁহার পৌত্তলিক বন্ধুগণ শিল্পবস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে গমন করেন কেন? একথার উত্তরে কবিতাকার যদি বলেন যে, পৌত্তলিকের পক্ষে উহাতে দোষ নাই, ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে দোষ আছে, তাহা হইলে তিনি ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিবেন। কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত শিল্পবস্ত্র পরিধান করিলে দোষ হয়, তাহাও লিখিবেন। প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে আমরা সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

কবিতাকার রামমোহন রায়কে পাষণ্ড, নাস্তিক প্রভৃতি শব্দে গালি দিয়াছেন। রামমোহন রায় তদ্বিষয়ে বলিতেছেন যে, "ইহাতে আমাদের ক্রোধ হয় না, দয়া হয়। কুপথ্যাশীরোগী, কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিতে বলিলে, কিম্বা কুপথ্য খাইতে নিষেধ

করিলে, সে ক্রোধ করে ও দুর্ব্বাক্য বলে। সেইরূপ, অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া বহু-কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাঁহার দৃষ্টির অবরোধ হয়, তাঁহাকে অন্য ব্যক্তি জ্ঞানোপদেশ করিলে অবশ্যই দুঃসহ হইবেক ; সুতরাং দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ করিতেই পারেন।"

রামমোহন রায়, গ্রন্থের উপসংহারে কবিতাকারের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন ;—"হে পরমেশ্বর! কবিতাকারকে, আত্মা অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দেও। তখন কবিতাকার অবশ্য জানিবেন যে, আমরা তাঁহার তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আত্মীয় কি অনাত্মীয় হই।"

(কবিতাকারের উত্তরের প্রত্যুত্তর)

কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় কি না ?

ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের পূর্ব্বে, গৃহস্থের পক্ষে স্মৃতি ও আগমোক্ত বিধি অনুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, একান্ত আবশ্যক কি না? রাজা রামমোহন রায় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, ইহজন্মে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের অধিকারী হওয়া যায়। বেদান্তভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যান আচার্য্য লেখেন ;—

ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।

কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে।

রাজা রামমোহন রায় অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, ইহজন্ম বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদ্বারা উপযুক্ত পরিমাণে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, কার্য্য দেখিয়াই কারণ স্থির করিতে হয়।

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিবার পূর্ব্বে সাকার উপাসনা আবশ্যক কি না ?

কবিতাকার বলেন যে, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমে সাকার উপাসনা আবশ্যক। রামমোহন রায় উহার উত্তরে বলেন যে, যাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় নাই, শাস্ত্রানুসারে তাহার কাম্যকর্ম্ম ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন ; কিন্তু যাহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইয়াছে, কিম্বা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার পক্ষে শাস্ত্রানুসারে সাকার উপাসনা নিষিদ্ধ। বেদান্তসূত্র হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ন প্রতীকেন হি সঃ।" ১ পাদের ৪ সূত্র।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, বিকারভূত নামরূপে পরমেশ্বর বোধ করিবেন না ; যেহেতু, এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না।

বেদান্তসূত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, চিন্ময়, সর্ব্বব্যাপী, পরমেশ্বরে যে ব্যক্তি চিত্তস্থির করিতে পারে না, সে শাস্ত্রানুসারে প্রথমতঃ শব্দের দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ অবয়বের কল্পনাদ্বারা এবং তৃতীয়তঃ প্রতিমার দ্বারা যথাক্রমে উপাসনা করিবে। উপাসনা তিন প্রকার ; উত্তম, মধ্যম, অধম। ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মার উপাসনা উত্তম। শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা মধ্যম, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনে মনে ব্রহ্মচিন্তা করিতে অক্ষম,

তিনি "ওঁতৎসৎ" কিম্বা গায়ত্রী, কিম্বা নামজপ ইত্যাদি অবলম্বনে মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করিবেন। মনে মনে অবয়বের কল্পনা অধম। যেমন, মনে মনে শিব কি বিষ্ণুর রূপ ধ্যান করা। ঐ সকল কল্পিত অবয়বের জপস্তুতি তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট। প্রতিমা-পূজা অধম হইতেও অধম।

ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই কি না ?

ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই। এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের একই অবস্থা। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় এবং সর্ব্বোপাধিশূন্য। ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই, একথা অশাস্ত্রীয় ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ২ পাদে ১১ সূত্র।

পরমেশ্বরের উভয় লিঙ্গ, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার বস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই ইত্যাদি।

একই সময়ে পরমেশ্বরে আকারের ভাব ও অভাব অর্থাৎ আকার আছে ও আকার নাই, তর্কশাস্ত্রানুসারে (Logical principle of noncontradiction) ইহা সম্ভব নহে।

গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য, শিব প্রভৃতি দেবতারা ব্রহ্ম কি না ?

এদেশে গণেশ, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য্য, শিব এবং গঙ্গা এই ছয় দেবতা প্রধান উপাস্য। ইহাঁদের ব্রহ্মত্ব যুক্তিবিরুদ্ধ। ইহাঁরা দুর্ব্বলাধিকারীদিগের উপাস্য। এই সকল দেবতা ভিন্ন, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, এমন কি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মত্ব আরোপিত হয়। অনেক দেবতা, ঋষি, আধ্যাত্মচিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করেন। ইহার তিন প্রকার তাৎপর্য্য। প্রথম, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব ; দ্বিতীয়, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তার অভাব, এবং তৃতীয়, ব্রহ্মে সত্তাই বাস্তব সত্তা, এই তিনটি তত্ত্ব প্রকাশ হয়।

পৌত্তলিকতা বিষয়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মত

কবিতাকার রামমোহন রায়কে এই দোষ দেন যে, তিনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বিদ্বেষী। একথা যে অমূলক, তাহা রামমোহন রায়, নিজ গ্রন্থ হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরিশেষে বলিতেছেন ;—"স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যদ্যপিও নানাবিধ কর্ম্ম ও সাকার উপাসনা বাহুল্যরূপে লিখিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে ঐ সকলকে কাল্পনিক ও অজ্ঞানের কর্ত্তব্য করিয়া কহিয়াছেন। অতএব, তাঁহার মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে, আমরা দ্বেষ করিব। স্মার্ত্তের একাদশীতত্ত্বে বিষ্ণুপূজার প্রকরণের প্রথমে ;—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ।।

জ্ঞানস্বরূপ. দ্বিতীয়রহিত, উপাধিশূন্য, শরীররহিত যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন।

স্মার্ত্তের আহ্নিক তত্ত্বে ;—

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবো মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ।।

জলেতে দেবতাজ্ঞান ইতর মনুষ্য করে, আর গ্রহাদিতে দেববুদ্ধি দেবজ্ঞানীরা করেন,

আর, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্খেরা করে, আর আত্মাতে ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানীরা করেন।"

নবদ্বীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুসারে, প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন করিলেন যে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতেও পৌত্তলিকতা অজ্ঞানীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ।

নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক কয়েক জন প্রসিদ্ধ সাকার উপাসকের নাম পাওয়া যাইতেছে ;—"আর প্রথম ১২ পৃষ্ঠার পংক্তি অবধি, মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েক জনকে ও আমাদিগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া ব্যঙ্গরূপে গণনা করিয়াছেন। উত্তর। কবিতাকারকে এবং অনেককে বিদিত থাকিবেক যে, সহস্র সহস্র লোক, কি এদেশে, কি পশ্চিমাদিদেশে নিষ্কল নিরঞ্জন পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ফলের তারতম্য হয়। অতএব, আমরা সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানেতে অধম যদ্যপিও হই, তাহাতে এ ধর্ম্মে অগৌরব নাই, এবং অন্য উত্তম জ্ঞানীদেরও কি হানি হইতে পারে? সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দেখিতেছি যে, রামপ্রসাদ অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গোঁসাই এবং কবিতাকার আপন আপন সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা এমত নিশ্চিত হয় না যে, অপকৃষ্ট সাকার উপাসক আর নাই। বরঞ্চ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অনেক অনেক ব্যক্তি অনুষ্ঠানের তারতম্যরূপে সাকার উপাসনা করিতেছেন। তাহাতে উপাসনার মান্যতা কিম্বা অমান্যতা বিজ্ঞলোকের নিকট হয়, এমত নহে।"

নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে দেখা যাইতেছে যে, কবিতাকার রামমোহন রায়কে অত্যন্ত অর্থানুরাগী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, উক্ত ঘটনা অমূলক ; কিন্তু উহা সত্য হইলেও, আত্ম-রক্ষা বা আত্মীয়রক্ষার জন্য, কোন কার্য্য করিলে ধর্ম্মহানি হয় না।

"২২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে, আপন পাওনার অন্বেষণের কারণ পাগলের ন্যায় চুঁচুড়া মোং দিবিরিঙ সাহেবের তত্ত্বে যাই। যদ্যপিও ব্যবহারে আত্মরক্ষণ এবং আত্মীয়রক্ষণ করিলে পরমার্থে হানি কিছুই নাই, কিন্তু দিবিরিঙ সাহেবের তত্ত্বে যাওয়া এ কেবল মিথ্যা অপবাদ। যেহেতু, দিবিরিঙ সাহেবের সহিত দেনা পাওনা কোন কালে নাই। দ্রবিঙ সাহেব বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার কাগজ পত্র ও চাকর লোক বিদ্যমান। বিশেষতঃ চুঁচুড়াতে কয়েক বৎসর হইল যাতায়াত মাত্রও নাই। অতএব, বিজ্ঞলোক বিবেচনা করিলে, কবিতাকার কি পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি দ্বেষ ও অপকারের বাঞ্ছা করেন, এবং মিথ্যারচনাতে কবিতাকারের শঙ্কা আছে কি না, ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন।"

অনেকে মনে করেন যে, ব্রাহ্ম শব্দ রাজা রামমোহন রায়ের পরে সৃষ্টি হইয়াছে ; তাঁহার সময়ে ব্রহ্মোপাসক অর্থে উক্ত শব্দের ব্যবহার ছিল না। কিন্তু শেষবার মুদ্রিত রাজার গ্রন্থের ৬৫৪ পৃষ্ঠায়, পঞ্চম পংক্তিতে, ও ৬৫৫ পৃ, ২১ পংক্তিতে, ব্রহ্মোপাসক অর্থে ব্রাহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাসকের লৌকিক ব্যবহার

"২২ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে, লোকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কহি যে, জনকাদির ন্যায় রাজনীতি কর্ম্ম ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকি। উত্তর। যাহা

আমরা এ বিষয়ে কহিয়াছি ও লিখিয়া থাকি, তাহার তাৎপর্য্য পরম্পরায় এই বটে, কিন্তু এ অভিমানসূচক ভাষাতে আমরা কদাপি কহি নাই ও লিখি নাই। তাহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের-ভূমিকায় ১৫ পৃষ্ঠে, ও বেদান্তচন্দ্রিকায় ১৫ পৃষ্ঠে নির্দিষ্ট আছে যে, পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যদ্যপিও কেবল এক ব্রহ্মমাত্র সত্য, আর নামরূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন, কিন্তু ব্যবহারদৃষ্টিতে হস্তের কর্ম্ম হস্ত হইতে ও কর্ণনাসিকাদির কর্ম্ম কর্ণনাসিকাদি হইতে লইবেন, এবং ক্রয় বিক্রয় ও আহারাদি ব্যবহারকে যে দেশে যৎকালে থাকেন, লোকদৃষ্টিতে সেই দেশের ব্যবহারনিষ্পাদক শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন করা উচিত জানিবেন। এরূপ ব্যবহার করাতে তাঁহাদের উপাসনার হানি নাই।

যোগবাশিষ্ঠে ;—

"বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব ।।"

বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া আর মনেতে সংকল্প ত্যাগ করিয়া এবং বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা জানাইয়া এবং মনে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম! লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর ; এবং সম্প্রদায় প্রণালীতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে এবং ভারতাদি শাস্ত্রে দেখিতেছি বশিষ্ঠ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, শৌনক, রৈক্ক, চক্রায়ণ, জনক, ব্যাস, অঙ্গিরঃ প্রভৃতি ব্রহ্ম-পরায়ণ ছিলেন, অথচ গার্হস্থ্যধর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন। যদি কবিতাকার একান্ত প্রৌঢ়ী করেন যে, পরমার্থদৃষ্টিতে সকল ব্রহ্মভাবে দেখিলে, ব্যবহারেতেও সেইরূপ করিতে হইবেক, তবে কবিতাকারকে, আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে, তাঁহার সাকার উপাসনাদিতে 'দেবীমাহাত্ম্যে'র এই বচনানুসারে, "স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" তাবৎ স্ত্রীমাত্রকে ভগবতীস্বরূপ পরমার্থদৃষ্টিতে তেঁহ অবশ্যই জানেন। ব্যবহারে সেইরূপ আচরণ তাঁহাদের সহিত করেন কি না? আর তন্ত্রের বচনানুসারে, "শিবশক্তিময়ং জগৎ" তাবৎ জগৎকে শিবশক্তিস্বরূপ জানিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না, এবং "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" এই প্রামাণানুসারে কেবল পরমার্থদৃষ্টিতে সকলকে বিষ্ণুময় জানেন, কি ব্যবহারে এসকলকে বিষ্ণুপ্রায় আচরণ করেন? অতএব, এই সকলের উত্তরে কবিতাকার যাহা কহিবেন, তাহা শুনিলে পর, তাঁহার প্রৌঢ়ী বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব।"

প্রথমভাগ বেদপাঠে অশক্ত ব্রাহ্মণেরা কি করিবেন ?

............ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদের প্রথম ভাগ না পড়িয়া, বেদান্ত পড়িলে বিড়ম্বনা হয়। অতএব, মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকে প্রথম কাণ্ডের পাঠ বিনা বেদান্ত পাঠের দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছেন। উত্তর ;—কবিতাকার দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া আপনার পূর্ব্বাপর বাক্যের অত্যন্ত বিরোধ হয়, তাহা বিবেচনা করেন না। যেহেতু কবিতাকার ২০ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি আপনি লিখেন যে, এদেশে অদ্যাপি বেদের ব্যবসা আছে। সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রীর অর্থ অনেকে জানেন, এবং আর আর শাখা সূক্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানেন। অতএব, এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বেদহীন নহেন। যদ্যপি সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রী আর কতক্ কতক্ শাখা সূক্ত জানিলে, পূর্ব্বভাগ বেদ পড়া একপ্রকার এদেশের ব্রাহ্মণেদের হয়, ইহা কবিতাকার এক স্থানে স্বীকার করেন ; পুনরায় মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্বভাগ বেদের সূর্য্যোপস্থান প্রভৃতি ও অন্য অন্য মন্ত্র অবশ্যই পড়িয়া থাকিবেন, তাঁহাদিগ্যে পূর্ব্বকাণ্ডীয় বেদহীন করিয়া অন্য স্থানে কিরূপে নিন্দা

করেন ? বস্তুত, প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য ; কিন্তু ইহাতে অসমর্থ ব্রাহ্মণেদের গায়ত্রী ও রুদ্রোপস্থান এবং সূর্য্যোপস্থান ও পুরুষসুক্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন করিয়া কহিয়াছেন। বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের বচনঃ—

"সাবিত্রীরুদ্রপুরুষসূর্য্যোপস্থানকীর্ত্তনং।
অনধীতস্বশাখানাং শাখাধ্যয়নমীরিতং ।।

অতএব, যাঁহারা গায়ত্র্যাদির অধ্যয়নবিশিষ্ট হয়েন, তাঁহাদের বেদান্ত পাঠে বিড়ম্বনা কখন হয় না।"

মনুর দ্বিতীয়াধ্যায়ে গায়ত্রীর প্রকরণে ;—

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্ব্রাহ্মণো নাত্রসংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ।।

কেবল গায়ত্র্যাদি জপেতেই ব্রাহ্মণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন ; অন্য ব্যাপার করুন বা না করুন, তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ কহা যায়।"

বেদান্তভাষ্যকার সাকার দেবতার স্তব করিয়াছেন কি না ?

কবিতাকার লেখেন বেদান্তের ভাষ্যকার সাকার ব্রহ্ম মানিয়া আনন্দলহরী স্তব করিয়াছেন। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;—"বেদান্তের ভাষ্য প্রস্তুত আছে, কোন্ স্থানে সাকারকে ব্রহ্মরূপে ভাষ্যকার মানিয়াছেন, তাহা কবিতাকারকে দেখান উচিত ছিল। তবে আনন্দলহরী, দেবীসুরেশ্বরী ইত্যাদি গঙ্গার স্তব, নমো শঙ্কটাকষ্টহারিণী ভবানী ইত্যাদি অনেক অনেক স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককেও শঙ্করাচার্য্যের রচিত কহিয়া সেই সেই দেবতার পূজকেরা প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। এ সকল স্তব, বেদান্তের ভাষ্যকার আচার্য্যকৃত ইহাতে প্রমাণ কিছু নাই। প্রধান লোকের নামে আপন আপন কবিতা বিখ্যাত করিলে চলিত হইবেক, এই নিমিত্ত, আচার্য্যের নামে এই সকল স্তবস্তুতি প্রসিদ্ধ করিয়াছেন ; আর যদ্যপিও তাঁহার কৃত এ সকল হয়, তথাপি হানি নাই। যেহেতু, ব্রহ্মের আরোপে জগতের তাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন করা যায়।

সৃষ্টি করিবার জন্য নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার হইতে হয় কি না ?

সৃষ্টি করিবার জন্য নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার হইতে বা রূপধারণ করিতে হয়, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে। নিরাকার হইতে সৃষ্ট্যাদি কিরূপে হয়, তাহার সিদ্ধান্ত বেদান্তে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২ অধ্যায়, ১ পাদ, ২৮ সূত্র।

যখন জীবাত্মা আকার ধারণ না করিয়াও স্বপ্নে রথ, গজ, নদী, দেশ, আকাশ, দেবতা, স্থাবর, জঙ্গম, এই সকল সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এই সকল জগৎ ও নানা প্রকার নামরূপের রচনা করিবেন, আশ্চর্য্য কি!

গুরুবাদ বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত

কবিতাকার তাঁহার বিচার গ্রন্থে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। রামমোহন রায় তদ্বিষয়ে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমে গুরুর প্রণামমন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন ;—

নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখহারিণে ।।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, মহামন্ত্রের দাতা, সংসারদুঃখহারক যে তুমি হে গুরু! তোমাকে
াজ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্তে প্রণাম করি। অখণ্ড ব্রহ্মের স্বরূপ এবং যিনি চরাচর জগতে
প্ত হইয়া আছেন, সেই পদকে দেখাইয়াছেন যে গুরু, তাঁহাকে নমস্কার।

বেদে বলিতেছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
শিষ্য পরমতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন।

অতএব, যে শাস্ত্রানুসারে গুরুকে মান্য করিতে হয়, সেই শাস্ত্রানুসারে গুরুর লক্ষণ
না আবশ্যক। কবিতাকারের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, গুরু যেমন শাস্ত্রানুসারে
ন্য হইয়াছেন, সেইরূপ শাস্ত্রেই আছে।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহরকঃ ।।
তন্ত্র।

শিষ্যের বিত্তাপহারী গুরু অনেক আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণ করেন যে গুরু,
নি অতি দুর্লভ।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার। "ইহা দেবনাগর অক্ষরে, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায়
ং বাঙ্গলা অক্ষরে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়, এই চতুর্ব্বিধরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।
াতে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদাধ্যয়নাদি না থাকিলেও এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি
র্মহীন হইলেও লোকের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার ও পরমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে।"

শূদ্র ও স্ত্রীলোক এবং বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না ?

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী বলেন যে, বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না;
দ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যায় বা ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রের অধিকার নাই। যে
ল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করেন না, তাঁহারা ব্রাত্য অর্থাৎ অব্রাহ্মণ। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম
র্থাৎ যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

রাজা রামমোহন রায়, শাস্ত্রীর সহিত বিচারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যাগযজ্ঞাদি
র্ম ও বর্ণাশ্রমকর্ম্মবিহীন ব্যক্তিও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী। তিনি বেদান্তসূত্র হইতে
ার প্রমাণ দিয়াছেন ;—

অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ।
অপিচ স্মর্য্যতে।

রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে এই দুই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,
হার সারমর্ম্ম এই ; অগ্নিহীন ব্যক্তি সকল, এবং দ্রব্যাদি সম্পত্তিরহিত ব্যক্তি সকল,
াদের কোন বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, এরূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার
ছে কি না, এই সংশয় উপস্থিত হইলে, আপাততঃ মনে হয় যে, আশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তি-
র ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই। ইত্যাদি। এই পূর্ব্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন, অনাশ্রমী ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী। যেহেতু, রৈক্ক, বাচক্নবী, প্রভৃতি। আশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তি সকলেরই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দেখিতেছি। সম্বর্ত্ত প্রভৃতি বর্ণাশ্রমকর্ম্মহীন ছিলেন ও সর্ব্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, তাঁহাদেরও মহাযোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি।

বেদাধ্যয়নবিহীন শূদ্র ও স্ত্রীলোকাদি যে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী, বেদ ও স্মৃতিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের বেদাধ্যয়নে অনধিকার থাকিলেও ইতিহাসে, পুরাণ ও আগমাদিতে তাঁহাদের অধিকার আছে। এই সকল শাস্ত্রে চতুর্বর্ণেরই অধিকার আছে। অতএব, ইতিহাস, পুরাণ ও আগম পাঠ করিয়া গৃহস্থ স্ত্রী, শূদ্র, ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিতে পারেন। এইরূপে, রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শাস্ত্রানুসারে, স্ত্রী শূদ্রের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে, রামমোহন রায়ের শাস্ত্রব্যাখ্যানুসারে শূদ্র, আগমেতিহাসাদিদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা হইলে, আশ্রমী গৃহস্থ থাকিয়াও ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইবেন। রামমোহন রায়ের মতে প্রণব, উপনিষদাদি বেদাভ্যাসও করিতে পারিবেন। ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মণ। সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শূদ্র, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে, প্রণব, উপনিষদাদি বেদাভ্যাসও করিতে পারিবেন। এইরূপ, রামমোহন রায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিয়াও তাহার ভিতর দিয়া শূদ্রের সামাজিক ও পরমার্থিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পক্ষে আর এক পথ বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার
জনৈক খ্রীষ্টিয়ান মিসনরির আক্রমণের বিরুদ্ধে
হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের পক্ষ সমর্থন

'ব্রাহ্মণসেবধি' ও 'Brahmanical Magazine' প্রকাশ

খ্রীষ্টধর্ম্মের চর্চা এবং খ্রীষ্টিয়ানদিগের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে বিচার। (১৮২০—১৮২৩ সাল)

শ্রীরামপুরের জনৈক খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রি, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র, এবং যোনিভ্রমণ, জন্মান্তরীণ ফলভোগ মতের বিরুদ্ধে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই একখানি পত্র প্রকাশ করেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হইবার জন্য রামমোহন রায় উহার একটি উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পত্রিকাসম্পাদক তাহা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণসেবধি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে উহার উত্তর দিলেন। উহাতে রচয়িতার জাতীয়ভাব ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এই উত্তরে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় যুক্তি ছিল।

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা* এই নামে পত্রিকা প্রকাশিত হইত। বাস্তবিক, রামমোহন রায়ই উহার প্রকৃত লেখক।

---

* রাজা রামমোহন রায় কল্পিত নামে, অথবা তাঁহার কোন কোন বন্ধুর নামে পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজের নাম গোপন রাখিয়া অন্য নামে পুস্তক ও প্রবন্ধ সকল সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। ঐ সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ বাস্তবিক যে তাঁহার নিজের লিখিত, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব, শিবপ্রসাদ শর্ম্মা ইত্যাদি নামে তাঁহার অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গী ও শিষ্য পরলোকগত চন্দ্রশেখর দেব মহাশয় ঐরূপ কতকগুলি পুস্তক সম্বন্ধে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশককে বলিয়াছেন যে, অপরের নামে প্রকাশিত হইলেও উহা বাস্তবিক রামমোহন রায়ের রচিত। The Answer of a Hindoo ইত্যাদি নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার নীচে চন্দ্রশেখর দেবের নাম রহিয়াছে! রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়ম্ আড্যাম সাহেব, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি, উহা কলিকাতা হইতে আমেরিকার বোষ্টান নগরবাসী ডাক্তার টকারম্যান সাহেবকে পাঠাইয়া দেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহাকে বলিতেছেন যে, উহা রামমোহন রায়ের রচিত এক নূতন পুস্তক। বাবু চন্দ্রশেখর দেব, রাজার গ্রন্থাবলীর যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঐ সকল পুস্তকের নাম রহিয়াছে, এবং রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় যে তালিকা করিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ সকল পুস্তকের নাম আছে। সুতরাং ঐ সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ যে রামমোহন রায়ের রচিত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

এই পত্রিকা ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন্ (Brahmanical Magazine) নামে, এক

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই ব্রাহ্মদিগের সহিত খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে। পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত তর্কবিতর্ক ও বিবাদের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত, এবং খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকদিগের আপত্তির উত্তরে 'The Vedantic doctrines vindicated' শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধ এবং উক্ত রূপ অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠ করিলে, তৎকালে পাদ্রিদিগের সহিত বিবাদের বিবরণ জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের প্রথমাবস্থায় খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারবিষয়ে রাজার একটি অভিপ্রায়

'ব্রাহ্মণসেবধি'তে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিলে প্রথম ত্রিংশৎ বৎসর কাহারও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তৎপরে তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা প্রথম ত্রিংশৎ বৎসর কাহারও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। কেবল বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, এমন নহে, এদেশে পাদ্রিগণ যে দেশীয় লোকের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা ভাল বাসিতেন না। গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিতেন, পাছে উক্তরূপ ধর্ম্মপ্রচারদ্বারা প্রজারা বিদেশীয় রাজশাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। এমন কি, এইজন্য একবার একজন পাদ্রি সাহেবকে গবর্ণমেণ্টের আদেশে, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিয়া ত্রিংশৎ বৎসরের পর, এদেশীয় লোককে খ্রীষ্টিয়ান করিবার উদ্দেশে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকপ্রচার। উহা হিন্দুদেবতা ও ঋষিদিগের কুৎসা, এবং মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দাতে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়, রাজপথে দণ্ডায়মান্ হইয়া আপনার ধর্ম্মের উৎকর্ষ এবং অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ দান। তৃতীয়, সামান্য দুঃখী লোককে চাকুরী দিয়া এবং প্রতিপালন করিবার লোভ দেখাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করা। এই তিন উপায় সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন যে, নিন্দা ও তিরস্কারদ্বারা অথবা লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করা কখনই যুক্তি ও বিচারসঙ্গত নহে। আপনার ধর্ম্ম যে সত্য, এবং অন্যের ধর্ম্ম যে মিথ্যা, ইহা বিচারবলে সংস্থাপন করাই ধর্ম্মপ্রচার করিবার যুক্তিযুক্ত প্রণালী। এই প্রকারে, এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্মে লোককে লইয়া গেলে কোন দোষ হয় না।

বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক লোক, দুর্ব্বল ব্যক্তির মনঃপীড়া দিতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হন। বিশেষতঃ যদি সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি তাঁহাদের অধীন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ সাবধান হন, পাছে সে মনের কষ্ট পায়। বাঙ্গালী প্রজা দুর্ব্বল, দীন ও ভয়ার্ত্ত। ইংরেজের নামমাত্রে ভীত হয়। তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা, কি লোকতঃ কি ধর্ম্মতঃ কখনই প্রশংসনীয় নহে। যদি খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ, তুর্কি ও পারস্য প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া ঐরূপ ধর্ম্মোপদেশ ও পুস্তক বিতরণ করেন, তাহা হইলে অবশ্য

পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইত। সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রামমোহন রায়ের বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশক বাঙ্গালায় তিনখানি ও ইংরেজী ভাষায় চারিখানির অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

বলিব যে, তাঁহারা নির্ভয়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন ;—তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের আচার্য্যের দৃষ্টান্তানুসরণ করিতেছেন। কিন্তু রাজশক্তির সাহায্য লইয়া দুর্ব্বল প্রজার উপরে এরূপ দৌরাত্ম্য করা একান্ত নিন্দনীয়।

রাজা রামমোহন রায়ের কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধীয় একটি ঘটনার বিষয় আলোচনা করা যাউক। কেবল ইংরেজের অধিকৃত দেশে কেন, ইংরেজের অনধিকৃত দেশেও তাঁহারা রাজশক্তির সাহায্য লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ চীনদেশে বা প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত কোন কোন দ্বীপে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। সেই সকল দেশবাসীদিগের উপাস্য দেবতার প্রতি গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেশবাসী অশিক্ষিত লোক ক্রোধান্ধ হইয়া খ্রীষ্টিয়ান-দিগের মধ্যে হত্যাকান্ড উপস্থিত করিল। তৎক্ষণাৎ খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন যে, শীঘ্র তথায় সৈন্যপ্রেরণ করা হয় ইত্যাদি। এস্থলে সৈনিকপুরুষদিগের সাহায্য লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করা হইল। রাজা এইরূপ প্রচারকে দৌরাত্ম্য বলেন। রাজা বলেন যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা যে সকল দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল দেশে তাঁহাদের কোন অধিকার ও ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা কোন প্রকার রাজশক্তির সাহায্য না লইয়া ধর্ম্মপ্রচার এবং নির্ভয়ে ধর্ম্মের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন।

রাজা বলিতেছেন যে, যদি কোন প্রবল জাতি, কোন দুর্ব্বল জাতিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন, তাহা হইলে, সেই প্রবল জাতির ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার উৎকৃষ্টই হউক, বা নিকৃষ্টই হউক, তাঁহারা সেই দুর্ব্বল, অধীনস্থ জাতির ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ ও উপহাস করিয়া থাকেন। ইতিবৃত্তে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নিরীশ্বরবাদী ও হিংস্র পশুতুল্য চঙ্গে সাহার সেনাপতিরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ গ্রাস করিয়াছিল। তাহারা এদেশবাসীদের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোক বিশ্বাসের কথা শুনিয়া উপহাস করিত। অত্যাচারী মগ্‌দের প্রায় কোন ধর্ম্মই ছিল না। তাহারা পূর্ব্ব অঞ্চল আক্রমণ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মে ব্যাঘাত উপস্থিত করিত। একেশ্বরবাদী য়ীহুদীরা, পৌত্তলিক গ্রীক্‌ ও রোমীয়দিগের প্রজা ছিলেন। য়ীহুদীদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার লইয়া গ্রীক্‌ ও রোমীয়গণ উপহাস করিতেন।

জাতীয় পরাধীনতার কারণবিষয়ে রাজার একটি অভিপ্রায়

তৎপরে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, প্রায় নয়শত বৎসর হইতে আমরা দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতি বলিয়া জগতের নিকট তিরস্কৃত হইয়া রহিয়াছি। ইহার প্রথম কারণ জাতিভেদ। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুজাতির ধীরতা, কোমলতা এবং হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষাগুণে জীবহত্যায় অপ্রবৃত্তি। মোক্ষমূলর তাঁহার 'সাইকোলজিক্যাল রিলিজন' নামক গ্রন্থে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা বিদেশীয়জাতির অধীন হওয়াতে তাঁহাদের (হিন্দুদের) আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরে জীবনসংগঠন করিবার প্রণালী, আকস্মিক বাহ্য-শক্তির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, হিংসাবিমুখতাই হিন্দুদিগের রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ।

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার একখানি রাজনৈতিক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অনেক সময় এক রাজ্যের সহিত আর এক রাজ্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইত ; সুতরাং জাতিসাধারণ রাজনৈতিক একতা জন্মিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন, বহুসংখ্যক জাতি ও বহুসংখ্যক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া দেশবাসিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহাদের রাজনৈতিক অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। জাতিভেদ ও

সম্প্রদায়ভেদ যে, আমাদের জাতীয় অনৈক্যের প্রধান কারণ, ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের বিষয়ে রাজার একটি কথা

পাদ্রি সাহেবদিগের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহাদিগকে রাজা অনুষঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের বিষয়ে বলিতেছেন ;—"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস শাকাদিভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু, সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য, অধিকার, উচ্চপদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে।"

তৎপরে, ষড়্‌দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি পাদ্রি সাহেব যে সকল দোষারোপ করেন. রাজা তাহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন

পরমেশ্বর ও মায়ার সমান প্রাধান্য কি না ?

বেদান্তদর্শনের প্রতি পাদ্রি সাহেব এই দোষারোপ করেন যে, উহাতে পরমেশ্বর ও মায়ার সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। রাজা এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, মায়া ঈশ্বরের শক্তি। কি খ্রীষ্টিয়ান, কি মুসলমান, কি বৈদান্তিক, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি হউন না কেন, যিনি পরমেশ্বরকে অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার স্বরূপলক্ষণ সকলও অনাদি। অনাদি পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি মায়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং বেদান্ত ইহাকে অনাদি বলিতেছেন। বেদান্তশাস্ত্র বলিতেছেন যে, মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা পরমেশ্বরের শক্তি। মায়ার কার্য্যদ্বারা মায়াকে জানা যায়। যেমন, অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; দাহিকাশক্তির কার্য্যদ্বারাই উহা জানা যায়। সেইরূপ, পরমেশ্বর হইতে মায়াশক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; মায়ার কার্য্যদ্বারাই উহাকে জানা যায়। যদি পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণসকলকে, অনাদি বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা কেবল বেদান্তের দোষ নহে, প্রচলিত সকল ধর্ম্মই ঐ দোষে দোষী। ইহা ভিন্ন বেদান্তদর্শনে, কি অন্য মতে, গুণ অপেক্ষা গুণাধার পদার্থের শ্রেষ্ঠতা সকলেই স্বীকার করেন। বেদান্তদর্শন, ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ের সমান প্রাধান্য কখনই স্বীকার করেন না। মায়া, পরমাত্মার উপরে কার্য্য করে, রামমোহন রায় একথা স্বীকার করেন নাই। মায়া তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই ক্রিয়া। তিনি যেমন তাঁহার দয়াগুণে জীবের কল্যাণ করেন, সেইরূপ, তাঁহার শক্তি বা মায়াদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন।

ব্রহ্ম ও জীব যখন এক, তখন জীব একাকী কেন কর্ম্মফল ভোগ করে ?

বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধে পাদ্রিসাহেব এই দ্বিতীয় আপত্তি করেন যে, বেদান্তমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। বেদান্তে অদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। জীব এবং ব্রহ্ম যখন এক, তখন একা জীব কেন কর্ম্মফল ভোগ করিবে? পরমাত্মার কর্ম্মফল ভোগ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। রামমোহন রায় ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সার-মর্ম্ম এই ;—যেমন, অনেকগুলি সরাতে জল রাখিলে, এক সূর্য্যের অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ, চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা জড়স্বরূপ নানা প্রপঞ্চে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

সরার জল কম্পিত হইলে প্রতিবিম্ব কম্পিত বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু জলের কম্পনে সূর্য্য কম্পিত হন না; সেইপ্রকার, জীব সকল, চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া জীবের হিতাহিত বোধ পরমেশ্বরকে স্পর্শ করেন না। জলের নির্ম্মলতা বশতঃ কোন কোন প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয়, ও জলের মলিনতা জন্য কোন কোন প্রতিবিম্ব মলিন হয়। সেইরূপ প্রপঞ্চময় শরীরে ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তির দ্বারা কোন কোন জীবের স্ফূর্ত্তির আধিক্য হয়; আর ইন্দ্রিয়াদির মলিনতা জন্য কোন কোন জীবের স্ফূর্ত্তির হানি হয়।

জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, এ কথার অর্থ কি ?

মায়া কি? মায়ার অর্থ কি? এ বিষয়ে রাজা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, মায়া মুখ্যরূপে পরমেশ্বরের জগৎকারণশক্তি। গৌণরূপে মায়া ঐ শক্তির কার্য্য; অর্থাৎ জগৎ। এই জগৎ ভ্রান্তিমাত্র। এ কথার অর্থ কি? বেদান্তদর্শন দুটি দৃষ্টান্ত দিয়া জগৎকে ভ্রম বলিয়া বুঝাইতেছেন। প্রথম, রজ্জুতে সর্পভ্রম। দ্বিতীয়, স্বপ্ন। প্রথম দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, ভ্রমাত্মক সর্পের ন্যায়, জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যেমন রজ্জু ভিন্ন, ভ্রমাত্মক সর্পের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; ঐ সর্পভ্রম রজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হয়, সেইরূপ, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই এই জগতের সত্তার জ্ঞান সম্ভব হইতেছে। জগৎকে স্বপ্ন বলার তাৎপর্য্য কি? স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল, যেমন জীবের সত্তার অধীন। সেইরূপ, এই জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন। জগৎ অসত্য, এ কথার অর্থ কি? কেবল এক পরমেশ্বরেরই যথার্থ সত্তা, পারমার্থিক সত্তা। সকল পদার্থই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্। ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন সকলই অসত্য।

ন্যায়দর্শন

পরমেশ্বরের ইচ্ছা নিত্য, তবে পৃথক্ পৃথক্ কালে কেমন করিয়া পদার্থ সকল উৎপন্ন হয় ?

পাদ্রি সাহেব ন্যায়দর্শনের বিরুদ্ধে এই এক আপত্তি উপস্থিত করেন যে, ন্যায়-শাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর নিত্য ইচ্ছাবিশিষ্ট। কিন্তু জগতের পদার্থ সকল পৃথক্ পৃথক্ কালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর কালাতীত। পদার্থ সকল কালাধীন। যে কালে যে বস্তুর উৎপত্তি, সেইকালে সেই বস্তু, পরমেশ্বরের নিত্য ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার নিত্যতা বিষয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ যে পদার্থ যখনই কেন উৎপন্ন হউক না, তাহার উৎপত্তি পরমেশ্বরের অনাদিঅনন্তকালস্থায়ী ইচ্ছা হইতেই হয়।

আকাশ ও কালাদি কেমন করিয়া পরমেশ্বরের ন্যায় নিত্য হইতে পারে ?

ন্যায়শাস্ত্রানুসারে দিক্, কাল, আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য। পাদ্রি সাহেব এ মতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, পরমেশ্বর ভিন্ন, আর কেহ নিত্য হইতে পারে না।

রামমোহন রায় এ আপত্তির এইরূপ উত্তর করিতেছেন। প্রথম, দিক্, কাল, আকাশ নাই, অথচ কোন পদার্থ আছে, ইহা মনে ভাবিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়, দিক্, কাল, আকাশের অভাব স্বীকার করিলে, কোন বস্তুরই প্রমাণ হইতে পারে না। তৃতীয়, নিত্যত্ব

ঈশ্বরেও যেমন, কালেও সেইরূপ। চতুর্থ, নিত্যত্ব জ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ। রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ঈশ্বরকে খ্রীষ্টিয়ানেরা ও নৈয়ায়িকেরা উভয়েই নিত্য বলেন ; অর্থাৎ তিনি সমুদায় কাল ব্যাপিয়া আছেন। যদি কাল নিত্য না হয়, ঈশ্বর নিত্য হইতে পারেন না। নিত্য শব্দের অর্থ এই যে, যাহার আদি নাই ও অন্ত নাই। ঈশ্বর এবং কাল উভয়ের পক্ষেই এই অর্থ। ঈশ্বরের নিত্যত্বজ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ।

পরমাণু সম্বন্ধে রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—ক্রিয়া ও গুণের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধকে সমবায় বলে। সেই সম্বন্ধে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরে জগৎকর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কর্ত্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। ইহা সকল মতসিদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই জগতের অতি সূক্ষ্মতম, অবয়ব, ইহার সমবায়ী কারণ। তাহার নাশ অসম্ভব। পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মতম ভাগকে পরমাণু বলে। অবয়বরহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভাবকে জগতের বা পরমাণুর সমবায়ী কারণ বলা যাইতে পারে না। অতএব, পরমাণু জন্য হইতে পারে না। পরমাণু সকল, ঈশ্বরেচ্ছায়, পৃথক্ পৃথক্ দেশে, পৃথক্ পৃথক্ কালে, পৃথক্ পৃথক্ আকারে, একত্র হইয়া নানা সৃষ্টি হইতেছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ত্তা, দ্রব্যসংযোগে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। সকল মতেই পরমেশ্বরকে জ্ঞানময় জগৎকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়। অতএব, পরমাণু কাল ও আকাশের সহযোগে তাঁহার সৃষ্টি কার্য্য চলিতেছে।

জীবের ন্যায় জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর, কার্য্য করেন বলিলে, ঈশ্বর ও জীব, বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর হয় কি না ?

পাদ্রিসাহেব ন্যায়শাস্ত্রের মতে আর একটি এই দোষ দিয়াছিলেন যে, জীব যেমন জড়ের সাহায্যে দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতেছে, সেইরূপ, যদি এমন বলা হয়, পরমেশ্বরও জড়ের সাহায্যে সৃষ্টিকার্য্য করিতেছেন, তাহা হইলে পরমেশ্বর ও জীব উভয়কেই ঈশ্বর বলিতে হয় ; কেননা উভয়ের কার্য্যই এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, একজন বড় ঈশ্বর, আর একজন ছোট ঈশ্বর।

রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না। কেননা পরমেশ্বর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ; এবং তিনি স্বতন্ত্র কর্ত্তা। জীবের কর্ত্তৃত্ব কিঞ্চিৎমাত্র, তাহাও আবার ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেই ঈশ্বরত্ব হয় না। "মিসনরি মহাশয়েরা এবং আমরা, ঈশ্বরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট, দয়া-বিশিষ্ট কহি। জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাবিশিষ্ট কহিয়া থাকি ; ইহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে, কি মিসনরি মহাশয়েরা কি আমরা, কেহ বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার করি না।"

পরমাণুবাদ ও মায়াবাদের সমন্বয় কি ?

এস্থলে পাঠকদের মনে একটি সংশয়ের উদয় হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসম্মত মায়াবাদ স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ তিনি ন্যায়শাস্ত্রের জগৎসমবায়িকারণ সূক্ষ্মপরমাণু উড়াইয়া দিতেছেন না। এই উভয় মতের কিরূপ সমন্বয় হইতে পারে ? বেদান্তমতে সকলই মায়ার কার্য্য ; রজ্জুতে সর্পভ্রম তুল্য। আর, ন্যায়শাস্ত্রানুসারে পরমাণু প্রভৃতি অনাদি। এই উভয় মতের সামঞ্জস্য

কোথায়? রাজা যেরূপে বেদান্তমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই আপাতপ্রতীয়মান্ বিপরীত মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য সহজেই বুঝা যায়।

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িকশিরোমণিগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, আকাশ, দিক্, কাল প্রভৃতির ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা নাই। সুতরাং বেদান্তানুসারে ঈশ্বরের নিত্যত্ব ও বিভুত্ব এবং জগতের অনিত্যতা ও মূর্ত্তত্ব, এই দুয়ের সম্বন্ধদ্বারা দিক্ কাল প্রভৃতির সত্তা সম্ভব হইতেছে। পরমাণু সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করিতে হইবে। জগতের সমবায়িকারণ সূক্ষ্মতম পরমাণু, বেদান্তমতে মায়াশক্তি বলিয়া অভিহিত। সুতরাং স্থির হইল যে, জগতের সমবায়িকারণ পরমাণুও ঈশ্বরাতিরিক্ত নহে।

মীমাংসাদর্শন

কর্ম্মফল কেমন করিয়া ঈশ্বর হইতে পারে ?

পাদ্রিসাহেব মীমাংসামতে এই দোষ দিতেছেন যে, মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে সংস্কৃত-শব্দরচিতমন্ত্র, এবং নানাবিধ দ্রব্যসহযোগে সেই মন্ত্রাত্মক যজ্ঞ হইতে যে আশ্চর্য্যরূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যের মধ্যে নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্র। ভাষা ও দ্রব্য মনুষ্যের অধীন। তাহার অধীন কর্ম্মফল। সেই কর্ম্মফলকে মীমাংসাশাস্ত্র কিরূপে ঈশ্বর বলেন? মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর কর্ম্মরূপী ও এক; কিন্তু কর্ম্ম নানা; সুতরাং যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর নানা হইয়া পড়েন। তবে মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের একত্ব কিরূপে রক্ষা পায়? বিশেষতঃ যে সকল দেশে সংস্কৃত শব্দে কর্ম্ম হয় না, সে সকল কি নিরীশ্বর দেশ?

রাজা রামমোহন রায় এই সকল আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, পাদ্রি সাহেবের পূর্ব্বাপর বাক্যের ঐক্য নাই। পাদ্রিসাহেব একবার বলিলেন যে, ঈশ্বর কর্ম্মফল, আবার বলিতেছেন যে, ঈশ্বর কর্ম্ম। এই দুই কথা পরস্পর মিলে না। যাহা হউক, পাদ্রি-সাহেবের আপত্তির উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, মীমাংসক দুই প্রকার। যাঁহারা কেবল কর্ম্ম পর্য্যন্ত মানেন, তাঁহারা এক প্রকার নাস্তিক। কিন্তু আর এক প্রকার মীমাংসক আছেন, যাঁহারা কর্ম্মফলভোগ এবং ঈশ্বর উভয়ই স্বীকার করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মীমাংসকেরা বলেন যে, যে মনুষ্য সৎকর্ম্ম করে, সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, যে মন্দ কর্ম্ম করে, সে মন্দ ফল ভোগ করে। পরমেশ্বর নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মানুসারে ফলবিধান করেন। এরূপ না মানিলে ঈশ্বরে বৈষম্যদোষ উপস্থিত হয়। যদি এমন বলা যায় যে, ঈশ্বর কাহাকেও আপনার আরাধনাতে ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া সুখ দেন, এবং কাহাকেও বা আপনার প্রতি উদাসীন করিয়া ও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া দুঃখ দেন, তাহা হইলে, ঈশ্বরেতে বৈষম্যদোষ উপস্থিত হয়।

খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে একটি বিশেষ মত আছে যে, পরমেশ্বর নিজ ইচ্ছায় কাহাকেও ধর্ম্মে মতি দিয়া অনন্ত মুক্তিসুখ দান করেন, এবং কাহাকেও বা পাপপথে মতি দিয়া পরিশেষে অনন্ত দুঃখ প্রদান করেন। এ মতে বৈষম্যদোষ হয়। সৎ ও অসৎ উভয়ই ঈশ্বরের সমান কার্য্য হইয়া যায়। সেন্ট পল এই মতে বিশ্বাস করিতেন। জন্ কল্‌ভিনের অনুগামিগণ এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। বোধ হয়, কল্‌ভিন্‌প্রচারিত মতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজা রামমোহন রায় পাদ্রিসাহেবের কথার উত্তর দিয়াছেন। রাজা দেখাইয়াছেন যে, এই সকল খ্রীষ্টিয়ান মত অপেক্ষা হিন্দুশাস্ত্রের কর্ম্মফলের মত শ্রেষ্ঠ।

মীমাংসামতে যে আপত্তি, পাতঞ্জলমতেও সেই আপত্তি খাটে কি না ?

পাদ্রিসাহেব পাতঞ্জলমত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উক্ত শাস্ত্রে যোগসাধন কর্ম্ম ; সুতরাং পাতঞ্জলমত, আর মীমাংসামত একই। মীমাংসামতে কর্ম্ম ; পাতঞ্জলমতে যোগ, অর্থাৎ যোগরূপ কর্ম্ম। সেইজন্য, পাদ্রিসাহেব পাতঞ্জলমতকে মীমাংসামতের অন্তর্গত বলিতেছেন। সুতরাং তাঁহার মতানুসারে, মীমাংসামতের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহা পাতঞ্জলমতেও অবশ্য খাটে।

রাজা রামমোহন রায় এই সকল কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, পাতঞ্জলমতে যোগ-সাধনদ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয়। উক্ত মতানুসারে, ঈশ্বর নির্দ্দোষ, অতীন্দ্রিয়, চৈতন্যস্বরূপ ও সর্ব্বাধ্যক্ষ। মীমাংসামতে কর্ম্মদ্বারা ভোগ হয়, পাতঞ্জল-মতে যোগসাধনদ্বারা মুক্তি। একটি সকাম কর্ম্মমার্গ, আর একটি ব্রহ্মযোগ বা অধ্যাত্ম-যোগমার্গ। সুতরাং পাতঞ্জলকে মীমাংসামতে ভুক্ত করা, কখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

সাংখ্যদর্শন

প্রকৃতি ও পুরুষমতে ব্রহ্মের একত্ব রক্ষিত হয় কি না ?

পাদ্রিসাহেব সাংখ্যমতে এই দোষ দেন যে, উক্ত মতে প্রকৃত ও পুরুষ চনকাদিলের ন্যায়। পুরুষেরই প্রাধান্য। তিনি অরূপী ব্রহ্ম ; সুতরাং এই মতে ঈশ্বরের একত্ব রক্ষিত হয় না। ইহাতে ঈশ্বরের দ্বৈতভাব। রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, অদৃশ্য ব্যাপক প্রকৃতি, কার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে, চৈতন্যের অধীন। অতএব চৈতন্যেরই প্রাধান্য। সুতরাং চৈতন্যই কেবল ব্রহ্ম। এ-বিষয়ে সাংখ্যমতেও দ্বৈতবাদ কি সাকারবাদ নাই। তবে, অনাত্মাপদার্থ সম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যে মতভেদ আছে। বেদান্তদর্শনানুসারে অনাত্মপদার্থের বাস্তব বা পারমার্থিক সত্তা নাই। উহা ঈশ্বরের মায়া। সাংখ্যমতানুসারে, অনাত্মপদার্থের বাস্তব সত্তা আছে ; উহাই প্রকৃতি।

পুরাণ ও তন্ত্র

পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সাকার উপাসনার উপদেশ আছে কেন ?

পাদ্রিসাহেব তন্ত্রাদি শাস্ত্রের এই দোষোল্লেখ করেন যে, (১) ঐ সকল শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের নানাবিধ রূপ ও ধাম স্বীকার করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় ; (২) গুরু-করণে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস আবশ্যক ; (৩) সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট, বিষয়-ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুরাণতন্ত্রাদির মতে, বিষয়ভোগী নানা ঈশ্বর। কিন্তু নামরূপবিশিষ্টের বিভুত্ব কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। পুরাণাদি শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর নামরূপবিশিষ্ট। প্রপঞ্চ চক্ষুঃদ্বারা জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাঁহার নামরূপ কি প্রকারে মানিতে পারি?

রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, পুরাণাদি শাস্ত্র, বেদান্তানুসারে ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় ও নিরাকার বলেন। তবে, যে সকল মন্দবুদ্ধি লোক নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে ধর্ম্মহীনতা এবং দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই

সকল কল্পিত দেবতাদিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ হইলে, এবং ধর্ম্মবিষয়ে যত্ন ও শাস্ত্রাভ্যাস করিলে, ক্রমে যথার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা থাকে।

"নির্ব্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ।

মাণ্ডূক্যভাষ্যধৃত বচন।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ।।

স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নিবচন।

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ।।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কিরূপ পুরাণ ও তন্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে ?

রামমোহন রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, ইহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য যে, তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই। সেইরূপ, মহাপুরাণ, পুরাণ, উপপুরাণ রামায়ণাদি গ্রন্থও অনেক। এই নিমিত্ত, শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে, এবং যাহার বচন মহাজনধৃত তাহাই প্রামাণ্য। নতুবা, পুরাণ ও তন্ত্রের নাম করিয়া কোন বচন বলিলেই উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে সকল পুরাণ ও তন্ত্রের টীকা নাই, ও যাহা সংগ্রহকারের ধৃত নহে, তাহা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন পুরাণ ও তন্ত্র, ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রদেশে চলিত আছে, অন্য প্রদেশের লোক তাহাকে কাল্পনিক বলেন। এক প্রদেশের মধ্যেই, কোন কোন পুরাণ বা তন্ত্রকে কতক লোক মান্য করেন, এবং কতক লোক আধুনিক জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করেন। অতএব, মান্য টীকাবিশিষ্ট কিংবা মহাজনধৃত বচনই গ্রাহ্য।

কোন্ শাস্ত্র মান্য, এবং কোন্ শাস্ত্র অমান্য, ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ, তাহা অপ্রমাণ।

যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ ।।

মনুঃ।

কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা উপনিষদ্, প্রাচীন স্মৃতি, এবং শিষ্টসংগৃহীত, পরম্পরাসিদ্ধ তন্ত্র, ইংরেজী ভাষায় এ সকলের অনুবাদ প্রায় করেন না। যে সকল শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ, শিষ্টের অসংগৃহীত, পরম্পরা অসিদ্ধ, তাহাই ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইয়োরোপীয়দিগের নিকট প্রকাশ করেন যে, হিন্দুধর্ম্ম অতি কদর্য্য।

পাদ্রিসাহেব পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের এই দোষোল্লেখ করেন যে, পুরাণ তন্ত্রাদিতে ঈশ্বরকে সাকার ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে ; তাঁহার স্ত্রী-পুত্র আছে ; তিনি বিষয়ভোগী। পুরাণ ও তন্ত্রানুসারে ঈশ্বরের বহুত্ব ও ইন্দ্রিয়ভোগ, স্বীকার করিতে হয়।

ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ পুরাণের ন্যায় বাইবেলেও আছে কি না ?

এই সকল কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় পাদ্রিসাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তাঁহারা মানবাকারবিশিষ্ট যীশুখ্রীষ্টকে, এবং কপোতাকারবিশিষ্ট হোলিগোষ্টকে

সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেন কি না? সাক্ষাৎ ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ স্বীকার করেন কি না? তাঁহার ক্রোধ, মনঃপীড়া এবং দুঃখ বেদনাদি হইত কি না? তিনি আহার করিতেন কি না? তিনি আপনার মাতা, ভ্রাতা ও কুটুম্বদিগের সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন কি না? তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছিল কি না? কপোতরূপ হোলিগোষ্ট, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না? তিনি স্ত্রীলোকের গর্ভে যীশুখ্রীষ্টকে সন্তানরূপে উৎপাদন করিয়াছেন কি না? যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে পুরাণের প্রতি যে সকল দোষ দিয়াছেন, তাহা বাইবেলের প্রতিও খাটে কি না? ঈশ্বর মূর্ত্তিবিশিষ্ট, তিনি বিষয়-ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র আছে, ঈশ্বরের বহুত্ব ইত্যাদি পুরাণের দোষ সকল বাইবেলের প্রতিও সংলগ্ন হয় কি না?

পাদ্রিসাহেবেরা যদি বলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সাকার প্রভৃতি হইতে পারেন, তাহা হইলে সে কথা সাকারবাদী হিন্দুরাও বলিতে পারেন

রামমোহন রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, পাদ্রিসাহেবেরা যদি বলেন যে, ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হয়, তাহা হইলে সাকারবাদী হিন্দুরাও সে কথা বলিতে পারেন। তাঁহারাও ঐ যুক্তিদ্বারা তাঁহাদের অবতার সকলের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিতে পারেন। বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্যই বলিয়াছেন ;—

রাজন্ শর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি ।।

অন্যের শর্ষপতুল্য দোষ লোকে দেখিয়া থাকে, কিন্তু আপনার বিল্বপরিমাণ দোষ দেখিয়াও দেখে না।

সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ, প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের, পুরাণের নহে

রামমোহন রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভৃতি পুরাণের যে সকল দোষের কথা পাদ্রিসাহেবেরা বলিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে, পুরাণের দোষ নহে, বাইবেলেরই দোষ। কেননা প্রথমতঃ পুরাণ বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকারত্ব ও ইন্দ্রিয়ভোগাদি যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা কাল্পনিক। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির চিত্তাবলম্বনের নিমিত্তে বলিয়াছি। মিসনরি মহাশয়েরা বলেন, বাইবেলে যে ঈশ্বরের সাকারত্ব ও ইন্দ্রিয়ভোগাদির বর্ণন আছে, উহা যথার্থ। অতএব ঐ সকল দোষ তাঁহাদের মতেই কেবল উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ ;—হিন্দুদের পুরাণতন্ত্রাদিশাস্ত্র সাক্ষাৎ বেদ নহে। বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে পুরাণাদির বচন গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু বাইবেল, মিসনরি মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ। অতএব, তাঁহাদের মতেই যথার্থ দোষ দেখা যাইতেছে।

লৌকিক গুরুকরণে ফল কি

পাদ্রিসাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যে গুরু, বস্তু অনুভব করেন নাই, তিনি সেই বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দিলে, তাহা কি প্রকারে শুভদায়ক হইতে পারে? লৌকিক গুরুকরণের কি ফল ?

রাজা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ;—"এ আশংকা হিন্দুর শাস্ত্রমতে উপস্থিত

হয় না। যেহেতু, শাস্ত্র কহেন, যে ব্যক্তির বস্তু অনুভূত আছে, তাহাকেই গুরু করিবেক ; অন্য প্রকার গুরুকরণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুণ্ডক শ্রুতি ;—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং

মুণ্ডক শ্রুতিঃ।

গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ।।

গুরুর লক্ষণ। শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ ইত্যাদি।

কৃষ্ণানন্দধৃত বচন।

কর্ম্মফলভোগ

কর্ম্মফলবিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের মত সকল পরস্পর বিরোধী কি না ?

পাদ্রিসাহেব হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে এই এক আপত্তি উপস্থিত করেন যে, কর্ম্ম-ফলভোগ বিষয়ে বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রের মত পরস্পরবিরোধী। এক মতের সহিত অন্য মতের মিল নাই। কোন শাস্ত্রমতে, কর্ম্মবশতঃ জীব বারম্বার স্থাবরজঙ্গমশরীর প্রাপ্ত হয়। কোন মতে, এই দেহ ত্যাগ হইলে, অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয়। আবার কোন মতে, সম্পূর্ণ ভোগাভাব ; অর্থাৎ মৃত্যুতেই শেষ।

রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে, হিন্দুর কোন শাস্ত্রে ভোগাভাব বলেন না। উহা নাস্তিকের মত। তবে শাস্ত্রে ইহা বলেন বটে যে, কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয়। কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ, পরমেশ্বর মৃত্যুর পর স্বর্গ ও নরকে বিধান করিয়া থাকেন। কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ অন্য স্থাবর-জঙ্গমাদি শরীরে হইয়া থাকে। এই সকল মতে, শাস্ত্রসকলের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য দৃষ্ট হয় না।

তাহার পর, রামমোহন রায় প্রদর্শন করিতেছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানমতে, বাইবেল শাস্ত্রেও, পাপপুণ্যের নানা প্রকার ভোগের কথা লিখিত আছে। ঈশ্বর কাহার পাপ-পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই বিধান করেন। যেমন, য়ীহুদীদিগকে তাহাদের পাপপুণ্যের ফল, বারম্বার ইহলোকেই প্রদান করিয়াছেন। যীশুখ্রীষ্ট আপনি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে দান করে, সে ইহলোকেই তাহার কর্ম্মফল ভোগ করে।*

বাইবেলে ইহাও লিখিত আছে যে, মৃত্যুর পরে পরলোকে শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে। কর্ম্মফলভোগের এরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা লিখিত থাকাতে, বাইবেলশাস্ত্রের অনৈক্য দোষ হয় নাই। যেহেতু, পরমেশ্বর ফলদাতা। কাহাকে এই লোকেই ফল দেন, কাহাকেও বা পরলোক ফল দেন। খ্রীষ্টিয়ানেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, এ দেহ নাশ হইলে, পাপপুণ্যের ফলদানের সময়, ঈশ্বর জীবকে এক নূতন শরীর দিয়া, সেই শরীরবিশিষ্ট জীবকে সুখ অথবা দুঃখরূপ কর্ম্মফল প্রদান করিবেন। যদি খ্রীষ্টিয়ানেরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, জীবের দেহ নষ্ট হইলে, পরমেশ্বর তাহাকে এক নূতন দেহ দিয়া তাহার কর্ম্মফলভোগের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা হইলে, তাঁহারা হিন্দুমত অসম্ভব জ্ঞান করেন কেন? যদি সৃষ্টিপ্রণালী হইতে ভিন্ন প্রকারে, জীবকে শরীর দিয়া,

---

* মথি ২য় অধ্যায়, দুই বচন।

পরমেশ্বর কর্ম্মফল ভোগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে, সৃষ্টির পরম্পরা-নির্ব্বন্ধানুসারে, জীবকে দেহ দিয়া ইহলোকেই কর্ম্মফলভোগ বিধান করেন, ইহা কেন অসম্ভব হইবে?

শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য দেশবাসীগণের কর্ম্মফলভোগ আছে কি না?

পাদ্রিসাহেব বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ভারতবর্ষবাসী ভিন্ন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীগণকে কর্ম্মফলভোগ করিতে হয় না। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, এরূপ মত হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও নাই। ভারতবর্ষবাসী ভিন্ন, অন্য দেশবাসীগণের কর্ম্ম নাই, ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু সে স্থলে কর্ম্ম শব্দের অর্থ, বেদোক্ত কর্ম্ম; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধও বটে।

তৎপরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসকলের মধ্যে পরস্পর সমন্বয় আছে। দর্শনশাস্ত্রসকলের মধ্যেও মূল বিষয়ে অনৈক্য নাই। সমুদয় দর্শন বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর এক, অতীন্দ্রিয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে, দর্শনকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। পদার্থতত্ত্ব বিষয়ে, বেদের তাৎপর্য্য যিনি যে প্রকার বুঝিয়াছেন, তিনি তদনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেইরূপ, বাইবেলের টীকাকারদিগের মধ্যেও মতভেদ আছে। ইহাতে বাইবেলের দোষ অথবা টীকাকারদিগের মহিমার লঘুতা হয় না।

পাদ্রিসাহেবদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন

তৎপরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পাদ্রিমহাশয়েরা হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল দোষ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলাম। কলিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাদ্রিমহাশয়েরা আছেন, তাঁহাদের পশ্চাল্লিখিত মতগুলি, কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহারা তাহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন।

১ম। তাঁহারা যীশুখৃীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলেন, এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরও বলেন; কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন?

২য়। তাঁহারা কখন কখন যীশুখৃীষ্টকে মনুষ্যের পুত্র বলেন, অথচ বলেন যে, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। এই বিপরীত কথার তাৎপর্য্য কি?

৩য়। তাঁহারা ঈশ্বরকে এক বলেন, অথচ বলেন, পিতাঈশ্বর, পুত্রঈশ্বর, হোলিগোষ্ট-ঈশ্বর, ইহার তাৎপর্য্য কি?

৪র্থ। তাঁহারা বলেন যে, পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা অর্থাৎ আত্মারূপে তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। তবে তাঁহারা জড়শরীরবিশিষ্ট যীশুখৃীষ্টকে, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরবোধে আরাধনা করেন কেন?

৫ম। তাঁহারা বলেন, যীশুখৃীষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, অথচ বলেন, তিনি পিতার তুল্য। পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে, তুল্যতা সম্ভব হয় না। তবে কেন বলেন যে, যীশুখৃীষ্ট পিতার তুল্য?

কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পাদ্রিসাহেব বলেন যে, বাইবেলে কোন স্থানে লেখা নাই যে, পুত্র যীশুখৃীষ্ট সাক্ষাৎ পিতাঈশ্বর। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, খৃীষ্টিয়ানধর্ম্মের উপদেশকর্ত্তারা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর এক,

যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁহাদের এই উক্তির দ্বারা আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের ইহাই অভিপ্রায় যে, পুত্র যীশুখ্রীষ্ট সাক্ষাৎ পিতা। সুতরাং জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারেন? যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, দেবদত্ত এক, আর যজ্ঞদত্ত তাঁহার পুত্র। তাহার পর তিনি পুনরায় বলেন যে, যজ্ঞদত্ত সাক্ষাৎ দেবদত্ত, তাহা হইলে আমরা ইহাই বুঝিব যে, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, পুত্র সাক্ষাৎ পিতা। তখন অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারে?

তৎপরে রামমোহন রায়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলিতেছেন যে, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান পাদ্রিদের মধ্যে গণ্য হইয়া আপনি বলিতেছেন যে, পুত্র যীশুখ্রীষ্ট যে পিতা-ঈশ্বর, বাইবেলে কোন স্থানে এ কথা লেখেন না ; বরং বাইবেলে এমন কথা আছে যে, পুত্র যীশুখ্রীষ্ট স্বভাবে ও স্বরূপে পিতার তুল্য এবং তিনি পিতা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। আপনি বলিতেছেন যে, যদি মনুষ্যের পুত্র তাহার পিতার ন্যায় মনুষ্যস্বভাববিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাক্ষস বলা যাইতে পারে। আমি আপনার অপেক্ষা বাইবেলের অর্থ অধিক বুঝি, এ কথা বলিলে অতিশয় স্পর্দ্ধা করা হয়। আপনি বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের পুত্র যেমন মনুষ্য, সেইরূপ ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর। এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিতাম ; কিন্তু উহা স্বীকার করিতে হইলে, আপনাদের আর একটি উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। সে উপদেশটি এই যে, পুত্র যীশুখ্রীষ্ট পিতার সহিত সমকাল-স্থায়ী। যেমন, মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য, সেইরূপ, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর, একথা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই তুলনাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুত্র কখনও পিতার সহিত সমকালস্থায়ী হইতে পারে না। যদি কোন মনুষ্যের পুত্র সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাহার পিতা যত দিন আছেন, সেও ততদিন বর্ত্তমান, তাহা হইলে, সেই পুত্রকে রাক্ষস হইতেও কোন অধিক অদ্ভুত জীব বলিতে হয়!

ঈশ্বর সংজ্ঞাশব্দ, কি জাতিবাচক শব্দ ?

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে কোন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র প্রদান করেন, তখন তাঁহাদের ভাষার নিয়মিত অর্থানুসারেই আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অতএব, আমি বিনীতভাবে একটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা করিতেছি। মিসনরী মহাশয়েরা "ঈশ্বর" এই শব্দটিকে সংজ্ঞাশব্দ বলেন, কি জাতিবাচক শব্দ বলেন, ইহা জানিতে চাই। যেহেতু, গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন, সমুদয় শব্দ দুই প্রকার। কতক্ জাতিবাচক শব্দ ও কতক্ সংজ্ঞা শব্দ। যদি বলেন যে, 'ঈশ্বর' এই পদ সংজ্ঞা শব্দ, তাহা হইলে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি যে, দেবদত্তের কিম্বা যজ্ঞদত্তের পুত্র, সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিম্বা যজ্ঞদত্ত ; অথবা দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সমকালস্থায়ী? আর যদি বলেন যে 'ঈশ্বর' এই রূপ জাতিবাচক, তাহা হইলে, যেমন মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য, সেইরূপ, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর, এরূপ বলিতে পারেন। কিন্তু তাহা বলিলে পাদ্রিমহাশয়ের আর একটি মত পরিত্যাগ করিতে হয় যে, পুত্র ও পিতা উভয়ে সমকালস্থায়ী। যেহেতু, পুত্রের সত্তা অবশ্য পিতার সত্তার পরকালীন হইয়া থাকে।

ঈশ্বর ও মনুষ্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ যে, মনুষ্য বলিলে অনেক ব্যক্তি বুঝায়, আর ঈশ্বর বলিলে খ্রীষ্টিয়ান মিসনরীদের মতে তিন ব্যক্তি বুঝাইয়া থাকে। ঐ তিন ব্যক্তির শক্তি ও সত্ত্বস্বভাব মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু

কোন এক জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ যদি সংখ্যাতে অল্প হন, এবং শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হন, তাহা হইলে জাতি-গণনার মধ্যে অবশ্যই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি জগতের বিচিত্র রচনার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, পাঠীন মৎস্যের গর্ভে যত ডিম্ব হয়, সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে মনুষ্যের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অল্প। কিন্তু মনুষ্য ক্ষমতাতে পাঠীন মৎস্য অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মনুষ্যশব্দ জাতিবাচকরূপে ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি সকলে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু তাহাদের সকলেরই মধ্যে এক মনুষ্যস্বভাব বর্ত্তমান। সেইরূপ, মনুষ্যজাতির ন্যায় ঈশ্বরজাতির অন্তর্গত, তিন ব্যক্তি। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ হইলেও ঈশ্বরস্বভাব তাঁহাদের তিন জনের মধ্যেই বর্ত্তমান; অর্থাৎ পিতাঈশ্বর, পুত্রঈশ্বর ও হোলিগোষ্ট-ঈশ্বর। পাদ্রিসাহেবেরা ঈশ্বরকে কি এইরূপে এক বলিয়া থাকেন? এরূপ যাঁহাদের মত, তাঁহারা কিরূপে সাকারবাদী হিন্দুকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া দোষ দেন ও উপহাস করেন? হিন্দুরা অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর তিন অপেক্ষা অধিক হইলেও, ঈশ্বরত্ব বিষয়ে সকলেই এক।

পাদ্রিসাহেব বলিতেছেন যে, যেমন দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ,—দেহ ও জীবনের সম্বন্ধ, আমরা বুঝি না;—বৃক্ষলতাদি মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কেমন করিয়া হয়, তাহা আমরা বুঝি না; সেইরূপ, পিতা, পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই তিন এক। একে তিন কেমন করিয়া হয়, তাহা বুঝি না; কিন্তু বিশ্বাস করি। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, বুদ্ধির অতীত অথচ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় অবশ্য মানিতে হয়। কিন্তু খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় নহে, সুতরাং উহা বিশ্বাস করিতে পারি না। রামমোহন রায় স্থানান্তরে এই যুক্তির উত্তরে বলিয়াছেন যে, হিন্দুরাও পুরাণে বর্ণিত অদ্ভুত, অলৌকিক ও অসম্ভব ব্যাপার সকল ঐ কথা বলিয়া সমর্থন করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যেমন দেহ ও আত্মা এবং দেহ ও জীবনের সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না; যেমন বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বুঝিতে পারি না, সেইরূপ, পুরাণবর্ণিত অলৌকিক বিষয় সকলও বুঝিতে পারি না, কিন্তু বিশ্বাস করি। যে যুক্তিদ্বারা পাদ্রিসাহেব, খ্রীষ্টিয়ানমত সমর্থন করিতেছেন, সেই যুক্তিদ্বারা পৌরাণিক হিন্দু তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারেন।

উপমিতিমূলকযুক্তি ও খ্রীষ্টধর্ম্ম

সুপ্রসিদ্ধ বিসপ্ বাট্লার উপমিতিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া বাইবেলবর্ণিত অসম্ভব ও অযুক্ত বিষয় সকলকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ, বাইবেলবর্ণিত যে সকল বিষয়ে লোকে দোষ দিয়া থাকে, তিনি তদনুরূপ বিষয় জগৎ বা প্রকৃতির মধ্যে প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, প্রকৃতির মধ্যে যাহা রহিয়াছে, তাহার অনুরূপ বিষয় বাইবেলে থাকিলে তাহা অবিশ্বাস্য হইবে কেন? প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা কিছুই বুঝি না। সুতরাং বাইবেলবর্ণিত কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে, তাহা অগ্রাহ্য করিব কেন? বাইবেলবর্ণিত কোন বিষয় অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু যদি দেখি যে, প্রকৃতির মধ্যে তদনুরূপ ঘটনা রহিয়াছে, তাহা হইলে বাইবেলবর্ণিত বিষয় অন্যায় বলিয়া অস্বীকার করিব কেন? বাইবেলে কোন স্থানে আছে যে, পরমেশ্বর বহুসংখ্যক নরনারী ও শিশুহত্যার আদেশ করিতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরোধী কোন ব্যক্তি এ স্থলে দোষপ্রদর্শন করিলে,

খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষসমর্থনকারীরা বলিবেন যে, ঝটিকা, ভূমিকম্প, মহামারি, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা সকলে কত নরনারী ও শিশুর প্রাণবিনাশ হয়। পরমেশ্বর প্রকৃতির মধ্যে যখন এরূপ ভীষণকাণ্ড উপস্থিত করিতেছেন, তখন বাইবেল-বর্ণিত নরনারী ও শিশুহত্যায় কেমন করিয়া দোষ দেওয়া যায়?

রামমোহন রায় বট্‌লারের অবলম্বিত উপমিতিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, যে যুক্তিদ্বারা খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁহাদের শাস্ত্রের অযুক্ত মত সকল সমর্থন করেন, অবিকল সেইরূপ যুক্তিদ্বারা পৌরাণিক হিন্দুরাও তাঁহাদের অযুক্ত মত সকল সমর্থন করিতে পারেন।

নিবাস, ক্রিয়া ও সত্তা পৃথক্ হইলেও তিন ব্যক্তি এক হইতে পারে কি না ?

রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—পিতাঈশ্বর, পুত্রঈশ্বর, হোলিগোষ্টঈশ্বর। এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ নিবাস, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তার কথা বলিয়া পাদ্রিসাহেব বলিতেছেন যে, তাঁহারা এক। পাদ্রিসাহেব ইচ্ছা করেন যে, অন্য সকলেও তাঁহাদের ন্যায় বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা এক।

তিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা পদার্থকে, এক মনে করা, ক্ষণমাত্রও সম্ভব হইতে পারে না। সেই তিনের এক ব্যক্তি, (পিতাপরমেশ্বর) স্বর্গে থাকিয়া, দ্বিতীয় ব্যক্তির (পুত্রযীশুখ্রীষ্ট) প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতেছেন। আর সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্ম্মযাজন করিতেছেন। আবার তৃতীয় ব্যক্তি (হোলিগোষ্ট) স্বর্গ মর্ত্ত্য এই দুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অভিপ্রায়ানুসারে, দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। যদি নিবাসের পার্থক্য, আধারের পার্থক্য, ক্রিয়ার পার্থক্য, ও কর্ম্মের পার্থক্য, বস্তু ও ব্যক্তি সকলের পৃথক্ ও ভিন্ন হইবার কারণ না হয়, তাহা হইলে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিবার কোন উপায় থাকিল না। বৃক্ষ ও পর্ব্বত, মনুষ্য ও পক্ষী যে, পরস্পর ভিন্ন, তাহার কিছু প্রমাণ রহিল না।

ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিপরীত কথা, ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রে থাকিতে পারে কি না ?

পাদ্রিসাহেব যে উপদেশকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলেন, ইহাই কি সেই উপদেশ? আমাদের উপকার ও কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য পরমেশ্বর আমাদিগকে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। যদি কোন পুস্তকে এমন উপদেশ থাকে, যাহা বিশ্বাস করিতে হইলে, আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে, সেই পুস্তক পরমেশ্বরপ্রণীত? যে মনুষ্যের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় আছে, এবং যে ব্যক্তি বাল্যাভ্যাস-জনিত ভ্রমে পতিত হয় নাই, সে ব্যক্তি, কোন প্রকার বাক্‌প্রণালীদ্বারা প্রতারিত হইয়া, বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত বিষয় বিশ্বাস করিতে পারে না।

পাদ্রিসাহেব লেখেন যে, পুত্রঈশ্বর, কিঞ্চিৎকালের জন্য আপনার মহিমা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ভৃত্যের আকার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং পিতাঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই মহিমা পুনর্ব্বার প্রদান করেন। পরমেশ্বর আপনার স্বভাবকে কিঞ্চিৎ কালের জন্য ত্যাগ করিলেন, ও পুনর্ব্বার তাহা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, ইহা কি অপরিবর্ত্তনীয়স্বরূপ, অবস্থান্তররহিত পরমেশ্বরের কার্য্য? রামমোহন রায় বলিতেছেন, যদি পাদ্রিসাহেব প্রমাণ করিতে পারেন যে, তাঁহাদের অনেক ঈশ্বরের মত অপেক্ষা, হিন্দুদিগের বহু ঈশ্বরের মত অযুক্তিসিদ্ধ, তাহা হইলে, তিনি পাদ্রিসাহেবের নিকট উপকৃত বলিয়া স্বীকার করিবেন। কিন্তু যদি প্রমাণ করিতে না পারেন, তাহা

হইলে, পাদ্রিসাহেব হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপনার ধর্ম্ম সংস্থাপনের চেষ্টা আর করিবেন না। কেননা, খ্রীষ্টিয়ানেরা ও হিন্দুরা উভয়েই বহু ঈশ্বরবাদ স্থাপনের জন্য ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভাব ও শক্তিকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছেন। অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান ও হিন্দু উভয়েই বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের যখন অচিন্ত্য ভাব ও শক্তি, তখন তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। ইত্যাদি।

ঈশ্বর যদি কপোতাকার হইতে পারেন, তবে মৎস্য ও গরুড়রূপ হইতে পারিবেন না কেন ?

পাদ্রিসাহেব বলেন যে, হোলিগোষ্ট, যীশুর উপদেশার্থে নিযুক্ত হওয়াতে, স্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্ত, কপোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি এ কথার এই যুক্তি দেন যে, যদি ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই কোন আকার গ্রহণ করিতে হয়। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড়বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পাদ্রিসাহেবেরা তাঁহাদিগকে উপহাস করেন। এ উপহাসের কারণ কি? মৎস্য কি কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে? গরুড় কি পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আসে না ?

যদি আত্মারূপে ঈশ্বরোপাসনা উচিত হয়, তাহা হইলে শরীরধারী যীশুর উপাসনা কেমন করিয়া হইতে পারে ?

রামমোহন রায় চতুর্থ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টিয়ানেরা বলেন যে, পরমেশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে অর্থাৎ আত্মারূপে আরাধনা করিবে, তবে তাঁহারা যীশুখ্রীষ্টকে প্রপঞ্চাত্মক শরীরে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন কেন ? ইহার উত্তরে পাদ্রিসাহেব বলেন যে, খ্রীষ্টিয়ানেরা যীশুখ্রীষ্টকে উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার শরীরকে আরাধনা করেন না। রামমোহন রায় ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন যে, পাদ্রিসাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, যীশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মকশরীরে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। এ কথা স্বীকার করিয়াও আবার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে খ্রীষ্টিয়ানেরা অপ্রপঞ্চভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। যদি পাদ্রিসাহেব বলেন যে দেহবিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা করিলেই অপ্রপঞ্চভাবে উপাসনা করা হয়, তাহা হইলে তিনি কোন ব্যক্তিকেই সাকারউপাসক বলিয়া অপবাদ দিতে পারিবেন না। কেননা ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তিই চৈতন্যরহিত দেহকে উপাসনা করে না। গ্রীকেরা ও রোমানেরা যুপিটর, যোনা প্রভৃতি দেবতাদের চৈতন্যরহিত শরীরের কি আরাধনা করিতেন? ঐ সকল দেবতার যে সকল লীলা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে, গ্রীকেরা ও রোমানেরা ঐ সকল দেবতার দেহবিশিষ্ট চৈতন্যকে মানিতেন? হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহারা কি নিজ নিজ উপাস্য দেবতার চৈতন্যরহিত দেহের উপাসনা করেন? কদাপি নহে। তাঁহারা যে সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, সেই সকল মূর্ত্তিকে তাঁহারা কদাপি আরাধ্য বলিয়া মনে করেন না। যতক্ষণ না সেই সকল মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, উহাতে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহারা উহার পূজা করেন না। অতএব পাদ্রিসাহেবের কথানুসারে কাহাকেও সাকারউপাসক বলা যাইতে পারে না। কেননা, চৈতন্য-

রহিত মূর্ত্তির উপাসনা কেহই করেন না। বাস্তবিক কথা এই যে, মানসমূর্ত্তি বা হস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা করা হয়।

এক অনন্ত ঈশ্বর কি যথেষ্ট নহে ?

পাদ্রিসাহেব বলেন যে; বাইবেলে আছে যে, পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই তিনে তুল্যরূপে মনুষ্যদিগকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন। তাঁহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন ও তাঁহাদের ধর্ম্মপথে প্রবৃত্তি দেন। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অনন্তস্নেহ, অত্যন্ত দয়ালু ব্যতীত এ সকল কার্য্য কেহ করিতে পারেন না। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে. তিনি ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট, অন্য কোনরূপ বহুঈশ্বরবাদ কখনও শুনেন নাই। তিন পৃথক্ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্তদয়াবিশিষ্ট বলা হইতেছে। সুতরাং এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এক ব্যক্তির সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তি ও অনন্ত দয়ার দ্বারা কি এই জগতের বিচিত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে না? যদি বলেন যে, এক সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হইতে পারে, তাহা হইলে, জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ স্বীকার করার প্রয়োজন কি? একজন সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কি যথেষ্ট নহেন? যদি বলেন যে, একজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরদ্বারা সৃষ্টিস্থিতি হইতে পারে না, তাহা হইলে, তিন ঈশ্বরেতে কেন বদ্ধ থাকিব? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত ব্রহ্মাণ্ড, ততজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কেন স্বীকার করিব না? তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাগে, এক এক ব্রহ্মাণ্ডকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না কেন?

ইয়োরোপীয়েরা রাজকার্য্যে ও শিল্পশাস্ত্রে যেরূপ বিচক্ষণতা প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়া অন্য দেশীয় লোক প্রথমে অনুমান করেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মও সেইরূপ উত্তম ও যুক্তিসিদ্ধ হইবে। কিন্তু যখনই তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মমতের বিষয় জ্ঞাত হন, তখন তাঁহাদের এই নিশ্চয় বোধ জন্মে যে, রাজ্যঘটিত উন্নতির সহিত যথার্থ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

রাজা রামমোহন রায় যে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের তিন ঈশ্বরের মতের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, ও অতি প্রবলভাবে উক্ত মতকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ, তাঁহার মুসলমান শাস্ত্রাধ্যয়ন। খ্রীষ্টিয়ানদিগের ত্রিত্ববাদকে আরবী ভাষায়, 'সেওল' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মুসলমানেরা উক্ত মতকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও বহু-দেববাদ বলিয়া মনে করেন। মুসলমান পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টীয় ত্রিত্বমতকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া থাকেন। অনেকেই বলেন যে, মুসলমানশাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা রামমোহন রায়ের মনে একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি এবং বহু দেবোপাসনার প্রতি অনাস্থা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য, তিনি একদিকে হিন্দু বহুদেবোপাসনা ও অপর দিকে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ, এ উভয়েরই বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন।

বাল্যশিক্ষা ও ধর্ম্মবিশ্বাস

সুসভ্য জগতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, এই একান্ত অযুক্তিসিদ্ধ ত্রিত্ববাদের মতে কেমন করিয়া বিশ্বাস করেন? রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, বাল্যশিক্ষাদ্বারা তিন ঈশ্বর এক, এই মতের প্রতি লোকের এমন পক্ষপাত হয় যে, উহার বিপরীত কথা শুনিলে ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও পরীক্ষার নিদর্শনকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত হন। খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিয়া থাকেন যে, নিজ মতাবলম্বীদের উপরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের অতিশয় প্রভুত্ব। কিন্তু

তাঁহাদের উপরে পাদ্রিসাহেবদিগের এতদূর ক্ষমতা যে ত্রিত্ববাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য পাদ্রি-সাহেবেরা যে সাদৃশ্য ও প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা তাহার দোষ দেখিতে পান না। রামমোহন রায় এমনও বলিয়াছেন যে, অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত, প্রাচীনকালের গ্রীক্ ও রোমান পণ্ডিতদের ন্যায়, সাধারণের মত অযথার্থ জানিয়াও লোকযাত্রানির্ব্বাহের জন্য উহাতেই সায় দিয়া থাকেন।

যীশু মনুষ্যের পুত্র, অথচ নয়, এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, যীশুখৃীষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র বলা হয়, এবং কখন বা বলা হয় যে, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিলেন না। ইহার তাৎপর্য্য কি? পাদ্রিসাহেব এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, যদিও কোন মনুষ্য যীশুর পিতা ছিলেন না, তথাচ তিনি আপনাকে মনুষ্যের পুত্র বলিয়া আপনার লঘুতা স্বীকার করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় এ কথার প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যীশুখৃীষ্ট আপনার লঘুতা স্বীকার করিবার জন্য এমন কথা বলিয়াছেন, যাহা বাস্তবিক নহে। যীশুর বাক্য বাস্তবিক নহে বলিয়া পাদ্রিসাহেবেরা দোষগ্রহণ করেন না ; অথচ হিন্দুপুরাণ সকলের এই অপবাদ দেন যে, পুরাণে মিথ্যা কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অল্পবুদ্ধি লোকের বোধাধিকার জন্য পুরাণে, রূপকভাবে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই সকল, কেবল অল্প-বুদ্ধি লোকের হিতের নিমিত্ত রচিত হইল। ইহাতে পুরাণশাস্ত্রে কিছুমাত্র দোষস্পর্শ হয় না।

"ঈশ্বরের দক্ষিণপার্শ্ব"—এ বাক্যের অর্থ কি ?

পাদ্রি সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে "ঈশ্বরের দক্ষিণপার্শ্ব" বাইবেল হইতে এই কথাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামমোহন রায় তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ঐ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ কি? ঐ বাক্যটিতে বাস্তবিক কি ঈশ্বরের দক্ষিণপার্শ্ব বুঝিতে হইবে, অথবা মনে করিতে হইবে যে, ঐ বাক্যটি রূপকভাবে লিখিত হইয়াছে? বাইবেলের প্রথম তিন অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাওয়া যায় ; "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন।" "ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন।" "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে, তুমি কোথায় রহিয়াছ?" "বিশ্রাম" এই শব্দের দ্বারা মূশা কি ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর শ্রমাধিক্যবশতঃ আপনার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন? এরূপ হইলে পরমেশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপে আঘাত পড়ে। "দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন" এই বাক্যদ্বারা মূশা কি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর উত্তাপের ভয়ে "দিবসের শীতল সময়ে" মনুষ্যের ন্যায় পদবিক্ষেপদ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছিলেন? "আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ?" এই প্রশ্নদ্বারা মূশা কি ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, আদম কোথায় আছেন, তাহা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর জানিতেন না ? এই সকল বাক্যের যদি ঐরূপ তাৎপর্য্যই হয়, তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, মূশার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালীন মূর্খ-দের পরমার্থজ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল।

রামমোহন রায়, তৎপরে বলিতেছেন যে, আমার বোধহয় যে, সেকালের অজ্ঞান য়ীহূদীদের বোধসুগমের জন্য মূশা পরমেশ্বরকে মানবীয়ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। "আমি

খ্রীষ্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টারা, যাঁহাদিগে ঐ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পিতা কহিয়া থাকেন, তাঁহারা এবং ইদানীন্তন জ্ঞানবান্ খ্রীষ্টানেরা কহেন যে, মুশা অজ্ঞানদের বোধাধিকারের নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন।"

পাদ্রিসাহেব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "এদেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইলেন, যে জড়তা সর্ব্বপ্রকারে নীতি ও ধর্ম্মের হন্তা হয়।" রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পাদ্রিসাহেব এ দেশে এতকাল থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যানুশীলন ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই জানিলেন না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে, তর্কশাস্ত্রে, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষে, কেবল বাঙ্গালাদেশে. এতদ্দেশীয় লোকদ্বারা শত শত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পাদ্রিসাহেবেরা যে, ইহা জানেন না, তাহার কারণ এই যে, এ দেশীয়দের যাহা কিছু উত্তম, তদ্বিষয়ে তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন।

পাদ্রিসাহেব বলিয়াছিলেন যে, এদেশের লোকেরা এতকাল একেবারে মূর্খতা ও জড়তায় মগ্ন ছিল। এ কথা প্রকৃত নহে। বিদ্যার অনুশীলন এদেশে একেবারে ছিল না, খ্রীষ্টিয়ানপাদ্রিরা উহা আনিলেন, ইহা অমূলক কথা। তবে, ইহা সত্য বটে যে, মূর্খতা, জড়তা ও কুসংস্কার সর্ব্বত্র অত্যন্ত প্রবল।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের অনেক ইংরেজ ও ইংরেজপাদ্রিরা মনে করিতেন যে, এ দেশের লোক নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তাঁহারাই প্রথমে আলোক আনিয়াছেন, তাঁহারাই এ দেশে সর্ব্ব প্রকার উন্নতির সূত্রসঞ্চার করিতেছেন; এ দেশের লোকের উন্নতির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা তাঁহারাই করিতেছেন। পাদ্রিদিগের এই প্রকার ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজা উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

এ দেশীয় ও ইয়োরোপীয়দিগের গার্হস্থ্যনীতি

এ দেশের লোকের নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ত্রুটি বিষয়ে পাদ্রিসাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন;—"এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপদেশীয়দের গার্হস্থ্যধর্ম্মবিষয়ে. উৎপ্রেক্ষা দিয়া, দোষের ন্যূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু শাস্ত্রীয়বিচারে এরূপ দ্বন্দ্ব করা অনুচিত হয়; সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যেহেতু, ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে।"

রামমোহন রায় আধুনিক হিন্দুর গার্হস্থ্যনীতির হীনতা স্বীকার করিতেন। অজ্ঞান ও জড়তাও স্বীকার করিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান মিসনরীরা আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, অমূলক ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। (এখনও সেরূপ করিয়া থাকেন।) রামমোহন রায় তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এস্থলে রাজা হিন্দুর পক্ষ হইয়া ন্যায়ানুগত বিচারে যাহা বলা যায় তাহাই বলিয়াছেন।

রাজার সময়ে, এদেশীয় ইয়োরোপীয়দিগের নীতিসম্বন্ধে অবস্থা ভাল ছিল না। এদেশস্থ ইয়োরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের নীতি ও চরিত্র দেখিয়া তাঁহার অতিশয় অশ্রদ্ধা হইয়াছিল। কিন্তু রাজা ইংলণ্ডে গমন করিয়া সেখানকার ভদ্রলোকদিগের মধ্যে, চরিত্র ও নীতির শ্রেষ্ঠতা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের চরিত্রের উচ্চতা ও পবিত্রতা দেখিয়া তিনি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই আনন্দ ও সন্তোষ পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজার সময়ে যে, ভারত-প্রবাসী ইয়োরোপীয়দিগের গার্হস্থ্যনীতি অতিশয় মন্দ ছিল, ইহা ভারতবর্ষের ইয়োরোপীয় ইতিবৃত্তলেখকগণও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গার্হস্থ্যনীতি সম্বন্ধে যে

অতিশয় দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহার দুইটি প্রধান কারণ। প্রথম,—তখন এদেশে ইয়োরোপীয় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প ছিল। দ্বিতীয়,—তখন ইংলণ্ডে গমনাগমনের সুবিধা ছিল না।

কদুক্তির উত্তর

পাদ্রিসাহেব অনেক কদুক্তি করিয়াছিলেন। যেমন, "মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুধর্ম্ম উৎপত্তি হয়।" "হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল।" "হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল।" এই সকল কদুক্তি সম্বন্ধে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে লিখিতেছেন ;—"সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে ; কিন্তু আমাদিগ্যে জানা কর্ত্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি ; পরস্পর দুর্ব্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।"

সুসমাচারের অনুবাদ

এক্ষণে তিনি বিশেষভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিশেষ যত্ন সহকারে বাইবেল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিয়া নূতন বাইবেলের মূলগ্রন্থ, এবং হিব্রু শিক্ষা করিয়া পুরাতন বাইবেলের মূলমন্ত্র পাঠ করিলেন। তিনি একজন য়ীহুদী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ছয় মাসের মধ্যে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন।* ইহাতে ভাষাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সত্য বটে, কিন্তু এত অল্পকালের মধ্যে হিব্রু শিখিতে পারিবার আর একটি কারণ ছিল। তিনি আরবী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেই জন্য মুসলমানেরা তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায়, "জবরদস্ত" মৌলবী বলিতেন। আরবীর সহিত হিব্রুর অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং হিব্রু শিক্ষা রামমোহন রায়ের নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল।

রামমোহন রায়, আড্যাম সাহেব ও ইউনিটেরিয়ান কমিটি

সে সময়ে পাদ্রি কেরি ও ইলারটন সাহেবের অনুবাদিত বাঙ্গালা বাইবেল সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলিতেন যে, উহাতে বাঙ্গালা ভাষার রীতি অত্যন্ত গুরুতররূপে উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে। পাদ্রি আড্যাম ও ইয়েট্স্ সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া রামমোহন রায় চারখানি সুসমাচার বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু অন্যান্য অংশ অনুবাদ করার পর, যখন তাঁহারা চতুর্থ সুসমাচার অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। মূল গ্রীক বাইবেলের অর্থ লইয়া পরস্পর মতভেদ হইল। যীশুদ্বারা সৃষ্টি অথবা যীশুর মধ্য দিয়া পরমেশ্বর সৃষ্টি করিলেন, এই দুই ভিন্ন অর্থ লইয়া মতভেদ হইল। ইয়েট্স্ সাহেব অনুবাদ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এই অনুবাদ কার্য্য হইতেই পাদ্রি আড্যাম সাহেব ও রামমোহন রায়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হয়। ইহার পরিণাম এই হইল যে, রামমোহন রায়ের সহিত খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা করাতে তিনি উহার অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিলেন। রামমোহন রায়কে ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ান করিতে গিয়া, তিনি নিজেই উক্ত মত

* স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাঁহার পিতা স্বর্গীয় নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট এ কথা শুনিয়াছিলেন।

পরিত্যাগ করিলেন। আপনাকে একেশ্বরবাদী বলিয়া প্রচার করিলেন। খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁহাকে "Second fallen Adam, বলিতে লাগিলেন।" অর্থাৎ শয়তানের হাতে পড়িয়া আদমের যেমন পতন হইয়াছিল, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া আড্যাম সাহেবের পতন হইয়াছে।

১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কলিকাতা ইউনিটেরিয়ান কমিটি নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হইল। খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটির সভ্য হইয়াছিলেন ; সুপ্রীম কোর্টের একজন কৌন্‌সিলি থিয়োডোর ডিকিন্‌স্‌, ম্যাকিন্‌টস্‌ কোম্পানির একজন বণিক্‌ জর্জ্জ জেম্‌স্‌ গর্ডন, একজন আটর্নি উইলিয়েম্‌ টেট্‌ কোম্পানির কার্য্যে নিযুক্ত একজন ডাক্তার (সার্জ্জন) কোম্পানির একজন কর্ম্মচারী নর্ম্যান কার্‌, এই কয়জন ইয়োরোপীয়, স্কটলণ্ডদেশীয় লোক ; ইহা ভিন্ন পাদ্রি আড্যাম সাহেব নিজে। আর কয়েকজন বাঙ্গালী ;—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায় ; আর বলা বাহুল্য যে, রামমোহন রায়, অবশ্য, ইহার মধ্যে ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়া আড্যাম সাহেব খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদের প্রচারক হইলেন। ধর্ম্মতলায় তাঁহার একটি সামাজিক উপাসনার ঘর প্রতিষ্ঠিত হইল। আড্যাম সাহেব আচার্য্যের কার্য্য করিতেন।

রামমোহন রায় এদেশে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে কিছুকালের জন্য বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আড্যাম সাহেবের দ্বারা ইউনিটেরিয়ান উপাসনা কার্য্য কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। এ বিষয়ে ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আড্যাম সাহেব এইরূপ লিখিতেছেন ;—"এখন তিনি (রামমোহন রায়) কোন উপাসনা স্থানে গতায়াত করেন না।" কিন্তু উক্ত পত্রে আড্যাম সাহেব এই বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন যে, পুনর্ব্বার যখন ইউনিটেরিয়ান মতে প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হইবে, তখন তিনি উহাতে নিয়মিত-রূপে উপস্থিত হইবেন।

১৮২৬ সালের ১৪ অক্টোবরের পত্রে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রামমোহন রায় তাঁহার উইলে আড্যাম সাহেবের পরিবারের জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। আড্যাম সাহেবের দ্বারা এদেশে একেশ্বরবাদ প্রচার এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতা এই সাহায্যের প্রধান কারণ।

উক্ত সালের প্রথমাংশে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান সভা হইতে তিনি One hundred arguments for the Unitarian Faith, ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসের স্বপক্ষে একশত যুক্তি, প্রাপ্ত হইয়া উহা পাঠ করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, কলিকাতায় উহা বিতরণের জন্য তিনি নিজের মুদ্রাযন্ত্রে উহার আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়, আর ছয় জন ইংরেজ ভদ্র-লোকের সহিত রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান কমিটিতে কার্য্য করিতেছিলেন। ১৮২৭ সালে অধিকতর উৎসাহের সহিত কমিটি কার্য্য আরম্ভ করিলে তিনিও তৎসঙ্গে কার্য্য করিতে লাগিলেন। আড্যাম সাহেবের Calcutta Chronicle নামক যে সংবাদপত্র ছিল. কয়েকমাস পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় উহা প্রকাশ হওয়া রহিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি এক্ষণে প্রচারকের কার্য্য করিতে অবকাশ পাইলেন। রামমোহন রায়ের পুত্র রাধা-প্রসাদ, আংগ্লো হিন্দু স্কুলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, একটি বিদ্যালয় ও উপাসনালয় নির্ম্মাণ

করিবার জন্য দান করিতে সম্মত হইলেন। উক্ত বিদ্যালয় ও উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিতে তিন চারি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

১৮২৭ সালের ১লা আগষ্ট দিবসে, আড্যাম সাহেব রেভেরেণ্ড ডবলিউ. জে. ফক্স্ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন "রামমোহন রায় মনে করেন যে, তিনি উক্ত পরিমাণ টাকা, তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।" কয়েকমাস পূর্ব্বে বৃটেনবাসী ইউনিটেরিয়ানগণ উক্ত কার্য্যের জন্য ১৫০০০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই গৃহ নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বেই "হরকরা" নামক সংবাদপত্রের আপিস, গৃহ ও পুস্তকালয়ের সহিত সংযুক্ত কয়েকটি ঘর উপাসনা কার্য্যের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। উক্ত স্থানে, ১৮২৭ সালের ৩রা আগষ্ট, রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে আড্যাম সাহেব উপাসনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে রামমোহন রায় আড্যাম সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া ইউনিটেরিয়ান খৃীষ্টধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া প্রথমে ধর্ম্মসমাজ সংস্থাপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮২৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি দিবসে রামমোহন রায়, জে. বি. এম্‌লিন্ সাহেবকে একপত্রে লিখিয়াছিলেন ;—"আমার পরিবারদিগের প্রতি কতকগুলি লোকের অতিশয় বিদ্বেষ-বশতঃ এরূপ ক্লেশকর ব্যাপার সকল ঘটিয়াছে যে, দুই বৎসরের অধিককাল হইল, আমি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অথবা আমার কোন প্রীতিভাজন বা ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি।"

১৮২৬ সালে তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় জয়লাভ করাতে তিনি গ্রন্থাদি লিখিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই সময়, ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এখানি বাস্তবিক গায়ত্রীমন্ত্রের একটি ভাষ্য।

রামমোহন রায় এই সময়ে আড্যাম সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া, যীশুখৃীষ্ট পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া যে চমৎকার উপদেশ দিয়াছিলেন, (Sermon on the Mount) তাহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই-রূপ অভিপ্রায় ছিল যে, যীশুর সমুদয় উপদেশ উক্ত ভাষায় অনুবাদ করিবেন।

১৮২৬ সালের শেষভাগে, নিম্নলিখিত, প্রশ্নের উত্তরে রাজা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিলেন। প্রশ্নটি এই,--ত্রিত্ববাদী খৃীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মসমাজ সকলের পরিবর্ত্তে তুমি ইউনিটেরিয়ানদিগের উপাসনা স্থানে উপস্থিত হও কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের নিম্নে রামমোহন রায়ের শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর আছে। ঐ প্রকার স্বাক্ষর থাকিলেও উহা বাস্তবিক রামমোহন রায়ের নিজের রচনা। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, নিজের রচিত প্রবন্ধ শিষ্য ও অনুচরদিগের দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ইউনিটেরিয়ান উপাসনা সমাজে তিনি এইজন্য গিয়া থাকেন যে, তথায় প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের সদৃশ বহুদেববাদ, ঈশ্বরে মানবীকরণ, অবতারবাদ, ঈশ্বরস্বরূপ ও মানবপ্রকৃতির যোগ (Union of two natures) ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি মত তাঁহাকে শুনিতে হয় না।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে, রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান খৃীষ্টধর্ম্ম প্রচারক আড্যাম সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া এদেশে উক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার উন্নতি দৃষ্ট হইল না। এই বিদেশী বৃক্ষ ভারতের ভূমিতে বদ্ধমূল হইতে পারিল না।

আগষ্ট মাসে আড্যাম সাহেবের দ্বারা প্রতি রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে ইউনিটেরিয়ান

খ্রীষ্টীয় মতে যে প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে অতি অল্প লোকই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই যাঁহারা স্পষ্টভাবে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই উপাসনা সমাজকে প্রায় কিছুই সাহায্য করেন নাই। এমন কি, ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধিকাংশই উক্ত উপাসনায় উপস্থিত হইতেন না। নবেম্বর মাসে, সায়াহ্নে, প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেখা হইল যে, তাহাতে লোক আসে কিনা? উহাতে প্রথম ষাট্ হইতে আশি জন লোক উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যা যাব পর নাই হ্রাস হইয়া গেল। আড্যাম সাহেব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, দেশীয়দের জন্য একটি দেশীয় উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, দেশের লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য দেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিবার প্রস্তাবে ইউনিটেরিয়ান কমিটির দেশীয় সভ্যগণ গুরুতর আপত্তি উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, দেশীয় ভাষায় যাহা কিছু বলা বা লেখা হইবে, তাহা লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। ইংরেজী, পারসী, সংস্কৃত, এই তিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষায় লোকের শ্রদ্ধা হইবে না। রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কি আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে, এবং তজ্জন্য উহা শিক্ষিত ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা কিরূপ আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা এই ঘটনাটির বিষয় আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। রাজা রামমোহন রায়ই এই উন্নতির মূল।

এই সময় অক্টোবর মাসে, আড্যাম সাহেব, রামমোহন রায়ের আংগ্লো-হিন্দু স্কুল গৃহে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বিষয়ে সাময়িক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। শ্রোতৃসংখ্যা প্রথমে ১২ হইতে ২৫ হইতেছিল। কিন্তু রামমোহন রায় নিজেই উপস্থিত হইতেন না। শেষে এমন হইল যে, বক্তৃতা শুনাইবার জন্য আড্যাম সাহেব একজনও শ্রোতা পাইলেন না।

যাহাতে পুনর্ব্বার উন্নতির দিকে গতি হয় তজ্জন্য আড্যাম সাহেব অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮২৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর, তিনি ইউনিটেরিয়ান কমিটির নিকট একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তাহাতে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করিলেন। উক্ত প্রস্তাবটি তিনি পূর্ব্ব বৎসর মে মাসে লিখিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি এই যে, ইউনিটেরিয়ান কমিটি British Indian Unitarian Association নাম গ্রহণ করিয়া বিশেষভাবে সভা-বদ্ধ হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়ানদিগের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হন।

কিন্তু ইহা করিলে কি হইবে? আড্যাম সাহেবের রবিবাসরিক উপাসক মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা ক্রমশই হ্রাস হইতে লাগিল। আড্যাম সাহেব মনে করিলেন যে, উপাসক-মণ্ডলীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবার পূর্ব্বে সাপ্তাহিক উপাসনা উঠাইয়া দেওয়াই ভাল। তিনি কমিটির নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত কিয়ৎকালের জন্য মাদ্রাজে প্রেরণ করা হউক। কিন্তু রামমোহন রায় কমিটিকে বুঝাইয়া দিলেন যে দুইটি কারণে তাঁহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ করা যাইতে পারে না। একটি এই যে, উক্ত কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। আর একটি এই যে, কলিকাতায় আড্যাম সাহেবের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। এইরূপ বুঝাইয়া দেওয়াতে কমিটি মাদ্রাজ যাত্রায় মত দিলেন না।

আড্যাম সাহেব যাহা কিছু করিতে চেষ্টা করিলেন, কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রামমোহন রায়ের আংগ্লো-হিন্দু স্কুল দ্বারা খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচারের বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং রামমোহন রায় তাহাতে বাধা দিয়া তাহা হইতে দেন নাই। আড্যাম সাহেব পরিশেষে স্কুলের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর উপাসক সংখ্যা, কি ইয়োরোপীয় কি

দেশীয়, প্রায় সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তিনি কমিটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রচারকের করিবার উপযুক্ত তাঁহারা তাঁহাকে কোন কার্য্য প্রদর্শন করুন। কোন প্রকার উপযুক্ত কার্য্য না করিলে তিনি কেমন করিয়া বিদেশ হইতে প্রেরিত তাঁহার বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন? আড্যাম সাহেব ইউনিটেরিয়ান প্রচারকরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, কমিটি এরূপ কোন কার্য্য দেখিতে পাইলেন না; এবং সেই জন্য তাঁহার নিয়মিত বৃত্তি বা বেতন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেওয়া বিবেচনা সিদ্ধ মনে করিলেন না। দুর্ভাগ্য আড্যাম সাহেব ভগ্নহৃদয় হইয়া আপনার কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন। এই শেষোক্ত ঘটনা ১৮২৮ খৃীঃ অঃ প্রথমাংশে সংঘটিত হয়।

খৃীষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ

এই সময়ে, রামমোহন রায়, বাইবেল হইতে খৃীষ্টের উপদশে সংকলনপূর্ব্বক ('Precepts ef Jesus, Guide to Peace and happiness') অর্থাৎ খৃীষ্টের উপদেশ, সুখ ও শান্তিপথের নেতা, এই নাম দিয়া ১৭৪২ শকে, ১৮২০ খৃীষ্টাব্দে, একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকট, সত্যশিক্ষা সম্বন্ধে, স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, স্বজাতীয় কি বিজাতীয়ের বিচার ছিল না। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় যেখানে সত্য পাইত, সেখান হইতেই তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত। তিনি হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক যেরূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমান-শাস্ত্র বিলোড়ন করিয়া সত্যসংগ্রহের ত্রুটি করেন নাই; আবার সেই উদারভাবপ্রণোদিত হইয়াই তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের হিতের জন্য খৃীষ্টের উপদেশ প্রকাশ করিলেন। আমরা শুনিয়াছি, উহার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছিল। ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকাতে রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, "যে পরমেশ্বর জাতি, পদমর্য্যাদা ও অবস্থা-নির্ব্বিশেষে, সমুদায় জীবকে সমভাবে, পরিবর্ত্তন, হতাশ্বাস, দুঃখ ও মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন, এবং যিনি প্রকৃতির উপর অজস্র করুণা বর্ষণ করিয়া তাহাতে সকলকে সমভাগী করিয়াছেন; ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধীয় এই সকল উপদেশ, লোকের মনকে সেই পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় উচ্চ উদার ভাবে পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা; এবং পরমেশ্বরের প্রতি, জনসমাজের প্রতি ও আপনার প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য সকল প্রতিপালন পক্ষে ইহা এ প্রকার উপযোগী যে, আমি ইহা বর্ত্তমান আকারে প্রচারদ্বারা সর্ব্বোত্তম ফললাভের আশা করি।"

মার্সম্যান্ সাহেবের সহিত বিচার

খৃীষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ করাতে রামমোহন রায়ের উদারভাব প্রায় কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশবাসীগণের ত কথাই নাই। খৃীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাও সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অনেকে বিরক্ত হইলেন। ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক, শ্রীরামপুরের সুপণ্ডিত মার্সম্যান্ সাহেব, তাঁহার পত্রে উক্ত গ্রন্থের নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন। তাঁহার প্রতিবাদের কারণ এই যে, খৃীষ্টের ঈশ্বরত্ব, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মতপ্রতিপোষক বাইবেলের বাক্য সকল উহাতে স্থান পায় নাই।

উপদেশসংগ্রহ পুস্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল না; কিন্তু সাধারণতঃ লোকের নিকট নাম অবিদিত ছিল না। মার্সম্যান্ সাহেবের সমালোচনার উত্তরে রামমোহন রায়, সত্যের বন্ধু, (A friend to truth) নাম লইয়া 'An Appeal to the Christian Public' নামে, ১৭৪২ শকে, ১৮২০ খৃীষ্টাব্দে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন।

উহাতে প্রদর্শন করিলেন যে, ঈশ্বরের ত্রিত্ব, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও খ্রীষ্টের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি মত বাইবেলগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মিসনরীগণ বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়াই ঐ প্রকার বিশ্বাস করিতেছেন।

নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও মার্সম্যান্ সাহেবের পরাভব

মার্সম্যান্ সাহেব পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। রামমোহন রায় দ্বিতীয়বার আপনার নাম দিয়া 'Second Appeal to the Christian Public' প্রকাশ করিলেন। মার্সম্যান্ সাহেব সহজে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি আবার উত্তর করিলেন। রামমোহন রায়ও তাঁহার তৃতীয় উত্তরপুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু একটি ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ব্যাপ্‌টিষ্ট মিসন-প্রেসে মুদ্রিত হইত। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ তাঁহার পুস্তক খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী জ্ঞানে মুদ্রিত করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু রামমোহন রায় প্রতিবন্ধক দেখিয়া নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি অক্ষরাদি প্রস্তুত করাইয়া নিজে ধর্ম্মতলায় 'ইউনিটেরিয়ান্ প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্রণালয় স্থাপন করিলেন। উহার কার্য্য প্রায়ই দেশীয় লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, রামমোহন রায়ই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম সংস্থাপক। ১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, এখান হইতে 'Final Appeal' নাম দিয়া তাঁহার নিজের নামে তৃতীয় উত্তরপুস্তক বাহির হইল। এই পুস্তকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি এতদূর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, লোকে, দেখিয়া অবাক্ হইল। মার্সম্যান্ সাহেব স্বমতসমর্থন জন্য ইংরেজী বাইবেল হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। রামমোহন রায়, ইংরেজী অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহা স্বয়ং ইংরেজীতে অনুবাদপূর্ব্বক দেখাইলেন যে, মার্সম্যান্ সাহেবের কথা তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত নহে। মার্সম্যান্ সাহেব পরাস্ত হইলেন।

'ইণ্ডিয়া গেজেটের' ইংরাজসম্পাদক লিখিলেন যে, এই বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রামমোহন রায় এ দেশে এখনও তাঁহার সমতুল্য লোক প্রাপ্ত হন নাই। রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক এই সকল বিচারপুস্তক অতি শীঘ্রই লণ্ডন নগরে প্রকাশিত হইল। তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর, অল্প দিনের মধ্যে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় উক্ত গ্রন্থ সকলের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসীগণ উক্ত পুস্তকপাঠে একজন বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

টাইটলর সাহেবের সহিত তর্কযুদ্ধ

এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি অতি আমোদজনক তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের একদিকে হিন্দু কলেজ ও মেডিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার টাইটলর সাহেবের ভ্রাতা (হিন্দু কলেজের জনৈক শিক্ষক) ও শ্রীরামপুরের মিসনরীগণ, এবং অপর দিকে রামমোহন রায়। সুপ্রসিদ্ধ হরকরা ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছিল। উভয় পক্ষই উক্ত দুই পত্রে পরস্পরের প্রতি তর্ক-অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতেন।

'হরকরা' পত্রে টাইটলর সাহেব, প্রথমতঃ রামমোহন রায়কে আক্রমণ করেন। তাহাতে "রামদাস" এই কল্পিত নাম স্বাক্ষর করিয়া, হিন্দুভাব অবলম্বনপূর্ব্বক রামমোহন রায় তাহার এইরূপ উত্তর দিলেন যে, "রামমোহন রায়, পৌত্তলিক হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী

খ্রীষ্টিয়ান উভয়েরই পরম শত্রু। রামমোহন রায় ঈশ্বরের বহুত্ব ও অবতার-বাদ উভয়েরই প্রতিবাদী। ঐ দুটী মতই হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ান, উভয়েরই মূল মত। সুতরাং এস, আমরা (হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান) একত্র মিলিত হইয়া আমাদের সাধারণ শত্রু রামমোহন রায়কে আক্রমণ করি।" এই উত্তরপত্র খানি কোথা হইতে আসিল, কেহ জানিতে পারিল না। একজন ঘৃণিত পৌত্তলিক, খ্রীষ্টিয়ানের সহিত সাধারণভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে চায়, ইহা টাইটলর সাহেব বা অপর খ্রীষ্টিয়ানদিগের সহ্য হইবে কেন? তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রামদাসের পত্রের উত্তর দিলেন। বলিলেন যে, "খ্রীষ্টধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে তুলনা করা অতি অন্যায় কর্ম্ম; উহাদের সাধারণভূমি এক হইতে পারে না। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। "রামদাস" অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিলেন যে, ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্ম্মের ভিত্তিমূল এক;—অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বহুত্ব। খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য, টাইটলর সাহেব ও তাঁহার পক্ষসমর্থনকারী খ্রীষ্টিয়ানগণ খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি অনেক দেখাইলেন। 'রামদাস'ও হিন্দুশাস্ত্র হইতে সে সকল প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিলেন। উভয়পক্ষ হইতে অনেক উত্তর প্রত্যুত্তরের পর 'রামদাসে'রই জয় হইল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রামদাসের ও অপর পক্ষের পত্র সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিতে অতিশয় আমোদ বোধ হয়।

রামমোহন রায়ের দ্বারা পাদ্রি আড্যাম সাহেবের মতপরিবর্ত্তন

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, আড্যাম সাহেব, রামমোহন রায়ের উপদেশে ইউনিটেরিয়ান হইলেন। চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানেরা আড্যাম সাহেবকে "Second fallen Adam" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনায় আড্যামের (প্রথম মনুষ্যের) যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া আড্যামের দ্বিতীয় বার পতন হইল।

'পাদ্রি ও শিষ্যসংবাদ'

আমরা রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক আর একখানি পুস্তকের কথা বলিব। ইহার নাম 'পাদ্রি ও শিষ্যসংবাদ।' উক্ত পুস্তকে এক পাদ্রির সহিত তাঁহার চীন-দেশীয় তিন জন শিষ্যের কথোপকথন কল্পিত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের তিন ঈশ্বরের মত যে, যার পর নাই অযুক্ত ও অসঙ্গত, উক্ত পুস্তকে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পাঠকবর্গের জন্য আমরা এস্থলে উক্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উদ্ধৃত করিলাম।

"এক খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রি ও তাঁহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য, ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথন

পাদ্রি। —তিনজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই, ঈশ্বর এক কি অনেক?

প্রথম শিষ্য। —উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন।
দ্বিতীয় শিষ্য। —কহিল, ঈশ্বর দুই।
তৃতীয় শিষ্য। —উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই।

পাদ্‌রি। —হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারীর ন্যায় উত্তর করিলে?

সকল শিষ্য। আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি এ ধর্ম্ম যাহা আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন; কিন্তু আমাদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানি।

পাদ্‌রি। তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য। আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছি, এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্ছা রাখি না; কিন্তু আপনকার উপদেশ আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে।

পাদ্‌রি। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ, তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ?

প্রথম শিষ্য। —আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতাঈশ্বর ও পুত্রঈশ্বর এবং হোলি-গোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

পাদ্‌রি। আহা! আমি দেখিতেছি, তুমি অতি মূঢ়। আমার অর্দ্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ। আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে, এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য। যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন; কিন্তু আমি অনুমান করিলাম যে, আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিবেক। এ নিমিত্তে, যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন, তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদরি।—হা এমত নহে। তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না, এবং তাঁহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে, এমত জানিওনা, কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য। এ অতি অসম্ভব, এবং আমরা চীনদেশীয় লোক, পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদ্‌রি।—ওহে ভাই! এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য। এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়?

পাদ্‌রি। এ নিগূঢ় বিষয় হয়। কিন্তু আমি জানিনা কিরূপে তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি, এ গুপ্ত বিষয় কোন রূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য। হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমার-দিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদ্‌রি।—আহা! স্থূলবুদ্ধির বাক্য এই বটে। চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম্ম প্রকৃতরূপে করিতেছে। পরে, দ্বিতীয় শিষ্যকে কহিলেন যে, কিরূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?

দ্বিতীয় শিষ্য।—অনেক ঈশ্বর আছেন, আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদ্‌রি।—আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে, ঈশ্বর দুই হয়েন? সে যাহা হউক, তোমাদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদিগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য।—সত্য বটে, আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে, ঈশ্বর দুই, কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই হয়।

পাদ্রি। তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য।—আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি। আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে, তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন, বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন। ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

পাদ্রি। কি বিপদ! এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও। কারণ কোন্ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে, ঈশ্বর নাই।

তৃতীয় শিষ্য। আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম। ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। আপনি জানেন যে, আমি পণ্ডিত নহি; সুতরাং যাহা বুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে। অতএব, এই অন্তঃকরণবর্ত্তী করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খ্রীষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

পাদ্রি। এ যথার্থ বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য। এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেন যে, দেখ, এই এক বস্তু বর্ত্তমান আছে, ইহাকে স্থানান্তর করিলে, এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক।

পাদ্রি। এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এস্থলে সঙ্গত হইতে পারে।

তৃতীয় শিষ্য। আপনারা পশ্চিম দেশীয় বুদ্ধিমান্ লোক, আমারদিগের ন্যায় নহে, আপনকারদিগের দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না। কারণ পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না, এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?

পাদ্রি। আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জ্জনার জন্যে প্রার্থনা করিব। কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করিলে না। অতএব, তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য। এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না এমন ধর্ম্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে, যেহেতু বুঝিতে পারিলে না। ইতি।"

সপ্তম অধ্যায়

চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ

শাস্ত্রের আদেশ এবং মতামত ও শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার

(১৮২২—১৮২৩—১৮২৬ সাল)

চারি প্রশ্নের উত্তর। কলিকাতানিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, রাজা রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন করেন। এই সকল প্রশ্নে, রামমোহন রায়ের কোন মত ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। ১৭৪৪ শকে, ৩০ বৈশাখ দিবসে (খৃীঃ অঃ ১৮২২) চারি প্রশ্নের উত্তর মুদ্রিত হয়। তাহার ভূমিকার নিম্নে নামস্বাক্ষরের স্থানে রাজা লিখিয়াছেন ; "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট"।

প্রথম প্রশ্ন। ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা এবং তাঁহাদের সংসর্গীরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং তাঁহাদের সহিত সংসর্গ অকর্ত্তব্য কিনা?

এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায়, যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ; কি তাঁহার সংসর্গী, বা অসংসর্গী, যে কোন ব্যক্তি স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সহিত সংসর্গ ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। কিন্তু যদি একজন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও আর একজন ভাক্ত কর্ম্মী, উভয়ই যদি স্ব স্ব ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান না করিয়া, পর ধর্ম্মানুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপণ করে, আর যদি তাহার মধ্যে ঐ ভাক্ত কর্ম্মী, সেই ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে আপনার অপেক্ষা নিন্দিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে, তাহা হইলে সেই ভাক্ত কর্ম্মীর নিন্দা হাস্যাস্পদ ও পাপজনক কি না? তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান, এই দুইকে যদি সমান বলিয়া স্বীকার করা যায়, আর ঐ দুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তি, যদি নিজ নিজ ধর্ম্মপালন না করে, তবে ঐ দুই ব্যক্তিকে তুল্যরূপে স্বধর্ম্মচ্যুত পাপী বলা যাইতে পারে। একজন অন্ধ, অন্য অন্ধকে অন্ধ বলিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেরূপ হয়, একজন ভাক্ত কর্ম্মী, ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর নিন্দা ও গ্লানি করিলেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলম্বন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় বলিতেছেন ; —"প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষদ্, মন্বাদি স্মৃতি, এই সকল শাস্ত্র, নিগূঢ় হউক কি অনিগূঢ় হউক, ইহারই প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু বেদ বিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তিন প্রভু, এই সকলের সাধকেরা কোন শাস্ত্র প্রমাণে অনুষ্ঠান করেন, জানিতে বাসনা করি।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন। সদাচার সদ্ব্যবহারহীন ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানীর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, স্পষ্ট বুঝা যায় না। যদি আপন আপন উপাসনাবিহিত যে সমুদায় আচার, তাহাকেই সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকেই মধ্যস্থ মানিয়া জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি নিজ উপাসনার সমুদায় আচার, কার্য্যে করিয়া থাকেন কিনা? যদি শাস্ত্রবিহিত সমুদায় আচার সম্পন্ন করেন, এমন হয়, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি আপনার উপাসনার সমুদায় ধর্ম্ম পালন করিতে পারে না, তাহাকে ত্যাজ্য বলিতে পারেন, এবং তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা, এ কথাও বলিতে পারেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে, ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনার উপাসনায় বিহিতধর্ম্মের সহস্রাংশের একাংশ না করেন, তাহা হইলে, তিনি প্রথমে আপনার যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যদি অন্যকে বলেন যে, তোমার যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হইতেছে, তাহা হইলে সে কথা শোভা পায়।

যদি সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দের তাৎপর্য্য এই হয় যে, আপন আপন উপাসনা-বিহিত ধর্ম্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান, এবং যে যে অংশের অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয়, তন্নিমিত্ত মনস্তাপ, এবং স্বধর্ম্মবিহিত প্রায়শ্চিত্ত, তাহা হইলে, কি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর, কি অন্য ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়।

মহাজন কাহাকে বলে ?

যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বলেন যে, মহাজন সকল যাহা করিয়াছেন, তাহারই নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, মহাজন বলিলে কাহাকে বুঝায়? বৈষ্ণবেরা গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, কবিরাজ গোঁসাই, রূপদাস, সনাতন দাস, শ্রীবাস প্রভৃতিকে মহাজন বলেন। শাক্ত সম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ, নির্ব্বাণাচার্য্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন বলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা, রামানুজ ও তৎশিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন বলিয়া তাঁহাদিগের আচার ও ব্যবহারকে, সদাচার ও সদ্ব্যবহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা শিবলিঙ্গদর্শন পাপজ্ঞান করিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন না। নানকপন্থী ও দাদুপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে মহাজন জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের আচার ও ব্যবহার অনুসারে আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের মহাজনকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকে মহাজন বলা দূরে থাকুক, খাতকও বলেন না। ঐ সকল মহাজনের অনুগামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর কথার এই প্রকার তাৎপর্য্য হইলে, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই থাকে না। এক জনের মতে, অন্য ব্যক্তি সদাচার ও সদ্ব্যবহারবিহীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীত-ধারী বলিয়া গণ্য হন। অতএব, কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহার ভিন্ন প্রকার হইলেই এরূপ বলা উচিত নহে যে, তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক।

তৃতীয় প্রশ্ন। "ব্রাহ্মণ সজ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসার দ্বারা আত্মোদর ভরণ অনুচিত কি না?"

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বিশেষভাবে রামমোহন রায়ের প্রতি এই দোষারোপ করিয়াছিলেন যে, অবৈধরূপে ছাগহনন এবং অনিবেদিত মাংসভোজন করা হয়। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কি ছাগ-হনন ও মাংসভোজনকালে উপস্থিত থাকিয়া উহা দেখিয়াছেন? নিজ উপাসনানুসারে

অনিবেদিত ভোজন করিতে কি তিনি দৃষ্টি করিয়াছেন? রামমোহন রায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন ;—

"বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ।
আত্মতৃপ্তঃসুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ ।।

জ্ঞানে যাহার নির্ভর, তিনি সর্ব্বযুগে বেদোক্ত বিধানে, এবং কলিযুগে বেদোক্ত কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন।

অতএব, আগমবিহিত মাংসভোজন, স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদনপূর্ব্বক করিলে অধর্ম্ম হয় না। ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রশ্ন। "লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও ব্যভিচার করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধকারী কি না?"

এই প্রশ্নের উত্তরে, সুরাপান সম্বন্ধে, রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রানুযায়ী যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই :— স্মৃতিশাস্ত্রে কলিযুগে ব্রাহ্মণের সুরাপান মহাপাতক বলিয়া সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্রবচনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে, সুরাপানের বিধিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, বিরোধখণ্ডন আবশ্যক। তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সংস্কারহীন মদ্যপান করিলে মহাপাতক হয় ; নিজ নিজ উপাসনানুসারে সংস্কৃত মদ্যপানে দোষ নাই। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে, মদ্যপান সম্বন্ধে, পরিসংখ্যা বিধিও রহিয়াছে। যথা, কুলবধূর পক্ষে মদ্যপানের পরিবর্ত্তে, মদ্যের আঘ্রাণ-মাত্র বিহিত। গৃহস্থসাধক পাঁচ তোলার অধিক গ্রহণ করিবেন না। তান্ত্রিক-সাধনে, মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার জন্য সুরাপান করিবে। লোলুপ হইয়া পান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়।

ব্যভিচার সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন যে, ব্যভিচার মহাপাতক, কিন্তু তান্ত্রিকদিগের পক্ষে তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহে দোষ নাই। তিনি শৈববিবাহ সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—"শৈব-বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই। কেবল সপিণ্ডা না হয়, আর, সভর্ত্তৃকা না হয়, তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক।"

রাজা বলিতেছেন ;—"খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্রপ্রমাণে হয়।" কেবল তান্ত্রিক সাধকদিগের জন্য মাংস, মদ্য ও শৈববিবাহ বিহিত। কিন্তু স্মার্ত্তমতে, এ সকল একেবারে নিষিদ্ধ। যাঁহারা গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব মতে উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও তাঁহাদের শাস্ত্রানুসারে এ সকল নিষিদ্ধ। রাজা যদিও আধুনিক বৈষ্ণবশাস্ত্র সকলকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তথাচ, গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবের পক্ষে, তাঁহার শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তু ত্যাগ করা, তাঁহার পক্ষে উচিত ভাবিতেন।

রাজা রামমোহন রায়, এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকবর্গ উহা অবহিতচিত্তে পাঠ করিলে, তাঁহার অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন।

"মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান করিবেক।" (এস্থলে স্মরণ করা উচিত যে, রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই জন্য সুরাপানের কথা বলিতেছেন না। যাঁহারা বৈদিক পথে চলিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে সুরাপান নিষেধ। যাঁহারা তন্ত্রমতে সাধন করেন, তাঁহাদেরও সকলের পক্ষে সুরাপান বিধি নহে। কেবল যাঁহারা বামাচারী, এ স্থলে তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে।) "লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয়, এমত পান করিলে

সিদ্ধি হয় না। কুলধর্ম্মের গোপন ও পশুর* বেশ ধারণ এবং পশুর অন্নভোজন, প্রাণসঙ্কটে জানিবে। অতএব, আপন আপন উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্যপান করিলে, হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন, তাঁহারা শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না। যদিস্যাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, স্বীয় মৎসরতার জ্বালাতে, যবন শাস্ত্রের কিম্বা চৈতন্য-মঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন, যাহাতে কোন মতে মদিরাপানের বিধি নাই, তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে, বৈধ মদ্যপানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদকদ্রব্য বিন্দুমাত্রও সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয়, তাঁহারা যদি লোকলজ্জা ও ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিম্বা সম্বিদা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন, তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্য-হীন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি, পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বদা পাতক, এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম ; কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী, জন্ম হইবা-মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে। বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন, এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্রপ্রমাণে হয়। গো শরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ, সে শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে ; অতএব খাদ্য হইল। আর গৃঞ্জনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে, অথচ স্মৃতিতে নিষেধপ্রযুক্ত স্মার্ত্তমতাবলম্বীদের তাহা ভোজনে পাপ হয়। সেইরূপ, স্মৃতির বচনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়া ও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না। সেইরূপ, সাক্ষাৎ মহেশ্বরপ্রোক্ত আগম-প্রমাণে সর্ব্বজাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না। এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। যথা,

বয়োজাতিবিচারোত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ ।। মহানির্ব্বাণ।

শৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই ; কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয় ; তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে ; কিন্তু যাঁহারা স্মার্ত্তমতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনামতে শৈবশক্তি গ্রহণ হইতে পারে না, অথচ যবনী কিম্বা অন্ত্যজ স্ত্রীতে গমন করেন, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচনের বিষয় হয়েন, অর্থাৎ সেই সেই জাতিপ্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন।"

শ্রীযুক্তবাবু রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থা-বলীর মধ্যে ৩২২ পৃষ্ঠা, 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে, গ্রন্থকার এইরূপ লিখিতেছেন :—"১৪৫ পৃষ্ঠার শেষে লিখেন যে, "কখন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, কখন বা ভাক্ত বামাচারী" এবং ১৩০ পৃষ্ঠেও এইরূপ পুনঃ পুনঃ কথন আছে, কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের এরূপ লিখিবাতে আশ্চর্য্য কি, যেহেতু, তাঁহার এ বোধও নাই যে, কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন। সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে বামাচারের মন্ত্র এই হয় (একমেব পরংব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং) এবং

* যে সকল তান্ত্রিকসাধক সুরাপানাদি করেন না, তাঁহারা পশুনামে উক্ত হইয়াছেন।

দ্রব্যশোধনে সর্ব্বত্র বিধি এই (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবয়েৎ) এবং কুলধাতুর অর্থ সংস্ত্যান, অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্ত্তে ; অতএব সমূহ যে বিশ্ব তাহা কুল শব্দের প্রতিপাদ্য ; যাহা মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হইয়াছে।" ইত্যাদি।

উক্ত গ্রন্থাবলীর ৩৩১ পৃষ্ঠায় রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—"১৬২ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে, "সুশীল সুজনদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদাভক্ষণ, যবনীগমন ও বেশ্যাসেবন সর্ব্বকালেই অসম্ভব।" উত্তর। এ যথার্থ বটে, অতএব ধর্ম্মসংহারকে যদি ইহার ভূরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়, তবে দুর্জ্জন পদপ্রয়োগ তাঁহার প্রতি সংগত হয় কি না? শৈবধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে, বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসংগে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাংগ হয় না, যদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসংগে পাপাভাব দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্রগৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়? শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন। একের মান্যতা, অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নাই।"

'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের শেষে, তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান অর্থাৎ সুরাপান ও শৈববিবাহ বিষয়ে বিচার সমাপ্ত করিয়া রাজা এইরূপে উপসংহার করিতেছেন ;—"এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে, পরমেষ্টি গুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থসাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, এবং নিন্দক মৎসরেরা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় হইয়াছে।"*

পাষণ্ডপীড়ন ও পথ্যপ্রদান

নন্দলাল ঠাকুর রামমোহন রায়ের একজন ঘোর বিপক্ষ ছিলেন। উল্লিখিত চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ হইলে, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন † 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে ২৩৮ পৃষ্ঠা পরিমিত, এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করেন। উহাতে রামমোহন রায়ের প্রতি অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছিল। 'পাষণ্ড', 'নগরান্তবাসী ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'র দুই অর্থ ; নগরের অন্তে যিনি বাস করেন ; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল। ১৭৪৫ শকে, (খৃীঃ অঃ ১৮২৩) "পাষণ্ডপীড়নে"র উত্তর 'পথ্য-প্রদান' বাহির হইল। 'পথ্যপ্রদানে' রামমোহন রায় অতি সুন্দররূপে প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তি সকলের অসারত্ব প্রদর্শন করিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীযুক্তবাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন ;—"এই সকল বিচারগ্রন্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার। রামমোহন রায় পূর্ব্বোক্ত

* কুমারী কলেটের লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পুস্তকে চারি প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয়, বাংগালা ভাষায় অতি সামান্য জ্ঞানের জন্য তিনি তাহাতে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চারিটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের তাৎপর্য্য কিছুই প্রকৃতভাবে দেওয়া হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি যে, "ব্যভিচার" করেন, বাক্যটির অনুবাদ করা হইয়াছে Consort with infidels, কলেটের পুস্তক পাঠ করিয়া পাঠক ভ্রমে পতিত না হন, সেইজন্য তাঁহাকে বলিতেছি যে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর ২২৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৪৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া ও উহার তাৎপর্য্য কলেটের ইংরেজী পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই সকল বুঝিতে পারিবেন।

† ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

বেদান্তসূত্র ও উপনিষৎ সকলের সহযোগে এক এক ভূমিকা দিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔচিত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও ঔচিত্য, এবং রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের বেদজ্ঞানবিহীনতা ও বিবিধ ব্যবহারদোষ প্রদর্শন করিয়া এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় ঐ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ উত্তরগ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে এই 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহা সকল বিচারগ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচারগ্রন্থের মর্ম্ম পাওয়া যায়।"

'পথ্য প্রদান' আখ্যাপত্রে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন ;—"সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপাবিশিষ্টকর্ত্তৃক।" পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের গালির উত্তরে দুই একটি সুমিষ্ট বিদ্রূপ আছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পুস্তকের নাম 'পাষণ্ডপীড়ন'। রামমোহন রায় তদ্বিষয়ে বলিতেছেন ;—আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক আপন পুস্তকের নাম 'পাষণ্ডপীড়ন' রাখেন। তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ, তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার বলিতেছেন— "আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক "নগরান্তবাসী" এই পদপ্রয়োগ পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি যে স্বয়ং হয়েন, তাহা স্মরণ করিলেন না।" বোধ হয়, তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও নগরের প্রান্তভাগে বাস করিতেন।

তর্কপঞ্চানন মহাশয় রাজা রামমোহন রায়কে এই বলিয়া আক্রমণ করিতেছেন যে, তিনি "অর্থ সহিত বেদমাতা গায়ত্রী স্লেচ্ছহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;—"যদি এমত আশংকা হয় যে, আমাদের কেহ গায়ত্রীর অর্থ না দিলে, ম্লেচ্ছ কি প্রকারে ঐ মন্ত্রের অর্থ জানিলেন, তবে সে আশংকাকর্ত্তাকে উচিত যে, কালেজে যাইয়া ম্লেচ্ছ ভাষার পুস্তক সকল দৃষ্টি করেন। যাহাতে বিশেষরূপে জানিবেন যে, ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে গায়ত্রীর অর্থ দেশাধিপতিরা জানিয়াছেন ; ও শ্রীরামপুরের পাদ্‌রি ওয়ার্ড সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থে, গায়ত্রী প্রভৃতি বেদমন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বাবধি লিখিত আছে কি না, আর কোন্ ব্যক্তিদ্বারা কেরি সাহেব ও অন্য পাদ্‌রিরা গায়ত্রী প্রভৃতির অর্থ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সকলের নিদর্শন কেরি সাহেব প্রভৃতিই বর্ত্তমান আছেন।"

মহাভারত উপন্যাস কি না ?

তর্কপঞ্চানন মহাশয়, রামমোহন রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—(যাঁহারা) "নারদকে দাসীপুত্র, ও ব্যাসকে ধীবরকন্যাজাত, পঞ্চ পাণ্ডবকে জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামী, মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুজন কি দুর্জ্জন জানিতে ইচ্ছা করি।" রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, নিন্দা করিবার উদ্দেশে ঐ সকল মহানুভবকে যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহারা অবশ্যই দুর্জ্জন ; কিন্তু ঐরূপ বলিলেই যদি দুর্জ্জনতা সিদ্ধ হইত, তবে ঐ সকল বৃত্তান্ত যে সকল গ্রন্থে আছে, সেই সকল গ্রন্থকারেরা ও ধর্ম্মসংহারক প্রভৃতি তাহার পাঠকগণ, অবশ্যই দুর্জ্জন বলিয়া গণ্য হইবেন। নারদ দাসীপুত্র, ও ব্যাস. ধীবরকন্যাজাত ইত্যাদি পৌরাণিক বৃত্তান্ত জনসমাজে প্রসিদ্ধই আছে ; সুতরাং তাহার প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শেষের

দুই কথার (অর্থাৎ মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা বলা) শাস্ত্রীয় প্রমাণ আবশ্যক। মহাভারত যে উপন্যাস, রামমোহন রায় তাহার প্রমাণ মহাভারত হইতেই দিয়াছেন ;—

লেখকোভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক।
ময়ৈব প্রোচ্যনামস্য মনসা কল্পিতস্য চ ।।

মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

আমি যাহা করিতেছি, ও মনের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে যে ভারত, হে গণেশ! তুমি তাহার লেখক হও।

শ্রীভাগবত হইতেও প্রমাণ দিতেছেন,—

যথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেযুষাং।
বিজ্ঞান বৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতির্নতু পারমার্থ্যং ।।

রাজারা ইহলোকে যশঃ বিস্তার করিয়া জীবনত্যাগ করিয়াছেন। তোমাকে এ সকল কথা বলিলাম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়ে অসার জ্ঞান ও বৈরাগ্য হয়। এ কেবল বাক্যবিলাস, অর্থাৎ বাক্যক্রীড়া মাত্র, পরমার্থযুক্ত নয়।

প্রতিমাকে মৃত্তিকা ও শালগ্রামকে শিলা বলার বিষয়ে, রামমোহন রায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীভাগবত ও অন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন ;

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বাধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থ বুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ ।।

শ্রীভাগবতে, দশম স্কন্ধে।

যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরে আত্মবুদ্ধি হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্ম-ভাব ও মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমাদিতে পূজ্যবোধ, আর জলে তীর্থবোধ হয়, কিন্তু এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে হয় না ; সে গরুর মধ্যে গাধা, অর্থাৎ অতি মূঢ়।

অপ্সুদেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ।।

আহ্নিকতত্ত্বধৃত শাতাতপ বচন।

জলেতে ঈশ্বরবোধ ইতর মনুষ্যের হয়, আর গ্রহাদিতে ঈশ্বরবোধ দৈবজ্ঞানীরা করেন, আর কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্খেরা করে, কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাতেই ঈশ্বরবোধ করেন।

পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চিত্ত

'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' বলিতেছেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠায়ীর কর্ম্মসাধনে কোন ত্রুটি হইলে, সে অসম্পূর্ণ ফললাভ করে, এবং শ্রীবিষ্ণুস্মরণদ্বারা তাহার দোষের ক্ষালন হয় ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসাধকের পক্ষে, সাধনে ত্রুটি হইলে, তাহার জ্ঞানসাধনের অধিকার নষ্ট হইয়া যায়। এ কথায় রাজা বলিতেছেন যে, এরূপ বলিলে নিতান্তই পক্ষপাতিত্ব হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞানসাধকদিগের পাপক্ষালন ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে, শাস্ত্রে কিরূপ বিধান আছে, রাজা তাহা বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন।

পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার-মর্ম্ম এই ;—গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে, পঞ্চবিংশ শ্লোক হইতে, একত্রিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত,

ভগবান্ কৃষ্ণ অধিকারীভেদে পাপক্ষয়ের উপায় ও পুরুষার্থসিদ্ধির কারণ ব্যক্ত করিতেছেন। ২৫ শ্লোকের অর্থ এই যে, কোন কোন ব্যক্তি কর্ম্মযোগী হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতার যজন করেন, আর কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানযোগী হইয়া ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞদ্বারা যজন করেন। ২৬ শ্লোকের অর্থ। কোন কোন ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে বহন করেন; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিরোধ করিয়া প্রধানরূপে সংযমের অনুষ্ঠান করেন। অন্য অন্য গৃহস্থেরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে বহন করেন। অর্থাৎ বিষয়ভোগ কালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ই করে, এই নিশ্চয় জ্ঞান করেন। ২৭ শ্লোকের অর্থ। অন্য অন্য ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ু এ সকলের কর্ম্মকে, জ্ঞানদ্বারা প্রজ্বলিত যে আত্মার ধ্যানরূপ যোগস্বরূপ অগ্নি, তাহাতে বহন করেন। অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আত্মাকে জানিয়া তাঁহাতে মনস্থির করিয়া বাহিরে নিশ্চেষ্টরূপে থাকেন। ২৮ শ্লোকার্থ। কোন ব্যক্তিরা দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন; আর কেহ কেহ চিত্তবৃত্তিনিরোধযজ্ঞ করেন; কেহ কেহ বেদপাঠরূপ যজ্ঞ করেন, এবং কোন কোন যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। ২৯ শ্লোকার্থ। কোন কোন ব্যক্তি পূরক, কুম্ভক ও রেচকক্রমে প্রাণায়ামরূপযজ্ঞপরায়ণ হন। ৩০ শ্লোকার্থ। কোন কোন ব্যক্তি আহারসংকোচদ্বারা ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে লয় করেন। এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব স্ব অধিকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হন, আর পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব যজ্ঞের দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। ৩১ শ্লোকার্থ। স্ব স্ব যজ্ঞের অবসরকালে, অমৃত-রূপ বিহিতান্ন ভোজনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কোন যজ্ঞই যে না করে, সে মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হয় না। পরলোকের সুখ তাহার কি প্রকারে হইবে?

গীতাবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা যেমন কর্ম্মযোগের অভ্যাসদ্বারা পাপ-ক্ষয় স্বীকার করেন, সেইরূপ, জ্ঞানযোগ, নৈষ্ঠিকযোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির দ্বারাও পাপ-ক্ষয় অবশ্য স্বীকার করিবেন।*

অন্য এক স্থলে পাপক্ষয় এবং প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে, রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—জ্ঞাননিষ্ঠদের পাপক্ষয় ও পুরুষার্থসিদ্ধি বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানাবলম্বীদের জ্ঞানাভ্যাসই প্রায়শ্চিত্ত। (বলা বাহুল্য যে, এস্থলে, জ্ঞানাভ্যাস শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাস।)

"সোহং সংসঃ সকৃৎধ্যাত্বা সুকৃতো দুষ্কৃতোপিবা।
বিধূতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে ।।

সুকৃত কিম্বা দুষ্কৃত ব্যক্তি, বীজ ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান একবার করিলেও সর্ব্বপাপ-ক্ষয়পূর্ব্বক পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোক :—

"সর্ব্বেপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ"

এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব স্ব যজ্ঞকে প্রাপ্ত হন ও পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব যজ্ঞের দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন।

* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২৬১।২৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

বৈষ্ণবশাস্ত্রেও, স্ব স্ব অধিকারে, পাপক্ষয়ের পৃথক্ যে সকল উপায় বলিয়াছেন, তাহা লিখিতেছি। শ্রীভাগবত, একাদশ স্কন্ধ, বিংশ অধ্যায়, ২৬ শ্লোক ;—

"যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্মবিগর্হিতং।
যোগেনৈব দহেদঙ্ ছ্যোনান্যত্তত্র কদাচন ।।
স্বে স্বেঽধিকারে যানিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুসারে এই শ্লোকের অর্থ এই ;—যে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি প্রমাদেতে গর্হিত কর্ম্ম করে, সেই পাপকে জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শাস্ত্রে কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত জ্ঞানযোগে কিরূপে পাপক্ষয় হইবে, এই আশংকা নিবারণার্থে শ্রীধরস্বামী ১৫ শ্লোকে বলিতেছেন যে,—আপন আপন অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাকে গুণ বলা যায়। এক অধিকারে অন্য প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত হয় না।*

বিভিন্ন অবস্থার সাধকের লক্ষণ

রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী বলেন যে, রাজা ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা এই তিনের কোন অবস্থার লোক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। রাজা ইহার উত্তরে যাহা বলিতেছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—আমরা আপনাদের সাধনাবস্থা সর্ব্বদা স্বীকার করি। সেই সাধনাবস্থা, অধিকারীভেদে নানাপ্রকার। ভগবদ্গীতাতে "অমানিত্বমদাম্ভিতং" ইত্যাদি পাঁচটি বচন, যাহা ধর্ম্মসংহারক ৩২ পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন কোন সাধক, মান, দম্ভ ও রাগদ্বেষত্যাগ বিষয়ে বৈরাগ্য, এবং ইষ্ট অনিষ্ট উভয়ে সমভাব ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত। ভগবদ্গীতাতে লেখেন যে, সাধকগণ ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া নৈষ্ঠিকী শান্তি যে মুক্তি, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরবহির্ম্মুখ ব্যক্তি ফলকামনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া নিতান্ত বন্ধ হয়। কোন কোন সাধক নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভগবদ্-গীতাতে সাধন বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়া শেষে ভগবান্ এই উপদেশ দিতেছেন ;—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ।।

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক, আমার শরণ লও। বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, তোমার যে পাপ হইবে, সে সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মোচন করিব।

ভগবান্ মনুও তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রন্থশেষে উহারই তুল্যার্থ বচন বলিতেছেন ;—

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তম।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ।।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজোভবতি নান্যথা ।।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকলকে ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। আত্মজ্ঞান, বেদাভ্যাস ও ইন্দ্রিয়দমনদ্বারা

* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সকলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের, জন্ম সফল হয়। যেহেতু, এই অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজাতিরা কৃতকৃত্য হন। অন্য কোন প্রকারে কৃতকৃত্য হন না।

কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ অথচ গৃহস্থ সাধকের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা বিষয়ভোগকালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া, ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ই করে, এই নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া স্থিতি করেন। গীতার বচনের তুল্যার্থবচন, ভগবান্ মনুর গৃহস্থধর্ম্মের প্রকরণে পাওয়া যাইতেছে। ৪ অধ্যায়ে, ২২ শ্লোক ;—

"এতানেকে মহাযজ্ঞান যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাং।
অনীহমানঃ সততমিন্দ্রিয়েস্বেব জুহ্বতি ।।"

অর্থাৎ যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞানুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন, তাঁহারা বাহিরে কোন যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসদ্বারা চক্ষুশ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি উহার পঞ্চ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

পুনরায় গীতা অন্যপ্রকার সাধনের কথা বলিতেছেন ;—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।।

কোন কোন ব্যক্তি পূরক, কুম্ভক ও রেচকক্রমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হন।
স্বামীধৃত যোগশাস্ত্র বচন ;—

"সঃ কারেণ বহির্যাতি হং কারেণ বিশেৎ পুনঃ।
প্রাণস্তত্র সএবাহমহং সঈতি চিন্তয়েৎ ।।

নিশ্বাসের সময় প্রাণবায়ু সঃ বলিয়া বহির্গমন করেন, প্রশ্বাসের সময় হং বলিয়া প্রবিষ্ট হন। অতএব সোহং, হংসঃ সাধক ইহাই চিন্তা করিবে।
ভগবান্ মনু গৃহস্থধর্ম্মপ্রকরণে ইহারই তুল্যার্থ বচন লিখিতেছেন। ২৩ শ্লোক ;—

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃতিমক্ষয়াং ।।

কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, পঞ্চযজ্ঞস্থানে, বাক্যেতে নিশ্বাসের বহন করাকে, এবং নিশ্বাসে বাক্যের বহন করাকে, অক্ষয়ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া বাক্যেতে নিশ্বাসের বহন এবং নিশ্বাসে বাক্যের বহন করেন।

গীতা পুনর্ব্বার অন্যপ্রকার সাধনের কথা বলিতেছেন ;—

"ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ।।

কোন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ যজন করেন। ভগবান্ মনু ২৪ শ্লোকে তৎতুল্যার্থ বচন লিখিয়াছেন ;—

"জ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা ।।

কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ, শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা অর্থাৎ উপনিষদের দ্বারা জানিতেছেন যে. পঞ্চযজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হন।

ইহার উপসংহারে ভগবান্ কল্লূকভট্ট লেখেন যে, "শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদ-সংন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।" বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানত্যাগী অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ-দের প্রতি এই সকল বিধি প্রদত্ত হইল। জ্ঞানপ্রতিপত্তির নিমিত্ত নানাবিধ সাধনের কথা বলিলেন। ইহার প্রত্যেক প্রকার সাধনেই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার সাধক আছেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রেও নানাপ্রকার মোক্ষোপায়সাধনের কথা আছে। শ্রীভাগবতে, একাদশ-স্কন্ধে, ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে, ১৯ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন, এইরূপ চিন্তাদ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে সকল জগৎ ব্রহ্মাত্ম বোধ হয়। অতএব, যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ জ্ঞানের স্থিরত্ব হইল, তখন সংশয়হীন হইয়া ক্রিয়ামাত্র হইতে নিবৃত্ত হইবে। যদ্যপিও মোক্ষসাধনের নানা উপায় আছে, কিন্তু মন, বাক্য, কায়, এ সকলের দ্বারা সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টি, সকল উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত।

যে সকল জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদের উত্তম সাধনাবস্থা হয় নাই, ধর্ম্মসংহারক (কাশী-নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মসংহারক বলিয়াছেন) তাঁহাদিগকে বলিতেছেন যে, তোমাদের অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা এই তিনের কোন অবস্থাই নহে। রাজা বলিতেছেন যে, ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে, বিষ্ণু উপাসনা বিষয়ে অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা এই তিনের মধ্যে তিনি কোন্ অবস্থায় আছেন? বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসকদিগের অধিকারাবস্থার লক্ষণ এই ;—

"শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোষতিঃ ।।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা ।।
তন্ত্রসারধৃত বচন।

শমগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহবিশিষ্ট ও বিনয়যুক্ত, চিত্তশুদ্ধিবিশিষ্ট, শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী ও মেধাবী, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানক্ষম, আচারাদি গুণযুক্ত, বিশেষদর্শী, সচ্চরিত্র, যত্নশীল ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলে শিষ্য হয় ; অন্যথা শিষ্য হইতে পারে না।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি যে-সকল বিশেষণ উক্ত বচনে রহিয়াছে, তাহা তাঁহাতে আছে কি না? বৈষ্ণবসাধকদিগের সাধনাবস্থার লক্ষণ এই ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।

আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ জানিয়া এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, আত্মাভিমান-শূন্য হইয়া, অন্যকে সম্মান দান করিয়া সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তন করিবে।

ভগবদ্গীতায় আছে,—

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।" ইত্যাদি ।।

অর্থাৎ শত্রু মিত্রে, মান অপমানে সমান বোধ করিলে, ভক্তব্যক্তি ভগবানের প্রিয় হয়।

ভগবদ্গীতায় আরও আছে ;—

"মচ্চিত্তামদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।

যাহারা আমাতেই চিত্ত ও সর্ব্বেন্দ্রিয় স্থির রাখে, এবং আমার গুণ সকল পরস্পরকে জ্ঞাত করে, সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করে, ইহার দ্বারা পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়।

এস্থলে বিজ্ঞ লোক সকল দেখিবেন, পূর্ব্বলিখিত বচনানুসারে, সাধনাবস্থার লক্ষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না?

তৎপরে, শাস্ত্রানুসারে ভক্তির সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ বলিতেছেন ;—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে ।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ।।

এইরূপ নিরন্তর যুক্ত হইয়া যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আমি সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক, দেদীপ্যমান্ জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনাশ করি। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে জ্ঞানপ্রদান করিয়া মুক্তি দান করি।

এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখিবেন যে, ভগবানের দত্ত তত্ত্বজ্ঞান যাহা ভক্তির সিদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দারা ধর্ম্মসংহারকের সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্টি হইয়াছে কি না? ইহার উত্তরে যদি তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনে বিষ্ণুভক্তের অধিকারাবস্থা ও সাধনাবস্থা বিষয়ে যে সকল বিশেষণ আছে, তাহা উত্তম অধিকারী ও উত্তম সাধককে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিভেদে সাধনাবস্থা উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার। তিনি যদি এইরূপ উত্তর করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, একথা প্রতীক ও অপ্রতীক উভয় প্রকার উপাসনা সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। উভয় প্রকার উপাসনা সম্বন্ধে এ কথা বলিলে শাস্ত্রের অপলাপ হয় না।

"আশ্রমাস্ত্রিবিধাহীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।"
মাণ্ডূক্যভাষ্যধৃত কারিকা।

আশ্রমীরা তিন প্রকার, হীনদৃষ্টি, মধ্যমদৃষ্টি ও উত্তমদৃষ্টি।

শাস্ত্রানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ

এক্ষণে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধে রাজার গ্রন্থে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা যথা-সাধ্য তাহার আলোচনা করিতেছি। বিভিন্ন প্রকার সাধন ও সাধকদিগের বিষয় বলিতে গিয়া, রাজা প্রাচীন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের নিকটে তাহা সাধ্যানুসারে ব্যাখ্যা করিতেছি।

প্রথম,—কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, বাহ্যযজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসদ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও তাহার পঞ্চ বিষয়ের সংযম করিয়া পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। (মনু ৪ অধ্যায়ের ২২ শ্লোক)। গীতাতেও উহার তুল্যার্থবচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়,—কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞস্থানে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হন। (মনুর ৪ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোক); গীতাতেও ইহার তুল্যার্থ বচন আছে। ইঁহারা জ্ঞানমার্গাবলম্বী গৃহস্থ যোগীব্রাহ্ম।

তৃতীয়,—কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, বিহিত পঞ্চযজ্ঞ, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞদ্বারা পঞ্চযজ্ঞ যজন করেন। ইঁহারা বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন। রাজা বলেন ;—"পঞ্চযজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্মস্বরূপ হন, এই চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তৎ তৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন।" ইঁহারা পরব্রহ্ম-চিন্তনে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও প্রণব, উপনিষদাদি অভ্যাসে যত্ন করেন। (মনুর ৪ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক); গীতাতেও ইহার তুল্যার্থ বচন আছে। এই তিন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানত্যাগী। ইঁহাদিগকে অপৌত্তলিক বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও এই তিন শ্রেণীভুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ,—কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃত্য হন। (গীতা, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি) এবং কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ কেবল আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও প্রণব, উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে, (সাধনচতুষ্টয়ে) যত্নবান্ হন। (মনু) ইঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও সনাতন ধর্ম্ম আচরণ করেন। সনাতন ধর্ম্ম কি?

যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃশ্রেয়ঃ সমশ্নুতে।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনং ।।
মহানির্ব্বাণ।

যে যে উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয়, তাহাই ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

ইঁহাদিগকেও অপৌত্তলিক ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠগণ ভক্তিপথাবলম্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। দ্বিতীয় প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ-গণ জ্ঞানাবলম্বী গৃহস্থ। ইঁহাদের সহিত মনুর তৃতীয় প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রভেদ কেবলমাত্র এই যে, ইঁহারা পঞ্চযজ্ঞ করেন না ; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বা চিন্তাদ্বারাও পঞ্চযজ্ঞ যজন করেন না।

পঞ্চম,—কোন কোন ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ গৃহস্থসাধক, ফলত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নৈষ্ঠিকীশান্তি লাভ করেন। (গীতা) ইঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানে উপনীত হন। কর্ম্ম-মার্গের ভিতর দিয়া চিত্তশুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

ষষ্ঠ,—ইঁহারা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী। ইঁহাদের লক্ষণ এই যে, রাগ-দ্বেষত্যাগ, বিষয়ে বৈরাগ্য এবং ইষ্টানিষ্ট উভয় প্রকার বিষয়ে সমভাবাপন্ন। (গীতা)।

পঞ্চম প্রকার সাধক ভিন্ন অন্য সকল প্রকার সাধকই জ্ঞানমার্গাবলম্বী। পঞ্চম প্রকার সাধকও কর্ম্মমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গে গমনোন্মুখ।

জ্ঞান ও ভক্তি সাধন

এই যে জ্ঞানমার্গের সাধনের মধ্যে এত প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক প্রকার সাধনেই আবার অবস্থাভেদ আছে ;—অধম, মধ্যম, উত্তম বিভাগ আছে। অধিকারাবস্থার পর সাধনাবস্থা, তাহার পর সিদ্ধাবস্থা।

ভক্তিমার্গেও অনেক প্রকার সাধন আছে ; এবং ভক্তিমার্গের প্রত্যেক প্রকার সাধনে অবস্থাভেদ আছে,—অধম, মধ্যম, উত্তম। শ্রীভাগবতে অধম, মধ্যম, উত্তম ভক্তের লক্ষণ বর্ণিত আছে ;— * অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থাও বর্ণিত আছে।

রাজার মতে, সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ জ্ঞানের স্থিরত্বই সিদ্ধাবস্থা। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে ইহাই শ্রীভাগবতের বচনের তাৎপর্য্য। "দদামি বুদ্ধিযোগং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইহাই গীতার তাৎপর্য্য। বৈষ্ণবেরা শ্রীধরস্বামীকে অত্যন্ত সম্মান করেন। শ্রীভাগবত ও গীতার তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। সুতরাং জ্ঞানদ্বারা যে মুক্তি হয়, ইহা তাঁহারা কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন?

শ্রীভাগবত, গীতা এবং বৈষ্ণবপুরাণ সকলের মতেও ভক্তিমার্গে জ্ঞানদ্বারা মুক্তি। রাজা জ্ঞানসাধন ও ভক্তিসাধন উভয়ই স্বীকার করেন। তাঁহার মতে, কর্ম্ম কিম্বা ভক্তি বিনা জ্ঞানসাধন ক্লেশকর। রাজা বলেন, ভক্তিনিষ্ঠ, ব্যক্তি, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন।

শ্রীধরস্বামী বলেন :—জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞানের পরিপাক জন্মে। ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়। জ্ঞাননিষ্ঠ ও ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির নিজ নিজ অবলম্বিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই দোষ। জ্ঞান ও ভক্তির যখন মিলন হয়, তখন উভয় প্রকার সাধনের একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে। তাহাতে পরস্পর বিরোধ হয় না। †

শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তর্কপঞ্চানন মহাশয় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোন্ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন? রাজা তাহার উত্তর দিয়া, তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন্ শাস্ত্রীয় প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করেন? ইত্যাদি। তদুত্তরে তর্কপঞ্চানন মহাশয় 'অনন্ত সংহিতা'র বচন বলিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরহরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে।
ইত্যাদি।

রাজা রামমোহন রায় এই শ্লোকদ্বয়কে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন স্থানে গৌরাঙ্গকে বিষ্ণুর অবতার বলেন না। গৌরাঙ্গের মতসংস্থাপক প্রাচীন গোস্বামীদের তুল্য পণ্ডিত, উক্ত সম্প্রদায়ে

* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† রাজার গ্রন্থের ২৮২ পৃষ্ঠা দেখ।

এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যদিও গৌরাঙ্গকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের রচিত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'অনন্তসংহিতা'র এই বচন লেখেন না। গৌরাঙ্গের অবতারত্ব বিষয়ে, 'অনন্তসংহিতা'য় এরূপ স্পষ্ট বচন থাকিলে, তাঁহারা অবশ্যই উহা উদ্ধৃত করিতেন।

পণ্ডিতেরা পুরাণসংহিতাদির প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন প্রসিদ্ধ টীকাসম্মত অথবা কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে, সামান্যতঃ কোন বচন গ্রাহ্য হইতে পারে না। কোন প্রসিদ্ধ টীকারহিত ও কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত না হইলেও, যদি কেবল পুরাণ সংহিতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র কোন বচনের প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তন্ত্ররত্নাকরের প্রমাণানুসারে গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় 'তন্ত্ররত্নাকর' হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। *

উক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই যে, বটুক ও ভৈরব ভগবান্ গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ত্রিপুরাসুর হত হইলে পর, তাহার আসুরতেজ নষ্ট হইল, কি উহার নাশ হইল না; হে গণনায়ক! আমাকে তাহা বল। যেহেতু, তোমা ব্যতিরেকে এরূপ সর্ব্বজ্ঞ আর নাই। তাহাতে ভগবান্ গণেশ বলিতেছেন যে, ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত তিনপুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন রূপ অবতীর্ণ হইল। পরে, নারীভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী ও বর্ণসঙ্করের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিল। আর তাহার সঙ্গী যে সকল অসুর ছিল, তাহারা মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া ঐ ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিল। ঐ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাপাতকী, অতিপাতকী, উপপাতকী, অনুপাতকী; আর কেহ কেহ সর্ব্বপাপযুক্ত ছিল। তাহারা বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া অনেক সরলান্তঃকরণ লোককে মায়ারূপ অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে। সেই ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে শেষস্বরূপ বলরাম, তৃতীয় অংশকে তাহারা মহাদেবরূপে বিখ্যাত করিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বের পক্ষে 'অনন্তসংহিতা'র বচন এবং তদ্বিরুদ্ধে তন্ত্র-রত্নাকরের বচন সকলের, কোন প্রসিদ্ধ টীকা না থাকাতে, এবং উহা কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-কারের ধৃত নহে বলিয়া রাজা রামমোহন রায় উভয়ই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শাস্ত্রীয় বিচারের কতকগুলি নিয়ম

শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য কতকগুলি বিশেষ নিয়মানুসারে শাস্ত্রব্যাখ্যা করা আবশ্যক। বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে, প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। মীমাংসক, নৈয়ায়িক ও সংগ্রহকারেরাও সেই প্রণালী ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজা রামমোহন রায় সেই সকল নিয়ম মানিতেন।

প্রাচীনেরা শাস্ত্রসকল সমানভাবে গ্রাহ্য করিতেন। শাস্ত্রের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতেন না। সুতরাং উহার মধ্যে যে, কোন অসামঞ্জস্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেন না। অথচ শাস্ত্র সকলের মধ্যে, বচনে বচনে বিরোধ দৃষ্ট হয়। সুতরাং

---

* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর ৩০৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

শাস্ত্রের প্রামাণ্য রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম সকল এবং আরও কোন কোন নিয়ম স্থির করা হইয়াছে। এই সকল নিয়মদ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রামাণ্য ক্রম। প্রথম শ্রুতি। দ্বিতীয় মনুস্মৃতি। কিন্তু শ্রুতি ও মনুস্মৃতি কার্য্যতঃ এক; অর্থাৎ বেদার্থনির্ণয় জন্য মনুস্মৃতিই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তৃতীয়, অন্যান্য স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র।

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা ।।
স্মার্ত্তধৃত বচন।

চতুর্থ—শিষ্টাচার বা সদ্ব্যবহার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন মত, পর পর শাস্ত্রে থাকিলেও, পরবর্ত্তী শাস্ত্রের মত সে বিষয়ে গ্রহণীয় নহে। যদি এমন কোন মত পরবর্ত্তী শাস্ত্রে থাকে, যাহা পূর্ব্বের শাস্ত্রেও আছে, তাহা হইলে তো সে মত অবশ্যই গ্রাহ্য হইবে; কিন্তু যদি পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রে সে মত না পাওয়া যায়, এবং তাহার বিরুদ্ধমতও কিছু না থাকে, সে স্থলে পরবর্ত্তী শাস্ত্রের মত অবশ্যই গ্রহণীয়। সেইরূপ আবার, সমানরূপ মান্য দুই শাস্ত্রে আপাতবিরুদ্ধ বচন থাকিলে, যেরূপ ব্যাখ্যাদ্বারা বচন সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গণ্য হইবে।

শাস্ত্রের বিধি সকল দুই ভাগে বিভক্ত;—সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধি। শাস্ত্রের বিরোধভঞ্জন করিবার জন্য ইহাও একটি উপায়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। শ্রুতিতে কোন স্থানে আছে, হিংসা করিবে না। আবার অন্য স্থানে আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে অশ্ববধ করিতে হয়। সুতরাং হিংসা করিবে না, এই বিধির সহিত সামঞ্জস্য হইতেছে না। তবে ইহার মীমাংসা কি? মীমাংসা এই যে, হিংসা করিবে না, ইহা সামান্য বিধি। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে, ইহা বিশেষ বিধি। সুতরাং স্থির হইল যে, বিশেষ বিধির যে সকল স্থল, তাহা ভিন্ন অন্যান্য স্থলে, সামান্য বিধি পালনীয়। অশ্বমেধ যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্যান্যস্থলে হিংসা নিষিদ্ধ।

আর একটি নিয়ম এই যে, গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ নির্ধারণ করিবে; অর্থাৎ উপক্রমণিকায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিষয়ে কি লেখা হইয়াছে, এবং উপসংহারেও তদ্বিষয়ে কি বলিয়া শেষ করা হইতেছে, এই দুইটি দেখিলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যায়। এতদ্ভিন্ন, আর সকল অর্থবাদ ও স্তুতিবাদ বলিয়া ত্যাগ করিবে। অর্থবাদ, স্তুতিবাদ, নিন্দার্থবাদ প্রামাণ্য নহে। ফলশ্রুতি মাত্রেই অর্থবাদ, উহা প্রামাণ্য নহে। তদ্রূপ মাহাত্ম্যবাচক বচনও প্রামাণ্য নহে। যেমন, রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন;—"বিষ্ণুপ্রধান গ্রন্থে, ব্রহ্মা, মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্ণন দ্বারা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথনের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু এবং তদ্ধর্ম্মের স্তুতিমাত্র তাৎপর্য্য হয়।" ইত্যাদি।

বিধিবাক্য স্থির করিবার একটি সামান্য নিয়ম এই যে, বিধিবাক্য অদৃষ্টার্থক হওয়া চাই। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কিম্বা অনুমান প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিধিবাক্য হইতে পারে না। আর, দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, কর্ম্মকাণ্ড, কিম্বা জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ে যে বিধিবাক্য, তাহা পরমার্থ, অর্থাৎ ধর্ম্ম বা মোক্ষ সম্বন্ধীয় হইবে; ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য এই সকল বিষয়েই বিধিবাক্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মও ইহার অন্তর্গত।

মহাভারতের ঐতিহাসিক অংশ রাজার মতে উপন্যাস মাত্র। রাজা বলিয়াছেন, উহা, "কেবল বাক্যবিলাস, অর্থাৎ বাক্যক্রীড়া মাত্র, কিন্তু পরমার্থযুক্ত নয়।" *

অধিকারিভেদ

বিধিনিষেধের প্রয়োগ বুঝিতে হইলে, অধিকারিভেদ বুঝা আবশ্যক। ইহাদ্বারাও শাস্ত্রের বিরোধভঞ্জন হয়।

অধিকারিভেদ সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন ;—

"অধিকারিবিশেষেন শাস্ত্রান্যুক্তান্যশেষতঃ।"

"অধিকারিপ্রভেদেতে শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মতত্ত্বে কোন মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয়, তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন। তদনুসারে, সেই ব্যক্তি কহে যে, "অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ" অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে এবং পানাদিতে রত, তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন, এবং সে কহে যে,—

"অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ"

বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটী কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সুখাদি বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহার প্রতি স্ত্রী-পুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন, এবং সে কহে যে,—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদণ্ড বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনু শৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্ য" ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রজ-বধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে, এবং বর্ণন করে, সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরমভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। আর যাহারা হিংসাদি কর্ম্মেতে রত হয়, তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন, এবং সে কহে যে,—

"স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।" ইত্যাদি।

মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন। এ সকল বিধি অপরাবিদ্যা হয় ; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্ত্ববিমুখ সকল, যাহাদের স্বভাবতঃ অশুচিভক্ষণে, মদিরাপানে, স্ত্রীপুরুষঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয়, তাহারা নাস্তিকরূপে এ সকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্বলিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে। যেহেতু, নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয় ; নতুবা যথারুচি আহার, বিহার, হিংসা ইত্যাদির সহিত পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে ? গীতাতে স্পষ্টই কহিতেছেন ;—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতাঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ।।
কাম্যাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ।।
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।।"

যে মূঢ় সকল বেদের ফলশ্রবণ বাক্যে রত হইয়া, আপাততঃ প্রিয়কারী যে ঐ ফল-

* রাজার গ্রন্থের ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

শ্রুতিবাক্য, তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহেন; আর কহেন যে, ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই,—ঐ সকল কামনাতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা, দেবতার স্থান যে স্বর্গ, তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া জানেন, আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফলপ্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায়, এমতরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্যে আছে, এমত বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহেন। অতএব, ভোগ-ঐশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত এমতরূপ ব্যক্তিসকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না। আর, ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে, যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে, সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ, সে কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। কুলার্ণবে, প্রথমোল্লাসে;—

"তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোকরঞ্জনকারণং।
মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি ।।"

অতএব, এ সকল কর্ম্ম লোকরঞ্জনের কারণ হয়; কিন্তু হে দেবি! মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে।

"আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং ।।'

মহানির্ব্বাণ।

যাঁহারা আহারনিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন, কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার-দ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন, তাঁহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন, তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন? অর্থাৎ তাঁহাদের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না।*

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে আহার পানাদি

তর্কপঞ্চানন বলিতেছেন;—"ব্রহ্মজ্ঞানীরা বাহ্যে কোন বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধ সত্ত্ব ও সিদ্ধপুরুষ জানিতে পারে, তাহা করিবেক না, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মদ্য, মাংস ভোজনাদি গর্হিত কর্ম্মই করিবেক, যাহাতে অনেকে অশ্রদ্ধা করে।" রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন;—"পূর্ব্বোক্তর লিখিত বচন, যাহা বিশ্বগুরু আচার্য্যদের ধৃত হয়, তদনুসারে তন্ত্রশাস্ত্রপ্রমাণে জ্ঞানাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে আহারাদি লোকযাত্রার নির্ব্বাহ করেন। ইহার নিন্দকের প্রতি যাহা বক্তব্য পরমারাধ্যা মহাদেবী কহিয়াছেন। অতএব আমরা অধিক কি লিখিব?

যে দহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনঃ।
স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাতিরিক্তা যতঃ স্বতঃ ।।

যে খল পাপীরা পরব্রহ্মোপাসকের অনিষ্ট করে, সে আপনারই অনিষ্ট করে, যেহেতু তাঁহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন।

এই তন্ত্রশাস্ত্র প্রমাণে ভগবান্ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ও শঙ্করাচার্য্য ও ভগবান্ বশিষ্ট প্রভৃতি সাধু ব্যক্তিরা পানভোজনাদি করিয়াছেন। এ ধর্ম্মসংহারক বুঝি তাহা অবগত হইয়া না থাকিবেক।

* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ৫৯৯—৬০১ পৃষ্ঠা দেখ।

উভৌ মধ্বাসবক্ষীণৌ উভৌ চন্দনচর্চ্চিতৌ।
একপর্য্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জ্জুনৌ ।।
মিতাক্ষরাধৃত ব্যাসবচন।

আমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে এক রথোস্থিত, চন্দনলিপ্ত গাত্র, মাধ্বীক মদ্যপানে মত্ত দেখিলাম।"

নিবেদিত খাদ্যগ্রহণ

রাজা রামমোহন রায়কে এই দোষ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি অনিবেদিত খাদ্য আহার করেন। তিনি উহা অস্বীকার করাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেন যে, ব্রহ্মের উদ্দেশে পশুহনন ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। রামমোহন রায় তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যাঁহার কিঞ্চিৎ শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তিনি অবশ্যই জানেন যে, দেবতারাই কেবল যজ্ঞাংশভাগী ; অতএব পরব্রহ্মের উদ্দেশে পশুহননের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, এ প্রশ্ন করা সর্ব্ব-প্রকারে অযোগ্য।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব গেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ।।

এবং

ব্রহ্মার্পণেন মন্ত্রেণ পানভোজনমাচরেৎ।

এই প্রমাণানুসারে, ব্রহ্মার্পণমন্ত্রের উল্লেখপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠের পানভোজন বিহিত। পরব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বপ্রযুক্ত ও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু যথার্থতঃ অভাব প্রযুক্ত, পানভোজন দ্রব্যের নিবেদন, তাঁহার প্রতি সম্ভব নহে।

সদাচার ও সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায়কে 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' সদাচার ও সদ্ব্যবহারহীন বলাতে রাজা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়, আপনাদের আচার ব্যবহারকেই সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলিয়া জানেন ; কিন্তু এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারকে অসদাচার বলিয়া নিন্দা করেন। পরস্পর নিন্দা করিলেও, যে সম্প্রদায়ের যে আচার, তাঁহারা তাহাকেই সদাচার বলিয়া জ্ঞান করেন। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে, যাঁহারা চলেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহাই সদাচার। ইত্যাদি।

'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' ইহার উত্তরে বলেন যে, আমরা স্ব স্ব জাতীয় সদাচার ও সদ্ব্যবহারহীন ব্যক্তির কথা বলিয়াছি। রাজা ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার-মর্ম্ম এই ;—এক জাতির চারিজন বর্ত্তমান আছেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গ মতে বৈষ্ণব। দ্বিতীয় ব্যক্তি রামানুজমতে বৈষ্ণব। তৃতীয় দক্ষিণাচার শাক্ত। চতুর্থ কৌল। প্রথম ব্যক্তি, গৌরাঙ্গমতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের যে আচার ব্যবহার, তাহা সদাচার ও সদ্ব্যবহার জ্ঞান করিয়া মৎস্য ও মাংস ভোজন ত্যাগ করিয়াছেন ; বলিদানে পাপ বোধ করেন, সর্ব্বদা তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করেন, চৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও পঙ্গতে ভোজন করেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের ব্যক্তি সকল তাঁহাকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার-সম্পন্ন বলেন। কিন্তু অন্য তিন জন সে ব্যক্তির দোষোল্লেখ করেন কি না?

দ্বিতীয় ব্যক্তি রামানুজ ও তন্মতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তদনুসারে তিনি মৎস্য, মাংস ত্যাগ করিয়াছেন। ভোজনকালে, ক্ষৌরকালে ও অশুচিবিসর্জ্জনে তুলসীকাষ্ঠমালা ত্যাগ ও আবৃত স্থানে ভোজন এবং সংকটেও শিবালয়ে গমনের নিষেধ করিয়া থাকেন। এই মতের অন্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে সদাচার ও সদ্ব্যবহারসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অন্য মতের লোকে তাঁহাকে দোষবিশিষ্ট ও পতিত বলিয়া জ্ঞান করেন। তৃতীয় ব্যক্তি দক্ষিণাচার শাক্ত। তিনি তাঁহার মতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আচারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলিয়া বিশ্বাস করেন। দেবীর প্রসাদ মৎস্য, মাংস ভোজন করেন, বলিপ্রদানে পুণ্যবোধ করেন এবং পঙ্গতে ভোজনে পাপজ্ঞান করেন। চতুর্থ ব্যক্তি কুলধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আচারকে সদাচার বলিয়া জানেন। বিহিততত্ত্বত্যাগীকে পশু বলিয়া জ্ঞান করেন; এবং তত্ত্বস্বীকার ও আরাধনাকালে তুলস্যাদির স্পর্শ ত্যাগ করিয়া থাকেন।

এই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রত্যেকে বলিবেন যে, আমার জাতির মধ্যে, অনেকেই পরম্পরায় এইরূপ আচার করিয়া আসিতেছেন। ঐ চারিজনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জাতীয় প্রধান ব্যক্তিদের কৃত গ্রন্থ ও ব্যবহারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন! 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের যে লক্ষণ দিয়াছেন, উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তদনুসারেই আপনাদের আচার ব্যবহারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বলিয়া প্রমাণ করিবেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও, প্রত্যেকেই আপনার আচার ব্যবহারকে সদ্ব্যবহার মনে করেন। প্রত্যেক জাতির মধ্যে পরস্পর-বিরোধী নানাপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে।

তর্কে শান্তভাব

রামমোহন রায়ের বিচারগ্রন্থ সকলে বিপক্ষের প্রতি একটিও দুর্ব্বাক্য নাই। প্রতিদ্বন্দ্বীগণের অন্যায় বাক্যের জন্য, স্থানে স্থানে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইংরেজী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায়, তাঁহার প্রণীত রাশি রাশি বিচারগ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ তন্মধ্য হইতে বিপক্ষের প্রতি একটিও অভদ্র বাক্য বাহির করিয়া দিতে পারেন না। প্রতিবাদীর সহস্র কটুকাটব্যেও তাঁহার গভীরচিত্ত বিচলিত হইত না। ঘোরতর বিচারের সময়েও তাঁহার প্রকৃতি লেশমাত্র উষ্ণ হইত না। তাঁহার নিকট অনেক তর্কালঙ্কার, তর্কবাচস্পতি বিচারার্থী হইয়া আসিতেন। আমরা শুনিয়াছি যে, ঘোরতর তর্কযুদ্ধের সময়েও তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের লাঘব হইত না। বিপক্ষ হয়ত ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া কতই অন্যায় কথা উচ্চারণ করিতেছে, অথচ রামমোহন রায়ের কোমল ধীরভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে না। তিনি ক্রমে, পরিশেষে বিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপ নিরুত্তর ও পরাস্ত করিয়া দিতেছেন। কি মৌখিক, কি লিখিত বিচারে, আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য যতটুকু বলা আবশ্যক, তিনি তাহার অধিক কিছুই বলিতেন না। বাস্তবিক, তর্কের সময়ে ধৈর্য্যরক্ষা করিতে অতি অল্প লোকেই শিক্ষা করেন। "আমার নিজের জয় চাই না, সত্যের জয় হউক", এই ভাবটি মনে বদ্ধমূল থাকিলে, অসহিষ্ণু হইবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। রামমোহন রায়, তাঁহার শিষ্য পরলোকগত চন্দ্রশেখর দেবকে বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে তর্কবিতর্কের সময়, প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।*

---

* ১৭৯৪ শক, অগ্রহায়ণের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখ।

আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ

'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ।'

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার কি প্রকার আচরণ হওয়া উচিত, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ইহা ১৭৪৮ শকে, (খৃঃ অঃ ১৮২৬) প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় এই পুস্তকে মনুর মতানুসারে তিন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের মধ্যে তৃতীয় প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ লিখিয়াছেন। ইঁহাদের এই কয়েকটি লক্ষণ। প্রথম, ইঁহারা বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ইঁহারা আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে, এবং প্রণব, উপনিষদাদি অভ্যাসে যত্নবান্ হন। রাজা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের এই-রূপ অর্থ লিখিয়াছেন ;—চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ বিষয়ের এ প্রকার সম্বন্ধ নিবন্ধ করিতে হইবে, যাহাতে একদিকে স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন না হয়, এবং অপরদিকে অন্যের অনিষ্ট না হয়। তৃতীয় লক্ষণ ;—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন ; কিন্তু ত্যাগ করা যে একান্ত আবশ্যক তাহাও নহে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন। স্বশাখাদি বেদপাঠ, তর্পণ, নিত্য হোম, ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অন্নাদি প্রদান, অতিথিসেবা এই পঞ্চযজ্ঞ। ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করার অর্থ এই যে, পঞ্চযজ্ঞাদি তাবৎ বিষয়ের আশ্রয় পরব্রহ্ম, এইরূপ চিন্তাদ্বারা, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা সেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। মনুর দ্বাদশাধ্যায়ে, ৯২ শ্লোকে, গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, পরিত্যাগেরও বিধি রহিয়াছে।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ।।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরব্রহ্মচিন্তনে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে, ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন।

'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং'

এই পুস্তক ১৭৪৯ শকে, (১৮২৭ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের মর্ম্ম এই যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রীজপদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। ইহাতে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত, এবং উক্ত খৃষ্টাব্দে ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছিল। গায়ত্রীর মধ্যে তিনটি মন্ত্র। রাজা এই তিন মন্ত্রের অর্থ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আদি মন্ত্র ওঁ। এই শব্দে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ওঁকারের প্রতিপাদ্য যিনি, তিনি এই সকল জগৎকার্য্য হইতে পৃথক্‌রূপে স্থিতি করেন না, ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য, পরে বলা হইতেছে ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্র। এই দ্বিতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, কারণরূপ পরব্রহ্ম ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" এই তৃতীয় মন্ত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্য্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষ মতে প্রার্থনীয় ; তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি। তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্য্যামী হন এমত নহে, কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তঃস্থিত, অন্তর্য্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন।"

এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম। সেই জন্য, এই তিন মন্ত্রের একত্র জপের বিধি রহিয়াছে। গায়ত্রীর অন্তর্গত তিন মন্ত্রের সংক্ষেপার্থ এই ;—"সকলের কারণ, সর্ব্বত্রব্যাপী, সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহযন্তের অন্তর্য্যামী, তাঁহাকে চিন্তা করি।"

'গায়ত্রীর অর্থ'

এই পুস্তক ১৭৪০ শকে (১৮১৮ খৃীঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। ইহা ভূমিকা ও গ্রন্থ, এই দুই ভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন যে গায়ত্রী জপ করেন, তাহাতে অজ্ঞাতরূপে পরব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়। গায়ত্রীর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত পুস্তকে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণের গায়ত্রীজপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণেরা প্রণব, ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী বাল্যকাল অবধি জপ করিয়া থাকেন, অনেকে ইহার পুরশ্চরণও করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহাদের গায়ত্রীপ্রদাতা আচার্য্য, পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগকে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত, এই মন্ত্রের কি অর্থ, তাহা অনেককে বলিয়া দেন না ; এবং জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ, তাহা জানিবার জন্য কোন অনুসন্ধান করেন না। শুক প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায়, কেবল শব্দ উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত থাকেন। এই জন্য, গায়ত্রীর অর্থ বুঝিয়া উহা জপ করিয়া জপের সফলতাসাধন প্রয়োজন হইয়াছে।

রাজা গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। গায়ত্রীর তিনটি ভাগের যে তিন প্রকার অর্থ, উহার বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, খৃীষ্টিয়ানদিগের ত্রিত্ব-বাদের সহিত উহার সাদৃশ্য আছে। যে ভাবে ত্রিত্ববাদ সচরাচর ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহার সহিত গায়ত্রীর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইয়োরোপের কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যে ভাবে ত্রিত্ববাদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত গায়ত্রীর অর্থের সাদৃশ্য আছে। পিতা, পুত্র পবিত্রাত্মা এই তিনের তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, পিতা জগতের মূলকারণ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা। ত্রিত্ববাদের পিতা যেমন, গায়ত্রীর ওঁ সেই-রূপ। ওঁ অর্থ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা। তাহার পর, পুত্র অর্থে ঈশ্বরের সৃষ্টি বা জগতে অভিব্যক্তি। গায়ত্রীরও "ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি অংশেও সেই ভাব প্রকাশ হইতেছে। অর্থাৎ ভূর্লোক, ভুবর্লোক প্রভৃতি সমস্ত জগতে তাঁহার প্রকাশের কথা বলা হইতেছে। তাহার পর, পবিত্রাত্মা। খৃীষ্টীয় মতে, পবিত্রাত্মা আত্মাতে পবিত্রতা, শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করেন। গায়ত্রীর শেষাংশটুকুও উহার সদৃশ। "ধীমহি ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইয়োরোপের যে সকল জ্ঞানীগণ ত্রিত্ববাদের ঐরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য তিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, একই ঈশ্বরের ঐ তিনটি ভাব। সুতরাং তাঁহারা ত্রিত্ববাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত গায়ত্রীর অর্থের সাদৃশ্য আছে। গায়ত্রী অথবা ত্রিত্ববাদের উক্তরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের চিন্তা ও উপাসনা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

'অনুষ্ঠান'

এই পুস্তকে অবতরণিকা নামে একটি ভূমিকা আছে। ইহাতে ১২টি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। কিরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়, অন্যান্য নিকৃষ্ট উপাসনাকে

দ্বেষ করা উচিত নয়, শাস্ত্রানুসারে আহার ব্যবহার করা উচিত, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে ইহাতে এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খ্রীঃ অঃ) মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই পুস্তকখানি প্রশ্নোত্তরের আকারে লিখিত। আমরা নিম্নে ঐ সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর, প্রকাশ করিতেছি।

১ শিষ্যের প্রশ্ন। —কাহাকে উপাসনা কহেন?

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর। —তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়; কিন্তু পর-ব্রহ্ম বিষয়ে, জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

২ প্রশ্ন। —কে উপাস্য?

২ উত্তর। —অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তিসম্বলিত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত, রাশিচক্রে বেগে ধাবমান্, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর, যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে, সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি, তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। —তিনি কি প্রকার?

৩ উত্তর। —তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা, তিনিই উপাস্য হন। ইহার অতিরিক্ত, তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন। —কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কিনা?

৪ উত্তর। —তাঁহার স্বরূপকে, কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন; এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়; যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ, অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না; সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়?

৫ প্রশ্ন। —বিচারতঃ এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না?

৫ উত্তর। —এ উপাসনার বিরোধী বিচারতঃ কেহ নাই। যেহেতু আমরা, জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই উপলক্ষ্য করিয়া উপাসনা করি। অতএব, এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না। কেননা, প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ-কারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে, আমাদের এই উপাসনাকে, তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব, অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিচারতঃ এ উপাসনার অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না; এবং চীন, ও ত্রিবৃৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে, যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন; সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে, আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনা-রূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

৬ প্রশ্ন। —বেদে কোন কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর, অনির্দ্দেশ্য শব্দে

কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি?

৬ উত্তর। —যে স্থলে অগোচর, অজ্ঞেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে; অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে, জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়; অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন, শরীরের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য, যাঁহাকে জীব কহেন, তিনি আছেন, ইহা নিশ্চয় হয়। কিন্তু সেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্ব্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।

৭ প্রশ্ন। —আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না?

৭ উত্তর। —কদাপি না। যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপাসনা করেন, সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বরবোধে, কিম্বা তাঁহার আবির্ভাবস্থানবোধে উপাসনা করিয়া থাকেন; সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবে?

৮ প্রশ্ন। —যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি?

৮ উত্তর। —তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয়বোধে উপাসনা করেন। কিন্তু আমরা, যিনি জগৎকারণ তিনিই উপাস্য; ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণদ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ—এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি। কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছি।

৯ প্রশ্ন। —কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়?

৯ উত্তর। —এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান্ যে জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ এইরূপ যে চিন্তন, তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা, এ উপাসনার আবশ্যকসাধন হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন, যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। বস্তুতঃ যে ব্যবহারকে, আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন; অর্থাৎ আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা, অর্থের অবগতি হয় না। অতএব, পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্রাদির অবলম্বন-দ্বারা, তদর্থ, যে পরমাত্মা, তাঁহার চিন্তন করিবেন, এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইঁহাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি, যব, ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তিদ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন, ইহা পুনঃপুনঃ বেদে কহিয়াছেন। অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।

১০ প্রশ্ন। —এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরূপ লোকযাত্রানির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য?

১০ উত্তর। —শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়। অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়; আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ উভয়থা বিরুদ্ধ হয়। শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরিপ্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না করিয়া আহার ও ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন, তবে লোকনির্ব্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেননা, খাদ্যাখাদ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই; কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দ্দোষ হইবার প্রতি-কারণ হয়। ইচ্ছাও সর্ব্বজনের এক প্রকার নহে। সুতরাং পরস্পরবিরোধী নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলে, সর্ব্বদাই কলহের সম্ভাবনা, এবং পুনঃপুনঃ পরস্পর কলহদ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক, বিদ্যা ও পরমার্থচর্চ্চা না করিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়। যেহেতু, আহার কোন প্রকারের হউক, অর্দ্ধ প্রহরে, সেই বস্তু-রূপে পরিণামকে পায়, যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং ঐ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে, আহারের শস্যাদি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে। অতএব, উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা, মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা, জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।

১১ প্রশ্ন। —এ উপাসনাতে দেশ, দিক্, কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না?

১১ উত্তর। —উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই; অর্থাৎ যে দেশে, যে দিকে, যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, সেই দেশে, সেই কালে, সেই দিকে, উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

১২ প্রশ্ন। —এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে?

১২ উত্তর। —ইহার উপদেশ, সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাঁহার যে প্রকার চিত্তশুদ্ধি, তাঁহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়।

একভাবে দেখিলে, এই 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত মত জানা যায়। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অনেক স্থলে শাস্ত্রানুযায়ী মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এই 'অনুষ্ঠান' পুস্তক-খানিতে তাঁহার নিজের মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এদেশে, হিন্দুসমাজে, যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে হইলে, এই 'অনুষ্ঠান' পুস্তকখানি অবহিতচিত্তে পাঠ করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন, 'প্রার্থনাপত্র', 'ব্রহ্মোপাসনা' এবং ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট্ডীড্ পত্র পাঠ করিলে তাঁহার প্রকৃত মত বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়।

এই 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থে যে ব্রহ্মোপাসনার কথা রহিয়াছে, তাহা রাজার মতে শাস্ত্রানুযায়ী সনাতন উপাসনা। তিনি ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়াছেন। এই 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন

[illegible]

ব্রহ্মোপাসক ভিন্ন, অন্য অন্য উপাসকেরা যে বিচারতঃ ব্রহ্মোপাসনার বিরোধী হইতে পারেন না, পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে, ইহা তিনি কেমন সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার পর, সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে, ইহাও দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য উপাসনার প্রতি ব্রহ্মোপাসকের

বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাকিতে পারে না। রাজার মতে, ব্রহ্মোপাসক ও অন্যান্য উপাসকের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাকা উচিত নয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে সেই প্রভেদ তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন।

"বুদ্ধি ভেদং ন জনয়েৎ" এই বাক্যানুসারে তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি যত্নবান্ নিষ্কাম কর্ম্মীর বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। কিন্তু অজ্ঞ এবং কাম্য ও তামস কর্ম্মীদিগকে জ্ঞানসাধনে উপদেশ দিবে; প্রতীকোপাসনা, কাম্যকর্ম্ম, তামসকর্ম্ম ত্যাগ করিতে উপদেশ দিবে। রাজা এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, এবং নিজেও আজীবন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। তবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক, বিরোধ ও বিদ্বেষভাবে এ ধর্ম্ম প্রচার না করেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ উপদেশ। বিরোধ ও বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, অজ্ঞ কর্ম্মীদিগকে এবং দেবতার উপাসকদিগকে বা প্রতীকোপাসক-গণকে অনুকম্পার সহিত জ্ঞানসাধনে ও ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে।

রাজা একেশ্বরবাদকে সমস্ত ধর্ম্মের সার বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মে তিনি বিশ্বাস করিতেন; এবং ইহাই তাঁহার অনুগত শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডেও বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক একেশ্বর-বাদ এবং বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক নীতির কথাই লিখিয়াছেন। এই 'অনুষ্ঠান' পুস্তকেও সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজার উদারতা আশ্চর্য্য! সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে দেবতার উপাসকগণ এবং অন্যান্য প্রকার ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধ হইতে পারেন না, কেবল ইহাই দেখাইলেন এমন নহে, যাঁহারা কাল, স্বভাব, বুদ্ধ বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহক বলেন, সেই সকল লোক সম্বন্ধেও রাজা বলিতেছেন যে, তাঁহারাও জগৎকারণকে চিন্তা করার বিরোধী হইতে পারেন না; কেননা, তাঁহারাও জগতের কারণ স্বীকার করিতেছেন। এই সকল লোককে সচরাচর অজ্ঞেয়তাবাদী, জড়বাদী বা নাস্তিক বলা হইয়া থাকে। দেবোপাসকদিগের অপেক্ষা এই সকল লোকের সহিত ব্রহ্মোপাসকের গুরুতর প্রভেদ। সে প্রভেদ এই যে, ইঁহারা আত্মা বা চৈতন্যের জগৎকর্ত্তৃত্ব এবং নির্ব্বাহকত্ব স্বীকার করেন না। তথাচ রাজার উদার হৃদয়, তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারে নাই;—রাজা তাঁহাদিগকেও গণনার মধ্যে আনিয়াছেন। কেননা, তাঁহারাও এ কথা স্বীকার করিবেন যে, জগতের কারণ ও নির্ব্বাহককে আমাদের জ্ঞানে আবৃত্তি করা উচিত। এই-রূপ উদারভাব সুসভ্য খৃষ্টীয় জগতেও দুর্ল্লভ। কিন্তু গীতাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে, এবং 'কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি দর্শনবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থে এই উদারভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয়, সংস্কৃতদর্শন ও অন্যান্য সংস্কৃতশাস্ত্র হইতেই রাজা এই উদারভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরমেশ্বরকে জগতের কারণ ও বিধাতারূপে চিন্তা করা এবং আবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানকে দৃঢ়ীকৃত করাই তাঁহার মতে ব্রহ্মোপাসনা; তিনি মনু হইতে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। এই উপাসনার দুইটি সাধন; প্রথম,—ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন। এ বিষয়েও মনুর প্রমাণ দিয়াছেন। কি প্রকার ইন্দ্রিয়দমন আবশ্যক, তদ্বিষয়ে তিনি বলিতেছেন যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপভাবে নিয়োগ করিতে হইবে যে, আপনার ও অন্যের অনিষ্ট না হয়, প্রত্যুতঃ আপনার ও অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। রাজার মতে ইহাই সনাতনধর্ম্ম। ন্যায়-ব্যবহার এবং সত্যবাক্য, এই ধর্ম্মের অন্তর্গত। অন্যের কল্যাণসাধন করিলে, রাজার মতে, সনাতনধর্ম্ম পালন করা হয়।

দ্বিতীয়;—প্রণব ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন। এ বিষয়েও মনুর প্রমাণ দিয়াছেন।

শব্দের অবলম্বন ব্যতীত অর্থের জ্ঞান হয় না ; ইহা আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ। সেই জন্য প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, ও শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্রাদির অবলম্বনদ্বারা পরমাত্মার চিন্তা করা আবশ্যক। রাজা এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ কঠ ও মুণ্ডক উপনিষদ হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, সমস্ত সংসার ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি, ওষধি প্রভৃতি, পশ্বাদি জীবকোটি, মনুষ্য, দেবতা, প্রভৃতি বহির্জগৎ ; প্রাণ, বেদাদি শাস্ত্র, যাগযজ্ঞাদি, তপঃ শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য বিধি, অন্তর্জগৎ এই সকল ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভাবিতে হইবে। অর্থাৎ বহির্জগতে, জীবনে, ধর্ম্মকার্য্যে এবং আত্মাতে পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিতে হইবে।

রাজার একেশ্বরবাদ অতি সহজ। তিনি পরমেশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, বিধাতা ও শাসনকর্ত্তারূপে দেখিতেন ও দেখিবার উপদেশ দিতেন। তিনি বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও যুক্তিহীনমতের ধর্ম্মকে অতিশয় ভয় করিতেন। তাঁহার মনে এই আশংকা ছিল যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায় সকলের যেরূপ দশা হইয়াছে, পাছে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের সেই প্রকার হয়। রাজার একেশ্বরবাদ ব্রাহ্মসমাজে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ আরও বিকশিত হইবে।

উপাসনা কি? তদ্বিষয়ে রাজা বলিতেছেন যে :—উপাসনার লৌকিক অর্থ তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত্ন ; কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে উপাসনার অর্থ, জ্ঞানের আবৃত্তি। তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত্ন দুই প্রকার। প্রথম, নৈবেদ্যাদির দ্বারা দেবতার সেবা। দ্বিতীয়, বাহ্যসেবা না করিয়া প্রেমভক্তিদ্বারা অন্তরে তাঁহার পূজা। শংকরাচার্য্যও মানসপূজার বিধি দিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও এই দুই প্রকার পূজার বিধি আছে। রাজা নৈবেদ্যাদির দ্বারা বাহ্যপূজা ত্যাগ করিতে গিয়া দ্বিতীয় প্রকার পূজারও উল্লেখ করেন নাই ; কেবল জ্ঞানদ্বারা উপাসনার কথা বলিয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়, কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ, কর্ম্ম ও ভক্তি। সংগীতাদিদ্বারা ভাবের উদ্দীপনাকে তিনি সাধনোপায় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আপনার অন্তরে, সেই অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরের সহিত প্রেমযোগ, সেই প্রেমাস্পদ পুরুষের সহিত প্রেমের আদান প্রদান, উপাসনা বিষয়ে রাজার উপদেশে এবং তাঁহার প্রদর্শিত উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে তাঁহার উপদেশের এই অভাব, ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

দশম প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, লোকে খাদ্যাখাদ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে কোন একটি প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে চলে, ইহাই তাঁহার মত। তিনি আশঙ্কা করিতেন যে, এ সকল বিষয়ে লোকে কেবলমাত্র আপনার স্বাধীন ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে সত্য ক্ষান্তি, দয়া, অস্তেয়, শম, দম ইত্যাদি সনাতনধর্ম্ম তাঁহাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

রাজার মতে, খাদ্যাখাদ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে স্বেচ্ছাচার, যুক্তি ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। এ সকল বিষয়ে মনুষ্যের ইচ্ছার নিয়ামক আবশ্যক। সাধারণতঃ শাস্ত্রই এক নিয়ামক। কেবল ব্যক্তিগত ইচ্ছা, কার্য্যের নির্দ্দোষিতার কারণ হইলে, লোকযাত্রা উৎসন্ন যায়। তাহাতে আবার সকলের ইচ্ছা একপ্রকার নহে। সকলের পরস্পরবিরোধী ইচ্ছাদ্বারা জনসমাজের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা ; সুতরাং নিয়ামক চাই। কোন একটি প্রচলিত শাস্ত্র, নিয়ামক হইতে পারে। ব্যক্তিগত ইচ্ছার, কোন নিয়ামক না থাকিলে

উহাতে স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতা উপস্থিত হইয়া জনসমাজের প্রভূত অকল্যাণ উৎপন্ন হইবে।

রাজা বলিতেছেন ;—খাদ্যাখাদ্যের বিচার লইয়া বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়, সকল খাদ্যের পরিণাম একই। "অতএব উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা, মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা, জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।"

'ব্রহ্মোপাসনা'

এই পুস্তক ১৭৫০ শকে, (১৮২৮ খৃীঃ অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনার একটি পদ্ধতি আছে। উক্ত পদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তখন সমাজে কেবল উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত।

ধর্ম্মের দুইটি মূল

রামমোহন রায় উক্ত পুস্তকে বলিতেছেন যে, সমুদয় ধর্ম্ম দুইটি মূলকে আশ্রয় করিয়া আছে। প্রথম, সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা। দ্বিতীয়, মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর সৌজন্য ও সাধুব্যবহার।

পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। তাঁহাকে আপনার আয়ু, দেহ ও সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক, তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিকার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তা করা, এবং তাঁহাকে ফলাফলদাতা, শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে সমীহ করা উচিত। সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করা কর্ত্তব্য যে, আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিতেছি, কথা বলিতেছি, ও কার্য্য করিতেছি, সকলই পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি।

ধর্ম্মের দ্বিতীয় ভিত্তি, পরস্পর সাধুব্যবহারসম্বন্ধে, রাজা এইরূপ নিয়ম বলিতেছেন যে, অন্যে আমাদের সহিত, যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের সন্তোষ হয়, আমরাও অন্যের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিব ; এবং অন্যলোকে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে আমরা অসন্তুষ্ট হই, তাঁহাদের প্রতি আমরা সেরূপ ব্যবহার কদাচ করিব না।

কোন কোন খৃীষ্টিয়ানেরা বলেন যে ;—"যীশু উপদেশ দিয়াছেন যে, অন্যের নিকটে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতি তুমি নিজে সেইরূপ ব্যবহার কর। ইহা ভাবাত্মক (Positive) উপদেশ। যীশুর পূর্ব্বে যাঁহারা এই প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপদেশ অভাবাত্মক (Negative)। অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশ এই যে, অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর না, অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও না। চীনদেশীয় জ্ঞানী কর্নাফিউসসের গ্রন্থে, মহাভারতে, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থে, এইরূপ অভাবাত্মক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যীশুই কেবল এ বিষয়ে ভাবাত্মক উপদেশ দিয়াছেন।" ইহা অমূলক কথা। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গ্রন্থে এ বিষয়ে ভাবাত্মক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায়, সংস্কৃতশাস্ত্র হইতে ভাবাত্মক উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি এই ব্রহ্মোপাসনা পুস্তকে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয় আকারেই উপদেশ দিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মের যে চারিটি বীজ স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহার

চতুর্থ বীজ এই ;—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদ্ উপাসনমেব।" তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। দেখা যাইতেছে যে, রাজা রামমোহন রায়, এই উপদেশ প্রথমেই দিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়, ব্রহ্মোপাসনা-পুস্তকে বলিতেছেন, পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা এবং পরস্পর সৌজন্য ও সাধুব্যবহার এই দুটি ধর্ম্মের মূল। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কেবল ভাষার ভিন্নতা মাত্র, ভাব একই।

ফরাসি দেশের থিওফিল্যান্থ্রপিস্ট্‌গণ

রামমোহন রায়ের সময়ে, ফরাসি দেশে ভল্‌নি, ভল্‌টেয়ার, টমাস পেন প্রভৃতি কতক্‌গুলি লোক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারাও ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম, এই দুটিকে আপনাদিগের ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মের থিওফিল্যান্থ্রপি (Theophilanthropy) অর্থাৎ পরমেশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম, এই নাম দিয়াছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, ফরাসিবিপ্লবের সময়, ভল্‌নি, 'Ruins of Empires' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহাতে স্বার্থপর ও চতুর ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা জগতের কত অনিষ্ট হইয়াছে, প্রদর্শন করেন। উক্ত পুস্তকে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, পরমেশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেমই প্রকৃত ধর্ম্ম। এ সম্প্রদায় এখন বর্ত্তমান নাই। ইঁহাদের ধর্ম্মমতের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মতের অত্যন্ত সাদৃশ্য। বিলাতের 'All the year round' নামক পত্রিকায় একটি ব্রাহ্মবিবাহের সংবাদ দিয়া, সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক ডিকিন্‌স্ সাহেব, ব্রাহ্মদিগের বিষয়ে বলিয়াছিলেন যে, ইঁহাদিগের ধর্ম্মমতের সহিত ফরাসি দেশের থিওফিল্যান্থ্রপিস্ট্‌দিগের মতের অত্যন্ত সাদৃশ্য।

রাজা রামমোহন রায় এই 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তকে ব্রহ্মোপাসনার একটি সংক্ষেপ ক্রম দিয়াছেন। সে ক্রম এই ;—প্রথম, 'ওঁ তৎসৎ' (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের যিনি কর্ত্তা, তিনি সত্য।) দ্বিতীয় ;—'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'—(একমাত্র, অদ্বিতীয়, বিশ্বব্যাপী, নিত্য) এই দুটি বাক্য একত্রে, অথবা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে, শ্রবণ ও চিন্তা করিবে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি পাঠ করিবে, ও উহার অর্থ চিন্তা করিবে। মূল সংস্কৃতে, এবং প্রচলিত ভাষায় উহার অনুবাদে, উহার অর্থ চিন্তা করিবে। রামমোহন রায় তৎপরে কয়েকটি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ও উহার পরে, তিনচারি ছত্র বাঙ্গালা পদ্য দিয়াছেন। তাহার পর, মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে—"নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্র উপাসনায় ব্যবহার করিবার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই স্তোত্রটির উপরে লিখিয়া দিয়াছেন, "তন্ত্রোক্ত স্তব, তান্ত্রিকাধিকারে হয়।" স্তোত্রের নিম্নে, সর্ব্বশেষে লিখিতেছেন ;—"এ ধর্ম্ম সুতরাং গোপনীয় নহে, অতএব ছাপা করান গেল, শেষ ছাপা হইল।" উক্ত স্তোত্রটি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া অদ্যাপি আদি-ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময় ব্যবহৃত হয়।

যদিও এই উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে রাজা সঙ্গীতের কথা কিছু বলিতেছেন না, কিন্তু তিনি সঙ্গীতদ্বারা উপাসনার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। স্থানান্তরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে সঙ্গীতদ্বারা উপাসনার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতদ্বারা উপাসনা তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। এই উপাসনাপদ্ধতিতে সঙ্গীত বিষয়ে কোন কথা না থাকিলেও, উহা উহ্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

'প্রার্থনাপত্র'

এই পুস্তক ১৭৪৫ শকে, (১৮২৩ খৃীঃ অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় সকলের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চলিতেছেন, ইহাতে, রামমোহন রায় বিশেষ ভাবে, তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন.—"দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়।"

ব্রহ্মনিষ্ঠের দুইটিমাত্র লক্ষণ

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠের দুইটি-মাত্র সামান্য লক্ষণ দিয়াছেন। প্রথম, বিশ্বাস সম্বন্ধে। বাক্য-মনের অগোচর পরমাত্মা, জগতের মূল এবং আশ্রয়, এই বিশ্বাস। দ্বিতীয়, জীবন ও ব্যবহার সম্বন্ধে। পরকে আত্মভাবে দেখিয়া তাহার প্রতি তদ্রূপ আচরণ। কেবল এই দুটি মাত্র লক্ষণ। ব্রহ্মোপাসনা পুস্তকেও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। কবীরপন্থী প্রভৃতি যে সকল হিন্দু সম্প্রদায়, ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চলিতেছেন বলিয়া রাজা তাঁহাদের সহিত, বিশেষ ভাবে, ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে উপদেশ দিতেছেন, সেই সকল সম্প্রদায়ের লোক জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, অনেকেই আত্মাংশে জীবের অনাদিত্ব স্বীকার করেন। তথাপি রাজা তাঁহাদিগকে "এই ধর্ম্মাক্রান্ত" অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, রাজা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান্ হইয়া হিন্দু পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্রানুসারে, আত্মাংশে জীবের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গুরুকরণে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদে যেরূপ গুরুর কথা আছে, সেই প্রকার গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। গুরুর লক্ষণ দেখিয়া গুরু নির্ব্বাচন করিয়া লইতে বলিয়াছেন। বৈষ্ণবগুরু কিম্বা কৌলগুরুকে যে সাক্ষাৎ ভগবান্ বা শিবস্বরূপ বলা হইয়াছে, উহা রামমোহন রায়ের মতে কেবল, মাহাত্ম্যসূচক বাক্যমাত্র। উহার অর্থ কেবল এই যে, গুরুকে বিশেষভাবে ভক্তি করিতে হইবে। রাজা গুরুর ব্রহ্মত্ব বা অভ্রান্তত্ব স্বীকার করেন নাই। সুতরাং কবীরপন্থী প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায়ের লোক ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চলিতে-ছেন, তাঁহাদিগকে যে, স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আশ্চর্য্য কি? আর একটি কথা এই যে, তিনি ধর্ম্মের যে দুইটি মূল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে একতা দেখিলেই লোককে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেন। অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাহা তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

প্রচলিত ভাষায় ও সংগীতদ্বারা উপাসনা

কবীরপন্থী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় নিরাকার উপাসক সম্প্রদায় সকল, প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষদাদি বেদাভ্যাস না করিয়া কেবল দেশপ্রচলিত ভাষায় সঙ্গীতাদি করিয়া উপাসনা ও ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকেন। পাছে কেহ মনে করেন যে, প্রচলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া উপাসনাদি করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য, তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ

করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, প্রচলিত ভাষায় উপদেশ ও সংগীতাদির দ্বারাও লোকে ব্রহ্মসাধন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। বেদপাঠ ও বেদগান ভিন্ন যে ব্রহ্মসাধন হইতে পারে না, এমন নহে। বেদগানে অসমর্থদের বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ;—

ঋগ্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা।
গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।।
বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি ।।

ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান, ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান, ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয়। এই সকল মোক্ষসাধন সংগীত অভ্যাস করিলে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ, ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি বিষয়ে যাঁহারা প্রবীণ, এবং তালজ্ঞ, তাঁহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হন।

সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সগুরুঃ স্মৃতঃ ।।

স্মার্ত্তধৃত শিবধর্ম্মের বচন।

শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন, তাঁহাকে গুরু কহা যায়।

মনুর মতে ব্রহ্মসাধনের প্রথম উপায় ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। দ্বিতীয় উপায় প্রণবাদি বেদাভ্যাস। যাজ্ঞবল্ক্য সাধকদিগের অধিকার আরও প্রশস্ত করিয়া দিলেন। সংস্কৃত প্রণবাদির পরিবর্ত্তে দেশভাষায় গান ও উপদেশাদি চলিবে, ইহাই ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রানুসারে, উপনিষদ্ পাঠাদি ও প্রচলিত ভাষায় উপাসনা, এ দুয়েরই স্থান রহিল।

রাজা 'প্রার্থনাপত্রে' হিন্দু ব্রহ্মোপাসক এবং একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এই প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছেন যে, হিন্দু ব্রহ্মোপাসক বেদাদি শাস্ত্র মানেন, আর একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ান, খ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য বলেন। রাজার মতে, এ প্রভেদ গুরুতর নহে। উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্যই প্রধান। সে বিষয়ে যখন কোন ভিন্নতা নাই, তখন উপাসকদিগের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় রামায়ৎ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বহুলোক আছেন, যাঁহারা রামাদি অবতার স্বীকার করেন। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে ধ্যান করেন, নানা অবতারের ঐক্যদর্শন করেন, কিন্তু কোন বাহ্যপ্রতিমা নির্ম্মাণ করেন না। সেইরূপ খ্রীষ্টিয়ান-দিগের মধ্যে, যাঁহারা পরমেশ্বরের ত্রিত্ব ও খ্রীষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করেন, অথচ কোনরূপ প্রতিমূর্ত্তি ব্যবহার করেন না, (যেমন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ), তাঁহাদের সহিত উপরি-উক্ত রামায়ৎ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য আছে। এই উভয় সম্প্রদায়ই অবতারবাদী ও কোনরূপ বাহ্যপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের বিরোধী। রাজা বলিতেছেন, হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান, ঐ উভয় প্রকার সম্প্রদায়েরই সহিত আমাদের অবিরোধিভাব থাকা কর্ত্তব্য।

এদেশে ও ইয়োরোপে যাঁহারা অবতারে বিশ্বাস করেন, এবং উহার বাহ্যপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন, তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকা উচিত নহে। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানগণ, পরমেশ্বরের ত্রিত্বে, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, এবং বাহ্যপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষেও এমন সকল হিন্দু রহিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের ন্যায়, অবতারে বিশ্বাস করেন, ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান ও ভারতবর্ষীয় হিন্দুর মধ্যে এ প্রকার সাদৃশ্য দেখিতেছি। রাজা বলেন যে, ভারতবর্ষীয় ও ইয়োরোপীয় এই দুই উপাসকসম্প্রদায়ের লোককে, বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, ইঁহাদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে।

বিভিন্ন ধর্ম্ম সকলের শ্রেণীবিভাগ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে (প্রার্থনাপত্র) দেখা যায় যে, রাজা রামমোহন রায় জগতে প্রচলিত ধর্ম্ম সকলকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবন্ধ করিয়াছেন। যাহারা এক মাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক, তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের "দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরুনানকের সম্প্রদায় ও দাদুপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন।" রাজার মতে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানগণ এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। অবতারবাদী খ্রীষ্টিয়ান ও অবতারবাদী হিন্দু, যাঁহারা আপনাদের উপাস্য দেবতার প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনে মনে তাঁহার ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তৎপরে যে সকল অবতারবাদী খ্রীষ্টিয়ান ও হিন্দু, উপাস্যদেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম, নিরাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী খ্রীষ্টিয়ান; দ্বিতীয় অবতারবাদী, অথচ প্রতিমাপূজার বিরোধী এরূপ হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান, এবং তৃতীয় অবতারবাদী ও মূর্ত্তিপূজক হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান, বিভিন্ন নামধারী হইলেও রাজার মতে আধ্যাত্মিক ভাবে ইঁহারা এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান এই বিভিন্ন নামে কিছুই আসিয়া যাইতেছে না। জ্ঞানের অবস্থানুসারে রাজা, নিরাকারবাদী, অবতারবাদী প্রভৃতি হিন্দু খ্রীষ্টিয়ানগণকে একত্রীভূত করিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত দুই প্রকার শ্রেণীভুক্ত অবতারবাদী হিন্দুর সহিত, আমরা যেরূপ ব্যবহার করিব, ঐরূপ দুই প্রকার শ্রেণীভুক্ত অবতারবাদী খ্রীষ্টিয়ানদিগের সহিতও সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমরা কাহারও প্রতি বিদ্বেষী হইব না। রাজা পরিশেষে বলিতেছেন;—"কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইয়োরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন, তখনও তাঁহাদিগে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়।" ইত্যাদি।

'আত্মানাত্মবিবেক'

এই গ্রন্থখানি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। রামমোহন রায় বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত মূলগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে বৈদান্তিক মত সকল জানিতে পারা যায়।

'ক্ষুদ্রপত্রী'

রামমোহন রায় ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটি সুশ্রাব্য ছন্দোবন্ধ শ্রুতি, শ্রুতিমর্ম্ম ও গীত এক এক খণ্ড দীর্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশক তাহা 'ক্ষুদ্র পত্রী' নামে দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত

ব্রহ্মসঙ্গীত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতুল কীর্ত্তি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীতের তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার নিজের ও বন্ধুগণের

বিরচিত সঙ্গীতগুলি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই উক্ত পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পরেও অন্যান্য লোকের দ্বারা উহা অনেকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল সঙ্গীত এক্ষণে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে। কি ব্রহ্মোপাসক, কি পৌত্তলিক, রামমোহন রায়ের সঙ্গীত সকলেরই নিকট সমাদৃত। এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু ও অনিত্যতা বিষয়ে রামমোহন রায়ের সঙ্গীতের তুলনা নাই। "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" প্রভৃতি গীতগুলি ঘোর বিষয়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও বিদ্যুতের ন্যায় বৈরাগ্য প্রতিভাত করিয়া দেয়। অসামান্য তর্কশক্তিসম্পন্ন হইয়াও তিনি যে কবিত্বশক্তিবিহীন ছিলেন না, গীতগুলি ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। যে সঙ্গীতটির উল্লেখ করা হইল, তাহাতে মৃত্যুর ছবি কেমন নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত করা হইয়াছে! বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত, অথচ কেমন ভয়ঙ্কর!

রাজার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বিশেষরূপে আত্মজ্ঞানসাধনের সহায়। বেদান্তের জ্ঞানমার্গ ও উপাসনানুযায়ী রচিত। ব্রহ্মের নিরাকারত্ব, নামরূপাতীত ও ত্রৈগুণ্যাতীত ভাব, সর্ব্বব্যাপীত্ব; দ্বৈতভাববর্জ্জন ও অদ্বৈতভাব দৃঢ়ীকরণ, সংসারের অনিত্যতা, শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যসাধন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অভিমান এবং আমি আমার ভাবত্যাগ, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতে এই সকল বিষয়ের উপদেশ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীত সকল সেই ভাবে রচিত। এতদ্ভিন্ন, উহা বেদান্তানুযায়ী সাধনের একান্ত উপযোগী। আত্মানাত্মবিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি বেদান্তানুযায়ী সাধনের পক্ষে তাঁহার সঙ্গীত, বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। উহাতে পরমেশ্বরের দয়া প্রভৃতিরও বর্ণনা রহিয়াছে।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহার রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে, রামমোহন রায়ের গীতার বিষয়ে বলিয়াছেন;—"তিনি (রামমোহন রায়) অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত, বোধ হয়, পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়-নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সমন্বিত। অনেক কলাবতেরা সমাদরপূর্ব্বক উহা গাইয়া থাকেন।"

আমরা নিম্নে, রাজা রামমোহন রায়ের নিজের রচিত বিভিন্ন ভাবের কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম।

ইমন—আড়াঠেকা

ভুল না নিষাদকাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল,
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন।
নিত্যসুখ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।।
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ।।

ইমন কল্যাণ—তেওট

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমানভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

সাহানা—ধামাল

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়।
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়।

বেহাগ—কাওয়ালী

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ,
বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকারবিহীন, কামক্রোধহীন,
নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময়।
উপমারহিত, সর্ব্বজনহিত
ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল
পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা।
সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন,
ভ্রমেন নিয়মে যাঁর।

জলবিন্দুপরি, শিল্পকার্য্য করি,
দেন রূপ চমৎকার।
পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা,
যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবরজঙ্গম, যথা যে নিয়ম,
সেই ভাবে সব রয়।
আহার উদরে, দেন সবাকারে।
জীবের জীবনদাতা।
রস রক্তস্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে,
পান হেতু বিশ্বপাতা।
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ,
হয় যাঁর নিয়মেতে।
সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর,
ভাব মনে বিধিমতে।

কেদারা—আড়াঠেকা।

বিগতবিশেষং, জনিতাশেষং,
সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতীতং,
স্মর পরমেশং তূর্ণং।
গচ্ছদপাদং, বিগতবিবাদং,
পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং, বিরহিতবর্ণং,
গৃহ্ণদহস্তমপীনং।
বেদৈর্গীতং, জগদালোকং,
সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং।
ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং,
নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাশং, জগদাবাসং,
সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং।

গৌড়মল্লার—আড়াঠেকা।

সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথা কর অন্বেষণ,
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ।
যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ,
মাজিয়া মন-দর্পণ তারে কর দরশন।

ইমন কল্যাণ—ধামাল।

শশ্বতমভয়শোকমদেহং
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং
দিনকরশশিশরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতোজগতোস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ।
যোনভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং।

টোড়ি—আড়াঠেকা।

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্ব্বান্তরে ।।
সূর্য্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপ করে স্থিতি,
শশীতে শীতলতা জগতে এই রীতি,
তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ,
সেই ব্যাপ্ত চরাচরে।

আলাইয়া—আড়া।

কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ,
সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে।
ফলশ্রুতি বাণী, হৃদয়েতে মানি,
প্রফুল্ল আপনি আপন মনে।
সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা,
অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে?

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

মন যাঁরে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে?
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধভাবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য, এই মাত্র নিভ্রান্ত জানিবে।

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, 'ইহাগচ্ছ' বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে আসন প্রদান করে,
'ইহতিষ্ঠ' বল তারে, একি অবিচার।
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার।

আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

শিবভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয় ।।
হংসরূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয়।
স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম,
প্রত্যেকেতে যথাক্রম, যাতে লীন হয়।
কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈতগর্ব্ব,
একাত্মা জানিবে সর্ব্ব, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারাইয়ে কর একি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর, অপরে পরম জ্ঞান ।।
জলভ্রমে মরীচিকা আশামাত্র সার,
অলভ্য বাণিজ্য তাহে না দেখি সংসার।
অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব, অতত্ত্বে যথার্থ ভান ।।

সংসারের অনিত্যতা ও মৃত্যুবিষয়ক সঙ্গীত

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এই হল এই হবে এই বাসনায়।
দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়।
মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্য বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিমকলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ।
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ ।।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহপূর্ণ ধনে আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর।
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর।
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর ।।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দম্ভভাবে কত রবে হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ না কর সন্ধান।

রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুলমতি,
অথচ অমর বলি মনে মনে ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে, মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি, বলে বন্ধুগণে ;
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধনজনবলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে, কি ভয় মরণে।

রামকেলী—

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে।
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছুদিনে ;
লোলচর্ম্ম কদাকার, কফ কাশ দুর্নিবার,
হস্তপদশিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণেক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে, নম্রভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন।

সঙ্গীতরচয়িতাদিগের নাম

সঙ্গীত পুস্তকের যে সঙ্গীতগুলি রামমোহন রায়ের বন্ধুগণের বিরচিত, তাহার নিম্নে রচয়িতাগণের নামের সংকেত আছে। অনেকেই গীতরচয়িতাদিগের প্রকৃত নাম জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। সেই জন্য, আমরা নিম্নে তাঁহাদের সাঙ্কেতিক ও স্পষ্ট নাম লিখিয়া দিলাম।

ক্, ম, কৃষ্ণমোহন মজুমদার।
নী, ঘো, নীলমণি ঘোষ।
নী, হা, নীলরতন হালদার।
গৌ, স, গৌরমোহন সরকার।
কা, রা, কালীনাথ রায়।
নি, মি, নিমাইচরণ মিত্র।
ভৈ, দ, ভৈরবচন্দ্র দত্ত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বেথুন স্কুলের সম্পাদক, তখন এই ভৈরবচন্দ্র দত্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দিন শুনিলেন যে,—

"অহংকারে মত্ত সদা অপার বাসনা"

এই সঙ্গীতটি ভৈরব বাবুর রচিত, সেই দিন হইতে তাঁহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্মানের সহিত সম্বোধন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

নীলমণি ঘোষ

গীতরচয়িতাদিগের মধ্যে নীলমণি ঘোষের বিষয়ে পাঠকবর্গকে আমরা একটি গল্প বলিব। গীত রচনাবিষয়ে ইঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। "ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সদরমেট জগন্নাথ ঘোষের পুত্র। ইঁহাদিগের বাটী প্রথমে কাঁসারিপাড়ায় ছিল, এক্ষণে গড়পার।" যে সময়ে রামমোহন রায়ের উপদেশে, নীলমণি ঘোষের চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি তৎকালীন মানসিক ভাবব্যঞ্জক একটি ভক্তিরসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়া এক দিবস রামমোহন রায়কে শুনাইলেন। গীত শুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। আমরা উক্ত সঙ্গীতটি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কে জানে তোমায় তারা,
তুমি সাকারা কি নিরাকারা?
বাক্যেতে কহিতে নারি
বর্ণেতে বর্ণিতে হারি,
ন ষণ্ড ন পুমান্ নারী,
ব্যোম আদি ধরা।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে,
কোন মতে নাম লয়ে,
হই যেন সারা।

কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচার

[illegible] ও অন্যান্য বিষয়ে রামমোহন রায়ের অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকের সারমর্ম্ম আমরা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি। আর একখানি পুস্তকের কথা বলিব। ইহার নাম 'কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচার'। উক্ত পুস্তকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, শূদ্রের পক্ষে সুরাপান শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য নহে। এমন কি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরও বিহিত মদ্যপানের অধিকার আছে। শাস্ত্রানুযায়ী সুরাপান করিলে ধর্ম্ম-হানি হয় না। রামমোহন রায় মদ্যপানের পক্ষসমর্থন, কেবল এই ক্ষুদ্র পুস্তকেই করিয়াছেন, এমন নহে ; 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদেও ঐ প্রকার মত সমর্থিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় সুরাপানের পক্ষসমর্থন করিতেন, ইহা শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন। বিবেচনা করিলে ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহাপুরুষেরাও ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহেন ; ইহাতে কেবল এই সত্যটিই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের স্মরণ করা উচিত। আমরা এক্ষণে সুরাপানের যে প্রকার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাঁহার সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। হিন্দুসমাজের মধ্যে বিলাতি সভ্যতার আধিপত্য তখন এতদূর বিস্তৃত হয় নাই। সুরাপান তিনি দূষণীয় মনে করিতেন না বটে, কিন্তু অতিরিক্ত পানের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। যে পরিমাণে সুরাপান করিলে চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা যার পর নাই নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজে এত অল্প পরিমাণে সুরাপান করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত না। কোন প্রাচীন ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যতবার একটু করিয়া সুরাপান করিতেন, প্রত্যেক বারে এক একটি কপর্দ্দক সম্মুখে রক্ষা করিতেন। কপর্দ্দক রক্ষা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কপর্দ্দক হইলেই আর তিনি কোনক্রমেই সুরাস্পর্শ করিবেন না। কথিত আছে, এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া আমোদ দেখিবার জন্য কয়েকটি কপর্দ্দক চুরি করিয়াছিলেন, সুতরাং ভ্রমক্রমেই তাঁহার পানের পরিমাণ অধিক হইয়া গিয়াছিল। রামমোহন রায় ইহা অনুভব করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, কেহ তাঁহার কপর্দ্দক চুরি করিয়া থাকিবে। কে চুরি করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং "বরং পণ্ডিত শত্রু ভাল অথচ মূর্খ বন্ধু ভাল নহে" এই মর্ম্মের সংস্কৃত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। অতিরিক্ত সুরাপানের প্রতি তাঁহার এতদূর বিদ্বেষ ছিল যে, তাঁহার কোন বন্ধু একবার উক্ত দোষে দোষী হইয়াছিলেন বলিয়া ছয় মাস কাল তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই।

উপরি-উক্ত গ্রন্থ সকল ব্যতীত রামমোহন রায় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি অনুবাদিত প্রাচীনশাস্ত্র এবং কয়েকখানি স্বরচিত গ্রন্থ। শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎ, গুরুপাদুকা ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে উক্ত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় না। স্বরচিত অথবা অনুবাদিত গ্রন্থ ভিন্ন রামমোহন রায় কোন কোন জ্ঞানগর্ভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রকাশক বলেন,—"রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূত্রের সমগ্র সংস্কৃত শাঙ্কর-ভাষ্য পৃথক্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষৎ, তাহার সংস্কৃত বৃত্তি বা টীকা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। বেদান্তসূত্রভাষ্যখানি

চতুষ্পত্রাকারের (Quarto size) ৩৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহাতে রামমোহন রায়ের রচিত কিছুই নাই। উপনিষদের বৃত্তিগুলি, ভিন্ন লোকের রচিত" ইত্যাদি।

বেদচর্চ্চার পুনরুদ্দীপন

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ সকল প্রকাশ করাতে, রামমোহন রায়ের দ্বারা একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে বেদ বেদান্তের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়া যায়। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বংশবাটী প্রভৃতি স্থানে পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধীত হইত বটে, কিন্তু বেদ বেদান্তের কিছুমাত্র অনুশীলন ছিল না। বেদ মূলশাস্ত্র, সর্ব্বোপরি মান্য, ইহা অবশ্যই হিন্দুমাত্রই স্বীকার করিতেন, কিন্তু বেদে কি আছে, তদ্বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই প্রকৃত জ্ঞান ছিল।

"রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য" এবিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"বহুদিবসাবধি বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছিল ; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বেদ বেদান্তের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, শ্লোক, সূত্র ও ভাষ্য শুনিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ হইতে রামমোহন রায় যে ভূরি ভূরি স্বমতপোষক ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য সকল উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভট্টাচার্য্যেরা ও গোস্বামীরা অভিভূত হইয়া পড়িলেন।" সাধারণতঃ সকলেই ভাবিতেন যে, বেদে দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেব দেবীর পূজাই সমর্থিত হইয়াছে। "বেদে বলে তুমি ত্রিনয়না।" রামমোহন রায় ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ বেদান্তে কি আছে, তদ্বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

অসাধারণ পরিশ্রম

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন রায় ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। উহাতে তাঁহার যে প্রকার পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার পুস্তক সকলের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাবয়ব। কিন্তু তাহাতে প্রমাণস্বরূপ যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সঙ্কলন করিবার জন্য, যার পর নাই পরিশ্রম সহকারে রাশি রাশি গ্রন্থপাঠ আবশ্যক হইয়াছিল। অসাধারণ মেধাবশতঃ তিনি এই গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন।

যে রামরতন মুখোপাধ্যায়, রাজার সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পরলোকগমনের পর, দেশে ফিরিয়া আসিলে, রাজার গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর নিকটে বলিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহার মানিকতলার বাটীতে রাত্রি দুইটা বা তিনটা পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন ও লিখিতেন। একটা বড় ঘুরান, গোল টেবিল করিয়াছিলেন। উহার অপর দিকে কোন পুস্তক থাকিলে, উঠিয়া গিয়া আনিতে হইত না ; টেবিল ঘুরাইলেই পুস্তক নিকটে আসিত।

'পৌত্তলিক মুখচপেটিকা' প্রকাশ

রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য বাবু ব্রজমোহন মজুমদার, ধর্ম্মতলার ইউনিটেরিয়ান্ মুদ্রাযন্ত্র হইতে "পৌত্তলিক মুখচপেটিকা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।*

---

* ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এমন সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ আমরা কখন দেখি নাই। ইহাতে যেরূপ শাস্ত্রীয়জ্ঞান ও প্রখর তর্কশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করেন যে, উহা রাজা রামমোহন রায়েরই লিখিত। বেনামি পুস্তক প্রকাশ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; সুতরাং এ অনুমান অমূলক বলিয়া একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। যাহা হউক, উহা যে অন্ততঃ তাঁহার বিশেষ সাহায্যে লিখিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। সে সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যক্তির নামে উক্ত পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। অনেকদিন পরে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে যখন উক্ত পুস্তক প্রকাশ করা হয়, তখন উহার কঠোর নামের পরিবর্ত্তে 'পৌত্তলিক প্রবোধ' এই নামকরণ হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ

আত্মীয়সভাসংস্থাপন। প্রকাশ্য উপাসনা সভা সংস্থাপন ;

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

(১৮২৬—১৮২৯ সাল)

রামমোহন রায়ের কলিকাতা বাসের পর বৎসর, অর্থাৎ ১৭৩৭ শকে (১৮১৫ খ্রীঃ অঃ) তিনি তাঁহার মানিকতলার ভবনে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা সংস্থাপন করেন। পর বৎসরই সিমলা ষষ্ঠিতলায় রামমোহন রায়ের বাটীতে সভা উঠিয়া যায়। কিন্তু আবার তৎপর বৎসরেই মানিকতলার বাটীতে উঠিয়া আসে। সভা সপ্তাহে এক দিন করিয়া হইত। শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন, এবং গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন ; কিন্তু শ্লোক ব্যাখ্যা হইত না। এই সময়ে লোকের বিরাগ ও নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার কয়েক জন অনুচর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। জয়কৃষ্ণ সিংহ পৌত্তলিকদিগের সহিত যোগ দিলেন, এবং সর্ব্বত্র এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, আত্মীয়সভায় গোবৎস হত্যা করা হয়। এই সকল প্রতিকূল অবস্থা, রামমোহন রায়কে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি সর্ব্বদা আপনার উদ্দেশ্যসাধনে যত্নশীল থাকিতেন, এবং প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে গম্ভীরভাবে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু সকলে ছাড়িলেন না। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, মধ্যে মধ্যে, এবং স্বর্গীয় ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু, রাজনারায়ণ সেন, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি নিয়মিতরূপে আত্মীয়সভায় উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্য-রূপে রামমোহন রায়ের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া গালি দিত।

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা

রামমোহন রায়ের বাটীতেই আত্মীয়সভা হইতে লাগিল। পরিশেষে, তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে তিনি স্বয়ং সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। সেই জন্য সভা কখন বৃন্দাবন মিত্রের বাটীতে, কখন উপনগরে, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে, এবং কখন তুলাবাজারে বিহারীলাল চৌবের বাটীতে হইয়াছিল।

এক মহা বিচারসভা ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর পরাভব

আত্মীয়সভা কিছুকাল পর্য্যন্ত এইরূপে চলিল। পরিশেষে ১৮১৯ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে, ১৭ পৌষ দিবসে, উপরি-উক্ত বিহারীলাল চৌবের ভবনে এক মহাসভা

হইল। কলিকাতা ও উপনগরের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভামণ্ডপে আসীন হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিবার জন্য, কলিকাতার প্রধান সমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বড় বড় ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। রামমোহন রায়কে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভার নিকট সকলই বিফল হইয়া গেল। সভা-স্থলে যে যে তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর তর্কই প্রধান। তিনি বলিলেন যে, বঙ্গদেশে প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং এখানে বেদপাঠ হওয়া উচিত নহে। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী এই কথা বলিলে, কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কেহই প্রতিবাদ করিলেন না। অবশেষে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে তাঁহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধের পর, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে নিরস্ত হইতে হইল। রামমোহন রায়ের অসামান্য ক্ষমতার কথা তাড়িতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পৌত্তলিকগণ ক্রোধ ও বিদ্বেষবশতঃ বিবিধ প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট-সাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

মোকদ্দমার জন্য ব্যস্ততা

রামমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ, সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্য, তাঁহার নামে সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় উহাতে এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এই সময়ে দুই বৎসরকাল আত্মীয়-সভা বন্ধ ছিল। এই অভিযোগসম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ
শরণং।

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ প্রণামা পরার্দ্ধ নিবেদঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্য লোকের কথা প্রমাণ মহাশয়ের নামে হিস্যা পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্য্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকট জাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি।

শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।—

পরম পুজনীয়—
শ্রীযুৎ রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়,

শ্রীচরণ সরজেষু

পত্র দেনা মোং কলিকাতা।

এতদ্ভিন্ন, এই সময়েই বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর পিতৃঋণের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কলিকাতা প্রভিন্স্যাল কোর্টে নালিশ করেন। শুনা যায়, রামমোহন

রায় প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ হওয়াতেই মহারাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় যেরূপে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিয়া জয়লাভ করেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।*

অনেকদিন হইতে রামমোহন রায়ের মনে এই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য বিধিপূর্ব্বক একটি সমাজসংস্থাপন করেন; কিন্তু উপরি-উক্ত মোকদ্দমা সকল এবং তজ্জনিত অন্যান্য কষ্টে পড়িয়া তিনি মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, শিষ্যদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই।

উপাসনাসভা সংস্থাপনের প্রস্তাব, ও কমল বসুর বাটীতে সভাপ্রতিষ্ঠা

আড্যাম সাহেব বুদ্ধিমান্ ও সরল লোক ছিলেন। মতপরিবর্ত্তনের পর তিনি বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। 'হরকরা' নামক সংবাদপত্রের আপিস-বাড়ীর দ্বিতীয়তল গৃহে 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' (Unitarian Society) নামক এক সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ানদিগের মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা হইত। রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে তাঁহার পুত্রগণ, কয়েকজন দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি, এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব এই দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। এক দিবস সভা ভঙ্গ হইলে তাঁহারা গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন যে, বিদেশীয়দিগের উপাসনাস্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাকিনিবাসী রায় কালীনাথ মুন্সীর সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে, এই বিষয় স্থির করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে এক সভা হইল। সভাতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রায় কালীনাথ মুন্সী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং হাবড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক বলিলেন যে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। চন্দ্রশেখর দেবের প্রতি ভার দেওয়া হইল যে, তিনি সিমলায় শিবনারায়ণ সরকারের বাটীর দক্ষিণে এক খণ্ড ভূমির মূল্য স্থির করেন। কিন্তু উক্ত স্থান, উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে অনুকূল বলিয়া বোধ না হওয়াতে, যোড়াসাঁকো, চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর† একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া ১৭৫০ শকে, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, ৬ই ভাদ্র, উপাসনাসভা সংস্থাপিত হইল।

প্রতি শনিবার, সন্ধ্যা সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইত। দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ, এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে, রাম-চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে, সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ হিন্দুগণ অনেকে সভায় উপস্থিত হইতেন।

---

* ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† পর্টুগিজ বণিকদিগের অধীনে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া লোকে কমললোচন বসুকে ফিরিঙ্গি কমল বসু বলিত। এক্ষণে হরনাথ মল্লিক উক্ত বাটীর স্বত্বাধিকারী।

বর্ত্তমান সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা

এই সভা সংস্থাপনের অল্পদিন পরে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে, চিৎপুর রোডের পার্শ্বে এক খন্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহার উপর বর্ত্তমান সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইল। ভূমি ক্রয়ের দলিলের নকল আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীশ্রীহরি
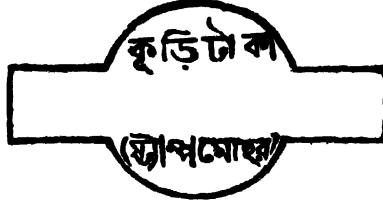
CEMIN

SUPT

মহামহিম শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীকালীপ্রসাদ কর ওলদে ৺বৈষ্ণবচরণ কর এবনে ৺রামসংকর কর কস্য জমী বিক্রয় কবলা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে সহর কলিকাতা সুতানুটি গ্রামের মধ্যে আমার পৌত্রীক বসতবাটী যে আছে ইহার চৌহুদ্দী চিৎপুর রোডের পুর্ব্বধার ফুলবিতরণের বাটীর দক্ষিণ ৺রামকৃষ্ণ করের বাটীর উত্তর রাধামণি ব্রাহ্মণীর বাটীর পশ্চিম এই চত্তর সীমার মধ্যে আমার পৌত্রীক খরিদা পাট্টাই জমী মায় এমারত কম বেশ /৪।/ চারি কাঠা অর্দ্ধপুয়া আমার অসাধারণ ভোগ দখলে আছে। ঐ চারি কাঠা অর্দ্ধপুয়া জমি মায় এমারত মহাশয়দিগের নিকট চিরকাল ব্রহ্মসমাজের নিমিত্তে মবলগে শিক্কা ৪২০০ চারি হাজার দুইশত টাকা পোনে বিক্রয় করিলাম। জমি মজকুরা আমুল মামুল মাফিক আমল দখল করিয়া মহাশয়রা ইচ্ছামত নওয়া ইমারত বানাইয়া জদাসএ খরিদ করিতেছেন তদাসয় পরন্তু চিরকাল করিবেন আমি কি আমার উত্তরাধিকারির সহিত কস্মীন কালে দাওা নাই দাওা করি কিম্বা কেহ করে সে ঝুটা ও বাতিল এতদার্থে পোনের বেবাগ টাকা নগদ দস্ত বদস্ত পাইয়া বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৬ বার সত্ত ছত্রীষ সাল তারিখ ২৮ জৈষ্ঠী।

ইসাদী

শ্রীরামধন মালাকার
সাং সিমিলা

শ্রীকালীনাথ কর
সাং সুতানুটী

শ্রীবংশধর আমদার
সাং কলিকাতা

রসীদ রূপেয়া বাবদী উপরের লিখীত জমি মায় এমারত বিক্রয়ের পোন সন ১২৩৬ সাল তাং—

আসামী	রূপেয়া
নিজরোজ	
গূঃ খোদ	৪২০০
রোক শিক্কা	

দঃ চারিহাজার দুই সত
টাকা মাত্র
শ্রীকালীপ্রসাদ কর
সাং সূতানুটী

ইসাদী

শ্রীকালীনাথ কর

শ্রীরামধন মালাকার
সাং সিমিলা

শ্রীবংশীধর আমদার
সাং কলিকাতা।"

এই দলিল, বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে রক্ষিত। উক্ত দলিলদ্বারা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় জানা যাইতেছে ১ম, ২০ টাকার ষ্ট্যাম্পে উহা লিখিত হইয়াছে। ২য়, ৪২০০ টাকায় গৃহ সহিত চারিকাঠা আদ পোয়া জমি বিক্রয় হইয়াছিল। উক্ত সময়ের সহিত তুলনা করিলে এখন কলিকাতায় ভূমির মূল্য কত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ৩য়, ১২৩৬ সালের ২৮সে জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজী ১৮২৯ সালের ৬ই জুন, উক্ত দলিল প্রস্তুত হইয়াছিল। ৪র্থ, ভেণ্ডার অর্থাৎ ষ্ট্যাম্পবিক্রেতার নাম, ব্রজমোহন দত্ত। ৫ম, বিক্রেতার নাম শ্রীকালীপ্রসাদ কর, তিনি সূতানুটীনিবাসী। ৬ষ্ঠ, দলিলদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এখন যে স্থানের নাম জোড়াসাঁকো, যে সময়ে দলিল লেখা হইয়াছিল, তখন উক্ত স্থানকে সূতানুটী বলা হইত। অথবা, উভয় নামেই উক্ত স্থান পরিচিত ছিল। ৭ম, রামমোহন রায়ের নামের পূর্ব্বে দেওয়ান উপাধি রহিয়াছে, তখনও তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে দেওয়ান রামমোহন রায় বলিত, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিতেন। ৮ম, কেহ কেহ বলেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ শব্দের উৎপত্তি হয় নাই, ব্রহ্মসভা বলা হইত। সাধারণ লোকে উহাকে ব্রহ্মসভা বলিত বটে, এখনও অনেক লোকে ব্রহ্মসভা

বলিয়া থাকে। কিন্তু এই দলিলে ব্রহ্মসমাজ শব্দ রহিয়াছে। ঐ 'ব্রহ্মসমাজ' ক্রমে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিণত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্মসমাজ নাম ছিল।

১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ (১৮২৯ খৃষ্টাব্দ) হইতে এই নূতন গৃহে সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। এক্ষণে উক্ত দিবসই সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথমে কিছুদিন ভাদ্রমাসে সাম্বৎসরিক উৎসব হইত, এবং তদুপলক্ষে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ মুন্সী, ও বাবু মথুরানাথ মল্লিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বহু অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করিতেন।

মাঘের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ, প্রতিষ্ঠার দিন, মণ্টগোমেরি মার্টিন (Mr. Montgomery Martin) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইয়োরোপীয় উপস্থিত ছিলেন না। মার্টিন সাহেব 'History of the British Colonies' অর্থাৎ 'বৃটিশ উপনিবেশ সকলের ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তকের রচয়িতা। তিনি উক্ত পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা অনুবাদিত হইল।

"১৮৩০ সালে, এই সমাজ, রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুস্তকের লেখক, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনিই একমাত্র ইয়োরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচশত হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল।"

খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু আকারে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করাতে ইয়োরোপীয়গণ দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আশা ছিল যে, রামমোহন রায়ের দ্বারা এদেশে ক্রমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে। হিন্দু আকারে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইল। রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুচরগণ হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য সমাজসংস্থাপন করাতে 'জনবুল' নামক এক সংবাদপত্র আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনায় উইলিয়ম আড্যাম সাহেবেরও চক্ষু ফুটিল। তিনি, সেই সময়, একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই;—"রামমোহন বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেন, এমন নহে। তথাচ যে তিনি এই সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন ও ইহার পোষণ করিতেছেন, তাহার কারণ এই যে, ইহাদ্বারা পৌত্তলিকতা সমূলোৎপাটিত হইতে পারিবে। যাহা হউক, সরলভাবে বলিতে গেলে, আমাকে বলিতে হয় যে, কিছুদিন হইতে আমার মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে যে, তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রচারের উপায় মনে করিয়া, ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিতেছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তিনি সুসমাচার সকলকে (Gospels) ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

সমাজসংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মত-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। এরূপ স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে উহার সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব কি ছিল? সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? তিনটি কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেই এ প্রশ্নের মীমাংসা

হইয়া যায়। প্রথম, তিনি যে উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার উপাস্য দেবতা কে? দ্বিতীয়, উপাসক কে? এবং তৃতীয়, উপাসনার প্রণালী কি? আমরা ক্রমে এই তিনটি কথারই উত্তর দিতেছি, তাহা হইলেই মূল প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইবে।

প্রথম কথা, উপাস্য দেবতা কে? ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, অনাদ্যনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরই উপাস্য। কিন্তু কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। রামমোহন রায় সমাজগৃহের যে ট্রাস্টডীড-পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং এ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

...."For the worship and adoration of the eternal, unsearchable and immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe, but not under or by any other name, designation or title, used for and applied to any particular being or beings by any man of set of men whatsoever."....

দ্বিতীয় কথা, উপাসক কে? যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য রামমোহন রায়ের উপাসনামন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম, সামাজিক পদ, এ সকলের কিছুই বিচার নাই। যে কোন সম্প্রদায়, যে কোন ধর্ম্ম, যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে সকলেরই সমান অধিকার। এ সম্বন্ধে ট্রাস্টডীড পত্রে লিখিত হইয়াছে।

...."For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction, as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner."

তৃতীয় কথা, উপাসনাপ্রণালী কি? কোন প্রকার ছবি, প্রতিমূর্ত্তি বা খোদিত মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হইবে না। কোন প্রাণীহিংসা হইবে না। কোন প্রকার আহার, পান হইবে না। উপাসনা-গৃহের মধ্যে এ সকল কিছুই হইতে পারিবে না; সুতরাং উপাসনাপ্রণালীতেও সে সকল নিষিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। যে কোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা সম্প্রদায়ের উপাস্য, এখানকার বক্তৃতা, বা সংগীতে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণার সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। এ সকল অভাব পক্ষে। ভাব পক্ষে এই যে, যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যানধারণার উন্নতি হয়; প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা, ও সংগীত হইবে। অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না। ট্রাস্টডীড-পত্র হইতে এ সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

...."That no graven image, statue or sculpture, carving, painting, picture, portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuage, building, land, tenements, hereditaments, and premises, and that no sacrifice, offering, or oblation of any kind or of anything shall ever be permitted therein, and that no animal or living creature shall within or on the said messuage &c., be deprived of life, either for religious purposes or for food, and that no eating or drinking (except as shall be necessary

by any accident for the preservation of life) feasting or rioting be permitted therein or thereon, and that in conducting the said worship and adoration, no object, animate or inanimate, that has been, or is, or shall hereafter, become, or be recognized as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching, praying in the hymns or other mode of worship that may be used or delivered in the said messuage or building, and that no sermon, preaching, dicsourse, prayer or hymns, be delivered, made, or used in such worship, but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue and strengthening of the bonds of union between men of all religious persuasions, and creeds."......

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় কি, ট্রষ্টডীড-পত্র মনযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তথাচ আমরা তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিব।

রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব

রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কি নূতন? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন মহর্ষিগণ নিরাকার ব্রহ্মকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" অনুভব করিয়াছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশে উপনিষদ্ পূর্ণ। তবে রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নিরাকার পরমেশ্বরের সার্ব্বভৌমিক উপাসনাপ্রচার, এইটিই তাঁহার নূতন। রামমোহন রায় বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কি চন্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, ভ্রাতৃবন্ধনে বন্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কর। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কেন হও না, সকলে এস, সার্ব্বভৌমিকভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাদ্যনন্ত পরব্রহ্মের পূজা কর।"

মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নানা মহৎভাবের মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের জীবনপথের নেতাস্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, সেই ভাবটি তন্মধ্যে মধ্যবিন্দু হইয়া অবস্থিত করে। "আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন" উপনিষদ্‌কারদিগের ইহাই প্রধান ভাব। বিশ্বব্যাপী মৈত্রী", বুদ্ধদেবের ইহাই প্রধান ভাব। "আপনাকে আপনি জান," সক্রেটিসের ইহাই প্রধান ভাব। "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য" ঈশার ইহাই প্রধান ভাব। "একমাত্র ঈশ্বরের পূজা, অপর সকল দেবপূজার প্রতিবাদ" মহম্মদের ইহাই প্রধান ভাব। "ধর্ম্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" লুথরের ইহাই প্রধান ভাব। "ভক্তিতেই মুক্তি" শ্রীচৈতন্যের ইহাই প্রধান ভাব। "মানব প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি" থিওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব "সার্ব্বভৌমিক উপাসনা"। কেবল তাহাই নহে; সেই সার্ব্বভৌমিক উপাসনার জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠা; এটিও জগতের পক্ষে নূতন। দ্বিতীয় ভাবটি প্রথম ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবের মৌলিকত্ব (originality) কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

কিন্তু এস্থলে একটি কথা হইতেছে। রামমোহন রায় যদি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বভৌমিকভাবে সমাজসংস্থাপন করিয়াছিলেন, তবে তিনি সেই সমাজকে হিন্দু-ভাবে সজ্জিত করিলেন কেন? বাস্তবিক তিনি সমাজকে বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বেদীতে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছেন, বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে, এ সকল সম্পূর্ণ হিন্দুভাব। ট্রষ্টডীড-পত্রের অসাম্প্রদায়িক উদারভাব, এবং ঐরূপ হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, ইহাই বিবেচনার বিষয়।

কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অসঙ্গতি দোষে দোষী করিয়াছেন। আমরা সেরূপ কোন দোষ দেখি না। সত্যমাত্রেই অসাম্প্রদায়িক ও উদার। সত্য, ভারতবর্ষীয় কি ইয়োরোপীয়, হিন্দু কি যাবনিক, জাতীয় কি বিজাতীয় নাই। সত্য আমারও নহে, তোমারও নহে। উহা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সত্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, ও সত্যপ্রচারবিষয়ে, প্রত্যেক জাতি তাঁহাদিগের জাতীয়ভাব ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করেন, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বসিয়া প্রার্থনা করেন এবং কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া ও একবার বসিয়া প্রার্থনা করেন। সার্ব্বভৌমিকতা রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আর কি আছে? জাতীয়ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই, এরূপ নহে, ঐরূপ করাই কর্ত্তব্য। নতুবা প্রচারবিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। সমগ্র জগতের ইতিহাস এ-কথার যাথার্থ্যপক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে। ভক্তিভাজন সেণ্টপল পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়াছেন যে, যে লোকের নিকট প্রচার করিতে হইবে, তাহাদিগের জাতীয়ভাব ও রুচির অন্তর্বর্ত্তী হইয়া তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই বিধেয়। "Be all unto all men" ইহাই তাঁহার উপদেশ। অবশ্য কপটতাচরণ যে মহাপাতক, তাহা বলা বাহুল্য।

তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে হিন্দুপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ট্রষ্টডীড-পত্রের কোন্ কথার বিরুদ্ধ? এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজে যে ঘরে বেদপাঠ হইত, সেখানে শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। সত্য হইলে, এ প্রকার নিয়ম নিশ্চয়ই অসাম্প্রদায়িকভাবের বিরোধী। কিন্তু রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য বাবু চন্দ্র-শেখর দেব, আমাদের কোন বন্ধুর নিকট এ কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

সমাজকে যদিও হিন্দু আকার দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু উহা মূলে বিদেশীয়-দিগের অনুকরণ। প্রকাশ্য সভা করিয়া সামাজিক উপাসনা দেশীয়ভাব নহে। সমাজের ইতিবৃত্তেও দেখা যাইতেছে যে, আডাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি দেখিয়া তদনু-করণে আর একটি উপাসনা সভা করা হইয়াছিল। তবে সেই অনুকরণকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু আকার দেওয়া হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার ও সামাজিক অশান্তি

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের যত্নে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার হইতে লাগিল। অনেক সরলচিত্ত লোক রাজার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার মতে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধেরা স্বভাবতঃই রক্ষণশীল ; সুতরাং নব্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্য হইতে অনেকে সত্যগ্রহণে অগ্রসর হইলেন। এই প্রকারে প্রাচীন ও নব্যতন্ত্রে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে

অনেক পরিবারে পিতা-পুত্রের মধ্যে অশান্তি উপস্থিত হইল। সে ভয়ানক সময়! এখন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলে বা বর্ণসঙ্কর বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়; তখন কেবল সমাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল।

ধর্ম্মসভা, বাঙ্গালা ও পারস্যভাষায় সংবাদপত্র

কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতা লইয়াই বিবাদ নহে। সতীদাহ বিবাদের একটি প্রধান বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার ও সতীদাহ নিবারণের জন্য রামমোহন রায়ের প্রাণগত যত্ন দেখিয়া পৌত্তলিকগণ শঙ্কিত হইলেন; এবং রামমোহন রায়ের পথে কণ্টকনিক্ষেপ করিবার উদ্দেশে ধর্ম্মসভা নামে একটি সভা সংস্থাপন করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও সতীদাহ নিবারণের পক্ষসমর্থন করিবার জন্য এবং সাধারণতঃ সকল হিতকর বিষয়ে লিখিবার জন্য. এই সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় 'সংবাদ কৌমুদী' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ধর্ম্মসভা 'কৌমুদী'র প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ 'চন্দ্রিকা' নামক এক-খানি পত্র প্রকাশ করিলেন। ভারতবাসী সকল প্রকার লোকের পক্ষে বাঙ্গালা পত্রিকা বোধগম্য হইবে না বলিয়া, রামমোহন রায় পারস্য ভাষাতেও একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার আন্দোলন

ধর্ম্মসভার সভ্যগণ বিবিধ উপায়ে ব্রহ্মসভার অনিষ্টচেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মসভার অপরাধ এই যে, যাহাতে অনাথা বিধবাগণকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা না হয়, উহার সভ্যগণ তজ্জন্য যত্ন করিতেছিলেন। যাহা হউক, ধর্ম্মসভা বিলক্ষণ আড়ম্বরের সহিত চলিতে লাগিল। রাজা রাধাকান্ত দেব, সভাপতি। মতিলাল শীল প্রভৃতি নগরের প্রধান প্রধান ধনীগণ উৎসাহী সভ্য। লক্ষটাকা সভার মূলধন। এরূপ শুনা যায় যে, সভার দিনে চিৎপুর রোডের যে বাড়ীতে সভা হইত, তাহার প্রায় এক পোয়া পথপর্যন্ত গাড়ী দাঁড়াইত।

একদিকে এই। অপরদিকে রামমোহন রায় কয়েকজন অনুগত বন্ধুমাত্র লইয়া ব্রহ্ম-সভার গৃহে সত্যের ভাবী উন্নতির প্রতি নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। যাঁহারা তাঁহার অনুগত হইয়াছেন, তাঁহারা তজ্জন্য সাধারণের নিকট নিন্দিত, তিরস্কৃত ও ঘৃণিত। 'নাস্তিক', 'পাষণ্ড' প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ। সত্যের গূঢ় আকর্ষণে তাঁহারা তাঁহাদের উপদেষ্টা ও নেতা মহাপুরুষের মুখপানে তাকাইয়া সমুদায় সহ্য করিতেছিলেন। লোকবল, অর্থবল, আড়ম্বর, এ সকলের কিছুই নাই। ধর্ম্মসভার উন্নতি ও আড়ম্বর দেখিয়া অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, ব্রহ্মসভা আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। বাস্তবিক সে সময়ের অবস্থা দেখিয়া কে মনে করিতে পারিত যে, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ, উন্নতিপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে;—বালুকাকণাসন্নিভ বীজকণা হইতে বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে?

সাংসারিকভাবে দেখিলে, ব্রহ্মসভার দল সকল বিষয়ে ধর্ম্মসভার দলের অপেক্ষা হীন ও নিকৃষ্ট। কিন্তু একা রামমোহন রায়ের প্রতিভা সমগ্র বঙ্গভূমিকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। কলিকাতায় ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার কথা লইয়া যথা তথা আন্দোলন। এক এক দিন জনরব উঠিত যে, ব্রহ্মসভা ধর্ম্মসভার নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া গিয়াছে।

আবার কোন দিন বা ঠিক্ তাহার বিপরীত প্রকার জনরব উঠিত যে, রামমোহন রায়ের নিকট ধর্ম্মসভা পরাভব স্বীকার করিয়াছে, আর উহা মস্তক তুলিতে পারিবে না।

রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য, ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভা বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন ;—"তাঁহার (রাজা রাধাকান্ত দেবের) একজন অনুচর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইয়া ঘরে ঘরে রামমোহন রায়ের ও ব্রাহ্মসমাজের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে সকলকে নিষেধ করিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করিতেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ জাতিভ্রষ্ট হইতেন। তথাপি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশীয়েরা ও তথাকার সিংহ মহোদয়েরা, গঙ্গার পশ্চিম পারের মল্লিক বাবুরা, টাকিনিবাসী কালীনাথ মুন্সী ও তেলেনীপাড়া-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা স্বীয় প্রভাবে ধর্ম্মসভার ধর্ম্মবিরুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর শাসন তুচ্ছ করিয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মসমাজের ও রামমোহন রায়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই প্রকারে দুই দল তৎকালে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রহ্মসভার দল ও ধর্ম্মসভার দল। এই দুই দল লইয়া সমুদায় বঙ্গভূমিতে মহা দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসভার দলের প্রধান শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডে দান লইতেন অথবা ইঁহাদের নিকট হইতে দুর্গোৎসবের বার্ষিক গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা ধর্ম্মসভাভুক্ত ব্যক্তিদের কর্ম্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় প্রাপ্ত হইতেন না—তাঁহারা ধর্ম্মসভার দলের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইয়া থাকিতেন। এ নিমিত্ত ব্রহ্মসভার দলপতিরা স্বপক্ষ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের পোষণের নিমিত্তে অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ই মাঘে, সাম্বৎসরিক সমাজ উপলক্ষে, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজস্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে উক্ত দলপতিরা ধনদানদ্বারা বিশেষ সম্মান করিতেন।"

রামমোহন রায়ের কার্য্য ও হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থাসম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি

ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার একটি বক্তৃতায় হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থা ও রামমোহন রায়ের কার্য্যসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান্ ছিল। শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছেন। তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদায় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলই অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গাস্রোতের উপর এই সমাজরূপ জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন।............তিনি যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল,

দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল ; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়্গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্য-ভূমি ছিল ; ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শত সহস্র শত্রুদ্বারা আবৃত হইয়া কুঠারহস্তে সেই ঘোর অবিদ্যারণ্য সমভূম করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। এখন তো দিনে দিনে জ্ঞানপ্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের সুবিধা ও ফলের প্রাচুর্য্য হইয়া আসিতেছে। তখন সে প্রকার ছিল না। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে, তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এ সংসারে আনিতে পারিত না। তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। ......ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল ; তাঁর ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতন-ভোগী পর্য্যন্ত হইয়া জীবনপোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তাঁর মনে এই আনন্দ ছিল যে ভবিষ্যদ্বংশ আমার আশা সফল করিবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে, তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন ; আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্ব্বরা করিব। অতএব, রামমোহন রায় আপনার গৃহ-কার্য্যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার শত গুণ, এক ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থাপনের জন্য করিতে হইয়াছিল। একদিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে ঊনষষ্টিবৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ন ছিল। তাঁহার সেই যত্নের ফল দেখিয়া কি আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন হইতেছে না? যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি।......যখন কলিকাতায় তিনি প্রথম বাস করেন, যখন তিনি ১৭৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের ন্যায় এখানে আইলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগী হইয়া সাহায্য দিতে পারে? তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ধর্ম্মের অনুরাগে বিষয়ী লোকদিগকে আপনার পথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যখন প্রথম তিনি কলিকাতা নগরে আইলেন, তখন লোকেরা তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নরকে পতিত বলিয়া তিরস্কার করিত ; তাঁহার মুখদর্শন করিতে নাই, নাম উচ্চারণ করিতে নাই ; এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তাঁর কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিলেন? কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার কলিকাতার ক্ষমতাসম্পন্ন অনেক বড়মানুষ তাঁহার সহচর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিষয়ীদিগের কিসের সম্বন্ধ ছিল? আপনার ধর্ম্মমূর্ত্তিদ্বারা তিনি তো সকলকে বশীভূত করিতেনই, তদ্ব্যতীত, তিনি নানা প্রকারে বিষয়ীদিগের বিষয়ের উন্নতি করিয়া দিতেন এবং বিষয়ীরা বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে সাহায্য করিতেন। ধর্ম্মের উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু তাঁহার সদ্ভাব দেখিয়া তাঁহারা বশীভূত হইতেন, এবং প্রত্যুপকার বলিয়া রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিতেন। ....একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে, ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়, অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানাভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন "ও সব কেন? 'অলখনিরঞ্জন' গাও।" তখন ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই যে, ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হইবে।

"১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতীদগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্ম্মসভাও স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় নাচ, তামাসা, নৃত্য, গীত হয় ; কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে, ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্ম্মসভা সতীদগ্ধ করিবার দল। এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী, আর কে পরাজিত, তাহা আমরা এখন দেখিতেই পাইতেছি। কিন্তু সে সময়ে ধর্ম্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সঙ্কট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন ; কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন ; কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন। এই একটি তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরাও তাহাতে যোগ দিতেন। তখনকার লোকদিগের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারও যোগ দেখা যায় না ; কেবল তখনও যে বিষ্ণু গান করিত, এখনও সেই বিষ্ণু আছে।"

নবম অধ্যায়

সামাজিক আন্দোলন

সতীদাহ

(১৮১৭—১৮৩০ সাল)

রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে সতীদাহ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছিলেন ?

রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ নিবারণের জন্য, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্লীর শাসনকালের শেষ ভাগে প্রথম সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৫ই ফেব্রুয়ারি, তাঁহার আদেশানুসারে, ডাওডেস্ওয়েল সাহেব নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গুড সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—

"নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত গুড সাহেব মহাশয় সমীপেষু।

মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত মাননীয় গবর্ণরজেনেরল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে অবগত করিতেছি যে, বেহারের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রেরিত পত্রের যে প্রতিলিপি আপনার নিকট পাঠাইলাম, তাহা আপনি নিজামত আদালতের বিচারপতির নিকট উপস্থিত করিবেন। দেখিতে পাইবেন যে. উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর মৃত-দেহের সহিত নিজদেহ ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিলে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। নিজামত আদালত জ্ঞাত আছেন যে, এদেশীয় লোকের ধর্ম্মমত, আচার ব্যবহার এবং সংস্কার সকল জ্ঞাত হইয়া, নীতি, সুবিবেচনা ও দয়াধর্ম্মের সহিত যতদূর সঙ্গত হইতে পারে, এবং সকল অবস্থায় কার্য্যতঃ যতদূর সম্ভব, ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান নিয়ম। বেহারের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট, এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে সমুদয় ঘটনা লিখিয়াছেন,—ইহার কিশোর বয়স, ইহার নেসার অবস্থা (State of intoxication or stupefaction),—তাহার স্বামীর শবদাহের সময়ে, তাহার এই প্রকার অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরল ইহা নির্ণয় করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন যে. এই অস্বাভাবিক ও নৃশংস দেশাচার সম্পূর্ণরূপে রহিত করা যাইতে পারে কি না? অথবা উপরে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে. তদনুসারে যদি এই প্রার্থনীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এমন উপায় সকল অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না, যদ্দ্বারা ভবিষ্যতে সহগমনে প্রবৃত্ত নারীদিগকে তাঁহাদের আত্মীয়েরা অন্যায় উপায়ে উত্তেজিত করিতে না পারে। যেমন, বেহারের ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছেন যে, ঐ স্ত্রীলোকের আত্মীয়েরা উহার নেসা করাইয়া উহার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিয়াছিল। এরূপ গর্হিত কার্য্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

নিজামত আদালতকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আদালত যেন প্রথমে পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন যে, এই প্রথা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কি না? যদি এই প্রথা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল আশা করিতে পারেন যে, এক্ষণে না হইলেও, সহমরণপ্রথা সময়ে রহিত হইতে পারিবে। নিজামত আদালত যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, উক্ত প্রথা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া উহা রহিত করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল সাহেব নিজামত আদালতকে অনুরোধ করেন যে, যাহাতে উপরি উক্ত নিন্দনীয় কার্য্য সমুদয় রহিত হয়, এরূপ সদুপায় অবলম্বন করা হয়। যে কোন প্রকারে হউক, যাহাতে সহমরণোদ্যতা স্ত্রীলোকগণকে মাদকদ্রব্য ও ঔষধ সেবন করান না হয়, এরূপ করা আবশ্যক। অল্প বয়স বা অন্য কোন কারণে, হিতাহিত নির্দ্ধারণে অক্ষমা স্ত্রীলোকগণকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করা উচিত।

খৃষ্টাব্দ ১৮০৫
৫ই ফেব্রুয়ারি

ভবদীয় ইত্যাদি
ডাওডেস্‌ওয়েল্‌
বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ।"

১৮০৫ খৃষ্টাব্দ, ৪ঠা মার্চ্চ দিবসে, নিজামত আদালতের পণ্ডিতগণের নিকটে, কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য একখানি পত্র প্রেরণ করা হয়। সেই কয়েকটি প্রশ্ন এই ;—

"হিন্দুদের মধ্যে, সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখা যায় যে, কোন লোকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী মৃতস্বামীর চিতায় স্বামীর সহিত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া থাকেন, সেইজন্য আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, ঐরূপ কার্য্যে শাস্ত্রের কিরূপ বিধি আছে? মৃতস্বামীর অনুগমন করা শাস্ত্রসম্মত কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ? শাস্ত্রে সহগমনের ব্যবস্থাই বা কি কি? আপনাদিগকে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে ইহার উত্তর দিতে হইবে।"

নিজামতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—

"নিজামত আদালত কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রশ্ন বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া আমি যথাজ্ঞান তাহার উত্তর দিতেছি।

"যাঁহারা পত্যনুগমনের জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অত্যন্ত শিশুসন্তান থাকিলে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা হইলে, ঋতুকাল হইলে, কিম্বা নাবালিকা অবস্থা হইলে, তাঁহারা সহমৃতা হইবার যোগ্য নহেন ; উপরি উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি না থাকিলে, সহমৃতা হইতে কোন নিষেধ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিই এই নিয়ম। যে স্ত্রীলোকের শিশু-পুত্র বা কন্যা থাকে, তিনি ঐ শিশুর প্রতিপালনের জন্য কোন স্ত্রীলোককে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সহমৃতা হইতে কোন নিষেধ নাই। কোন উৎকট ঔষধ বা মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া কোন স্ত্রীলোককে সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। ঐরূপে অজ্ঞান বা উন্মত্ত করাও অবৈধ। সহমরণের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে সংকল্প করিতে হয়, এবং অন্যান্য কোন কোন বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। অঙ্গিরা, ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহামুনিগণ ইহার প্রবর্ত্তক।

"মানবদেহে সার্দ্ধত্রিকোটী লোম আছে। যাঁহারা সহমৃতা হন, তাঁহারা তৎসংখ্যক বৎসর, অর্থাৎ সাড়েতিনকোটি বৎসর স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস করেন। যেমন সর্প-ব্যবসায়ীরা গর্ত্ত হইতে সর্পকে টানিয়া বাহির করে, সেইরূপ সহমৃতা স্ত্রীলোকেরা নরক

হইতে নিজ নিজ স্বামীকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। পরিশেষে, স্বামীদিগের সহিত স্বর্গলোকে বিচরণ করেন। শিশুসন্তানবতী, গর্ভবতী, ঋতুমতী, ও অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকদের পক্ষে পূর্ব্বে যে নিষেধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সগর রাজার জননীকে ঔর্ব্ব ও অন্যান্য ঋষিরা বলিয়াছিলেন।

শ্রীঘনশ্যাম শর্ম্মা।"

ঘনশ্যাম শর্ম্মা নিজামত আদলতের বেতনভোগী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পত্র পাইয়া নিজামত আদালত হইতে, তাঁহাকে আরও দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সে প্রশ্ন এই ;—

"যদি কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইতে উদ্যতা হইয়া পুনর্ব্বার তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার পরিণাম কি হয়? তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন?"

ঘনশ্যাম শর্ম্মা এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—

"যদি কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য, সংকল্প ও অন্য সকল ক্রিয়া না করিয়া থাকেন তাহা হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। এ অবস্থায় তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। শাস্ত্রে তাহার কোন বিধি কিম্বা নিষেধ নাই। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিয়া সহমরণ হইতে নিবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের পর, তাঁহার জাতি-কুটুম্বেরা তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে পারেন।

"শাস্ত্রে আছে যে, যে স্ত্রীলোক সাংসারিক মায়াবশতঃ সহমরণ হইতে বিরত হন, তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত পাপমুক্ত হইতে পারেন না।

শ্রীঘনশ্যাম শর্ম্মা।"

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে, লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জর্জ্জ বার্লো এই তিনজন গবর্ণর জেনারল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। উক্ত সালে লর্ড ওয়েলেস্‌লির অধিকারের শেষে, সতীদাহ বিষয়ে যাহা কিছু কার্য্য হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিলাম। ঐ সালেই কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয়বার গবর্ণর জেনারল হইয়া আসিলেন। তাঁহার সময়ে সতীদাহ বিষয়ে কোন কার্য্য হয় নাই। ১৮০৫ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সার্ জর্জ্জ বার্লো গবর্ণর জেনারল ছিলেন। তাঁহার সময়েও সতীদাহ বিষয়ে কোন কার্য্য হয় নাই।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে, রাজপুরুষগণ সতীদাহ নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ান্ ক্রোপ সাহেব, ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, ৩রা আগষ্ট দিবসে, নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত টর্ণবুল সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহার সারমর্ম্ম এই ;—

"শ্রীযুক্ত টর্ণবুল সাহেব নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার মহাশয় সমীপেষু।
মহাশয়,

সম্প্রতি এক সতীদাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই।

সহমরণ সম্বন্ধে এখানকার কার্য্যালয়ে কোন আদেশ না থাকায়, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উক্ত বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিছু করিতে পারেন কি না, এবং কি উপায়ে সহমরণ হইতে হিন্দুস্ত্রীলোকগণকে নিরস্ত করা যাইতে পারে?"

উক্ত অব্দে, ৩রা সেপ্টেম্বরে, নিজামত আদালত গবর্ণর জেনারলকে সতীদাহ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় জ্ঞাত করেন। গবর্ণর জেনারল সতীদাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন।

১ম,—ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকদিগকে, যাহাতে তাঁহাদের আত্মীয়রা সহমৃতা হইবার প্রবৃত্তি দিতে, বা উক্ত বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২য়,—কোনরূপ মাদকদ্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে না।

৩য়,—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যে বয়সে স্ত্রীলোকের সহমৃতা হইবার অধিকার আছে, সেই বয়স নির্ণয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

৪র্থ,—সহগমনোদ্যতা নারী গর্ভবতী কি না, জানিতে হইবে।

৫ম,—উপরি উক্ত কারণ সকল থাকিলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সতীদাহ অসিদ্ধ। ঐ সকল স্থলে সতীদাহ নিবারণ করিতে হইবে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে, ৫ই ডিসেম্বরে, নিজামত আদালতের প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রার বেলি সাহেব, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ডাওডেস্‌ওয়েল্‌ সাহেবকে এক পত্র লেখেন। উহার সারমর্ম্ম এই ;—

"শ্রীযুক্ত জর্জ ডাওডেস্‌ওয়েল্‌ সাহেব সরকারী বিচারবিভাগের সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কয়েকটি আচার ব্যবহার বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া আপনা আপনি ক্রমে লোপ পাইয়াছে, কিম্বা হিন্দুরাজাদিগের উদ্যোগে রহিত হইয়াছে। সতীদাহপ্রথা হিন্দুধর্ম্মসম্মত হইলেও, হিন্দুজাতির ধর্ম্মের উপর গুরুতর আঘাত না করিয়া উহা শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কিনা, নিজামত আদালত ইহার মূল অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। অত্যন্ত সাবধানতার সহিত অনুসন্ধানের পর, উক্ত আদালতের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, এই প্রথার প্রতি লোকের অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এত অধিক যে, এ প্রদেশীয় সকল বর্ণের হিন্দুগণ ইহা প্রচলিত রাখিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্‌। অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষতঃ ত্রিহুতে, ধর্ম্মজ্ঞান উন্নত থাকাতে সতীদাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন কোন জিলায় এই প্রথা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে প্রবল, অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৮১২ খৃষ্টাব্দ
৫ই ডিসেম্বর

(স্বাক্ষর)
বেলি।
নিজামত আদালতের প্রতিনিধি
রেজিষ্ট্রার।"

১৮১৫ হইতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, মার্কুইস্‌ অব হেষ্টিংসের শাসনকাল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, ৪ঠা জানুয়ারি, সার্কুলার আদেশানুসারে সতীদাহের এক তালিকা সংগৃহীত হয়। তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত সালে কোন্‌ কোন্‌ বিভাগে, কত স্ত্রীলোক সহমৃতা হইয়াছিল।

মার্কুইস অব হেষ্টিংসের শাসনকালে, সতীদাহের যে তালিকা সংগৃহীত হয়, তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইংলণ্ডীয় কতক্গুলি হিতৈষী ব্যক্তির চেষ্টায় উহা প্রকাশিত হয়। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টারদিগের সভায় তাঁহারা এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। ইহাদ্বারা ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ সতী-দাহের বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন ; এবং এইরূপেই ইংলণ্ডীয় জনসাধারণ, সতীদাহ নিবারণের আবশ্যকতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সতীদাহ নিবারণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, ৯ই সেপ্টেম্বর, ব্যবস্থাপক সভার সরকারি সভাপতির আজ্ঞাক্রমে নিজামত আদালত, সতীদাহ বিষয়ে, ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ও পুলিস কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া, কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন।

সতীদাহ বিষয়ে পুলিসরিপোর্ট

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মসভার সহিত ধর্ম্মসভার বিবাদের একটি প্রধান কারণ সতীদাহ। সতীদাহরূপ ভয়ঙ্কর প্রথা, বঙ্গদেশে যে কি প্রকার প্রবল ছিল, তাহা এখনকার লোকেব জ্ঞান নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট পুলিস-কর্ত্তৃক যে বিজ্ঞাপনী উপস্থিত করা হয়, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে উক্ত বৎসরে, ব্রাহ্মণজাতিতে ২৩৪, ক্ষত্রিয় জাতিতে ৩৫, বৈশ্যজাতিতে ১৪, শূদ্রজাতিতে ২৯২ ; এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭৫ জন বিধবা সহমৃতা হইয়াছিল। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে ৩৪০ জন কলিকাতা কোর্ট অব সরকিটের সীমার মধ্যে সহমৃতা হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, উক্ত সীমার মধ্যে সহমরণের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই অনেক পরিমাণে ঠিক্। দূরবর্ত্তী স্থানের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাস্তব সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। এতদ্ভিন্ন, এই বিজ্ঞাপনীতে কেবল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির সহ-মৃতার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অন্যান্য প্রেসিডেন্সির বিষয় নাই ; থাকিলে জানা যাইত যে, সমুদয় দেশে এক বর্ষকাল মধ্যে কত অধিক সংখ্যক বিধবানারী পত্যনুগমন করিত।

উক্ত বিজ্ঞাপনীতে সহমৃতাদিগের বয়ঃক্রম দেওয়া হইয়াছে! ১৮২৩ সালে ৫৭৫ জনের মধ্যে ১০৯ জন যাট বৎসরের অধিক বয়স্কা। ২২৬ জন চল্লিশ হইতে যাট পর্য্যন্ত ; ২০৮ জন কুড়ি হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত, এবং ৩২ জনের বিংশতি বৎসরেরও অল্প বয়স। দেখা যাইতেছে যে, সতীদাহ প্রথারূপ দুরাচার রাক্ষসীর গ্রাস হইতে যুবতী কি বৃদ্ধা কাহারও নিস্তার ছিল না।

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু আড্যাম সাহেব তাঁহার বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন অবধি, গবর্ণমেণ্ট ও তাহার কর্ম্মচারীদিগের চক্ষুর সম্মুখে, প্রতিদিন অন্ততঃ এইরূপ দুইটি হত্যাকাণ্ড সুস্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৫।৬ শত অনাথা রমণীকে এই রূপে নিহত করা হইত।"

যে সময়ে এই তালিকা সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সময়ে কলিকাতা বিভাগে বর্দ্ধমান, হুগলী, যশোহর, জঙ্গল মহল, মেদিনীপুর, নোগং, নদীয়া, কলিকাতার উপনগর সকল, চব্বিশপরগণা, বারাসত, কটক, খুর্‌দা, পুরী, বালেশ্বর এই কয়েকটি প্রদেশ ছিল। বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা নগর, ঢাকাজেলালপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এই কয়েকটি

স্থান ঢাকাবিভাগের অন্তর্গত ছিল। বীরভূম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দিনাজপুর, মালদহ, মুরসিদাবাদ নগর, রংপুর ও রংপুরের কমিসনরের অধীনস্থ স্থান, পূর্ণিয়া, রাজসাহী, বগুড়া, ও রংপুরের জয়েণ্ট মাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, এই কয়েকটি প্রদেশ, মুরসিদাবাদ বিভাগের অন্তর্গত ছিল। পাটনা বিভাগে বেহার, পাটনা, গোরক্ষপুর, রামগড়, সারণ, সাহাবাদ, ত্রিহুত, এই সাতটি প্রদেশ ছিল। আরা, আলিগড়, বেরিলি, পিলিভীত, সাজিহানপুর, কানপুর, বিঠুর, ইটোয়া, ইটোয়ার জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, ফরেক্কাবাদ, সিরুরা, মুরাদাবাদ, লগ্‌গনা, মিরট, বুলন্দসহর, বেলাল, মজফরপুর, ও সাহরণপুর, এই কয়েকটি স্থান বেরিলি বিভাগের অন্তর্গত। এলাহাবাদ ও বিঠুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, ফতেপুর, বুন্দেলখণ্ডের উত্তর বিভাগ, বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ বিভাগ, বারাণসী, গাজিপুর ও গাজিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, জোনপুর, আজিম্‌গড়, মৃজাপুর, এই কয়েকটি স্থান বারাণসী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের কয়েকটি বিভাগে সতীদাহের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭	১৮১৮	১৮১৯	১৮২০	১৮২১	১৮২২	১৮২৩	১৮২৪	১৮২৫	১৮২৬	১৮২৭	১৮২৮
কলিকাতা	২৫৩	২৮৯	৪৪২	৫৪৪	৪২১	৩৭০	৩৯২	৩২৮	৩৪০	৩৭৩	৩৯৮	৩২৪	৩৩৭	৩০৮
ঢাকা	৩১	২৪	৫২	৫৮	৫৫	৫১	৫২	৪৫	৪০	৪০	১০১	৬৫	৪৯	৪৭
মুরসিদাবাদ	১১	২২	৪২	৩০	২৫	২১	১২	২২	১৩	১৪	২১	৮	৯	১০
পাটনা	২০	২৯	৪৯	৫৭	৪০	৪২	৬৯	৭০	৪৯	৪২	৪৭	৬৫	৫৫	৫৫
কাশী	৪৮	৬৫	১৯	১৩৭	৯২	৯৩	১১৪	১০২	১২১	৯৩	৫৫	৪৮	৪৯	৩৩
বেরিলি	১৫	১৩	১০৩	১৩	১৭	২০	১৫	১৬	১২	১০	১৭	৮	১৮	১০
সমষ্টি	৩৭৮	৪৪২	৭০৭	৮৩৯	৬৫০	৫৯৭	৬৫৪	৫৮৩	৫৭৫	৫৭২	৬৩৯	৫১৮	৫১৭	৪৬৩

সতীদাহ নিবারণে নিশ্চেষ্টতা

সতীদাহের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় কি দেশীয় অনেকেই কিছু বলিতেন না। এমন কি, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক অনেক পাদ্রিসাহেব উহার বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন যে, গবর্ণমেণ্ট যখন সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, তখন উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলিলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কথা বলা হইবে। বাস্তবিক এরূপ আশঙ্কার একটি কারণ ঘটিয়াছিল। ডাক্তার জন্‌স্‌ নামক একজন সাহেব এইরূপ কোন কারণে এদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা ভাবিতেন যে, সতীদাহের প্রতিবাদ করিলে, তাঁহারাও ঐরূপে তাড়িত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদাধিষ্ঠিত, সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক, কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই উক্ত কুপ্রথা নিবারণে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় মনে করিতেন। তাঁহারা বলিলেন যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে দেশীয়দিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য; এবং এরূপ আশা করিতেন যে, সুশিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি সহকারে উহা ক্রমশঃ রহিত হইয়া যাইবে।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, রামমোহন রায় যৌবনকালেই কোন স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত না উক্ত প্রথা রহিত হয়, ততদিন তিনি তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। তিনি সেই প্রতিজ্ঞা কখনও বিস্মৃত হন নাই। উপদেশ, পুস্তকপ্রচার, গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান, ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে ভারতভূমি হইতে নারীহত্যারূপ মহাপাতক বিদূরিত করিবার জন্য, নিরন্তর যত্নশীল ছিলেন।

রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর সহমরণ

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের দুই ভ্রাতা ছিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহারা তিন ভ্রাতা। দুইজন সহোদর ও একজন বৈমাত্রেয়। জগন্মোহন জ্যেষ্ঠ, রামমোহন মধ্যম, সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম রামলোচন। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রামমোহনের সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। যিনি সহমৃতা হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম অলকমণি বা অলকমঞ্জরী। তিনি জগন্মোহনের দ্বিতীয় বা মধ্যমা স্ত্রী। তাঁহার জ্যেষ্ঠা সপত্নীর নাম যশোদা; তৃতীয়ার নাম অজ্ঞাত। চতুর্থীর নাম দুর্গামণি। সর্ব্বশুদ্ধ জগন্মোহনের চারি ভার্য্যা। অলকমণির সহমরণের সময়ে চল্লিশের অধিক বয়স হইয়াছিল। ১২১৬ সালে, ২৭শে চৈত্র, রবিবারে, শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে, অপরাহ্নে এই ঘটনা ঘটে। ১২১৬ সালের ২৭শে চৈত্র, ইং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল এই সহমরণ হইয়াছিল। রামমোহন রায় তখন রংপুরে। এই ঘটনায় সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়াছিল। তাঁহার জননী উহা নিবারণ করেন নাই বলিয়া, তিনি বাটী আসিয়া তাঁতাকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। জননী বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুত্রশোকে একান্ত কাতরা ছিলেন, সুতরাং উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

সতীদাহ ও বলপ্রয়োগ

অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও এ প্রকার সংস্কার আছে যে, যে সময়ে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পত্যনুগামিনী রমণীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন্ত দেহ ভস্মাবশেষ করিতেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, দশসহস্রের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও সে প্রকার স্বাধীনভাবে জীবনবিসর্জ্জন করিত কি না সন্দেহ। প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া

এবং ১৮২৯ সালের প্ূর্ব্বে উক্ত বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, চিতারূঢ়া সতীর প্রতি আত্মীয়-স্বজনেরা বিলক্ষণ বল-প্রয়োগ করিতেন। জে, পেগস নামক জনৈক ইংরেজ, ১৮২৮ সালের ৯ মার্চ্চ দিবসে, 'The Suttee's Cry to Britain' নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উক্ত পুস্তকে বলপূর্ব্বক সতীদাহের অনেক হৃদয়ভেদী বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ফ্যানি পার্ক্স্ (Fanny Parks) নাম্নী জনৈক ইয়োরোপীয় মহিলা একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উহার নাম, 'Wanderings of a pilgrim in search of the Picturesque during four and twenty years in the east with Revelations of life in the Zenana.' এই পুস্তক ১৮৫৩ সালের কলিকাতা রিভিউয়ে সমালোচিত ও বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে বলপূর্ব্বক সতীদাহের কয়েকটি ভয়ঙ্কর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

বলপ্রয়োগ বিষয়ে পেগস্ সাহেবের সাক্ষ্য

জে. পেগস্ সাহেব বলপূর্ব্বক সতীদাহের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন ;—"The use of force by means of bamboos, is, we believe universal through Bengal. It is intended to prevent the possibility of the widow's escape from the flames, as such an act would be thought to reflect indelible disgrace on the family."

"In the burning of widows as practiced at present in some parts of Hindustan, however voluntary the widow may have been in her determination, force is employed in the act of emmolation. After she has circumambulated and ascended the pile, several natives leap on it, and pressing her down on the wood, bind her with two or three ropes to the corpse of her husband, and instantly throw over the two bodies, thus bound to each other, several large bamboos, which being firmly fixed to the ground on both sides of the pile prevent the possibility of her extricating herself when the flames reach her. Logs of wood are also thrown on the pile, which is then inflamed in an instant."

পূর্ব্বোক্ত ফ্যানি পার্ক্স্ তাঁহার গ্রন্থে যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই একটি ঘটনা ;—১৮৩০ সালের ৭ই নবেম্বর কানপুর নিবাসী এক ধনশালী বণিকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সতীদাহ দেখিবার জন্য কানপুরের গঙ্গাতীরে অতিশয় জনতা হইল। সতী উপযুক্তরূপ সজ্জিতা হইয়া স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত করিল। সাহস ও উৎসাহের সহিত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া চিতার উপর বসিল। বসিয়া "রাম নাম সত্য হ্যায়" "রাম নাম সত্য হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে যখন হুতাশন আপনার সহস্র দশন বিস্তার করিয়া দংশন করিতে লাগিলেন, তখন আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী লম্ফ দিয়া গঙ্গায় পড়িতে উদ্যত হইল। যাহাতে সতীর প্রতি কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ; এবং খোলা তলবার হস্তে একজন সিপাহীকে

চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। সতী যখন চিতা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল, নিকটস্থ সিপাহী তখন আপন প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশতঃ সতীকে তলবারদ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্ব্বার চিতার মধ্যে প্রবেশ করিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সিপাহীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে তফাৎ করিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সতী আবার অল্পক্ষণ পরেই যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতারা, আত্মীয়-স্বজন, ও অপরাপর সকলে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, উহাকে বলপূর্ব্বক চিতায় আনিয়া দগ্ধ করা যাউক। নিশ্চয় তাহা করা হইত। সতীও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার চিতায় আসিতে সম্মত হইয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জন্য তাহা হইল না। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ পাল্কী করিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন। ফ্যানি পার্ক্‌স্‌ কলিকাতার সন্নিহিত স্থান সকলেও এই প্রকার সতীদাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সহমরণপ্রথা প্রচলিত থাকাতে অবলা রমণীগণকে কুসংস্কারের ভীষণ মন্দিরে বলিদান দেওয়া হইত। আমরা প্রাচীনদিগের সহিত সতীদাহ বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়াছি যে, সতীরা শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বলিত যে, তাহারা সহমৃতা হইবে; কিন্তু সংকল্পের পর আর ফিরিবার উপায় ছিল না; ফিরিলে পরিবারের দুরপনেয় কলঙ্ক; সুতরাং সংকল্পের পর মতপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখিলে অথবা মত পরিবর্ত্তন হইলে বিলক্ষণ-রূপেই তাহার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত।

সতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচার সকল নিবারণ করিবার জন্য নিজামত আদালত যে সকল নিয়ম প্রচার করেন, তাহা রহিত করিবার জন্য গোঁড়া হিন্দুরা গবর্ণর জেনারল হেষ্টিংসের নিকটে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদন পত্রের বিরুদ্ধে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, গবর্ণর জেনারলের নিকট আর এক আবেদন পত্র উপস্থিত হয়। এই দ্বিতীয় আবেদন পত্র যে, রাজা রামমোহন রায়ের উদ্‌যোগে প্রেরিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের 'এসিয়াটিক জার্ণল' পত্রে, উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রে লিখিত আছে যে, ঐ আবেদনে কলিকাতানিবাসী অনেক ভদ্রলোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। গোঁড়া হিন্দুদিগের আবেদনপত্র যে, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল, ইহা দ্বিতীয় আবেদন পত্রে অস্বীকার করা হইয়াছে। সতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয় আবেদন পত্রে সেই সকলকে ন্যায্য ও একান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের আবেদন পত্রে, আবেদনকারীগণ বলিতেছেন যে, তাঁহারা নিজে জানেন এবং অনেক স্থলে চাক্ষুষদর্শী লোকের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন যে, কোন নারীর পতিবিয়োগ হইলে, তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীগণ চেষ্টা করেন, যাহাতে সেই বিধবা-নারী সহমৃতা হন। বিত্তলোভই এরূপ চেষ্টার একমাত্র অভিসন্ধি। এমন সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, কোন নারী পতিবিয়োগে অধীরা হইয়া সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু সংকল্পের পর, ভয় প্রযুক্ত অস্বীকার করেন। এরূপ স্থলে, তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক চিতাশায়ী করিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধন করেন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ ভস্মীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া থাকেন। কোন কোন স্ত্রীলোক, কখন কখন কোনরূপ সুবিধা পাইয়া, চিতা হইতে পলাইয়া যান। তাঁহাদের আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া, চিতানলে ভস্মীভূত করেন। আবেদন-

কারীগণ বলিতেছেন যে, এইরূপ কার্য্য, সকল জাতির সহজ জ্ঞানে, এবং সকল শাস্ত্রানুসারে হত্যা বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইবে।

"Your petitioners are fully aware from their own knowledge, or from the authority of credible eye-witnesses that, cases have frequently occurred when women have been induced by the presuasions of their next heir, interested in their destruction, to burn themselves on the funeral piles of their husbands; that others who have been induced by fear to retract a resolution rashly expressed in the first moments of grief, of burning with their deceased husbands, have been forced upon the pile and there bound down with ropes, and pressed by green bamboos until consumed by the flames; that some often flying from the flames, have been carried back by their relations and burnt to death. All these instances, your petitioners humbly submit, are murders, according to every Shastra, as well as to the common sense of all nations."

কিন্তু আবেদন পত্রে তারিখ ছিল না। কিন্তু ঐ আবেদন পত্রের সঙ্গে, এসিয়াটিক জারনালে (Asiatic Journal) প্রকাশিত হইবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে তারিখ ছিল। সেই তারিখ অনুসারে, প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ১৮১৮ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমে লাট সাহেব আসিয়া তাঁহার কর্ম্ম গ্রহণের অল্পকাল পরেই উক্ত দরখাস্ত করা হয়। সতীদাহ বিষয়ক রামমোহন রায়ের প্রথম পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের তিন মাস পূর্ব্বে উক্ত আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ৩০শে নবেম্বর,১৮১৮ সালে উক্ত পুস্তক প্রকাশ হয়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, রামমোহন রায় এই সময় হইতেই সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বলপ্রয়োগ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় কি বলেন, পাঠকবর্গ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তিনি সহমরণ বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইখানি পুস্তক নিবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তক এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। আমরা তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

বলপ্রয়োগ বিষয়ে রামমোহন রায়ের উক্তি

"নিবর্ত্তক। তুমি এখন যাহা কহিতেছ, সে অতি অন্যায্য। ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বচনেতে এবং ঐ বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্প বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দাও, যাহাতে ঐ বিধবা আর উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চুপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন হারীতাদির বচনে আছে, তদনুসারে করিয়া থাকহ, অতএব কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা হয়।"

"অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ যথার্থ বটে ; কিন্তু বালক-কাল অবধি আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধসংস্কার জন্মে ; এই নিমিত্ত, কি স্ত্রী কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"

কুমারী কলেট বলেন,* ১৮২৮ সালের ১৫ই মার্চ্চ দিবসে, সংবাদ কৌমুদীতে, রামমোহন রায় একটি সতীদাহের বিবরণ লিখিয়াছিলেন। উহা কলিকাতায় ঘটিয়াছিল। সেই বিবরণ এই যে, একজন সতী অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় চিতা হইতে পলাইয়া যায়। কয়েকজন ইয়োরোপীয় ও মার্কিন দেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। যখন দাহকার্য্য আরম্ভ হইল, তখন সেখানে উক্ত ইয়োরোপীয় ও মার্কিন দেশবাসী ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাই তাহাকে চিতার সহিত বন্ধ করিতে দেন নাই। যখন স্ত্রীলোকটি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া চিতা হইতে পলাইয়া আসিল, তখন তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার চিতায় লইয়া গিয়া বলপূর্ব্বক চিতানলে ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঐ ইয়োরোপীয় ও মার্কিন দেশবাসী ভদ্রলোকেরা তাহা করিতে দিলেন না। উক্ত প্রবন্ধে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, গত বৎসর মঙ্গলঘাটে, ঐরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সতী চিতা হইতে পলাইয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ জানিতে পারে নাই।

রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, হিন্দুনারীর দায়াধিকার সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতেও তিনি প্রদর্শন করেন যে, দায়াধিকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা, অনেক স্থলে, সহমরণের একটি কারণ। আমরা এ বিষয়ে পরে বিশেষরূপে লিখিব।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং তাহা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে তিনখানি পুস্তক প্রচার করেন। প্রথম দুইখানি সহমরণ প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। প্রথম পুস্তকের নাম 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম সংবাদ'। দ্বিতীয় পুস্তকের নাম 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ।' 'বিপ্রণাম' এবং 'মুগ্ধবোধছাত্র' নামধারী দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তিনি তৃতীয় পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রথম পুস্তক ১৭৪০ শকে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ হয়। ঐ বৎসর ৩০শে নবেম্বর, উহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। দ্বিতীয় পুস্তক, ১৭৪১ শকে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে উহার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় এই দ্বিতীয় পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ, মারকুইস্ অব হেষ্টিংসের সহধর্ম্মিণীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এধং সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারীদিগের মতপরিবর্ত্তনের জন্য, রামমোহন রায় তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পুস্তকেরই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭১৫ শকে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, তৃতীয় পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল।

* ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বরের ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার দেখ।

এই পুস্তকত্রয়ের সারমর্ম্ম এই যে, সমস্ত শাস্ত্রেই কাম্যকর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে। সহমরণ কাম্যকর্ম্ম, সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসারে উহা অকর্ত্তব্য। তিনি বহুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন, সতীদাহ বিষয়ে তাঁহার সমুদয় যুক্তির সারমর্ম্ম লিখিয়া ইংরেজী ভাষায় আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সতীদাহ বিষয়ে তর্কযুদ্ধ ও আন্দোলন

কুসংস্কারান্ধ প্রাচীনতন্ত্রের লোকদিগের ক্রোধের ইয়ত্তা থাকিল না। রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া উত্তর বাহির হইল। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে, পত্যনুগমন কাম্যকর্ম্ম বলিয়া নিন্দনীয়। তাঁহার বিপক্ষগণ বিচারে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিরুত্তর হইলেন।

সতীদাহ সম্বন্ধে তিনটি কথা

রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারে তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন করেন। প্রথমতঃ। শাস্ত্রানুসারে পত্যনুগমন অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের কোন আদেশ নাই, অর্থাৎ সহমৃতা না হইলে যে, প্রত্যবায় হয়, এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ। সমস্ত শাস্ত্রেই কাম্যকর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে। সহমরণ কাম্যকর্ম্ম, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসারে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। সুতরাং সহমৃতা না হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাপন করাই বিধবার পক্ষে শ্রেয়স্কর। তৃতীয়তঃ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সহমৃতা হওয়া আবশ্যক। স্বাধীনভাবে সংকল্প করিবে, স্বাধীনভাবে চিতারোহণ করিবে, এবং স্বাধীনভাবে জ্বলন্ত অনলে আপনার জীবন্তদেহকে ভস্মীভূত হইতে দিবে। কিন্তু তাহা হইতেছে না। পত্যনুগামিনী নারীর প্রতি বলপ্রয়োগ করা হইয়া থাকে। একপ্রকার জ্ঞানপূর্ব্বক নারীহত্যা করা হয়। সুতরাং এ প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকার শ্রুতি আছে। নিষ্কাম শ্রুতি অপেক্ষা সকাম শ্রুতি দুর্ব্বল। সুতরাং নিষ্কাম শ্রুতি অনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা রামমোহন রায় মনুর বচন অনুসারে প্রদর্শন করিতেছেন ;—

"ইহ বা মুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপ দিশ্যতে ।।
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সার্ষ্টিতাং।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ ।।

কি ইহলোকে, কি পরলোকে, বাঞ্ছিত ফল পাইব, এই কামনাতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম প্রবৃত্তকর্ম্ম ; অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগের পর, জন্মমরণ-রূপসংসারে উহা প্রবর্ত্তক হয় ; আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসপূর্ব্বক যে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে নিবৃত্তিকর্ম্ম বলে ; অর্থাৎ উহাতে সংসার হইতে নিবৃত্ত করায়। যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্ত কর্ম্ম করে, তাহারা দেবতাদের সমান হইয়া স্বর্গাদিভোগ করে, আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে শরীরের কারণ যে পঞ্চভূত তাহার অতীত হয়, অর্থাৎ মুক্ত হয়।"

কিরূপ কর্ম্ম করিবে ?

এস্থলে রাজা রামমোহন রায়ের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি বা কর্ম্মপরিত্যাগই ধর্ম্ম। নিবৃত্তিকর্ম্মের অর্থ, কেবল নিবৃত্তি বা কর্ম্ম পরিত্যাগ নহে। কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবশ্য করিতে হইবে। যে কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় আছে, তাহা অবশ্য করিতে হইবে। পুণ্য হইবে বলিয়া করিবে না, কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্যসাধন করিবে।

সকাম কর্ম্মের বিধি কি প্রতারণা ?

এস্থলে রামমোহন রায়ের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী এই এক আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন যে, নিষ্কামধর্ম্মই যদি প্রকৃত ধর্ম্ম হইল, তবে বেদপুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সকামকর্ম্মের বিধি রহিয়াছে, তাহা কি প্রতারণা? রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, উহা প্রতারণা নহে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যের নানাপ্রকার প্রবৃত্তি। যাহাদের চিত্ত, কাম, ক্রোধ, লোভেতে আচ্ছন্ন, তাহারা পরমেশ্বরের নিষ্কাম আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না, অথচ যদি সকাম শাস্ত্র না পায়, তবে এককালেই শাস্ত্র হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় যথেচ্ছাচার করিবে। অতএব, সেই সকল লোককে যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, শাস্ত্রে নানাপ্রকার যজ্ঞাদির বিধি রহিয়াছে। যেমন, শত্রুবধার্থীর প্রতি শ্যেন যাগ, পুত্রার্থীর প্রতি পুত্রেষ্টী যাগ, স্বর্গার্থীর প্রতি জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ইত্যাদি বিধান হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে সকামীর নিন্দা করিয়াছেন। সকাম কর্ম্মফল যে অতি তুচ্ছ, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। যদি শাস্ত্রে সকামীর নিন্দা এবং সকাম কর্ম্মফলের প্রতি অবজ্ঞা পুনঃ পুনঃ করা না হইত, তাহা হইলে ঐ সকল বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারিত। ইহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ।। এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি ।।

যেমন ইহলোকে, কৃষিকর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত ফল পশ্চাৎ নষ্ট হয়, সেইরূপ পরলোকে, পুণ্যকর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফল নষ্ট হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন করিলেন যে, সকাম কর্ম্মমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত।

রাজা রামমোহন রায় ও ভগবদ্গীতা

রাজা ভগবদ্গীতাকে সর্ব্বশাস্ত্রের সার বলিয়াছেন। তিনি অনেক সময় বন্ধুবান্ধবের নিকটে বলিতেন ;—

"গীতার কথা শুনে না যে,
তার কথা শুনবে কে?"

আজকাল বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি ভগবদ্গীতার নিষ্কামধর্ম্ম বিষয়ে অনেক লিখিয়াছেন। তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় গীতামাহাত্ম্য ও গীতার নিষ্কামধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে সকামকর্ম্মের যে সকল ফলশ্রুতি আছে, উহা স্তুতিবাদ বা অর্থবাদ মাত্র। মূঢ় ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তি দান করাই ঐ সকল ফলশ্রুতির উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইলে, প্রকৃত শাস্ত্রবিধি কি, এবং অর্থবাদ বা স্তুতিবাদ কি, এই প্রভেদ নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। রাজা এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন।

কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, দেশাচার বলিয়া কি কর্ত্তব্য হইতে পারে ?

রাজার বিপক্ষগণ এই এক যুক্তিদ্বারা সহমরণপ্রথা সমর্থন করিতেন যে, সহমরণ দেশাচার, পরম্পরা হইয়া আসিতেছে, সুতরাং উহাতে কোন দোষ নাই। রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, যাহার ধর্ম্মভয় আছে, সে কখনও বলিবে না যে, পরম্পরা হইয়া আসিতেছে বলিয়া নরহত্যা ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপ থাকিতে পারে। এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচার মান্য করিলে, অবশ্য বলিতে হয় যে, যে সকল বনস্থ ও পার্ব্বতীয় লোক বংশপরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে, তাহারাও নির্দ্দোষী ; এবং ঐ দুষ্কার্য্য হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা কখনই উচিত নহে। বাস্তবিক, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত্র এবং শাস্ত্রসম্মতযুক্তি। এরূপ স্ত্রীবধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভন দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক হত্যা করা, যুক্তি অনুসারেও অত্যন্ত পাপজনক। স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি দারুণ পাতক সকল দেশাচার বলিয়া ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। যদি কোন দেশে এরূপ আচার প্রচলিত হয়, তবে সে দেশ পতিত হয়। অতএব, বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রী-লোককে বন্ধন করিয়া অগ্নিদ্বারা দাহ করা সর্ব্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং অতিশয় পাপজনক। এক দেশীয় লোকের কথা কি? যদি সমুদয় দেশের লোক একমত হইয়া ঐরূপ স্ত্রীবধ করে, তাহা হইলেও বধকর্ত্তারা অবশ্য পাতকী হইবে। অনেকে একমত হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। শাস্ত্রে যে যে ক্রিয়ার কোন বিশেষ বিধি নাই, সেই সকল স্থলে দেশাচার ও কুলধর্ম্মানুসারে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু দেশাচার বলিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীবধ কদাপি সৎকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

"ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়োন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারস্তত্র ধর্ম্মোনিরূপ্যতে ।।

স্কন্দপুরাণ ।।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে যে বিষয়ের সাক্ষাৎ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই সেই বিষয়ে দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে।"

যদি দেশাচার ও কুলাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তথাপি উহা কর্ত্তব্য, এবং সৎকর্ম্মের মধ্যে গণ্য, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায়, আরও বলিতেছেন যে, শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি এই দুই দেশে পণ্ডিত কি মূর্খ চাতুর্ব্বর্ণ্য লোকের কুলাচার এই যে, বিষ্ণুকাঞ্চিবাসীরা শিবের নিন্দা করিয়া থাকেন, আর শিবকাঞ্চিবাসীরা বিষ্ণুর নিন্দা করেন। অতএব, বলিতে হইবে যে, দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দা দ্বারা তাহাদিগের পাতক হয় না। যেহেতু, উক্ত দেশদ্বয়বাসী প্রত্যেক ব্যক্তি বলিতে পারে যে, দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে নিন্দা করিয়াছি ;—সুতরাং কোন দোষ হয় না। কোন পণ্ডিতই বলিবেন না যে, দেশাচার বলিয়া তাহাদের পাপ হইতেছে না। অন্তর্ব্বেদের নিকটস্থ দেশে রাজ-পুতেরা কন্যাবধ করিয়া থাকে। উক্ত মতানুসারে কন্যাবধের জন্য রাজপুতদিগকে দোষী বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, কন্যাবধ তাহাদের দেশাচার ও কুলাচার। এইরূপ অনেক

উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কোন পণ্ডিত স্বীকার করেন না যে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ দারুণ পাতক, দেশাচার বলিয়া পুণ্যজনকরূপে গণ্য হইতে পারে।*

ভগবান্ গীতায় কাম্যকর্ম্মের নিন্দা করিয়া, আবার, যুধিষ্ঠিরাদির কাম্যকর্ম্মে কিরূপে আনুকূল্য করিলেন ?

'বিপ্রনামা' স্বাক্ষরকারী রামমোহন রায়ের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এই প্রশ্ন করিতেছেন যে, "গীতায় ভগবান্ কাম্যকর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন ; তবে, যুধিষ্ঠিরাদি যে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কিরূপে তাহার অনুকূল ছিলেন? রামমোহন রায় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এবং অন্যকেও সেই আজ্ঞানুরূপ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। "ঈশ্বরানাং বচঃ সত্য মিথ্যাদি।" যদি বিপ্রনামা ভগবানের বিধি ও নিষেধবাক্যকে অতিক্রম করিয়া, ভগবান্ যে যে কর্ম্মের অনুকূল ছিলেন. তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পাণ্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদ্যুক্ত হন, তাহা হইলে, অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে, অর্জ্জুন ভগবানের আনুকূল্যে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই প্রমাণে স্ব-শিষ্যের প্রতি ঐ রূপ ব্যবহারের উপদেশ দিতে পারেন ; এবং পঞ্চ পাণ্ডবের এক কন্যা বিবাহ কৃষ্ণানুকূল্যে হইয়াছে, ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া, ইহার নিদর্শন দেখাইয়া তদনুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে পারেন। অতএব, জিজ্ঞাস্য এই যে, এ প্রকারে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্য বিপ্রনামা কেন শাস্ত্রের নাম অবলম্বন করেন? ব্রহ্মাদি দেবতার ও অবতারদের কর্ম্মানুরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য, বিপ্রনামা এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব তিনি বুঝি তদনুসারে ব্যবহার করিতে শীঘ্র প্রবৃত্ত হইবেন।"

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনাদির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য কি না ?

'মুগ্ধবোধচ্ছাত্র' এই নামধারী রামমোহন রায়ের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতেছেন, —"ভগবান্ ও তাঁহার অংশাবতার অর্জ্জুন ও তাঁহার সমকালীন অনুগত ব্যক্তিরা যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন, সেইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও তদনুসারে গীতার অর্থ করিতে হইবেক।" রামমোহন রায় বলিতেছেন,—"ইহার উত্তর পূর্ব্ব পত্রীর উত্তরে লিখা গিয়াছে ; অর্থাৎ 'বিপ্রনামা' ও 'মুগ্ধবোধচ্ছাত্র', এইক্ষণে আপনাদের ভাবৎকর্ম্ম ভগবানের ও অর্জ্জুনের ও তাঁহাদের সমকালীন লোকের ক্রিয়ার ন্যায় বুঝি সম্পাদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, এবং অন্যকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিবেন। অর্থাৎ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারা যে বিধি নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অর্জ্জুন প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত ঐক্য হইলেই মান্য হইবেক, কিন্তু 'মুগ্ধবোধচ্ছাত্রে'র এরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বধর্ম্মের নাশের কারণ হয়। যেহেতু অস্ত্রত্যাগীর প্রতি অস্ত্রাঘাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে ; কিন্তু গীতাশ্রবণানন্তর অস্ত্রত্যাগী ভীষ্মকে অর্জ্জুন অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন ; এবং সাত্যকী ও ভূরিশ্রবা উভয়ের দ্বৈরথযুদ্ধে অর্জ্জুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং পাণ্ডব-দের গুরু দ্রোণাচার্য্যকে কৃষ্ণানুকূল্যে মিথ্যাকথা কহিয়া নষ্ট করিয়াছেন। 'মুগ্ধ-বোধচ্ছাত্র' বুঝি এই প্রকার গুরুবধাদি কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইবেন, এবং স্বশিষ্যকে এই

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের ১৫৪ পৃষ্ঠা দেখ।

সকল নিদর্শন দেখাইয়া প্রবর্ত্ত করাইবেন যে, পাণ্ডবেরা মিথ্যা কহিয়া গুরুবধ করিয়াছেন, অতএব মিথ্যা কহিয়া গুরুহত্যা করিতে পারে, এই ব্যবস্থা দিয়া 'মুগ্ধবোধছাত্র' সকল ধর্ম্মনাশ করিতেছেন কি না, তাহা 'মুগ্ধবোধছাত্র'দের অধ্যাপক বিবেচনা করিবেন, এবং মাদ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহমরণ দেখাইয়া মুগ্ধবোধছাত্র, আধুনিক স্ত্রীসকলকে সহ-মরণে প্রবৃত্তি দিতেছেন, তবে বুঝি মুগ্ধবোধছাত্র সূর্য্যাদিদ্বারা মাদ্রীর ও কুন্তীর পুত্রোৎপত্তি নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোন পরাক্রমী ব্যক্তিদ্বারা স্ববর্গের আধুনিক স্ত্রী-লোকেরও পুত্রোৎপত্তি করিতে প্রবৃত্তি দিবেন। কি আশ্চর্য্য! মুগ্ধবোধছাত্র ও তাঁহাদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়া ধর্ম্মলোপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া সহমরণের প্রবৃত্তির বিষয় লিখিয়াছেন, ইহার উত্তর, প্রথম পত্রের উত্তরে ২১৩ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তি অবধি বিবরণপূর্ব্বক লেখা গিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টি করিবেন।"

সহমরণ বিষয়ে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতেছেন যে, ভগবদ্গীতার যে কয়েকটি শ্লোক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহার অধিকারী সকামী কি নিষ্কামী; এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা ছেন, যে সকল ব্যক্তির কর্ম্মেতে অধিকার আছে, তাঁহারাই ঐ শ্লোক সকলের বিষয়; কিন্তু সকামকর্ম্ম কর্ত্তব্য, কি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে ভগবান্ সকাম-কর্ম্মের নিন্দাপূর্ব্বক নিষ্কামকর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

সংসারে সকাম লোক অধিক, কি নিষ্কাম লোক অধিক ?

প্রতিবাদী মহাশয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, সংসারে নিষ্কাম লোক অধিক কি সকাম লোক অধিক? রাজা ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ইহা অদ্ভুত প্রশ্ন। যে ভাগ লোক অধিক, সেই ভাগ যদি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, তবে, এই ভারতবর্ষে স্ববৃত্তিস্থিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, স্ববৃত্তিত্যাগী ব্রাহ্মণ অনেক অধিক। সুতরাং স্ববৃত্তি ত্যাগ কি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে?

স্ত্রীলোকের মন হইতে কেমন করিয়া কামনা দূর হইতে পারে ?

প্রতিবাদী বলেন, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের মন হইতে কেমন করিয়া কামনা দূর হইতে পারে? রাজা ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবৃত্তি দিলেই নিন্দিত কাম্যকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ও তৎপরে সদ্গতি, কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ উভয়ের সমানরূপে হইতে পারে। প্রমাণ ভগবদ্গীতা।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিং ।।

মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক, পরমেশ্বরের আরাধনাদ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা বেদ, পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীকে সকামকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবেন কি না ?

প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।' গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি? রাজা উত্তর করিতেছেন যে, বিপ্রনামা কিঞ্চিৎ শ্রম করিয়া ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধ দেখিলেই উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেন। ঐ শ্লোকের

পরামর্শ এই,—"যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ।।" জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আপনি কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গীকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবেন।

জ্ঞানীর নিষ্কামকর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবে। কাম্যকর্ম্মে জ্ঞানীর কদাপি অধিকার নাই। তাঁহার নিষ্কামকর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানী চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কামকর্ম্ম করিবে। কর্মসঙ্গীদের, কি প্রকারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা গীতায় অনেক স্থানে লিখিয়াছেন "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" তুমি কর্ম্ম করিতে পার, কিন্তু কর্ম্মফলে তোমার কদাপি অধিকার নাই। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" পরমেশ্বরের উদ্দেশ ব্যতিরেকে, অর্থাৎ ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্মদ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়।

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন ব্যক্তজ্ঞায় কর্ম্মহি।
ন রাতি রোগিণে পথ্যং বাঞ্ছতোপি ভিষক্তমঃ ।।

স্মার্ত্তধৃত ষষ্ঠস্কন্ধ বচন ।।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকামকর্ম্ম করিতে, উপদেশ দেন না। যেমন, রোগী ব্যক্তি কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না। এই প্রমাণানুসারে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যে ;—

"পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ।"

পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খকে কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন না।

কি আশ্চর্য্য! বিপ্রনামা রাগান্ধ হইয়া এই দেশপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেও মনোযোগ করেন না!

সংকল্পবাক্যে ফলের উল্লেখ না করিয়া কাম্যকর্ম্ম করিলে, চিত্তশুদ্ধি হয় কি না ?

বিপ্রনামা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সহমরণাদির সংকল্পবাক্যে ফলের উল্লেখ না করিয়া কাম্যকর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্মে অন্য কর্ম্মের ন্যায় চিত্তশুদ্ধি হয় কি না? রাজা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রথমতঃ,—স্বামীর সহিত স্বর্গভোগকামনা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে কদাপি প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবে শরীরদাহ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে, আত্মার পীড়ার দ্বারা অথবা অন্যের নাশের নিমিত্ত যে তপস্যা, গীতা তাহাকে তামস-কর্ম্ম বলিয়াছেন। ঐ তামসকর্ম্মকর্ত্তা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

"মূঢ়গ্রহেণাত্মনোযৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং।"

ভগবদ্গীতা।

বিপ্রনামা যদি বিশেষ মনোযোগ করিয়া গীতা দেখিতেন, তবে এ প্রশ্ন করিতেন না। তিনি বোধ হয় মিতাক্ষরা গ্রন্থে কাম্যকর্ম্মের দ্বারা জীবননাশের নিষেধশ্রুতি বিশেষরূপে দেখেন নাই।—"তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াৎ।" স্বর্গকামনা করিয়া পরমায়ু সত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবে না, অর্থাৎ মরিবে না।

সহমরণাদি কাম্যকর্ম্ম সকল, কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, বিপ্রনামা যদি এরূপ স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতঃপর স্মার্ত্তধৃত নরসিংহ পুরাণের বচনানুসারে, লোককে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দিতে পারেন।

"জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নিসাহসী।
ভৃগুপ্রপাতী সৌখ্যন্তু রণে চৈবাতিনির্ম্মলং ।।
অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ সগচ্ছেত্তুত্রিপিষ্টপং।"

যে ব্যক্তি জলে প্রবেশ করিয়া মরে সে আনন্দনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; সাহসপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে মরে, সে প্রমোদনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; পর্ব্বতাদি উচ্চ দেশ হইতে পতিত হইয়া যে মরে, সে সৌখ্য নামক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; যুদ্ধে যে মরে, অতি নির্ম্মলনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; আহার ত্যাগপূর্ব্বক যে মরে, সে ত্রিপিষ্টপনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।

এস্থলে বিপ্রনামা বলিতে পারেন যে, সঙ্কল্পত্যাগপূর্ব্বক উক্ত প্রকারে শরীর ত্যাগ করিলে নিষ্কামকর্ম্মের ন্যায় নানাবিধ আত্মহত্যাতেও চিত্তশুদ্ধি হইবে।

"যঃ সর্ব্বপাপযুক্তোপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ।
নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ।।"
স্মার্ত্তধৃতবচন।

সকল পাপযুক্ত হইয়াও যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক পুণ্যতীর্থে প্রাণত্যাগ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

ঐ বচন পাঠানন্তর বিপ্রনামা লোককে এরূপ প্রবৃত্তি দিতে পারেন যে, কামনাত্যাগ করিয়া তীর্থমরণে চিত্তশুদ্ধি হইবে। বিপ্রনামার ইহা বোধ হইল না যে, স্বর্গাদিকামনা না থাকিলে এ প্রকার আত্মহননরূপকর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এ প্রকার দুঃসাহসকর্ম্মে যে প্রবৃত্তি, তাহা তামসীপ্রবৃত্তি। গীতায় ও উপনিষদে তামসীপ্রবৃত্তি বারম্বার নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিপ্রনামা লোককে ভবিষ্যপুরাণোক্ত নরবলিপ্রদানের প্রবৃত্তি দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, যদ্যপিও ইহা ক্রূরকর্ম্ম, কিন্তু কামনাত্যাগ-পূর্ব্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে; এবং কালিকাপুরাণোক্ত এই মন্ত্রও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে পারেন।

"নর ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ।
প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণং ।।"

বিপ্রনামা এরূপ বিচার করিবেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কি পণ্ডিত ছিলেন না, এবং ইহার পূর্ব্বে এই কলিকালেও কি পণ্ডিত ছিলেন না? দেখ, সত্যাদি যুগে নর-বলি প্রচলিত ছিল! জড়ভরত প্রভৃতির উপাখ্যানে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। কলিতেও তন্ত্রানুসারে নরবলি প্রথা ছিল, এবং বর্ত্তমান্ সময়েও দেশবিশেষে নরবলি প্রচলিত আছে। অতএব, যখন শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং পরম্পরা ব্যবহারসিদ্ধ, তখন নরবলি অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলেন যে, গীতাদি শাস্ত্রে কামনাপূর্ব্বক কর্ম্মের নিন্দা আছে, তাহার উত্তরে বিপ্রনামা বলিবেন যে, কামনাত্যাগপূর্ব্বক নরবলি দান না কর কেন? নরবলি দান করিলে, চিত্তশুদ্ধি হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। ধন্য ধন্য বিপ্রনামা! ধন্য অধ্যাপক!"

সহমৃতা না হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে, বিষয়াসক্তা বিধবার উভয় দিক্ ভ্রষ্ট হয় কি না?

সহমরণবিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের একজন প্রতিবাদী বলিতেছেন যে, যে সকল স্ত্রীলোক সর্ব্বদা বিষয়সুখে এবং কাম্যকর্ম্মফলে নিতান্ত আসক্তা, তাহাদিগকে সহমরণ-

রূপ বিধবার পরমধর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত করিলে তাহাদের উভয় দিক্ ভ্রষ্ট করা হয়। ঐ বিষয়ে গীতার প্রমাণ ;—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।"

রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন। সহমরণে স্ত্রীলোককে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায় কি, তাহা এখন বিশেষরূপে ব্যক্ত হইল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বিষয়সুখে আসক্তা। সহগমন না করিলে তাহাদের ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইবে, এই ভয়ে স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া স্বামীর সহিত তাহাদের আয়ুঃশেষ করেন। কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ কাম, ক্রোধ, লোভে জড়িত। কিন্তু শাস্ত্রানুশীলন এবং সৎসঙ্গদ্বারা ক্রমশঃ ঐ সকল দোষের দমন হইতে পারে, এবং তাঁহারা উত্তম পদপ্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন। এই জন্য আমরা কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ, সকলকে অধম শারীরিক সুখের কামনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করি। স্বর্গে গমন করিয়া স্বামীর সহিত অভ্যস্ত স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারপূর্ব্বক কিছুকাল বাস করিয়া পুনরায় অধঃপতিত হইয়া গর্ভের মলমূত্রঘটিত যন্ত্রণাভোগ কর, এমন উপদেশ আমরা কদাপি প্রদান করি না। শাস্ত্রে এইরূপ বিধি দিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে যাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণমনন করিয়া সাংসারিক অত্যন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন। আর যাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রের আদেশ এই যে, কামনারহিত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি-পূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস করিবেন। অতএব, শাস্ত্রানুসারে, বিধবাদিগকে নিন্দিত এবং অচিরস্থায়ী যে স্বর্গসুখ, তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাই, এবং যে জ্ঞানাভ্যাস-দ্বারা পরমপদ লাভ হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যত্ন করি। নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের শ্রবণমনন করিয়া বিধবানারী পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে বিধবার ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইবার কদাপি সম্ভাবনা নাই।

"মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রীয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিম্।"
গীতা।

হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, যে সকল পাপযোনি, তাহারাও পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

আপনারা স্ত্রীলোককে মোক্ষসাধনে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সহমরণ প্রবৃত্তি দেন। কিন্তু যাঁহারা সহগমন করেন না, আপনাদের সিদ্ধান্তানুসারে তাঁহাদের ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হওয়া নিশ্চিত হইল। যেহেতু, আপনাদের মতানুসারে তাঁহারা জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্যই নহেন, এবং সহমরণদ্বারা তাঁহাদের স্বর্গারোহণও হইল না।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।" কর্ম্মেতে আবৃত যে অজ্ঞানী তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। এই গীতার প্রমাণ দিয়াছেন। উক্ত বচনের তাৎপর্য্য এই যে, কামনারহিত কর্ম্মীর বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। সকামকর্ম্মী সম্বন্ধে এ বচনের প্রয়োগ করা অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেহেতু, কামনাত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া এই বচনের ও সমুদয় গীতার অভিপ্রায়। গীতা ও তাহার টীকা, দুই প্রস্তুত আছে, পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি গল্প

রাজা রামমোহন রায় স্বভাবতঃ অতিশয় সদয়হৃদয় লোক ছিলেন। সুতরাং অনাথা বিধবানারীর ভীষণ হত্যাকাণ্ডে তিনি যার পর নাই ক্লেশানুভব করিতেন। কেবল কথোপকথন ও পুস্তকপ্রচারদ্বারা সহমরণপ্রথার অবৈধতা ও নিষ্ঠুরতা লোককে বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি কখন কখন কলিকাতার গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া সহগামিনী রমণীর সহগমন নিবারণ জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন। আমরা তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে একটি গল্প বলিব। বীরনৃসিংহ মল্লিকের পরিবারস্থ কোন একটি স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়। রাজা রামমোহন রায় এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সহমরণ হইতে স্ত্রীলোকটিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়গণকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা দূরে থাকুক, যার পর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একজন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হিন্দুর কার্য্যে মুসলমান কেন?" রামমোহন রায় এই অপমানবাক্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইতেই প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, সে প্রভুর অপমান দেখিয়া বড়ই রাগিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে স্থির হইতে আজ্ঞা করিলেন।*

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের এসিয়াটিক জারনাল নামক পত্রে, উক্তরূপ আর একটি ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। কালীঘাটে কয়েক জন নারী সহমৃতা হইবেন শুনিয়া রামমোহন রায় তথায় উপস্থিত হইয়া উহা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, সতীদাহনিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। ইহা বিলক্ষণ সম্ভব যে, এই আবেদন প্রেরণের মূলে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় সংবাদকৌমুদী নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সকল লিখিত হইত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় 'সহমরণবিষয়ে তৃতীয় প্রস্তাব' ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিলেন।

সতীদাহ বিষয়ে পুস্তকপ্রকাশ করাতে, রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইণ্ডিয়া গেজেটে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ;—

"আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সতীদাহবিষয়ক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের এই পুস্তকখানি জনসমাজে পুনর্ব্বার প্রচারিত হওয়াতে ইহাদ্বারা নিশ্চয়ই সুফল উৎপন্ন হইবে।"

ইণ্ডিয়া গেজেটে যে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম সংবাদকৌমুদী। রামমোহন রায় এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই পত্রিকার সম্বন্ধ ছিল। উহাতে সহমরণ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ

---

* যে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় রাজার সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই গল্পটি শুনিয়াছিলেন।

হইলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, সমাচারচন্দ্রিকা প্রথম প্রকাশ হয়।

এই সময়ে পুনর্ব্বার ইণ্ডিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের প্রশংসা প্রকাশ হইল। উহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ;—

"এদেশীয় অতি প্রধান এক বিশ্বহিতৈষী ব্যক্তি অনেকদিন হইতে, সভ্য রাজপুরুষগণের সাহায্যকারী এবং মনুষ্যজাতির হিতকারীরূপে এই গুরুতর বিষয়ে (সতীদাহ) নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত পত্রের আকারে গবর্ণর জেনারলের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তিনি গবর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, গবর্ণর জেনারল মহা অভ্যর্থনা সহকারে, আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, গবর্ণর জেনারল তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথা রহিত করিবেন। কারণ, ইহা আমাদের প্রজাবর্গের চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। আর বৃটিস গবর্ণমেণ্ট সমর্থন করিতেছেন বলিয়া ঐ প্রথায় রাজপুরুষগণের কলঙ্ক প্রকাশ পাইতেছে।"

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত লর্ড আমহার্ষ্টের শাসন কাল। এই সময়ে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সতীদাহ বিষয়ে রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। লর্ড আমহার্ষ্টের পূর্ব্বে এ বিষয়ে যে সকল নিয়ম ছিল, তাহা এই আইনের অন্তর্গত করা হইল। বারাণসীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যামিল্টন সাহেব (R. N. C. Hamilton) উক্ত আইনের ধারা উদ্ধৃত করিয়া ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট, উহা ঘোষণা করিয়া দেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি বেলি সাহেব (W. B. Bayley) এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। হ্যারিংটন্ সাহেব, (I. J. Harrington) ১৮ই ফেব্রুয়ারি দিবসে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই সতীদাহ রহিত করিবার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। হ্যারিংটন্ সাহেব একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ধারা ও ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ধারায় সতীদাহের কোন বাধা দিতে পারে নাই।"

বেলিসাহেব যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—

"১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে ও পশ্চিম অঞ্চলে কতকগুলি স্ত্রীলোক সহমৃতা হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত, অন্যান্য পত্র ও বর্ণনার সহিত, মেকনাটেনের যে পত্র গত ২০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি।

"১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে সকল সতীদাহের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহের সংখ্যা ৬৩৯। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য জিলা অপেক্ষা রাজধানীর নিকটস্থ জিলাসমূহে এই প্রথা অধিক প্রচলিত।

"আমার বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এই নৃশংস প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে উচিত, তাহার অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ
১৭ই জানুয়ারি

বেলি।"

বেলিসাহেবের অভিপ্রায় পাঠ করিয়া ব্যবস্থাপকসভার সহকারী সভাপতি কম্বারমিয়ার সাহেব ঐ সালের ১লা মার্চ্চে, এইরূপ লেখেন ;—

"নৃশংস সহমরণপ্রথা শীঘ্র রহিত করিবার জন্য, বেলিসাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন, অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ
১লা মার্চ্চ — কম্বারমিয়ার
সহকারী সভাপতি।"

গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ষ্ট এ বিষয়ে এইরূপ মত লিপিবন্ধ করিলেন ;—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন কার্য্য অসম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা হইলে, তাহাতে সুফলপ্রসূত না হইয়া কুফল উৎপন্ন হইবার অধিক সম্ভাবনা। সতীদাহ একেবারে স্থগিত করার জন্য কোন আইন বিধিবন্ধ করা আমি ভাল বোধ করি না। সে কার্য্যে আমার মত নাই।"

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ
১৮ই মার্চ্চ — আমহার্ষ্ট।"

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল। লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ, গবর্ণর জেনারলের পদ পরিত্যাগ করিলে, বেলিসাহেব ঐ সালের ১৩ই মার্চ্চ হইতে ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন। ৪ঠা জুলাই দিবসে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারলের পদ গ্রহণ করেন।

বেণ্টিঙ্কের সময়ে সতীদাহের পক্ষসমর্থন করিয়া একশত পৃষ্ঠাপরিমিত এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে অঙ্গীরা, পরাশর, হারিত প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত ছিল।

রামমোহন রায় যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা, তাঁহার স্বদেশবাসী অনেক লোককে বুঝাইয়া দিলেন যে, সতীদাহপ্রথা, ন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে, বিসপ হিবর, কলিকাতা হইতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ডাক্তার মার্সম্যানের (ইনি শ্রীরামপুরের সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রি) নিকটে শুনিয়াছেন যে, দেশীয় লোকের মধ্যে অনেক ক্ষমতাশালী ও ধনীব্যক্তি সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত একমত প্রকাশ করিতেছেন। শাস্ত্রে যে সতীদাহ বিষয়ে কোন আদেশ নাই, এবং উহা যে নৃশংসপ্রথা ইহা তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১৮২০ সালের ২৭শে জুলাই, ইণ্ডিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের যে প্রশংসা বাহির হইয়াছিল, তাহার পাঁচ মাসের মধ্যে রাজবিধিদ্বারা সতীদাহ নিবারিত হইয়াছিল।

বৃটিস গবর্ণমেণ্ট নৃশংস সতীদাহপ্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনে মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, পাছে তদ্দ্বারা প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, এবং বিদ্রোহিতা উপস্থিত হয়। ১৮২১ সালে, ২০শে জুন, এবিষয়ে পার্লেমেণ্ট সভায় (House of Commons) যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে ক্যানিংসাহেব উক্ত আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষস্থ রাজ-কর্ম্মচারী সতীদাহপ্রথা উঠাইবার পক্ষে ছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে, কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্র-লোক, উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ হন, ইহা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। রামমোহন রায়ের প্রাণগত চেষ্টায় এদেশের অনেকগুলি ভদ্রলোক ক্রমে ক্রমে বুঝিতে

পারিলেন যে, সতীদাহ অত্যন্ত অন্যায় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য। রামমোহন রায় একদিকে যেমন দেশের অনেকগুলি লোককে বুঝাইয়া দিলেন যে, সতীদাহ প্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ আবার অন্যদিকে, গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইলেন, যে, সতীদাহপ্রথা, শাস্ত্রসিদ্ধ নহে; উহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে না। সতীদাহসম্বন্ধে রামমোহন রায়ের এই সুমহৎ কার্য্য, ভারতের ইতিবৃত্তে চিরদিন বিঘোষিত হইবে। এই মহৎ কার্য্যের জন্য তিনি অসামান্য পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষ চিরদিন তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক

সতীদাহনিবারণ সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। তৎকালীন গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম্‌ বেণ্টিঙ্ক উক্ত বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহার নিকট একজন এডিকং প্রেরণ করেন। তিনি (রামমোহন রায়) এডিকংকে বলিলেন, "আমি এক্ষণে বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক লাট সাহেবকে জ্ঞাত করিবেন যে, রাজদরবারে উপস্থিত হইতে আমার বড় ইচ্ছা নাই। এডিকং যে প্রকার শুনিলেন, বেণ্টিঙ্ক সাহেবের নিকট গিয়া অবিকল তাহা জানাইলেন। বেণ্টিঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলেন?" এডিকং উত্তর করিলেন "আমি বলিয়াছিলাম যে, গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বাধিত হন।" বেণ্টিঙ্ক শুনিয়া বলিলেন "আপনি পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট গমন করুন; গিয়া বলুন যে, মিষ্টার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিলে তিনি বাধিত হন।" এডিকং পুনরায় রামমোহন রায়ের নিকট আসিয়া ঐরূপ বলিলেন। গবর্ণর জেনারলের এতদূর আগ্রহ ও শিষ্টাচারকে রামমোহন রায় কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেণ্টিঙ্ক ও রামমোহন রায়ের এই শুভযোগ হইতে যে সুমহৎ ফল প্রসূত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জনৈক সুবক্তা ইহাকে "মণিকাঞ্চনযোগ" বলিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরমণীগণ যে, বুদ্ধি বিবেচনার অনুবর্ত্তিনী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শরীর ভস্মাবশেষ করিতেন, এরূপ নহে। বিধবার সম্পত্তি থাকিলে অনেক স্থলে তাহার স্বার্থপর আত্মীয়গণ উহা অধিকার করিবার আশায়, সহমরণে তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণকে উৎকোচ দিয়া নিযুক্ত করিতেন। বিধবা যখন পতিবিরহে শোকোন্মত্তা, বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, সেই সময়েই সুবিধা বুঝিয়া সহমরণ বিষয়ে তাহার মত গ্রহণ করা হইত। শোকের সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে কিছুমাত্র আহার দেওয়া হইত না, এবং শোক ও অনাহারজনিত ক্ষীণতা উপস্থিত হইলে ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া তাহার মত গ্রহণ করা হইত। পূর্ব্বে যে পেগ্‌স্‌ সাহেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে ভাং পান করাইবার কথা বলিয়াছেন।

সতীদাহনিবারণ

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তকনিচয় সতীদাহ নিবারণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত কুপ্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন; কিন্তু পাছে দেশীয় ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, এই

আশঙ্কায় তাহাতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। রামমোহন রায়ের গ্রন্থ এ বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রম দূর করিয়া দিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, এই কুরীতি রাক্ষসীকে ভারতভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। রামমোহন রায়ের বহুদিনের প্রাণের আশা সফল হইল; তাঁহার বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের নাম অতীতসাক্ষী ইতিহাস চিরদিন কীর্ত্তন করিবে।

সতীদাহনিবারণআইন বিধিবদ্ধ হওয়ার দুই দিবস পরে, নিজামত আদালত দেশের ম্যাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট বিশেষ পরামর্শসহ ঐ আইনের প্রতিলিপি প্রেরণ করেন।

বিদ্বেষবুদ্ধি ও আন্দোলন

সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে ধর্ম্মসভার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহাদের ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিসীমা থাকিল না। আর তাঁহারা পরমারাধ্য জননী, স্নেহপ্রতিম ভগিনী প্রভৃতিকে জ্বলন্ত চিতানলে জীবন্তদগ্ধ করিতে পারিবেন না, ইহা কি সামান্য পরিতাপের কথা। ধর্ম্মসভা কেন, সমুদায় বঙ্গভূমি,—ভারতবর্ষে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ঘোর কলি উপস্থিত! রামমোহন রায়ের প্রতি চতুর্দ্দিক্ হইতে গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজচ্যুত করা হইল। এই সময়ে কলিকাতার কোন কোন বড়মানুষ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবেন। বাস্তবিক, রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের পক্ষে অতি সংকটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার হিতৈষী ব্যক্তিগণ, তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকিতে, বাহিরে যাইবার সময়ে সঙ্গে প্রহরী লইয়া যাইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয়ভাবে একাকী নগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতেন। একেবারে সাবধান হন নাই, এরূপ নহে। বাহিরে যাইবার সময়ে, বক্ষঃস্থলে, পোষাকের ভিতর কিরিচ রক্ষা করিতেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দনপত্রপ্রদান

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ জন্য রামমোহন রায় সবান্ধবে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১২৩৬ সালের ৪ঠা মাঘে, রাজা রামমোহন রায় টাউন হলে এক সভা করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, হরিহর দত্ত এবং অপর কয়েকজন ব্যক্তি, কলিকাতা নগরের ৩০০ তিনশত অধিবাসীর পক্ষ হইয়া উহা গবর্ণর জেনারলকে প্রদান করেন। দুইখানি অভিনন্দন পত্র লিখিত হইয়াছিল। একখানি বাঙ্গালা ভাষায় ও একখানি ইংরেজীতে। বাঙ্গালাখানি মূল। ইংরেজীখানি তাহার অনুবাদ। টাকির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, বাবু কালীনাথ রায় মহাশয় বাঙ্গালা অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। বাবু হরিহর দত্ত উহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিলেন।

আমরা কোন ভক্তিভাজন প্রাচীন ব্যক্তির* নিকট শুনিয়াছি যে, বাবু দ্বারকানাথ

* শ্রীযুক্তবাবু রামতনু লাহিড়ী।

ঠাকুর, টাকির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তিন চারি জন ব্যতীত দেশের কোন সম্ভ্রান্ত লোক উক্ত অভিনন্দনপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই।

রামমোহন রায় উক্ত অভিনন্দনপত্রের এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন ;—

"We are, my Lord, reluctantly restrained by the consideration of the nature of your exalted situation, from indicating our inward feelings by presenting any valuable offerings as commonly adopted on such occasions; but we should consider ourselves highly guilty of insincerity and ingratitude, if we remained negligently silent when unrently called upon by our feelings and conscience to express publicly the gratitude we feel for the everlasting obligation you have graciously conferred on the Hindoo Community at large. We, however, are at a loss to find language sufficiently indicative even of a small portion of the sentiments we are desirous of expressing on the occasion; we must therefore conclude this address with entreating that your Lordship will condescendingly accept our most grateful acknowledgment for this act of benevolence toward us, and will pardon the silence of those who, though equally partaking of the blessing bestowed by your Lordship, have through ignorance or prejudice omitted to join us in this common cause."

সর্ব্বশেষে যে কথাটি রহিয়াছে, কেমন সুন্দর। "যাঁহারা আপনার প্রদত্ত অনুগ্রহ আমাদের সহিত সমভাবে লাভ করিয়াছেন, অথচ অজ্ঞতা বা কুসংস্কারবশতঃ (এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপ) সাধারণকার্য্যে যোগ দেন নাই, আপনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।" লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই অভিনন্দনপত্রের একটি সুন্দর উত্তর প্রদান করিলেন।* †

কিন্তু ধর্ম্মসভা নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সতীদাহ নিবারণের আইন রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন।

* শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের ইং গ্রন্থাবলীর ৩৮৩—৩৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† এই অভিনন্দনপত্র সম্বন্ধে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট আমরা একটি গল্প শুনিয়াছি। যে সময়ে গবর্ণর জেনারলকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়, সেই সময়ে বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, বাবু দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দুকালেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা এক-দিবস কালেজের এক ঘরে বসিয়া অভিনন্দনপত্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, উক্ত পত্রের ইংরেজী রচনা রামমোহন রায়ের কি আড্যাম সাহেবের। এমন সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ডিরোজীও সাহেব আসিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা মানুষ, না এই দেয়াল? নারীহত্যারূপ ভীষণ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথা আনন্দ করিবে না অভিনন্দনপত্রের ইংরেজী কাহার রচনা এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত! রামমোহন রায় ইংরেজীতে কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি জানিলে তোমরা উহা আড্যাম সাহেবের বলিয়া মনে করিতে না।"

নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নারীজাতির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। স্বদেশীয় রমণীকুলের হিতের জন্য তিনি কোন পরিশ্রমকেই পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। তাহাদিগের শোচনীয় অবস্থা চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। সহমরণ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাজনিতঅত্যাচার হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ নিরন্তর ক্রন্দন করিত। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অত্যাচারে তিনি যার পর নাই কাতর হইতেন। তাঁহার প্রণীত সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থের একস্থলে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

এদেশীয় রমণীগণের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উক্তি

"নিবর্ত্তক। —এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে ; কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ; এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন ; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে ; কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্যি কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

"প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয় ; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাতা আছে ; বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

"দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি ; কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যদ্বারা স্বীকার উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

"তৃতীয়তঃ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, বিবেচনা কর যে কত স্ত্রী, পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ, স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত

হইয়াছে ; আমরা অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক ; তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহারদ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এপর্য্যন্ত, কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

"চতুর্থ, যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহগণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি ; আর স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

"পঞ্চম, তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প। এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ, কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাঁহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি-বার সাক্ষাৎ করেন ; তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীদ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃ-গৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম-নির্ব্বাহ করেন ; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহাদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন ; যেহেতু, স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্রমার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে ; যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিককাল করেন ; এই নিমিত্ত বিষয়-ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইঁহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে ; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন ; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ-পূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যাঁহাদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘোষী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচারদোষে মগ্ন হয়, এবং মাস-মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়। এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে। আর যাহার স্বামী দুই

তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে, চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে। অনেকেই ধর্ম্ম-ভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"

রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্মীয় সভা সংস্থাপন করেন। এই সময়ে প্রাতস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। ডেভিড হেয়ার রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের মহৎ কার্য্যে, তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। পরলোকগত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের রচিত, ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত পুস্তকে এ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, ডেভিড হেয়ার রাম-মোহন রায়কে পাইয়া একজন একান্ত স্নেহশীল বন্ধু লাভ করিলেন। রামমোহন রায় তখন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং সতীদাহ প্রথা রহিত করিবার জন্য স্বর্গমর্ত্ত্য বিচলিত করিতেছিলেন।

(David Hare) "..found an ardent friend in Ram Mohan Ray. He had begun to spread Theism, denounce idolatry, and was moving heaven and earth for the abolition of the Suttee rite."

ডেভিড হেয়ারের ন্যায় একজন প্রকৃত মহৎ, সাধু ও জনহিতৈষী ব্যক্তির সহিত রামমোহন রায় অকৃত্রিম বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; যার পর নাই স্বাভাবিক। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের কার্য্যে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন।*

রামমোহন রায় ও বহুবিবাহপ্রথা

রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয় বঙ্গবাসিনী দুঃখিনী অবলাকুলের দুঃখে কতদূর কাতর হইয়াছিল, তাঁহার লিখিত উদ্ধৃত অংশটির প্রতি পংক্তি তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছে। উহাতে তৎকালীন সমাজের চিত্র যথাযথরূপে চিত্রিত হইয়াছে। বহুবিবাহ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের যন্ত্রণার সকল প্রকার কারণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শেষোক্ত

* প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের রচিত ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত পুস্তকে লিখিত আছে যে, রামমোহন রায়ের নিকটে, হেয়ারসাহেব প্রথম মদগুর মৎস্য আহার করিতে শিক্ষা করেন।

কদর্য্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। উহার বিষময় ফল স্বদেশবাসীগণকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিয়াছিলেন। আধুনিক কৌলীন্য ও অধিবেদনপ্রথা যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণ থাকিলেই ঋষিগণ দারান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, অন্যথা নহে।

মদ্যপাসাধুবৃত্তাচ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাহধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ।।

পত্নী যদি সুরাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষীণী, হিংস্রস্বভাবা, অর্থনাশিনী বা রোগগ্রস্তা হয়, তাহা হইলে পুরুষ দারান্তর গ্রহণ করিবেক।

বন্ধ্যাষ্টমে ধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী মদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ।।

পত্নী যদি বন্ধ্যা হয়, তবে অষ্টবৎসর; যদি মৃতবৎসা হয়, তবে দশ বৎসর, যদি কেবল কন্যাসন্তান হইতে থাকে, তবে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত দেখিয়া পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে।

যা রোগিণী স্যাত্তু হিতাসম্পন্না চৈবশীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যাচ কর্হিচিৎ ।।

সচ্চরিত্রা, হিতকারিনী স্ত্রী, রুগ্ণা হইলেও সম্মতি গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে, তাহাকে কখন অবমাননা করিবে না।

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অত্যন্ত উপকার হয় যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন দোষ আছে। প্রমাণ করিতে সক্ষম না হইলে, সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না। রাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শ মতে কার্য্য হইলে ভারতবাসিনী অবলাকুলের দুঃখযন্ত্রণা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইত।

কেহ কেহ বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, ইহাতে রাজা রামমোহন রায়ের মত ছিল না। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহার এ প্রকার মত হইলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, রাজবিধিদ্বারা সতীদাহ রহিত করিলে পর, তিনি তাঁহাকে টাউন হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া, তজ্জন্য অভিনন্দনপত্র প্রদান করিতেন না। বহুবিবাহ নিবারণ জন্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, তিনি রাজবিধির আবশ্যকতা অনুভব করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র যে বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন, বহু বিবাহের বিরোধী, রাজা তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন ;—

"Had a Magistrate or other public officer been authorized by the rulers of the empire to receive applications for his sanction to a second marriage during the life of a first wife, and to grant his consent only on such accusations as the foregoing being substantiated, the above law might have been rendered effectual, and the distress of the female sex in Bengal, and the number of suicides, would have been necessarily very much reduced."

রামমোহন রায় ও হিন্দুনারীর দায়াধিকার

রাজা রামমোহন রায়, আর একটি অতি গুরুতর বিষয়ে, লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে এক্ষণে যে ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহা যে নিতান্ত অন্যায় ও প্রাচীনশাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহা তিনি শাস্ত্রীয়প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন যে, শাস্ত্রানুসারে পত্নী মৃত-পতির সম্পত্তিতে পুত্রদিগের ন্যায় সমানাধিকারিণী। একাধিক পত্নী থাকিলে, তাহারা প্রত্যেকে স্বামীর সম্পত্তির অংশভাগিনী। যাহাতে সপত্নীপুত্রেরা পুত্রহীনা বিমাতাকে তাঁহার স্বামীর বিত্ত হইতে বঞ্চিত করিতে না পারেন, তজ্জন্য কোন কোন ঋষি ইহা বিশেষরূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উক্ত অবস্থাপন্ন বিধবারা নিশ্চয়ই স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন। রাজা রামমোহন রায় অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আধুনিক দায়ভাগকারগণ প্রাচীন মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া পতিবিত্তসম্বন্ধে হিন্দু-রমণীর অধিকার খর্ব্ব করিয়াছেন। তিনি বলেন, দায়তত্ত্ব ও দায়ভাগলেখকগণের মতে, যদি স্বামী, জীবদ্দশায় পুত্রহীনা পত্নীকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া না দিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি তাহাতে অধিকারিণী হইবেন না। যে স্ত্রীলোকের কেবল এক-মাত্র পুত্র আছে, তাঁহারও স্বামীবিত্তেতে স্বত্ব জন্মিবে না, পুত্র বিষয়াধিকারী হইবে। পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূ বিষয়াধিকারিণী হইবে, তথাচ স্বামীসম্পত্তিতে তাঁহার লেশমাত্র অধিকার জন্মিবে না। পুত্র জীবিত থাকিতে অন্নবস্ত্রের জন্য তাহার মুখাপেক্ষা করিতে হইবে,—পুত্রের মুখাপেক্ষার অর্থ অনেক স্থলে পুত্রবধূর মুখাপেক্ষা। পুত্রের মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পৌত্র বা পুত্রবধূর প্রতি নির্ভর করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন করেন যে, ইয়োরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দায়াধিকার সম্বন্ধে নারীজাতির প্রতি অনেক গুণে ন্যায় ও দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক টীকাকারদিগের দোষাবহ মীমাংসার জন্য তাঁহারা সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। কল্য যিনি গৃহের কর্ত্রী ছিলেন, অদ্য স্বামীর মৃত্যুতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পুত্র ও পুত্রবধূদিগের অনুগ্রহের পাত্রী ; অনেক সময়ে অবজ্ঞা ও অনাদরের পাত্রী। তিনি তাহাদিগের অনুজ্ঞাব্যতীত একটি পয়সা কি একখানি বস্ত্রও কাহাকে দান করিতে পারেন না। পুত্রবধূ ও শাশুড়ির মধ্যে বিবাদ হইলে, অনেক সময়ে পক্ষপাতী পুত্র, বধূর পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক জননীকে নির্যাতন করে। বহুবিবাহের প্রাবল্যবশতঃ এদেশে বিধবা বিমাতার সংখ্যা অধিক। সুতরাং অনেক অনাথা পুত্রহীনা বিধবাকে সপত্নীপুত্রের হস্তে যার পর নাই যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়।

রাজা রামমোহন রায় বিধবাদিগের দুর্গতি বর্ণনা করিয়া তৎপরে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দায়াধিকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা বঙ্গদেশে সহমরণ ও বহুবিবাহের আধিক্যের একটি কারণ। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান অপেক্ষা বঙ্গভূমিতে সহমরণ সংখ্যা অধিক। কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাল্য-সংস্কার এই আধিক্যের কারণ নহে। স্বামীর মৃত্যুর পর, তাঁহার বিত্ত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিধবাগণকে কি প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগের জীবনের প্রতি মমতা হ্রাস হইয়া যায় ; সুতরাং ইহকালের দারুণ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গসুখ ভোগের আশায় অনেকে সহমৃতা হইতে সহজে সম্মতি প্রদান করে। দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থা বহুবিবাহের আধিক্যের কারণ কেন? যদি পুরুষ জানিত যে, তাহার বিবাহিত পত্নীকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হইবে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধিক সংখ্যার

বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হইত। যতই কেন বিবাহ করি না, কোনও স্ত্রীই বিত্তের অংশ-ভাগিনী হইবে না, এমন কি, তাহার ভরণ পোষণের ভার পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে না, এরূপ জানিলে, লোকের বহুবিবাহ প্রবৃত্তি প্রবল হইবারই কথা।

কন্যাপণ বা কন্যাবিক্রয়

কন্যাবিক্রয় রূপ কদাচারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে বলিতেছেন যে, নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে কন্যাবিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে। যে ব্যক্তি অধিক অর্থ দিতে পারে, তাহারই সহিত তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা অর্থলোভে বৃদ্ধ, রুগ্ণ ও অঙ্গহীন ব্যক্তির সঙ্গেও কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। ইহার ফল এই হয় যে, বিবাহিতা কন্যা শীঘ্রই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়, অথবা যাবজ্জীবন অত্যন্ত ক্লেশে দিনযাপন করে। রাজা এ বিষয়ে বলিতেছেন ;—

"In the practice of our contemporaries a daughter or a sister is often a source of emolument to the Brahmuns of less respectable caste, (who are most numerous in Bengal) and to the Kayusths of high caste. These so far from spending money on the marriage of their daughters or sisters, receive frequently considerable sums, and generally bestow them in marriage on those who can pay most. Such Brahmuns and Kayusths, I regret to say frequently marry their female relations to men having natural defects or worn-out by old age, and disease, merely from pecuniary considerations, whereby they either bring widow-hood upon them soon after marriage or render their lives miserable. They not only degrade themselves by such cruel and unmanly conduct, but violate entirely express authorities of Munoo and all other ancient law-givers, a few of which I here quote." *

রাজা তৎপরে কন্যাবিক্রয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্র হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জাতিভেদ

'বজ্রসূচি' গ্রন্থপ্রকাশ

জাতিভেদ প্রথা যে ভারতবর্ষের অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহা রাজা রামমোহন রায় সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে উক্ত প্রথার অসারত্ব বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য বিরচিত 'বজ্রসূচি' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। উহাতে জাতিভেদের অযুক্ততা অখণ্ডনীয় যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

*রাজার ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।

রাজা রামমোহন রায় ১৭৪৯ শকে উহার প্রথম নির্ণয় নামক প্রথম অধ্যায়টি অনুবাদ করিয়া মূল এবং তাহার ভাষা বিবরণ প্রকাশ করেন।

বজ্রসূচি গ্রন্থের যে অংশটুকু রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ কি, বা ব্রাহ্মণ কি, ইহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কেননা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। ব্রাহ্মণ শব্দে কি বুঝায়? জীবাত্মা, দেহ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, পাণ্ডিত্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, ইহার কিসে ব্রাহ্মণত্ব হয়, অথবা ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কি?

যদি বল জীবাত্মা ব্রাহ্মণ, সে কথায় দোষ হয়। প্রথমতঃ সকল প্রাণীর জীবাত্মার স্বরূপ এক বলিয়া স্বীকার করিলে, সকল প্রাণীর ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ শরীরভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করিলে, ইহ জন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি কর্ম্মানুসারে জন্মান্তরে শূদ্রদেহ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মণরূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহাতে যে জীবাত্মা আছেন, তিনি ব্রাহ্মণ, এমন কথা বলিলে, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহারমূলক হয়। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, পরমার্থতঃ উহা কিছুই নহে। যদি কোন অজ্ঞাতকুলশীল শূদ্র, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণরূপে ব্যবহার করে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে কি না? তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন এবং এক শয্যায় শয়ন উপবেশনাদি করিলে পাপোৎপত্তি হয় কি না? শাস্ত্রানুসারে অবশ্য হয়। অতএব জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বল দেহ ব্রাহ্মণ, তবে আচণ্ডাল সকল মনুষ্যের দেহ ব্রাহ্মণ হইল। কেননা সকল মনুষ্যের মূর্ত্তি তুল্য এবং জরামরণাদি ধর্ম্ম সকল দেহে একরূপ। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ একশত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অর্দ্ধেক ক্ষত্রিয়, তাহার অর্দ্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্দ্ধেক শূদ্র বাঁচিয়া থাকেন, এরূপ নিয়ম নাই। এরূপ নিয়ম থাকিলে অন্য দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ দেহের বৈলক্ষণ্য জানা যাইত। আর এক কথা এই, দেহকে ব্রাহ্মণ বলিলে পিতা-মাতার মৃতদেহকে দাহ করিয়া পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপের উৎপত্তি হয় না কেন? অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বল জাতি ব্রাহ্মণ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষীসকল এক এক জাতি-বিশিষ্ট; কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ, নয় কেন? যদি জাতিশব্দে জন্ম বুঝায়, অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিত বিবাহদ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্রাহ্মণ এমন বল, তাহা হইলে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বর্ণিত অনেক প্রসিদ্ধ মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মিয়াছিলেন। পুষ্পস্তবক হইতে কোসীমুনি, উই ঢিবি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মতঙ্গ মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, হস্তীগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজমুনি, কৈবর্ত্ত কন্যাতে বেদব্যাস, বিশ্বামিত্র মুনির পিতা ও মাতা উভয়েই ক্ষত্রিয়। এই সকল মুনিদিগের উক্ত প্রকারে জন্ম হইলেও, তাঁহারা সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বল শরীরের বর্ণ বিশেষদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয়, তাহা হইলে সত্ত্বগুণ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ, এবং সত্ত্ব ও রজ গুণপ্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ; রজ ও তমগুণপ্রযুক্ত বৈশ্যের পীত-

বর্ণ এবং তমগুণপ্রযুক্ত শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এবং পূর্ব্বকালেও শুক্লাদি বর্ণের স্থানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। অতএব শরীরের বর্ণ-বিশেষদ্বারা কদাপি কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি বল, ধর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিয়াছেন, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপী কূপাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং ক্ষত্রিয়াদি অনেকে নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কেন ব্রাহ্মণ বলিব না? অতএব দেখা গেল, ধর্ম্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি বল যে, পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয়গণকে কেন ব্রাহ্মণ বলিব না? শাস্ত্রে দেখিতেছি, জনকাদির মহা পাণ্ডিত্যের কথা বর্ণিত রহিয়াছে; কিন্তু জনক ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক্ষণেও ব্রাহ্মণেতর অনেক অনেক জাতীয় লোকের পাণ্ডিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু তাহাদিগকে কেহ ব্রাহ্মণ বলে না। অতএব পাণ্ডিত্যের দ্বারা কদাপি কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি বল, কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, ভূমি প্রভৃতি দান করিতেছেন। কিন্তু এই সকল কর্ম্মের জন্য তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব হয় না। অতএব কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হইল না।

তবে কে ব্রাহ্মণ? করতলন্যস্ত আমলক ফলে যেমন নিশ্চয় বিশ্বাস হয়, পরমাত্মাতে সেইরূপ বিশ্বাসদ্বারা যিনি কৃতার্থ হইয়াছেন, শম দমাদি সাধনে যিনি যত্নশীল, দয়া সরলতা ক্ষমা সত্য সন্তোষ ইত্যাদি গুণে যিনি ভূষিত, যিনি মাৎসর্য্য দম্ভ মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ বলা যায়। যেহেতু শাস্ত্রে আছে;

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ ।।"

জন্ম হইলে সর্ব্বসাধারণ লোক শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দ-বাচ্য হন, বেদাভ্যাসদ্বারা বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন।

অতএব, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য কেহ নহে, ইহা নিশ্চয় হইল। "যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে স্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে পুনর্গমন করে তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।" "সকল বেদ যে ব্রহ্ম-পদকে কহিতেছেন" "ব্রহ্ম একমাত্র দ্বিতীয়রহিত" "নাম রূপ হইতে যিনি ভিন্ন তিনি ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং তাহার অভাবদ্বারা শূদ্র হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত।

(বজ্রসূচিগ্রন্থে ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর মতের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় মত প্রায়ই তুল্য। 'আর্য্য-সমাজ সংস্কার বিধি' গ্রন্থে দয়ানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্যদ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হয়। জ্ঞানের অভাবদ্বারা শূদ্র হয়। দয়ানন্দের মতে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে অল্প প্রভেদ। যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া রাজকার্য্যে বা যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হন, তিনি ক্ষত্রিয়। আর যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই বৈশ্য।)

বিধবাবিবাহ

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, রাজা রামমোহন রায় বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে বিধবাবিবাহের পক্ষে কোন প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা শুনিয়াছি যে, বালিকা বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত হয়, রামমোহন রায় বন্ধুদিগের নিকটে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তিনি বিলাত গমন করিলে সর্ব্বত্র জনরব হইয়াছিল যে, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবেন। এপ্রকার জনরবের কোন মূল থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার সহমরণবিষয়ক পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত স্থানটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তিনি অন্ততঃ উক্ত পুস্তক লিখিবার সময় পর্য্যন্ত বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন না। সহমরণবিষয়ক পুস্তকের সে স্থানটি এই,—
"শেষে লেখেন যে, তন্ত্রবচনানুসারে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অনুচিত এবং মনুষ্যের গোমাংস-ভোজন কর্ত্তব্য, এবং বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উচিত, এ সকল বিষয়ের অনুমতির নিমিত্ত রাজদ্বারে আবেদন করা যায়। উত্তর; ঐ সকল তন্ত্রবচনের যদি বেদ ও মানবাদি স্মৃতির সহিত এক বাক্যতায় মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের বিশ্বাস হইয়া থাকে ও নিবন্ধকারদের মীমাংসাসম্মত হয়, এরূপ তাঁহার নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তিনি অগ্রে অবাধেই এ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা ঐ বচন সকলের অনৈক্য জানেন ও সংগ্রহকারের মীমাংসাসিদ্ধ নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মুগ্ধবোধচ্ছাত্র যে উপদেশ দিতেছেন, সে ব্যর্থশ্রম।"*

* রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

দশম অধ্যায়

পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি

(১৮১৭—১৮৩০ সাল)

ইংরেজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্যজ্ঞানপ্রচারদ্বারা ভারতবর্ষের যে অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন; ইহার জন্য ডেভিড হেয়ার, লর্ড মেকলে প্রভৃতির ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের নিকটেও আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। তাঁহার সময়ে রাজপুরুষদিগের মধ্যে একটি বিচার চলিতেছিল। এক পক্ষের মত এই ছিল যে, এতদ্দেশীয় লোককে ইংরেজীশিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসীশিক্ষা দেওয়াই বিধেয়, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এক পক্ষ হিন্দুদিগের জন্য সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত একটি কালেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই বিচারের সময়ে রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ষ্টকে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে উক্ত বিষয়ে একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কেবল সংস্কৃত ও পারসীশিক্ষায় এদেশীয়লোকের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই; ইংরেজীশিক্ষা ব্যতীত লোকের দৃঢ়-নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নির্ম্মূল হইবে না। সুতরাং হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থাও কখন বিদূরিত হইবে না। কুসংস্কারবিনাশ ও সামাজিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যজ্ঞান যার পর নাই আবশ্যক। উক্ত পত্রখানি এরূপ অকাট্য যুক্তি ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ যে, তৎকালীন সুবিজ্ঞ ইংরেজেরা উহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিসপ হিবার উহাকে একটি আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যে সময়ের লোক, তাহা স্মরণ করিলে পত্রখানিকে বাস্তবিক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিতে হয়। উহা পাঠ করিয়া অনেকেই ইংরেজীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমরা পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

TO HIS EXCELLENCY THE RIGHT HONOURABLE LORD AMHERST GOVERNOR-GENERAL IN COUNCIL

MY LORD,

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present

rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs and ideas are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves and afford our rulers just grounds of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present, to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for improvement.

The establishment of a new Sanskrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the natives of India by education,—a blessing for which they must even be grateful, and every wellwisher of the human race must be desirous that the efforts made to promote it, should be guided by the most enlightened principles, so that the stream of intelligence may flow in the most useful channels.

When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talent and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge, thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude, we already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened nations of the West with the glorious ambition of planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe.

We find that the government are establishing a Sanskrit School under Hindoo Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors

or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago with the addition of vain and empty subtleties since then produced by speculative men such as is already commonly taught in all parts of India.

The Sanskrit language so difficult that almost a lifetime is necessary for its acquisition is well known to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge, and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of valuable information it contains, this might be much more easily accomplished, by other means than the establishment of a new Sanskrit College, for there have been always and are now numerous professors of Sanskrit in the different parts of the country engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of the new seminary. Therefore, their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted, by holding out premiums and granting certain allowance to their most eminent professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertion.

From these considerations, as the sum set apart for the instruction of the natives of India was intended by the Government in England for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation, that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed, since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Baikarana or Sanskrit Grammer. For instance, in learning to discuss such points as the following; *khada* signifying to eat, *khadati* he or she or it eats; query; whether does *khadati* taken as a whole conveys the meaning he, she or it eats, or are separate parts of this meaning conveyed by distinction of the words. As if in the English language it were asked, how much meaning is there in the *eat* and how much in the *s*? And is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly or by them taken jointly?

Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta;—in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation

does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother, &c., have no actual entity, they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world, the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the *Mimansa* from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta and what is the real nature and operative influence of passage of the Vedas, &c.

The student of the Naya Shastra cannot be said to have improved his mind, after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation, the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear &c.

In order to enable your Lordship to appreciate utility of encouraging such imaginary learning as above characterised, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowlegde, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing a College furnished with necessary books, instruments, and other apparatus.

In representing this subject to your Lordship, I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened soverign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land, actuated by a desire to improve the inhabitants, and therefore humbly trust you will excuse

the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

I HAVE THE HONOUR &C.
RAM MOHUN ROY.

এস্থলে অনুষঙ্গক্রমে আমরা একটি কথা বলিতেছি। উক্ত পত্রে রাজা কতকগুলি বৈদান্তিক মত ও হিন্দু দার্শনিকদিগের অন্যান্য মতের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, তিনি বেদান্তাদি দর্শনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না। তিনি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। বেদান্তদর্শনকে ভিত্তিমূল করিয়া তিনি পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছিলেন। কেবল হিন্দু পণ্ডিত-গণের সহিত কেন? 'ব্রাহ্মণসেবধি' পত্রে, পাদ্রিসাহেবদিগের আপত্তিখণ্ডনে তিনি বেদান্ত-দর্শনের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি বেদান্ত মতানুযায়ী সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।*

তবে এস্থলে সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষ-সমর্থন করিয়া গবর্ণর জেনারলকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বৈদান্তিকমতের বিরুদ্ধে লেখনীচালনা কেন করিলেন? এস্থলে তিনি কি উকিলের ন্যায়, বিশেষভাবে পাশ্চাত্যশিক্ষার গৌরব ও আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বেদান্তাদি হিন্দুদর্শনের নিন্দা করিয়াছেন? কখনই না। তবে তিনি ঐরূপ কেন লিখিলেন?

তিনি বেদান্তদর্শনের বিরোধী ছিলেন না। সচরাচর বেদান্তশাস্ত্র যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহারই বিরোধী ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াও সকল পদার্থের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতেন। কেবল তাহাই নহে। অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও তিনি লৌকিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও নৈতিকদায়িত্বে বিশ্বাস করিতেন।†

বেদান্তশাস্ত্রের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন রায়ই বঙ্গদেশে বেদান্ত-চর্চ্চার প্রবর্ত্তক। তিনিই প্রথমে মূল সংস্কৃত বেদান্তদর্শন এদেশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তিনিই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথমে বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত পঞ্চোপনিষদ মুদ্রিত করিয়া বঙ্গবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করেন। হিন্দুদর্শনের প্রতি তাঁহার যে আস্থা ছিল, তাহার আর একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ এই যে, কুমারী কার্পেণ্টারের লিখিত 'The Last Days in England of the Raja Ram Mohun Roy' নামক পুস্তকে আছে যে, রাজা ইংলণ্ডবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকটে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদর্শনের তুলনায় ইংলণ্ডের দর্শন কিছুই নহে।

রামমোহন রায়ের বেদবিদ্যালয়

এদেশে বেদান্তচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য রাজা যাহা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বলিয়াছি। এস্থলে উক্ত বিষয়ে তাঁহার একটি কার্য্যের কথা বলিব। তিনি বেদশিক্ষার জন্য ১৮২৬ সালে একটি বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ৭৪নং বাটীতে উক্ত বেদবিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। পরলোকগত শ্রীযুক্তবাবু আনন্দচন্দ্র

* ৯৯ ও ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

† ৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বসু ও তাঁহার পুত্রের মুখে আমাদের কোন কোন বন্ধু শুনিয়াছেন যে, উক্ত বাটীতেই রামমোহন রায়ের বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামমোহন রায় বিলাত গমন করিলে, তাঁহার অনেক ভূসম্পত্তি বন্ধক থাকা সূত্রে বিক্রীত হইয়া যায়। ঐ বাটীটিও সেইরূপ বিক্রীত হইয়াছিল। উক্ত আনন্দচন্দ্র বসু মহাশয় উহা ক্রয় করেন।*

উক্ত বিদ্যালয়ের বিষয়ে ১৮২৬ সালের ২৭ জুলাই দিবসে আড্যাম সাহেব যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম ;—

"অল্পদিন হইল, রামমোহন রায় একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি উহার নাম দিয়াছেন, বেদ-বিদ্যালয়। এক্ষণে উহাতে অল্পসংখ্যক কয়েকজন যুবা, একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভ করিতেছেন। হিন্দু একেশ্বরবাদ সমর্থন ও তাহার প্রচার এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা আছে, এই বিদ্যালয়ে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ বিষয়ে শিক্ষা দিতেও তাঁহার ইচ্ছা আছে।"

ইংরেজীপক্ষের জয় ; রামমোহন রায়ের হিন্দুকলেজের কমিটিত্যাগ

ইংরেজীশিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের মধ্যে রামমোহন রায় একজন প্রধান ছিলেন। ডেভিড হেয়ার, সার্ এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট, এবং রামমোহন রায় এই তিন জনের যত্নে হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষদল এবং দেশীয় শিক্ষার পক্ষদলের মধ্যে দ্বাদশবর্ষ অথবা তদধিককাল তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। পরিশেষে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যশিক্ষা পক্ষেরই জয় হইল। এই বিবাদের প্রথম অবস্থায় দেশীয় শিক্ষার পক্ষপাতীদিগের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বহু অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হন। রামমোহন রায় উহার প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব্বপ্রকাশিত পত্রখানি গবর্ণরজেনারলকে লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই আন্দোলনবশতঃই সংস্কৃতকলেজের বাটীর ভিত্তিপ্রস্তর, হিন্দুকলেজের নামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে, ফেব্রুয়ারি মাসে নিখাত হইয়াছিল। সংস্কৃতকলেজ ও হিন্দুকলেজ উভয় বিদ্যালয়ই উক্ত গৃহে স্থাপিত হয়।

"ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষেরা এদেশীয় লোকের শিক্ষাসাধনার্থ একলক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন, এবং অত্রত্য রাজপুরুষেরা তদ্দ্বারা একটি সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপন করিতে উদ্যত হন। এই সম্বাদ অবগত হইয়া রামমোহন রায় সে সময়ের শাসনকর্ত্তা লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি সংস্কৃতকালেজের পরিবর্ত্তে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন।

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে সর্ব্বপ্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের যে স্মরণার্থ সভা হইয়াছিল, তাহাতে আনন্দচন্দ্র বসু মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট আনন্দবাবু বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বয়ঃক্রম যখন অষ্টাদশ বৎসর, তখন তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিকটে, তাঁহার মাণিকতলার ভবনে সর্ব্বদা গমন করিতেন। কোন বিষয় লিখিতে হইলে, রাজা বলিয়া যাইতেন, আনন্দবাবু লিখিতেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আনন্দবাবুর নিকট হইতে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা প্রাপ্ত হইয়া রামমোহন রায়ের প্রথম স্মরণার্থ সভায় পাঠ করেন। আনন্দচন্দ্র বসু মহাশয় এক্ষণে পরলোক গমন করিয়াছেন।

সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলন ও অধ্যাপনা প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশ্যে এদেশীয় চতুষ্পাঠী সমুদায়ের অধ্যাপকগণের আনুকূল্যপ্রার্থনা লিখিয়া দেন।"*

যে দুই দলের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে যাঁহারা ইংরেজীশিক্ষার পক্ষ ছিলেন, তাঁহাদেরই জয় হইল। হিন্দুকলেজ সংস্থাপন জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, রামমোহন রায় তাহার একজন সভ্য ছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উপস্থিত করায়, তিনি উক্ত পদ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কালেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নহি।"

ডফ্ সাহেবকে সাহায্যদান

ইংরেজীশিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের যে একান্ত যত্ন ছিল, তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তথাচ আমরা আর দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা ডফ্ সাহেব ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বালকদিগের ইংরেজীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি তদ্বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য তিনি ডফ্ সাহেবকে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের গৃহ ছাড়িয়া দেন। যতদিন বিদ্যালয়ের নিজের গৃহ না হইয়াছিল, ততদিন উক্ত স্থানেই উহার কার্য্য হইত। নূতননির্ম্মিত নিজগৃহে সমাজ উঠিয়া আসিবার সময়ে রামমোহন রায় কমল বসুর বাটী চল্লিশ টাকা ভাড়ায় স্কুলের জন্য স্থির করিয়া দেন। তথা হইতে সমাজ উঠিয়া আসিবার সময়ে রামমোহন রায় একখানা বড় টানাপাখার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ডফ্ সাহেবকে বলিলেন, "I leave you that legacy of mine"। এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের জন্য প্রথম কয়েক জন ছাত্র তিনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় এক মাসকাল তিনি নিজে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমন করিয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রতি দিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এবং খ্রীষ্টের আদর্শ-প্রার্থনাটি (Lord's Prayer) বিশেষ উপযোগী বলিয়া তাহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি উক্ত প্রার্থনাটিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন যে, কোন পুস্তক বা ভাষায় এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ উদারভাবপূর্ণ প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ডফ্ সাহেবের স্কুলে বাইবেল পাঠ হইত বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তিনি বলিতেন যে, সকল প্রকার শিক্ষা ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে বাইবেল শিক্ষা হইলে তাঁহার মতে কোন প্রকার অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ উপকারেরই সম্ভাবনা। ডফ্ সাহেবের স্কুল যে দিন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে আপত্তি করিলে, রামমোহন রায় তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন :—"বাইবেল পড়িলেই খ্রীষ্টিয়ান হয় না। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খ্রীষ্টিয়ান হই নাই : কোরান পাঠ করিয়াছি, অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হরেস্ উইলসন সাহেব হিন্দু-শাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ হিন্দু হন নাই। বিচারপূর্ব্বক সত্যগ্রহণ করিবে। কেহ তোমা-

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

দিগকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টিয়ান করিবে না।" রামমোহন রায়ের কথা শুনিয়া ছাত্রগণ আর আপত্তি করিল না। আমরা শুনিয়াছি যে, এই সাহায্যের জন্য ডফ্ সাহেব রামমোহন রায়ের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। ডফ্ সাহেব বেথুন সভাতে একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি এদেশে আসিয়া রামমোহন রায়ের নিকট যেরূপ সাহায্য পাইয়াছেন, দেশীয় কি ইয়োরোপীয়, অন্য কাহারও নিকট সেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

রামমোহন রায়ের ইংরেজী স্কুল

ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তিনি কেবল অন্যের সাহায্য করিতেন, এরূপ নহে; তাঁহার নিজের একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকেরা সেখানে অধ্যয়ন করিতেন।*

১৮২২ সালে হিন্দুবালকদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহার প্রায় সমুদায় ব্যয় আপনিই বহন করেন, কেবল কোন কোন বন্ধু কিছু কিছু চাঁদা দিতেন। ইউলিয়ম আড্যাম সাহেব এই বিদ্যালয়ের দর্শক বা তত্ত্বাবধারক ছিলেন। ১৮২৭ সালে তিনি এইরূপ বলিতেছেন;—

বিদ্যালয়ের দুই জন শিক্ষক। এক জনের মাসিক বেতন ১৫০ দেড়শত মুদ্রা; আর এক জনের মাসিক বেতন ৭০ সত্তর মুদ্রা। ৬০ হইতে ৮০ জন হিন্দু ছাত্র ইংরেজী শিক্ষা করে। খ্রীষ্টধর্ম্মের মতামত সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় না; কিন্তু নীতি সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সকল তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সকল ছাত্র মানবজাতির সাধারণ ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মের ঐতিহাসিক ঘটনা সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

এই বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষাদ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, উহার শিক্ষা কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত। এই বিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় ব্যয় রামমোহন রায় নিজে বহন করিতেন; এবং উহার উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানও সম্পূর্ণ ছিল। আড্যাম সাহেব ইচ্ছা করিতেন যে, বিদ্যালয়টি বিশেষভাবে রামমোহন রায়ের না থাকে। উহা ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধীন এবং উহার জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এ প্রস্তাবে রামমোহন রায়ের মত ছিল না। আড্যাম সাহেব, বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য, যে সকল ব্যবস্থা করিতেন, রামমোহন রায় সে সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেন। কিন্তু আড্যাম সাহেব বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। দেশের লোক আড্যাম সাহেবকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। যাহা হউক, স্কুল সংক্রান্ত কার্য্যে রামমোহন রায়ের সহিত মতের অনৈক হওয়াতে, তিনি ১৮২৮ সালে, বিরক্তির সহিত উহার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন।

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য

এমন এক সময় ছিল যখন, বাঙ্গালাভাষায় গদ্যগ্রন্থ ছিল না। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, প্রভৃতি পদ্যগ্রন্থ

---

* ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, রাজা রামমোহন রায় নিজে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া আপনার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। রাজার সঙ্গে যাইবার সময়, তিনি বিমুগ্ধচিত্তে রাজার সুন্দর গম্ভীর, ঈষৎ বিষাদ-মিশ্রিত মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্কুলে গিয়াছিলেন।

সকল ছিল, গদ্যগ্রন্থ একেবারেই ছিল না। কেহ কেহ বলেন, রামমোহন রায় বাঙ্গালা গদ্য-রচনার সৃষ্টিকর্ত্তা। কেহ বা এ কথার প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ের প্রকৃতসিদ্ধান্ত কি?

দলিল ও পত্রাদি অবশ্য প্রচলিত বাঙ্গালায় লিখিত হইত। সুতরাং রায়, বাঙ্গালা গদ্যরচনার সৃষ্টিকর্ত্তা এ কথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত পুস্তকে, পণ্ডিত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, তাঁহাদের বাটীতে স্মৃতিকল্পদ্রুম নামে, বাঙ্গালা গদ্যে হস্তলিখিত স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করেন যে, উহা একশত বৎসরেরও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের জন্য গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; কিন্তু উক্ত পুস্তক সকলের ভাষা অতি কদর্য্য, উহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই, এবং কেহ তাহার রচনাপ্রণালী অনুকরণ করে নাই। রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীগণ তাঁহার মতের প্রতি-বাদ করিবার জন্য গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা রামমোহন রায়ের পরে লিখিত।

আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, বাঙ্গালা গদ্যের সহিত রামমোহন রায়ের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? প্রথমতঃ ইহা নিশ্চয় যে, রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে গদ্যরচনা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার পূর্ব্বে হস্তলিখিত গদ্যগ্রন্থ কোন কোন গৃহস্থের গৃহে ছিল। তৃতীয়তঃ, রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তবে রামমোহন রায়, বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে কি করিয়াছেন? এ কথার উত্তর এই যে, **সাধারণপাঠ্য** বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ, রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীগণ তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইলে, তাঁহার মত খণ্ডন করিবার জন্য উত্তর পুস্তক বাহির করেন: সুতরাং রামমোহন রায়ের পরে, তাঁহাদের গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের দ্বারাই সর্ব্বপ্রথমে **সাধারণপাঠ্য** বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিনি ১৭৩৭ শকে, ১৮১৫ খৃীষ্টাব্দে, বেদান্তদর্শনের ভাষ্য প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রতিবাদকারীগণের গ্রন্থ, ইহার অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাধারণপাঠ্য বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রবর্ত্তক।

যে সময়ে রামমোহন রায়, গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, সে সময়ে যে এদেশে কোন সাধারণপাঠ্য গদ্যগ্রন্থ ছিল না,—গদ্যগ্রন্থ পাঠ করা যে লোকের অভ্যাস ছিল না, তাহার একটি প্রমাণ এই,—রামমোহন রায় প্রথম গদ্যগ্রন্থে, কিরূপে গদ্যপাঠ করিতে হয়, তাহার প্রণালী শিখাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাধারণের মধ্যে গদ্যগ্রন্থ পাঠের, তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা নিম্নে তাঁহার গ্রন্থ হইতে উক্ত স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে, আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য, কেবল কতক্-গুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা, ইহাতে করিবার সময়, স্পষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এ ভাষার গদ্যেতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। ইহা

প্রত্যক্ষ কানুনের তর্জ্জমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন। এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক, আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস-দ্বারা, সাধুভাষা কহেন আর শুনেন, তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে, যখন, যাহা, যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে, তাহার প্রতিশব্দ তখন, তাহা, সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ, অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত, কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয়, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। যেহেতু একবাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে, অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাহাকে সকল বেদে গান করেন, আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে, সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে, যদ্যপি ব্রহ্মশব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি, তথাপি সকলের শেষে 'হয়েন' এই যে ক্রিয়াশব্দ তাহার সহিত ব্রহ্মশব্দের অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে 'গান করেন' যে যে ক্রিয়া শব্দ আছে, তাহার অন্বয়, বেদ শব্দের সহিত, 'আর' চলিতেছে, এ ক্রিয়া শব্দের সহিত 'নির্ব্বাহ' শব্দের অন্বয় হয়। 'অর্থাৎ' করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে, সেই বিবরণকে পরপূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন। এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই, এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই, তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থবোধ কিঞ্চিৎকাল করিলে, পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ মনোযোগ আবশ্যক হয়।"

রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল, তাহাতে, উক্ত ভাষায়, গভীর দার্শনিক বিষয়ে গ্রন্থরচনা করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তিনি বাঙ্গালায় বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। ইহা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বহুল উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে রামমোহন রায় সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ;—"রামমোহন রায় রচিত যে কয়েকখানি বাঙ্গালাপুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ এবং পৌত্তলিক মতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত বিচার। ঐ সকল বিচারে তিনি নিজের নানা শাস্ত্রবিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্ট-চিত্তে সেই সকল অধ্যয়ন করিলে, চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়।"*

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। যে বাঙ্গালা গদ্য ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, রামমোহন রায়ই তাহার ভিত্তিমূল

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা যার পর নাই প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য। কাল-সহকারে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া রামমোহন রায়ের রচনা এখনকার লোকের রুচিসঙ্গত না হইতে পারে; কিন্তু পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা ছিল। তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য যে অনেক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের অধিকাংশই ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয়। তিনি ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার হইবারই কথা। তথাচ তিনি অন্য বিষয়েও কোন কোন পুস্তক লিখিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে তাহার উল্লেখ করিব।

ব্রহ্মজ্ঞান ও সহমরণ নিবারণ বিষয়ে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকের বিষয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার প্রচারিত আর কয়েকখানি পুস্তক ও পত্রিকার বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশক বলেন, "রামমোহন রায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থ ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে তাহা মুদ্রিত হয়। পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা-ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ রচনা করেন; তাহা একপ্রকার উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও বলা যায়। কিন্তু ইহা মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ইংলণ্ড-যাত্রা করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে স্কুলবুক সোসাইটী এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণবোধে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইত। প্রথম মুদ্রণের দিবস ১৮৩৩, এপ্রেল। উক্ত স্কুলবুক সোসাইটী দ্বারা ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইহা চতুর্থবার মুদ্রিত হইয়াছিল। তখনো ইহাতে কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের প্রথমে স্কুলবুক সোসাইটিদ্বারা একটি ভূমিকা নূতন করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমরা সেই ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ভূমিকা

"সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দ্বারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপূর্ব্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যক্‌রূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালক-দিগ্যের আপন ভাষাব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্য অন্য ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। একারণ স্কুলবুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমনসময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপিমাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পুনর্দৃষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুলবুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন; তেঁহ যত্ন-পূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন।"

বাঙ্গালা গদ্যে 'কমা' প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার

এই ভূমিকায় দেখা যাইতেছে যে "গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে" রামমোহন রায় ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ব্যাকরণেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। এস্থলে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা এই যে, এই ব্যাকরণে কমা, সেমিকোলন ও জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল চিহ্ন রাজা রামমোহন রায়, কিম্বা স্কুলবুক সোসাইটির অধ্যক্ষ, এই দুই জনের মধ্যে কেহ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ব্যবহার করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক পূর্ব্বে, বাঙ্গালা গদ্যে, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে প্রকাশিত তাঁহার সঙ্গীতপুস্তকে, কমা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার অধিকাংশ গ্রন্থে 'কোটেশন' চিহ্নও দৃষ্ট হয়। সুতরাং নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা গদ্যে সর্ব্বপ্রথমে কমা, প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

সংবাদকৌমুদী

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায়, 'সংবাদকৌমুদী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, বিদেশীয় ও দেশীয় সংবাদ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় পারিবারিক সংবাদ থাকিত। ইহার মাসিক মূল্য দুই টাকা। ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ প্রথম সংখ্যায় বলা হইয়াছিল যে দেশের কল্যাণের জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে। উহাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন উহাতে লর্ড হেষ্টিংস যে পরিমাণে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, অন্যান্য পত্রিকায় পারস্য, হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত অনুবাদযোগ্য প্রবন্ধ ইহাতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইবে। দেশীয় লোকদিগের বিশেষ কোন কষ্ট বা তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচার উপস্থিত হইলে তাহা সম্মানের সহিত গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইবে। কুমারী কলেট বলেন যে, সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ভাষায় দেশীয় লোকের দ্বারায় পরিচালিত সংবাদপত্র, ইহাই প্রথম। রামমোহন রায়ই দেশীয় সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশক, এবং সংবাদকৌমুদীই সর্ব্বপ্রথম দেশীয় সংবাদপত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে 'সংবাদকৌমুদী' কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন পাদ্রি সাহেব বালকদিগের শিক্ষার জন্য 'বঙ্গীয় পাঠাবলী', নামক একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন; স্কুলবুক সোসাইটির দ্বারা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। উহাতে 'সংবাদকৌমুদী' হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের জন্য, বাঙ্গালা পুস্তকে 'সংবাদ-কৌমুদী'র কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল। বাবু রাজনারায়ণ বসুর প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সংবাদকৌমুদী'র কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে। উহাতে এই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। "বিবাদ ভঞ্জন" নামক একটি হিতোপদেশপূর্ণ গল্প: ইহা ১৮২৩ সালের সংবাদকৌমুদীতে প্রকাশ হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি" "অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি" "মকর মৎস্যের বিবরণ" "বেলুনের বিবরণ", "মিথ্যাকথন", "বিচারজ্ঞাপক

ইতিহাস", "ইতিহাস"। ইহা ১৮২৪ সালের সংবাদকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাদ্রি লং সাহেব ১৮৫২ সালে বাঙ্গালা পুস্তক সকলের এক তালিকা মুদ্রিত করেন। তাহাতে ১৮১৯ সাল সংবাদকৌমুদীর প্রথম প্রকাশাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় সংবাদকৌমুদীতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি সকল হিতকর বিষয়ই লিখিতেন। তাঁহার সুপ্রশস্তচিত্ত কেবল ধর্ম্মবিষয়ক বিচারেই বদ্ধ ছিল না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার বাবু, রাজনীতি ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই লেখনীচালনা করিতেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়ই লিখিতেন। রামমোহন রায় ইহার প্রবর্ত্তক বা পদপ্রদর্শক। সংবাদকৌমুদীর শিরোদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছিল :

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।

রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ ।।

কোন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা উক্ত শ্লোকটি প্রাপ্ত হইয়াছি।

মিরাট আল আকবর

'সংবাদকৌমুদী' সর্ব্বসাধারণ লোকের জন্য প্রকাশিত হইত। রামমোহন রায় ১৮২২ খৃীঃ অঃ শিক্ষিত লোকদিগের জন্য 'মিরাট আল আকবর' নামে পারস্য ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'মিরাট আল আকবর' এই নামটির অর্থ, সমাচার দর্পণ। সংবাদ কৌমুদী প্রতি মঙ্গলবারে এবং পারস্য পত্রিকা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হইত। ১৮২২ সালের ১১ অক্টোবর দিবসের মিরাট আল আকবর পত্রিকায় আয়ার্লণ্ড ও উক্ত দেশবাসীগণের দুঃখ দুর্গতির বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই আয়ার্লণ্ড পৃথিবীর কোন স্থানে (Geographical position) বলা হয়। তাহার পর উহার রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত বিবৃত হইয়াছিল। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ইংলণ্ডের রাজাগণ আপনাদের তোষামোদকারী সহচরগণকে আইরিস জমিদার-গণের জমিদারি অত্যন্ত অন্যায়পূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন। আয়ার্লণ্ডবাসীগণ খৃীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইংলণ্ডের রাজার সহিত তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। তাঁহারা রোমন্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যাদি পোপের অধীন ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। আয়ার্লণ্ডবাসীগণ কোন ধর্ম্মকার্য্যে রাজার নিযুক্ত প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ধর্ম্মযাজকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। অথচ তাঁহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া ঐ সকল রাজকীয় ধর্ম্মযাজক-দিগের বেতন দেওয়া হইত। কিন্তু এমনই অন্যায় যে, ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের বেতন রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত না। উহা আয়ার্লণ্ডবাসীগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া দিতেন। আয়ার্লণ্ডের জমিদারগণ ইংলণ্ডে বাস করিয়া তাহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য সেখানেই আপনাদের বিবিধ সুখভোগের জন্যই ব্যয় করিতেন। তাহাতে ইংলণ্ডের বণিক ও দোকানদারগণই বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন। এই সকল জমিদারগণের কর্ম্মচারীগণ আয়ার্লণ্ডে থাকিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও অন্যায়পূর্ব্বক দুঃখী প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে যার পর নাই কষ্ট দিতেন। এই সকল লোকের অত্যাচারে প্রজাগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় পর্য্যন্ত থাকিত না। আয়ার্লণ্ডে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, মিরাট আল আকবর তজ্জন্য চাঁদা দিবার প্রস্তাব করাতে এ-

দেশীয় অনেক ইংরেজ ও দেশবাসী অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কুমারী কলেট বলেন যে, ইহার জন্য বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রধান সংস্কারক রামমোহন রায়ের প্রতি আইরিসগণের কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য।

ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতি

রাজা রামমোহন রায় একখানি ভূগোল লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী জিওগ্রাফি শব্দের অনুকরণে উহার নাম জ্যাগ্রাহী রাখিয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহজ সহজ সত্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য একখানি খগোলও লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত পুস্তকদ্বয় এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাঙ্গালায় একখানি ক্ষেত্রতত্ত্ব লিখিয়াছিলেন। উহার 'জ্যামিতি' নাম দিয়াছিলেন। উহাও এখন আর পাওয়া যায় না।

একাদশ অধ্যায়

এদেশে রাজনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত আন্দোলন
সংবাদপত্র প্রকাশ। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা
(১৮১৯–১৮৩০ সাল)

ধর্ম্ম ও রাজনীতি

সচরাচর লোকে রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপক ও সতীদাহনিবারণের প্রধান উদ্যোগী বলিয়া জানেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই, প্রায় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি কেবল ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যেই আপনার সমস্ত চেষ্টা বদ্ধ রাখেন নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি যার পর নাই উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইতেন। অনেক ব্যক্তির এই প্রকার সংস্কার আছে যে, যিনি পরমার্থ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তিনি রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিতে পারেন না। ধর্ম্মজ্ঞ কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকিবেন, রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। আবার যিনি রাজনীতিজ্ঞ, তিনি কেবল রাজনীতির আলোচনাতেই ব্যস্ত থাকিবেন, ধর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর মত। ধর্ম্ম ঈশ্বরের, রাজনীতি কি শয়তানের? যাহা কিছু সত্য, পবিত্র ও হিতকর, তাহাই ঈশ্বরের। মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ। প্রকৃত জ্ঞানবান্ ধর্ম্মজ্ঞের নিকট এ সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে না। এ বিষয়ে আমাদের দেশে ব্রহ্মনিষ্ঠ জনক রাজার জাজ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মহর্ষিগণ যেমন ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে রাশি রাশি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থের অভাব নাই।

তাঁহারা নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা ও তপস্যা করিতেন, এরূপ নহে। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। রাজনীতি ও সমাজনীতি তাঁহাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। সমুদয় স্মৃতিশাস্ত্র তৎপক্ষে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজাগণ যে, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন, সমুদয় সংস্কৃত সাহিত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। বিগত শতাব্দীতে ইয়োরোপে রাজনীতি সম্বন্ধে জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনির ন্যায় অসামান্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি এতদূর ঈশ্বরনিষ্ঠ ছিলেন যে, প্রার্থনা ভিন্ন জীবনের কোন কার্য্য আরম্ভ করিতেন না। আমেরিকার থিওডোর পার্কার এ বিষয়ে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মোৎসাহী পিউরিট্যান্‌গণ ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া প্রজাসাধারণের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রধান কারণ। সেই পিউরিট্যানগণই আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সভ্যতা ও উন্নতির ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই : সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস এ প্রকার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ।

রামমোহন রায় ও রাজনৈতিক আন্দোলন

রামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই। প্রত্যুতঃ এ উভয়কেই মনুষ্যজীবনের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন। যে রামমোহন রায় অসাধারণ উৎসাহ সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় সুতীক্ষ্ম তর্কাস্ত্রে পৌত্তলিক, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান-দিগের বিচারজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেই রামমোহন রায়ই ভারতবাসিনী অনাথা বিধবাগণকে জ্বলন্ত চিতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রাম-মোহন রায়ই অবলাকুলের মঙ্গলের জন্য বহুবিবাহ ও দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনার তেজস্বিনী লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়ই ভারতের অশেষ অনিষ্টের মূল জাতিভেদপ্রথার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়ই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ও সাধারণ হিতকর অন্যান্য রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আবার সেই রামমোহন রায়ই স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রাণগত যত্ন করিয়াছিলেন। এমন কি, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের ন্যায়, তিনি রাজনীতি সম্বন্ধেও অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন। তাঁহার সময়ের প্রায় সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনিই মূল। বাল্যকাল হইতেই রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক ভাব প্রবল ছিল। উপক্রমণিকায় তাঁহার যে, পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তিনি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে বিদেশীয় অধিকারের প্রতি আন্তরিক ঘৃণাবশতঃ ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ের অপর পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকল ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের প্রতি তাঁহার এ প্রকার বিদ্বেষভাব স্থায়ী হয় নাই। তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজ-শাসন হইতে ভারতের প্রভূত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে। সে যাহা হউক, তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে এ দেশের রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংবাদপত্র প্রকাশ

১। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই দুই পত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক জ্ঞান, হিন্দু মুসলমান সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। বাঙ্গালা পত্রিকাখানির নাম **'সংবাদ-কৌমুদী'**। পারস্য পত্রিকাখানির নাম **'মিরাট আল আকবর'**।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

২। যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অশেষ মঙ্গলের হেতু বলিয়া স্বীকার করেন, আমরা তজ্জন্য লর্ড মেট্‌কাফের ন্যায় রাজা রামমোহন রায়ের নিকটেও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। উক্ত স্বাধীনতার হিতকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তিনি এদেশে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। এ সম্বন্ধে একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনারলের নিকট একখানি সুযুক্তিপূর্ণ আবেদন-

পত্র প্রেরিত হয়। রামমোহন রায় উক্ত আবেদনপত্র রচনা করিয়াছিলেন।* তাঁহার বন্ধু আড্যাম সাহেব বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে অনেক উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ইংরেজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

বকিংহাম সাহেব ও গবর্ণমেণ্ট†

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জারনাল (Calcutta Journal) নামক সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বকিংহাম সাহেব গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে তৎকালীন প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারল শ্রীযুক্ত আড্যাম সাহেব তাঁহাকে এদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন; এতদ্ভিন্ন ১৮২৩ সালের ১৪ই মার্চ্চ দিবসে, এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রচার করেন। পার্লেমেণ্টের প্রচারিত আইন অনুসারে তখন এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যতদিন পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট গ্রাহ্য না করিতেন, ততদিন গবর্ণর জেনারলের কোন ব্যবস্থা আইন বলিয়া

---

* রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে উক্ত আবেদনপত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ৪৩১—৪৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† ১৮২২ সালের শেষে লর্ড হেষ্টিংস, গবর্ণর জেনারলের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বিলাত গমন করিলে, তাঁহার পর লর্ড আমহার্ষ্ট আসিয়া তাঁহার পদ গ্রহণ করেন। হেষ্টিংসের পদত্যাগ ও আমহার্ষ্টের পদ গ্রহণের মধ্যে যে সময়, তাহাতে জন আড্যাম প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে নূতন স্কটলণ্ডীয় গির্জার পাদ্রি ডাক্তার ব্রাইস্, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ষ্টেসনি ক্লার্কের কর্ম্ম গ্রহণ করাতে কলিকাতা জারনাল (Calcutta Journal) পত্রে লেখা হয় যে, উপাসনালয়ের প্রধান আচার্য্যের পক্ষে উহা অনুপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে। এইরূপ লেখাতে প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারল আদেশ করিলেন যে, কলিকাতা জারনালের সম্পাদক বকিংহাম সাহেবকে দুই মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড গমন করিতে হইবে। দুই মাস অতীত হইলে, আর এক দিনও তিনি এদেশে থাকিতে পারিবেন না। এই অপরাধে কলিকাতা জারনাল পত্র, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রহিত হইল। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮২৩ সালে, কলিকাতা জারনালের সহকারী সম্পাদক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া একখানি বিলাতগামী জাহাজে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন। সম্পাদকদ্বয় ইংলণ্ডে বিদূরিত হওয়ার পরেই গবর্ণর জেনারল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করিয়া একটি আইন পাস করিলেন। এই আদেশ হইল যে, এখন কোন ব্যক্তি কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রধান সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। সে সময়ে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের প্রস্তাবিত কোন আইনের পক্ষে সুপ্রীম কোর্ট সম্মতি না দিলে উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিত না। সেই-জন্য, সংবাদপত্রাদির স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী রামমোহন রায় সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের জজ (Sole Acting Judge of the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal) স্যার ফ্রান্সিস্ ম্যাকনেটনের নিকট একটি আবেদন করিলেন। ঐ আবেদনপত্রে এদেশ-বাসী নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ;—

চন্দ্রকুমার ঠাকুর; দ্বারকানাথ ঠাকুর; রামমোহন রায়; হরচন্দ্র ঘোষ; গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই ছয় জন স্বাক্ষরকারী। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া রামমোহন রায় বিলাতে প্রিভিকৌন্সিলে আবেদন করিলেন। দ্বিতীয় আবেদন

গণ্য হইত না। যাহাতে গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থা সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক গ্রাহ্য না হয়, তজ্জন্য তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের একজন কৌন্সিলি শ্রীযুক্ত ফারগুসান সাহেব বকিংহাম সাহেবের পক্ষসমর্থন করেন। সুপ্রীম কোর্টের জজ সার্ ফ্র্যান্সিস্ ম্যাক্নেটনের নিকটে বিচার হইয়াছিল। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ দিবসে, একটি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রারের দ্বারা আদালতের সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল। সুপ্রীম কোর্ট গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিলেন। এই ঘটনায় রামমোহন রায় একখানি আবেদন-পত্র রচনা করিয়া ইংলণ্ডাধিপতি চতুর্থ জর্জের নিকটে প্রেরণ করেন। উহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন

৩। সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন চীফ জষ্টিস সার চার্লস্গ্রে একটি মোকদ্দমায় প্রচলিত উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, "পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া, কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দানবিক্রয় করিতে পারিবেন না।" এই নিষ্পত্তিতে তৎকালীন হিন্দুগণ যার পর নাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি এ বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন।* শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক হিন্দুর পৈতৃক সম্পত্তির উপর কি প্রকার অধিকার, উহাতে তিনি পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত নিষ্পত্তিতে বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এবং তৎকালে হিন্দুদিগের সম্পত্তিগত যে সকল স্বত্ব ছিল, এবং তদনুযায়ী যে সকল নিয়মপত্র হইয়াছিল, তাহা বিচলিত হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি ইহাও বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে দেশীয় ব্যবস্থা অতিক্রম করিলে দেশবাসীগণের প্রতি যার পর নাই অন্যায় করা হইবে। তিনি এ বিষয়ে তৎকালীন হরকরা পত্রে অনেকগুলি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় উক্ত প্রবন্ধ এবং প্রেরিত পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।† তিনি কেবল পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। স্বজাতিগণের নেতৃস্বরূপ হইয়া উক্ত নিষ্পত্তি রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন। সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইলেন; প্রিভি কৌন্সিল হইতে সুপ্রীম কোর্টের নিষ্পত্তি রহিত হইল।

পত্রে রামমোহন রায় পঞ্চান্নটি যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, উক্ত আইন পাস হইলে এদেশের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। উহাতে বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করেন যে, ঐ আইন দ্বারা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের কার্য্য সর্ব্বপ্রকার সমালোচনার অতীত হওয়াতে তাঁহাদের অন্যায় ব্যবহার, ও অন্যায় কার্য্য সকল, শাসনের অতীত হইবে। ইহাতে দেশের যথেষ্ট অনিষ্টের সম্ভাবনা। কলিকাতা জারনালের পূর্ব্ব সম্পাদক বকিংহাম সাহেব উক্ত আবেদন পত্র প্রিভিকৌন্সিলে উপস্থিত করেন। প্রিভিকৌন্সিল ছয় মাস বিবেচনার পর উক্ত আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করেন।

(রাজার ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ৪৩৭ পৃষ্ঠা ও ৪৪৫ পৃষ্ঠা, সুপ্রীম কোর্টের জজের নিকট ও প্রিভিকৌন্সিলের নিকট দুইখানি আবেদনপত্র দেখ।)

* Essay on the rights of Hindoos over ancestral property according to the Law of Bengal. Calcutta, 1830.

† ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ৩৭১—৪২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

৪। পূর্ব্বে অসিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া কালেক্টরেরা কোন ভূমি বাজেয়াপ্ত করিলে, তাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া স্বত্বাস্বত্বের বিচার প্রার্থনা করা যাইত। ১৮২৮ সালে গবর্ণমেণ্ট একটি আইন প্রচার করেন, তাহাতে এই নিয়ম হয় যে, কয়েক জিলা লইয়া এক একজন বিশেষ কমিসনার নিযুক্ত হইবেন.; তাঁহার নিকটে কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবে ; এবং প্রিভি কৌন্সিলের বিচারযোগ্য স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন, তাহা চূড়ান্ত হইবে। যে যে জিলার নিমিত্ত এই কমিসনর নিযুক্ত হইবেন, সেই সেই জিলায় দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরের বিচারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবামাত্র রাজা রামমোহন রায়, বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার ভূম্যধিকারীদিগকে লইয়া উহার প্রতিবাদ করিলেন। গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন।* কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া বিলাতে আবেদন করা হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। এজন্য রামমোহন রায় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। কি স্বদেশে, কি ইংলণ্ডবাসকালে, উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে তিনি কোথাও ক্ষান্ত হন নাই। আড্যাম সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "এই অন্যায় আইন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বঙ্গবাসীর বিরক্তির একটি প্রধান কারণ। রামমোহন রায় যেমন তাঁহার স্বদেশীয়-গণকে ভালবাসিতেন, সেইরূপ বৃটিস গবর্ণমেণ্টেরও পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং স্বদেশবাসীগণের হিতের জন্য ও গবর্ণমেণ্টের সুনাম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে উক্ত অন্যায় আইনের প্রতিবাদ করিতে তিনি কখনও ত্রুটি করেন নাই।"

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিয়া সেখানে স্বদেশবাসীগণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা যতদূর জানা গিয়াছে, এস্থলে কেবল তাহাই বিবৃত হইল।

বৈদেশিক রাজনীতির সহিত গাঢ় সহানুভূতি

রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল স্বদেশের রাজনৈতিক মঙ্গল-চিন্তাতেই বদ্ধ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহার একান্ত সহানুভূতি ছিল। যত্ন-পূর্ব্বক ইয়োরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হইতেন। কোন স্থানে ন্যায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিলে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। ১৮২১ খৃীষ্টাব্দে স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ কলিকাতায় আসিলে, তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য কলিকাতার টাউন হলে নিজ ব্যয়ে একটি প্রকাশ্য ভোজ (Public Dinner) দিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু আড্যামসাহেব বলিয়াছেন যে, পর্টুগ্যাল দেশে উক্তরূপ নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়াও তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের

* রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর সহিত উক্ত আবেদনপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ৬৩৯—৬৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

সহিত তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে গ্রীকেরা তুরস্কবাসী-দিগের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়, ইহা তিনি একান্ত হৃদয়ে কামনা করিতেন। যখন নেপল্‌স্‌বাসীগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, স্বাধীনতাপক্ষাবলম্বী পরাজিত হইতেছেন। রামমোহন রায়ের চিত্ত সে সংবাদ শুনিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। মিঃ বক্‌ল্যাণ্ড নামক একজন ইংরেজের সহিত তাঁহার সে দিন সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতের কথা ছিল। তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিবার এই কারণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, অপরাহ্নে বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্যে তাঁহার শ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ নেপল্‌সের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হওয়াতে সে দিন তিনি দেখা করিতে যাইতে অক্ষম। বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবকে রাজা যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

My Dear Sir,

A disagreeable circumstance will oblige me to be out the whole of this afternoon, and as I shall on my return home feel so much fatigued as to be unfit for your company, I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening; more especially as my mind is depressed by the late news from Europe. I would force myself to wait on you tonight, as I proposed to do, were I not convinced of your willingness to make allowance for unexpected circumstances.

From the late unhappy news, I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy.

Under these circumstances I consider the cause of the Napolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful.

Adieu, and believe me,
Yours very sincerely
Ram Mohun Ray.

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবেও তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডযাত্রাকালে আফ্রিকার দক্ষিণাংশে নেটাল বন্দরে একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উহাকে অভিবাদন প্রদান করিতে গিয়া তাঁহার চরণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যে প্রকার সম্পর্ক, তাহাতে স্বভাবতঃই ইংলণ্ডীয় রাজনীতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট হইত। তিনি ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তত্রত্য রাজনৈতিক দল সকলের উন্নতি [illegible] চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ডের আইনানুসারে রোমান্

ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য হইতে অথবা গভর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সেই সকল অন্যায় আইন রহিত হওয়ার জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন, এবং যখন উহা বাস্তবিক রহিত হইল,* তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। রোমান্ ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা লাভ, ও ১৮৩০ সালে হুইগ্ দিগের ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে তিনি যার পর নাই সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু আড্যাম সাহেব বলেন যে, তিনি ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে রিফর্ম (Reform) বিল্ পাস্ হওয়া সম্বন্ধে কেবল আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এরূপ নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত যত্ন এবং পরিশ্রমও করিয়াছিলেন।

টাউনহলে সভা ও রামমোহন রায়ের বক্তৃতা

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর দিবসে, টাউনহলে একটি মহাসভা হইয়াছিল। চীন ও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য এবং ইয়োরোপীয়গণের ভারতবর্ষবাসের বাধা সকল বিদূরিত করিবার জন্য পার্লামেণ্ট মহাসভায় আবেদন করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য। ইয়োরোপীয়দিগের ভারতবর্ষ বাসের বাধা সকল দূর করিবার জন্য সভায় যে প্রস্তাব হইয়াছিল, রামমোহন রায় তাহার সমর্থন করিবার জন্য যে বক্তৃতা করেন† তাহাতে তিনি ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও সহবাসদ্বারা কিরূপ উপকার হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

"From personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs; a fact which can be easily proved by comparing the condition of those of my contrymen who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity; and a fact which I could, to the best of my belief, declare on solemn oath before any assembly."

সকল শ্রেণীর ইয়োরোপীয়দিগের সহবাসে যে কল্যাণ হয় না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত, ভদ্র ও ধর্ম্মানুরাগী, তাঁহাদের সংসর্গে যে বিশেষ উন্নতি ও উপকার হয়, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। সাহিত্যসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক, এই বিবিধ বিষয়েরই উন্নতির সম্ভাবনা। রামমোহন রায়ের সময়ে কলিকাতায় কয়েকজন উচ্চপ্রকৃতির ইয়োরোপীয় বাস করিতেন। রাজা তাঁহাদের সংসর্গে বিশেষ তৃপ্তি ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সুতরাং রাজা ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও সহবাসের পক্ষসমর্থন করিবেন, আশ্চর্য্য কি?

* The repeal of the Test and corporation Acts.

† রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা দেখ। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের, মে ও আগষ্ট মাসের এসিয়াটিক্ জারনাল পত্রিকা (Vol. II. New Series) হইতে পুনর্মুদ্রিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

পারিবারিক ঘটনা এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ

পৈতৃকসম্পত্তিলাভ, মাতৃবিয়োগ ও স্ত্রীবিয়োগ
রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিপদ

১৮২১ সাল হইতে ১৮২৬ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায়ের জীবনে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি পারিবারিক বিপদ সংঘটিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, রাধাপ্রসাদ, বর্দ্ধমান কলেক্টরিতে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিতেন। গবর্ণমেণ্টের টাকা আত্মসাৎ করা অপরাধে তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে আড্যাম সাহেব লেখেন যে, রাধাপ্রসাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারীর অসতর্কতা এবং তাঁহার সহযোগী অন্যান্য কর্ম্মচারীর তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা এই ঘটনার মূল কারণ। জনৈক লেখক বলেন যে, রামমোহন রায় দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলাও এ মোকদ্দমার একটি কারণ হইতে পারে। রামমোহন রায়, পুত্রকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকিট্ কোর্টে রাধাপ্রসাদ নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন হন। তৎপরে উক্ত মোকদ্দমা সদর নিজামত আদালতে আসিলে, সেখানেও তিনি নিরপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রামমোহন রায় পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত মাতা-কর্ত্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠের বয়স তখন বিংশতি বৎসর। তিনি উভয় পুত্রকে লইয়াই কলিকাতার বাটীতে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে রঘুনাথপুরে গমন করিতেন। তাঁহার মাতার সহিত অসম্মিলন স্থায়ী হয় নাই। তিনি পুত্রের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন, এবং কিছুকাল পরে, সমস্ত জমিদারি রামমোহন, জগন্মোহন ও রামলোচনের পুত্র পৌত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করেন। তিনি সেখানে একবর্ষকাল কিরূপভাবে অবস্থিতি করিয়া পরলোকযাত্রা করেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মাতৃবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু হইল। তখন কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী দেবীর কঠিন পীড়ার সংবাদ আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাধাপ্রসাদকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যদি তোমার মাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া দেখ, তবে অতি শীঘ্র আমাকে সংবাদ দিবে; আর যদি তিনি মৃত্যুমুখে পতিতা হন, তবে কোন-ক্রমে তাঁহার মুখাগ্নি করিও না। অল্পকাল পরেই শ্রীমতী দেবীর মৃত্যুসংবাদ আসিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, রামমোহন রায় স্ত্রীবিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদৌহিত্র আর্য্যদর্শন পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণনগর গমন করিয়া পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর চিতার উপরে দাম্পত্যপ্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বিলাতগমনের সংকল্প

রাজা রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত গমনের ইচ্ছা করিতেছিলেন.; কিন্তু জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য তিনি যে সকল মহদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন, পাছে সে সকলের কোন অনিষ্ট হয়, সেই জন্য হঠাৎ স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উপক্রমণিকার প্রকাশিত পত্রে তিনি স্বয়ং বলিতেছেন ;—"এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক. যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।" ক্রমে অবস্থা অনুকূল হইয়া আসিল। তিনি বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় বিলাত যাইবেন বলিয়া দেশের সর্ব্বত্র ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বে কখন কোন হিন্দু-সন্তান অর্ণবযানারোহণে ম্লেচ্ছদেশে যাত্রা করেন নাই। কুসংস্কারান্ধ দেশবাসীগণ অবাক্ হইলেন। ঘৃণা, বিদ্বেষ, ও আশ্চর্য্য, এই সকল ভাব পর্য্যায়ক্রমে লোকের হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল ; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে এই এক কথা, "রামমোহন রায় বিলাত যাইবে!"

তাঁহার বিলাতগমনের কারণ

তাঁহার বিলাতগমনের কারণ তিনি নিজে এইরূপ বলিতেছেন ;—"পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসীগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে, নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডযাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্ম-চারীদিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন।"

রামমোহন রায় ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে বিলাতযাত্রা করিতেন, কিন্তু অর্থাভাব তাঁহার বাসনা চরিতার্থ করিবার পথে অন্তরায় হইয়াছিল।

'রাজা' উপাধিলাভ

দিল্লীর বাদসাহের কার্য্য, তাঁহার বিলাতগমনের সুবিধা করিয়া দিল ; নতুবা বিলাতগমন তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিত। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন জমিদারির রাজস্বে বাদসাহের ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া তিনি কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্সদিগের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, তিনি সর্ব্বপ্রথমে যাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, এবং রাজনিয়ম ও ন্যায়বিচারে যাহা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহাই দেওয়া হইতেছে। বাদসাহ উক্ত উভয় সভায় অকৃতকার্য্য হইয়া ইংলণ্ডাধিপতির নিকট আবেদন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং রামমোহন রায়কে সনন্দ দ্বারা রাজা উপাধি দিয়া এ বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক বিলাত প্রেরণ করা স্থির করিলেন।

এ বিষয়ে কুমারী কলেট তাঁহার রচিত রাজার জীবনী গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এই সময় একটি ঘটনায় রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের বিশেষ সুবিধা হইল। সেই সময়ের দিল্লীর বাদসা কোন বিষয়ের জন্য বিলাতে আবেদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি লোক পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত যাইবেন। সুতরাং ভাবিলেন যে, রামমোহন রায়কে তাঁহার দূতরূপে ইংলণ্ডের রাজসভায় প্রেরণ করিয়া তাঁহার কষ্ট ও অভাবের বিষয় রাজা ও মন্ত্রীগণের গোচর করা আবশ্যক। বাদসাহের আবেদনের বিষয় এই ছিল যে, বাদসার সহিত বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের সন্ধিপত্রে তাঁহাকে যে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দিবার কথা ছিল, তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে বৃত্তি প্রদান করা হইত। আর সেই অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বৃত্তি দ্বারা তাঁহার অভাব সকল পূর্ণ হইত না। বাদসার পরিবারগণ অর্থাভাবনিবন্ধন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। এই জন্য ১৮২৯ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমে বাদ্‌সাহ রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধি দিয়া ইংলণ্ডের রাজসভায় তাঁহাকে প্রেরণ করিবার জন্য, তাঁহার দূতরূপে নিযুক্ত করিলেন।

রামমোহন রায় এই 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া মণ্টগোমেরি মার্টিন সাহেবকে বাদ্‌সার কার্য্যে তাঁহার সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই মার্টিন সাহেব, বেঙ্গল হের‍্যাল্ড (Bengal Herald) নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৮২৯ সালে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, এন. আর. হালদার ও রামমোহন রায় এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে, একজন এটর্নি এই পত্রের বিরুদ্ধে লাইবেল মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে, রামমোহন রায় ইহার জনৈক স্বত্বাধিকারীরূপে আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শীঘ্রই উক্ত সংবাদপত্র উঠিয়া গেল। মার্টিন সাহেব সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রামমোহন রায়ের অধীনে বাদ্‌সার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় ১৮৩০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'জন বুল' পত্রে কোন ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় ও মার্টিন সাহেব স্থির করিয়াছিলেন যে, ১৮২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে তাঁহারা ইয়োরোপ যাত্রা করিবেন। এক মাস পরে, তাঁহারা স্থির করিলেন যে, এলাহাবাদ হইয়া তাঁহারা ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। কিন্তু তিন মাস পর্য্যন্ত ইংলণ্ড যাত্রার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করিতে হইল। এই সময়ের মধ্যেই সতীদাহ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচারিত হইল। রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ারি, রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্‌কে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই ;—আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, কয়েক মাস গত হইল, দিল্লীর বাদ্‌সা মহম্মদ্ আকবর বাদ্‌সা, গবর্ণর জেনারেলকে অবগত করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে গ্রেট্ বৃটেনের রাজসভায় দূতরূপে প্রেরণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন ; এবং তাঁহার ভৃত্য বলিয়া উক্ত পদের সম্মানের জন্য আমাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। উপাধিজনিত সম্মান লাভে ব্যাকুল নহি বলিয়া, আমি এ পর্য্যন্ত বাদ্‌সা কর্ত্তৃক প্রদত্ত উক্ত সম্মান গ্রহণে বিরত ছিলাম।

যাহা হউক, এ বিষয়ে দিল্লীর বাদ্‌সার অভিপ্রায় এই যে, আমি ইয়োরোপে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন মহারাজার সভায়, তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া, তাঁহাদের রাজবংশের গৌরব রক্ষার জন্য, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত তাঁহার বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারের মীমাংসার জন্য, কর্ম্মচারী বলিয়া এরূপ উপাধি গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। বাদ্‌সা তজ্জন্য আমাকে উক্ত উপাধি প্রদান করিবার জন্য একটি মোহর দিল্লীতে ১৮২৭ সালে, খোদিত করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রেসিডেণ্ট সর্ চার্লস্ মেটকাফের ২৬ জুনের

রিপোর্টের সুপারিসে, গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করেন, যে, বাদ্‌সা তাঁহার নিজের ভৃত্যাদিগকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিতে পারিবেন। সকৌনসিল গবর্ণর জেনারেল তাঁহার সেক্রেটারি ষ্টার্লিং সাহেবের দ্বারা যে উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, তিনি তাঁহার রাজা উপাধি ও দিল্লীর বাদসার দূতরূপে রাজসভায় গমন, এ উভয়ের কিছুই অনুমোদন করিতে পারেন না।

গবর্ণর জেনারেল যে এইরূপ উত্তর দিবেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের অনুগত হইয়া কার্য্য করা, রামমোহন রায়ের লক্ষ্য ছিল না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধেই তাঁহার কার্য্য।

বিলাতগমন সম্বন্ধে দেশবাসীগণ ও আত্মীয়গণ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার কথা শুনিয়া দেশের লোক আশ্চর্য্য হইয়াছিল। একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণসন্তান গোখাদক ম্লেচ্ছদিগের দেশে যাইতেছে, ইহাতে তাঁহাদের বিরক্তি ও ঘৃণার ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহার পৌত্তলিক আত্মীয় স্বজনেরা যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। এই "গর্হিত কার্য্য" হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। "জাতি যাইবে, পৈতৃক সম্পত্তি হারাইতে হইবে" তাঁহাকে এই সকল সাংসারিক ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে রামমোহন রায় স্বদেশবাসীগণের সকল প্রকার অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ প্রকার বাধাবিঘ্ন বীরের ন্যায় অতিক্রম করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন জন্য কুসংস্কারান্ধ ব্রাহ্মণদিগের অভিসম্পাত, ধর্ম্মসভার প্রবল আক্রমণ এবং নির্ব্বোধ চিন্তাশূন্য দেশবাসীগণের নিন্দা, বিদ্রূপ, ও তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়, জ্ঞাতি কুটুম্বের পরামর্শে, অনুরোধে বা ক্রন্দনে, কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনাদরপূর্ব্বক, স্বদেশের হিতব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিহার করিবার লোক ছিলেন না। যে ষোড়শ বৎসরবয়স্ক বালক, ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তিব্বতযাত্রা করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ব্যক্তি পরিণত বয়সে সকল বিঘ্ন বাধা অগ্রাহ্য করিয়া, সম্পত্তিচ্যুতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত না হইয়া, আত্মীয়স্বজন পরিবারগণের অশ্রুজলে অবিচলিত থাকিয়া, জন্মভূমির হিতকামনায়, অকূল সাগরপারে গমন করিতে উদ্যত হইল। যে দেশবাসীগণের হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, যে দেশে বিজ্ঞান ও দর্শন, সভ্যতা ও স্বাধীনতা আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, নিউটন ও বেকন্, সেক্সপীয়ার ও মিল্টন, যে দেশের গৌরব, সুসভ্য জগতের সম্মুখে চিরদিন উজ্জ্বল রাখিয়াছেন, সেই দেশ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

বিলাতগমনের পূর্ব্বে তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি

কোন ভক্তিভাজন প্রাচীন ব্যক্তির* নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহার বিলাতযাত্রার দিন, তিনি তাঁহার বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোক আসিয়াছিল যে, সিঁড়িতে পর্য্যন্ত লোকের জনতা হইয়াছিল। তিনি বিলাতে যাইবার পূর্ব্বেই সেখানে তাঁহার যশঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁহার প্রণীত খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তক সকল লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এ দেশের অনেক সুবিজ্ঞ ইংরেজ, রামমোহন রায়ের মহৎ কার্য্য ও ক্ষমতার বিষয় ইংলণ্ডবাসীগণের অবগতির জন্য তথায় লিখিয়া পাঠাইতেন। বিলাতগমনের পূর্ব্বে, ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে, রামমোহন রায়ের যশঃ কি প্রকার বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য, মিস্ কার্পেণ্টার তাঁহার গ্রন্থে রামমোহন রায় সম্বন্ধে তৎকালীন কোন কোন সুবিজ্ঞ ইংরেজের লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কয়েকটি স্থান অনুবাদ করিয়া দিলাম।

তাঁহার বিলাতগমনের পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কোন ইয়োরোপীয়ের মত

ব্যাপ্‌টিষ্ট মিসনারী সোসাইটির ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিজ্ঞাপনীতে রামমোহন রায়ের উল্লেখ আছে। "রামমোহন রায় একজন কলিকাতার ধনবান্ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। পারস্য ভাষায় ইঁহার জ্ঞান এত অধিক যে, লোকে ইঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিয়া থাকে। ইনি বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিয়া থাকেন এবং উক্ত ভাষায় গণিত ও মনোবিজ্ঞানের পুস্তক সকল পাঠ করেন। তিনি শ্রীরামপুরে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে কেবল একেশ্বরবাদী মাত্র (Thiest); যীশুখ্রীষ্টকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁহাদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করেন না। ....তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা বলেন যে, তিনি বড় দুষ্ট লোক।"

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে একখানি পত্রে ইয়েট্‌স্ সাহেব রামমোহন রায়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;—"এক বৎসর হইল, আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছি। ......কিছুকাল পরে, ইউষ্টেস কেরি সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ করিয়া দিলাম; তাঁহার (রামমোহন রায়ের) সহিত আমাদের অনেকবার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। যখন আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তিনি কেবল পরমাণুর অনাদিত্ব, প্রমাণের প্রকৃতি প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়েই কথা কহিতেন। কিন্তু অল্পদিন হইতে অধিকতর বিনীত হইয়াছেন, ও সুসমাচারের বিষয়ে কথা কহিতে অভিলাষী হইয়াছেন।......তিনি ঈশ্বরের একত্ব সমর্থন করেন, এবং সকল প্রকার পৌত্তলিকতা ঘৃণা করেন। কিছুদিন হইল, তিনি ইউষ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পারিবারিক উপাসনায় উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইউষ্টেস্ তাঁহাকে ডাক্তার ওয়াট সাহেবের রচিত ঈশ্বরসংগীত পুস্তক দিলেন ; তিনি বলিলেন যে, তিনি উহা তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। ....একটি স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য, তিনি ইউষ্টেস্‌কে একখণ্ড ভূমি দান করিবেন, বলিয়াছিলেন।"

ইংলণ্ডীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের (Church of England) ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মিসনারী রেজিষ্টার (Missionary Register) পত্রিকায় রামমোহন রায়ের বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। একস্থলে এইরূপ বলা হইয়াছে ;—"তিনি একজন ব্রাহ্মণ ; প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়স ; তাঁহার সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি ; তাঁহার সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি অনেক ; তিনি চতুর, সতর্ক, কার্য্যতৎপর, এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ; লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার (Manners) অত্যন্ত চমৎকার ; তিনি অনেক ভাষায় সুপণ্ডিত ; তিনি তাঁহার কতকগুলি স্বদেশীয় লোককে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মপুস্তক বিষয়ে অভিজ্ঞ, এবং খ্রীষ্টের নামে যাহা কিছু

বলা হয়, তাহা শুনিতে তাঁহাকে অভিলাষী বলিয়া বোধ হয়। ....তাঁহার প্রাণসংহার করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার অনেকগুলি বন্ধুর সহিত ইংলণ্ড গমন করিবেন, এবং তথায় আমাদের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনটিতে অথবা দুইটিতেই কয়েক বৎসর থাকিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন। রামমোহন রায় ইংরেজী শুদ্ধরূপে লিখিতে ও বলিতে পারেন; ....সম্ভবতঃ তিনি গ্রীশিক শাস্ত্রের যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু আমাদের একজন পত্রপ্রেরক বলেন যে, তিনি এখন একজন আত্মনির্ভরকারী একেশ্বরবাদী মাত্র (Deist)।

লণ্ডনের এসেক্স ষ্ট্রীট চ্যাপেলের (Essex Street Chapel) ধর্ম্মযাজক, রেভারেণ্ড টি. বেল্‌স্যাম, মান্দ্রাজের উইলিয়ম্‌ রবার্ট্‌স্‌ নামক এক ব্যক্তির পত্র প্রকাশ করিয়া তাহার ভূমিকাস্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রশংসা আছে। উহার একস্থলে তিনি বলিতেছেন;—"এই অসাধারণ ব্যক্তির সাহস, বাক্‌পটুতা, এবং অধ্যবসায়, সকল বাধাকে পরাস্ত করিয়াছে, এবং এরূপ শুনা যায় যে, শত শত হিন্দু, বিশেষতঃ যুবকেরা তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছে। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া স্বীকার করেন না।"

রামমোহন রায়ের বিলাতগমনের পূর্ব্বে, কেবল ইংলণ্ডেই তাঁহার যশঃ বিস্তৃত হয় নাই; ফরাসী ভাষায় তাঁহার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। মান্থলি রিপাজিটারী পত্রিকার (Monthly Repository) সম্পাদকের নিকট উহার এক-খণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল। কলিকাতা টাইমস্‌ (The Calcutta Times) নামক পত্রিকা-সম্পাদক, এম. ডি. একষ্টা (M. D. Acosta) সাহেবের নিকট হইতে সংবাদ লইয়া উহাতে রামমোহন রায়ের একটি জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল। উহাতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে; একস্থলে এইরূপ আছে—"রামমোহন রায় বিবেচনা করিলেন যে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, বালকেরাই নূতন বিষয় সহজে গ্রহণ করিতে পারে। সেই জন্য তিনি নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে পঞ্চাশৎ জন ছাত্র, সংস্কৃত, ইংরেজী ও ভূগোল শিক্ষা করিত।" অপর একস্থলে এইরূপ আছে;— "ইয়োরোপীয়েরা যখন আহার করেন, তিনি সেখানে তাঁহাদের সহিত একত্রে বসিতে সঙ্কুচিত হন না; কখন কখন তিনি তাঁহাদিগকে আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদের রুচি অনুসারে তাঁহাদিগকে ভোজন করান।......যে সুসংস্কার থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক একত্র আহার করে না, তিনি তাহা বিনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, এ বিষয়ে উন্নতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইহা হইলে অন্যান্য বিষয়েরও উন্নতি হইবে, এমন কি, দেশের রাজনৈতিক উন্নতিও ইঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, এবং সেই জন্য তিনি এ বিষয়ে উদাসীন নহেন।......আরবী ভাষায় তর্কশাস্ত্র পাঠ করাতে তিনি ধর্ম্মবিচারে সুদক্ষ হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, আরবীর তর্ক-শাস্ত্র, অন্যান্য তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ, তিনি আবার ইহাও বলেন যে, ইয়োরোপীয় গ্রন্থ সকলে এমন কিছুই দেখিতে পান নাই, যাহার সহিত হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের তুলনা হইতে পারে। * ....এখনও তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়স হয় নাই। তিনি

* "He seems to have prepared himself for his polemical career from the logic of the Arabians, which he regards as superior to every other; he asserts, likewise, that he has found nothing in European

দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। তিনি উৎসাহিত হইলে তাঁহার সুগঠিত এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর-মূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। তাঁহার স্বভাবতঃ একটু বিমর্ষভাব আছে। তাঁহাকে প্রথম দেখিবামাত্রই, তাঁহার কথোপকথন ও ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি।......ইহা জানা হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি, তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারসংক্রান্ত অভিপ্রায় সম্বন্ধে আগ্রহের সহিত প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন। তাঁহারা কেহই, এমন কি তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্ত, কলিকাতাতে তাঁহার নিকট আসেন না।... তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করার বিষয়েও তাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন ; এবং তিনি যেমন পৌত্তলিকতা বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার কুসংস্কারান্ধ মাতাও তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনবরত উৎসাহের সহিত চেষ্টা পান।"

লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ফীটস্‌ ক্লারেন্স তাঁহার ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালের ভারতবর্ষ ও মিসর দেশভ্রমণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন ;—"তিনি (রামমোহন রায়) কেবল সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নহেন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ; উহা বিকৃত হইয়া বহুদেবোপাসনায় পরিণত হইয়াছে। আমি তাঁহার সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলাম। আমি তাঁহার বিদ্যা ও ক্ষমতার প্রশংসা করি। আমাদের ভাষায় তাঁহার অতিশয় বাক্‌পটুতা আছে এবং আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার আরবী ও পারস্য ভাষায় জ্ঞান ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি ইয়োরোপের রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন এবং উহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজনীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। আমার সহিত যখন তাঁহার শেষবার দেখা হইয়াছিল, তিনি স্বাধীন দেশে (Standing Army) শান্তির সময়েও সৈন্য রাখিবার বিরুদ্ধে, অতি সুন্দররূপে তর্ক করিলেন, এবং পার্লেমেণ্ট মহাসভার যে সকল সভ্য উক্ত মতাবলম্বী, তাঁহাদিগের যুক্তি সকল বলিতে লাগিলেন। আমি বিবেচনা করি যে, তিনি অনেক বিষয়ে একজন অত্যন্ত অসাধারণ লোক। প্রথমতঃ তিনি একজন ধর্ম্মসংস্কারক। ইয়োরোপের মধ্যকালের লোকদিগের অপেক্ষাও কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তি সকলের মধ্যে থাকিয়াও, তিনি নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। তিনি একজন সদ্বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি কেবল ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক সকলের সহিত সুপরিচিত এরূপ নহে ; তিনি আরবী ও ইংরেজীতে অলঙ্কার শাস্ত্রও পাঠ করিয়াছেন। লক্‌ এবং বেকনের লেখা, সকল সময়েই আবৃত্তি করিয়া থাকেন।......... আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার পরিবারেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ; তিনি তাঁহার জাতি হারাইয়াছেন এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্মসংস্কারকের ন্যায় তিনি এক্ষণে লোকের উপহাসের পাত্র হইয়াছেন।.........তিনি অত্যন্ত সুশ্রী.........ইংলণ্ড দেখিতে ও আমাদের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ করিতে তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা।"

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিস্‌ অ্যাণ্ড ফরেন্‌ ইউনিটেরিয়ান্‌ আসোসিয়েসানের (British and Foreign Unitarian Association) সাম্বৎসরিক সভায় আর্ণট

books equal to the scholastic philosophy of the Hindoos." 'The Last Days in England of the Raja Ram Mohun Roy.' Edited by Mary Carpenter, P. 36.

সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বলেন ;—"তাঁহার (রামমোহন রায়ের) উচ্চক্ষমতা সকলের বিষয় তাঁহার রচিত গ্রন্থের দ্বারা ইয়োরোপের লোক জানিতে পারিয়াছে ; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত, যাঁহারা তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুখ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ঠিক্ বুঝিতে পারেন যে, তিনি কি প্রকার চরিত্রের লোক। যদিও তাঁহার ক্ষমতার জন্য পৃথিবীর সকল অংশের লোক তাঁহার প্রশংসা করিতেছে, তথাচ কেবল ক্ষমতা নয়, তাঁহার সদ্‌গুণ সকল,—তাঁহার জ্ঞানালোকসম্পন্ন হিতৈষণাপূর্ণ হৃদয় (স্বাভাবিক শক্তি ও উপার্জ্জিত বিদ্যার ন্যায়) পরোপকারিতাতেও অন্য সকলের অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে।"

রাজারাম ও রামরত্ন

রামমোহন রায় বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল যে, তাঁহার সহিত তাঁহার পালিতপুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এবং রামহরিদাস গমন করিবেন।* রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একটি দুর্নাম আছে ; সুতরাং রাজারামের প্রকৃত বৃত্তান্ত পাঠকবর্গকে অবগত করা আবশ্যক। ডিক্ নামে একজন সিবিলিয়ান্ সাহেব, হরিদ্বারের মেলায় একটি অনাথ ও পরিত্যক্ত বালককে কুড়াইয়া পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সাহেব যখন বিলাত যান, রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উক্ত বালকের বিষয়ে তিনি কি করিলেন? রামমোহন রায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বালকের বিষয়ে একদিন বলিয়াছিলেন, "যখন আমি দেখিলাম, যে একজন খৃষ্টীয়ান ইংরেজ একটি দরিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্য এত যত্ন করিতেছেন, তখন আমি দেশের লোক হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে ও তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারি?" ডিক্ সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, সুতরাং রামমোহন রায়ের দ্বারা বালকটি প্রতিপালিত হইয়াছিল। তিনি তাহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাহাকে এত ভালবাসিতেন যে, কেহ কেহ মনে করিতেন যে, অতিরিক্ত আদর দিয়া তিনি তাঁহার অনিষ্ট করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে, রাজারাম কোন প্রকার উৎপাত করিলে, তিনি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। রামমোহন রায় কখন কখন শ্রান্তিদূর করিবার জন্য, আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন ; এমন সময়ে কোন কোন দিন রাজারাম আসিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার উপর পড়িত। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তিনি উঠিয়া বসিতেন, এবং কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া "রাজা, রাজা" বলিয়া সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠদেশ চাপ্ড়াইতেন।

অনেক লোকের সংস্কার ছিল যে, রাজারাম মুসলমানের সন্তান। রামমোহন রায় তাহাকে গৃহে রাখিয়া সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতেন বলিয়া পৌত্তলিকেরা তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

* রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প' নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে ;—"রাজা রামমোহনের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন। রামরতনের পূর্ব্ব নাম শম্ভু, এবং রামহরিদাসের পূর্ব্ব নাম হরিদাস।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইংলণ্ডযাত্রা ও ইংলণ্ডবাস

(১৮৩০ সালের ১৫ নবেম্বর—১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম)

জাহাজে অবস্থানকালের বিবরণ

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর, সোমবার দিবসে রাজা-রাম, (১) রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া "আলবিয়ান" নামক সমুদ্র-পোতে আরোহণ করিলেন। যে সময়ে হুগলি হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে লোকে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক, কর্ণে বিল্বদল সংলগ্ন করিত, সেই সময়ে একজন বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ ঝঞ্ঝাঝটিকাসঙ্কুল অকূল সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড ভূমি দর্শনের জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার জাহাজে অবস্থানকালের বিবরণ তাঁহার একজন সহযাত্রী ইংরেজ হুগলি কালেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সদরল্যাণ্ড সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"জাহাজে রামমোহন রায় তাঁহার নিজের ঘরে আহার করিতেন ; রন্ধন করিবার স্বতন্ত্র স্থান ছিল না বলিয়া প্রথমে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছিল। জাহাজে কেবল একটি সামান্য মৃণ্ময় চুল্লি ছিল। তাঁহার ভৃত্যেরা সমুদ্র-পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল ; তাহারা 'ক্যাবিনের' মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিত ; কখন বাহিরে আসিত না। (২) তিনি স্থানাভাববশতঃ অন্য একটি স্থানে কষ্ট করিয়া থাকিতেন, তথাচ এমনি সদয়হৃদয় ছিলেন যে, তাহাদিগকে কোনক্রমেই সেখান হইতে অন্তরিত করিতে চাহিলেন না। অধিকাংশ সময়েই তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করিতেন। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যাকালে ডেকের উপরে বায়ুসেবন করিতেন ; এবং কখন কখন কোন ব্যক্তির সহিত উৎসাহ সহকারে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। জাহাজের যাত্রী সকলের আহারের পর, মেজ পরিষ্কৃত হইলে এবং ভোজনের জন্য তখন ফল সকল আসিলে, তিনি আপনার ঘর হইতে আসিয়া সেখানে উপবেশনপূর্ব্বক সকলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। তাঁহার প্রতি জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। কে তাঁহাকে অধিক যত্ন করিবে, ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি, জাহাজের খালাসীরা পর্য্যন্ত তাহাদের সাধ্যানুসারে কোন প্রকারে তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হইত। ঝটিকা উপস্থিত হইলে তিনি ডেকের উপর আসিয়া

১ রাজারামের বয়স তখন প্রায় দ্বাদশ বৎসর।

২ রামরত্ন মুখোপাধ্যায় দেশে ফিরিয়া আসিলে পর, রাজার গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঈশান বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সমুদ্র-পীড়া হইয়াছিল বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে রন্ধন করিয়া আহার করা হয় নাই, নতুবা হইত। তিনি ঈশান বাবুকে আরও বলিয়াছিলেন যে, সমুদ্র-পীড়া হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের বিলাতে মৃত্যু হয় নাই। রামমোহন রায়ের সমুদ্র-পীড়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার বিলাতে মৃত্যু হইয়াছে। শেষ কথাটিতে কিছু সত্য আছে। সমুদ্র-পীড়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

দাঁড়াইতেন এবং সুনীলপ্রসারিত শুভ্রফেনশোভিত সাগর দর্শন ও তাহার গভীরগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন।" রামমোহন রায় জাহাজে তাঁহার সঙ্গে দুইটি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন।*

"তাহার চিত্তের স্থৈর্য্য আশ্চর্য্য ছিল। একাধিক বার, সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা তাঁহার ক্যাবিনস্থ প্রত্যেক বস্তু ভাসিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু উহাতে তাঁহার চিত্তের শান্তির ব্যাঘাত হয় নাই। প্রতিকূল বায়ু উঠিলেই তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইত। জাহাজ যাহাতে অগ্রসর হইতে থাকে সে বিষয়ে তিনি অতিশয় ব্যাকুল ছিলেন। কেননা, তাঁহার মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, পাছে তাঁহার ইংলণ্ড পেঁৗছিবার পূর্ব্বেই ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়।"

দেশের হিতের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই এতদূর ব্যগ্র থাকিত।

জাহাজ যখন উত্তমাশা অন্তরীপে পেঁৗছিল, তখন তিনি দুই এক ঘণ্টার জন্য তীরে উঠিয়াছিলেন। জাহাজে ফিরিয়া আসার পর একটি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। যে সোপানে (Gangway ladder) পদনিক্ষেপ করিয়া জাহাজের ভিতরে আসিতে ও ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে হয়, তাহা উপযুক্তরূপে সংস্থাপিত হয় নাই বলিয়া তিনি পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। চরণে আঘাত প্রাপ্তির জন্য তিনি আঠার মাস খঞ্জাবস্থায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমন কি ইহজীবনে আর কখনই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু শারীরিক কষ্টে তাঁহার মনের আবেগ নিবারিত হইবার নহে। দুইখানি ফরাসী জাহাজ স্বাধীনতার পতাকা বহন করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও, তিনি ফরাসী জাহাজে একবার যাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়া তাঁহার উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শরীরের কষ্ট তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। উৎসাহে কষ্টবোধ চলিয়া গেল। তাঁহাকে ফরাসী জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। জাহাজের ফরাসীগণ তাঁহাকে উপযুক্তরূপ অভ্যর্থনা করিলেন। ফরাসীস্বাধীনতাপতাকার নিম্নে আসিয়া তিনি কত আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি ইণ্টারপ্রেটরের দ্বারা ফরাসীগণকে জানাইলেন; পার্থিব শক্তির উপর ন্যায়ের জয় প্রকাশ হইতেছে বলিয়া তাঁহার এত আনন্দ! ফরাসী জাহাজ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়, তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন;—*"glory, glory, glory to France!"* ফরাসী দেশের গৌরব! ফরাসী দেশের গৌরব! ইত্যাদি।

উত্তমাশা অন্তরীপের কতকগুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তি, তিনি যে হোটেলে গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া, তথায় তাঁহাদের কার্ড রাখিয়া গিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা জাহাজে পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

সদরল্যাণ্ড সাহেব লিখিতেছেন যে, যতই আমরা ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই রাজা রামমোহন রায়ের চিত্ত পার্লেমেণ্টে তখন কি হইতেছে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি আমাদের জাহাজের কাপ্তেনকে মিনতি

* হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সদরল্যাণ্ড সাহেব বলিতেন যে, যে জাহাজে রামমোহন রায় বিলাত গিয়াছিলেন, তিনি সেই জাহাজে ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, দুগ্ধপানের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি দুইটি দুগ্ধবতী গাভী জাহাজে সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন।

করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে কোন জাহাজ আসিতেছে দেখিলে, তিনি যেন তাহার আরোহীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পার্লেমেণ্টে কি হইতেছে। পরিশেষে আমরা বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী হইলে, জাহাজ দেখিতে পাইলাম। তাহার আরোহীগণ আমাদিগকে এমন সকল সংবাদপত্র দিলেন, যদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, ইংলণ্ডে রাজমন্ত্রীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।* এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়েই কয়েকদিন পর্য্যন্ত আমাদের কথোপকথন চলিয়াছিল। ঐ মন্ত্রীত্বের পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষের মঙ্গলের সম্ভাবনা বলিয়াই রাজার এত আহ্লাদ হইয়াছিল। যখন ইংলিস্ চ্যান্যালে পৌঁছিতে আমাদের আর কয়েকদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন একখানি জাহাজের সহিত দেখা হইল। উহা চারিদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে ছাড়িয়াছে। উহার আরোহীদিগের নিকট আমরা শুনিলাম যে, পার্লেমেণ্টে রিফরম্ বিল দ্বিতীয়বার পাঠ হইবার সময় উক্ত পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলদিগের (টোরি) পক্ষে একটি মাত্র অধিক ভোট হইয়াছিল! এই সংবাদে রামমোহন রায়, আশান্বিত হইলেন যে, পরিণামে রিফরম্ বিল্ পাস হইবে। তজ্জন্য তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন! কয়েক দিন পরেই ইংলণ্ডের ইতিহাসের এই সঙ্কট সময়ে, রামমোহন রায় গ্রেটব্রিটেন দ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। রিফরম্ বিলের জন্য, তখন ইংলণ্ডবাসীগণের হৃদয়ে উৎসাহানল জ্বলিতেছে। রামমোহন রায়ের হৃদয়েও সেই অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। সদরল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছেন, যে, আমার ভয় হইয়াছিল যে, ঐ উৎসাহ তাঁহার পক্ষে অতিরিক্ত হইতে পারে। ঐরূপ প্রবল উৎসাহাগ্নির জন্য রাজা পীড়াগ্রস্ত হইতে পারেন।

লিভারপুল নগরে পৌঁছান

১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে, চারিমাসে ২৩ দিনে "অ্যাল্বিয়ান্" তাহার গম্যস্থানে উত্তীর্ণ হইল। রামমোহন রায় সেই দিনেই লিভারপুর নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড পৌঁছিবার সংবাদ পাইয়া উইলিয়ম র‍্যাথবোন্ সাহেব তাঁহার "গ্রীনব্যাঙ্ক" নামক ভবনে বাস করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া র‍্যাড্লিস্ হোটেল নামক এক প্রসিদ্ধ হোটেলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একজন ইংলণ্ডবাসী জাহাজের কোন সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। তথায় সে রামমোহন রায়ের যশের কথা শুনিয়া অপার সারকিউলার রোডে তাঁহার বাটী দেখিতে গিয়াছিল। গৃহস্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই ; কিন্তু গৃহের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ একটি দ্রব্য কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিল, এবং দেশে পুনরাগমনের পরেও উহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থার লোক হইলেও রামমোহন রায় তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

উইলিয়ম রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ

লিভারপুলে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ উইলিয়ম্ রস্কোর সহিত রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রস্কোর চরিতাখ্যায়ক বলেন "তিনি অল্প বয়সে খৃষ্টের উপদেশ

* অর্থাৎ ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ডিউক অব ওয়েলিংটনের পরিবর্ত্তে লর্ড গ্রে প্রধানমন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সকল সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টের উপদেশসংগ্রহ (Precepts of Jesus) দর্শন করিয়া তাঁহার নিজের প্রথম বয়সের কার্য্য স্মরণ হইল। কেবল তাহাই নহে; রামমোহন রায়ের বৃত্তান্ত তিনি যতই অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, রামমোহন রায় যে কেবল পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন এরূপ নহে, তিনি তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকলেরও এতদূর উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন যে, সুসভ্য দেশেও অতি অল্প লোকেরই সে প্রকার ঘটিয়া থাকে।"

উইলিয়ম রস্কো একখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণপত্র এবং উপহারস্বরূপ তাঁহার রচিত কতকগুলি পুস্তক ভারতবর্ষে রামমোহন রায়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। লিভারপুলনিবাসী টমাস হজসান্ ফ্লেচার সাহেব কলিকাতায় গমন করেন। রামমোহন রায়কে দিবার জন্য রস্কো তাঁহারই হস্তে পুস্তক ও পত্র দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহা রামমোহন রায়ের হস্তগত হয় নাই। ফ্লেচার সাহেব কলিকাতা পেঁাছিবার পূর্ব্বেই রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। রস্কো রামমোহন রায়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বলিতেছেন যে, খ্রীষ্টের উপদেশ সংগ্রহ করিতে গিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাই প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম।

রস্কোর পত্র কলিকাতা পেঁাছিবার পূর্ব্বেই তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে, রামমোহন রায় ইংলণ্ড আসিতেছেন। অল্পদিন পরে আবার শুনিলেন যে, তিনি লিভারপুল নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় তাঁহার মধুর চরিত্র ও সুন্দর মূর্ত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।

রামমোহন রায় যে সময়ে লিভারপুলে পেঁাছিলেন, রস্কো তখন পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তথাচ তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে দেখিয়া এদেশীয় প্রণালী অনুসারে "সেলাম" করিয়া বলিলেন যে, "যে ব্যক্তির যশঃ কেবল ইয়োরোপে নয়, সমুদয় পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইলাম।" রস্কো উত্তর করিলেন, "আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, অদ্যকার দিন পর্য্যন্ত আমি জীবিত আছি।" তাঁহার (রামমোহন রায়ের) ইংলণ্ড আগমনের উদ্দেশ্য ও রিফর্‌ম্ বিল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। রস্কোর বাটীতেই রামমোহন রায়ের সহিত লিভারপুলের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের আলাপ হয়। তাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। লিভারপুলে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তত্রত্য ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয়ে গমন করেন। উপাসকমণ্ডলী তাঁহাকে যার পর নাই সম্মান ও আদর করিয়াছিলেন। লিভারপুলে উইলিয়ম র‍্যাথবোন সাহেবের বাটীতে রামমোহন রায়ের সহিত সুপ্রসিদ্ধ হৃত্তত্ত্ববিৎ (Phrenologist) পণ্ডিত স্পরজিমের বন্ধুতা হইয়াছিল। কিন্তু রামমোহন রায় কখন তাঁহার প্রচারিত বিদ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। জনৈক ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্ম্মচারী লিভারপুলের মেয়রের দূতস্বরূপ হইয়া রামমোহন রায়কে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন যে, তিনি একবার মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ করিলে মেয়র তাঁহাকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিবেন। রামমোহন রায় এ অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

লিভারপুলে অবস্থিতিকালে রস্কোসাহেবের সহধর্ম্মিণীর সহিতও রামমোহন

রায়ের আলাপ হইয়াছিল। লিভারপ্ুলে যে সকল লোক রামমোহন রায়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে একজন মহাপ্ুরুষ বলিয়া অন্ুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার ম্ুখশ্রী ও ব্যবহারে সৌন্দর্য্য ও শক্তি অন্ুভব করিয়াছিলেন।

যে সময়ে রামমোহন রায়ের সহিত রস্কোসাহেবের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার বয়স অষ্টসপ্ততি বৎসর। রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সেই বৎসর ৩০শে জ্ুন দিবসে তিনি পরলোক গমন করেন।

লিভারপ্ুলে তিনি অতি অল্পকালই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় রিফর্‌ম্‌ বিল্‌ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক শ্ুনিবার জন্য তিনি শীঘ্রই লণ্ডন যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় রস্কো. লর্ড ব্রুহ্যামকে (Brougham) একখানি পত্র দিলেন। উক্ত পত্রে তিনি রামমোহন রায়ের প্ুর্ব্ব ব্ৃত্তান্ত ও তাঁহার ইংলণ্ড আসিবার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে পার্লেমেণ্ট সভায় গ্যালারির নীচে আসন দিবার জন্য অন্ুরোধ করিলেন।

হ্ুগলি কলেজের ভ্ূতপ্ুর্ব্ব অধ্যক্ষ (Principal) স্বর্গীয় সদরল্যাণ্ড সাহেব, রামমোহন রায়ের লিভারপ্ুল অবস্থিতিকালের যে ব্ৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কয়েকটি কথা নিম্নে গ্রহণ করিলাম ;—

লিভারপ্ুল নগরে রামমোহন রায়ের পোঁছিবার সংবাদ প্রকাশিত হইবামাত্র তত্রত্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়কে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অন্তত ছয় জন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইত। বড়লোকদিগের সহিত দেখা করিবার জন্য প্ুর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সর্ব্বদাই তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইত। সকল সময়ই প্ুর্ব্বাহ্নে বা সায়াহ্নে আহার করিবার সময়ে পর্য্যন্ত লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। তাঁহাদের সহিত রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইত।

লিভারপ্ুল নগরে সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায় একটি ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয়ে উপস্থিত হন। তৎপ্ুর্ব্বে তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে গমন করেন নাই! উক্ত উপাসনালয়ে গ্রিন্থ নামক এক ব্যক্তি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। অন্যের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ উপদেশ রামমোহন রায়ের বড় ভাল লাগিয়াছিল।

উপদেশ শেষ হইয়া গেলে উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ তথা হইতে চলিয়া গেলেন না। রামমোহনকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সকলে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। টেট নামক ইংরেজের সহিত রাজার ভারতবর্ষে বন্ধ্ুতা ছিল। তখন তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। রাজা উপাসনালয়ের বাহিরে যাইবার সময় সেই টেট সাহেবের একটি প্রস্তর-স্মরণচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার জন্য হঠাৎ শোকার্ত্ত হইলেন। শীঘ্র তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ভারতবর্ষীয় ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের সহিত যেরূপ কথা কহিলেন তাহা শ্ুনিয়া তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। উপাসনাদি কার্য্য শেষ হওয়ার একঘণ্টা পরে তাঁহারা রামমোহন রায়কে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরস্পর বিদায়ের প্ুর্ব্বে রামমোহন রায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সহিত হস্তমর্দ্দন করিয়াছিলেন।

সায়াহ্নে রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় ত্রিত্ববাদীদিগের এক উপাসনালয়ে গমন করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড স্কোরসবি নামে এক ব্যক্তি উক্ত সমাজের আচার্য্য ছিলেন। তিনি প্রথমে অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। জাহাজের খালাসীর কার্য্য করিতেন।

পরে, বিদ্যানুরাগের জন্য এক জন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মযাজক হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়াও, রামমোহন রায় প্রশংসা করিয়াছিলেন।

লিভারপুলে বড় লোকদিগের বৈঠকখানায় ও প্রকাশ্য স্থান সকলে, রামমোহন রায়কে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এক জন ব্রাহ্মণ রিফরম্ বিলের পক্ষপাতী হইয়া কথা কহিতেছেন, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার পক্ষসমর্থন করিতেছেন দেখিয়া লিভারপুলবাসীগণ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিচার উপস্থিত হইলে, খৃষ্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের অপেক্ষা রামমোহন রায়ের অধিকতর পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়াছিলেন।

লিভারপুলে দুইটি কোয়েকার পরিবার (একটির নাম ক্রুপার, আর একটির নাম বেনসন,) রামমোহনের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত, রামমোহনের সামাজিক সম্মিলন সংঘটিত করিতে লাগিলেন। কোয়েকারদিগের দ্বারা একটি সম্মেলনে হাইচর্চ্চের লোক, ব্যাপ্‌টিষ্ট, ইউনিটেরিয়ান, একেশ্বরবাদী (Deists) সকলে সদ্ভাবে ও প্রেমে রামমোহন রায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রাজনীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব, রামমোহন রায়ের কথোপকথনের প্রধান বিষয় ছিল। র‍্যাথবোন সাহেবের বাটীতে রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা সফল হয় নাই।

লিভারপুল হইতে লণ্ডন

এপ্রেল মাসের শেষে লিভারপুল হইতে লণ্ডন যাইবার সময়ে রামমোহন রায় রেল-ওয়ের উভয় পার্শ্বে ইংলণ্ডের ধন, সভ্যতা ও ক্ষমতার নিদর্শন সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। সুন্দর হর্ম্ম্যনিচয়, পুষ্পোদ্যানসমন্বিত-কুটীররাজী, চতুর্দ্দিকব্যাপী রেলরোড, অশেষহিতকারী কৃত্রিম নদী ও মনোহর সেতু সকল তাঁহার নয়ন মন আকর্ষণ করিতে লাগিল। যে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সর্ব্বত্র পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। ইংলণ্ড কেন পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান দেশ, এবং ভারতবর্ষ কেন দুঃখ ও দরিদ্রতায় মুহ্যমান্, ইহা তিনি সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের কল দর্শন

তিনি লণ্ডন যাইবার পথে ম্যাঞ্চেষ্টার নগর দেখিতে গিয়াছিলেন। তথাকার কল সকল দেখিয়া তিনি যার পর নাই প্রীত ও আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। যে সকল দরিদ্র স্ত্রী-লোক ও পুরুষ কলে কাজ করিতেছিল, তাহারা "ভারতের রাজা" আসিয়াছে শুনিয়া স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিল। রামমোহন রায় অত্যন্ত অমায়িকতা সহকারে তাহাদের অনেকের সহিত হস্তবিকম্পন করিলেন; এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি আশা করি, তোমরা রিফর্‌ম্ বিল সম্বন্ধে রাজা এবং তাঁহার মন্ত্রীগণের পক্ষসমর্থন করিবে।" তাহারা আহ্লাদপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কথায় সায় দিল।

লণ্ডনে উপস্থিতি

রামমোহন রায় রাত্রিকালে লণ্ডন নগরে পৌঁছিলেন, এবং নগরের এক অপরিষ্কৃত অংশে, নিউগেট ষ্ট্রীটে এক কদর্য্য হোটেলে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি মনে করিয়া-

ছিলেন যে, সেখানে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিবেন। কিন্তু যে ঘরে তাঁহাকে শয়ন করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে এত দুর্গন্ধ আসিতেছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি একখানি গাড়ি হুকুম করিলেন, এবং রাত্রি দশটার সময় আডেল্‌ফি (Adelphi) হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

জেরিমি বেন্‌থ্যামের সহিত সাক্ষাৎ

রামমোহন রায় তথায় নিদ্রিত হইলে, প্রায় নিশীথকালে আধুনিক ব্যবস্থাদর্শনের সৃষ্টিকর্ত্তা জেরেমি বেন্‌থ্যাম তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নিজের বাটী ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন নাই। কেবল উদ্যানে বেড়াইতে যাইতেন। অথচ রামমোহন রায় আসিয়াছেন শুনিয়া প্রায় নিশীথ কালে হোটেলে আসিলেন। কিন্তু দেখা না হওয়াতে তিনি একটু কাগজে "জেরিমি বেন্‌থ্যাম, তাঁহার বন্ধু রামমোহন রায়ের নিকট" এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার পরে আলাপ হইলে তিনি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বেন্‌থ্যাম তাঁহার প্রতি এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে "মনুষ্যজাতির হিতসাধনব্রতে তাঁহার শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত প্রিয় সহযোগী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। হোটেলের গোলমালে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে তিনি রিফরম্‌ বিল্‌ বিষয়ে পার্লেমেণ্ট মহাসভার বিচার শুনিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, রিফরম্‌ বিল্‌ বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার যার পর নাই আনন্দ হইয়াছিল। তিনি এ বিষয়ে উইলিয়ম র্যাথ্‌বোন্‌ সাহেবকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—"আমি প্রকাশ্য-রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে. রিফরম্‌ বিল্‌ পাস না হইলে আমি এদেশ পরিত্যাগ করিব। যতদিন পর্য্যন্ত না পার্লেমেণ্টে উক্ত বিষয়ক বিচারের ফল আমি জানিতে পারিয়াছি, তত-দিন আমি আপনাকে এবং লিভারপুলবাসী অন্যান্য বন্ধুগণকে পত্র লিখিতে ক্ষান্ত ছিলাম।" রিফরম্‌ বিল্‌ বিধিবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে তিনি অন্য এক স্থলে লিখিয়াছিলেন যে ;—"উহাতে ইংলণ্ড ও তাহার অধীনস্থ দেশ সকলের, এমন কি, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল হইবে।"

বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও যশঃবিস্তার

রামমোহন রায় কয়েক মাসের জন্য ১২৫নং রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার লণ্ডনে আগমনের সংবাদ পাইয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ও সুবিখ্যাত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসা হইবামাত্রই বেলা একাদশ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন চারিটা পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারে ক্রমাগত গাড়ি আসিতে লাগিল। তাঁহার উদারপ্রকৃতি ও মধুর-ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। একজন অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার পরিশ্রম ও উৎসাহ এত অধিক হইতে লাগিল যে, তিনি তজ্জন্য পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চিকিৎসকগণ তাঁহার ভৃত্যকে অনুমতি করিলেন যে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেয়।

ইংলণ্ডাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ ও রাজসম্মান লাভ

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত রামমোহন রায়ের 'রাজা' উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডাধিপতির রাজ্যাভিষেককালে বিদেশীয় দূতগণের সঙ্গে তাঁহার

আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। লণ্ডনের সেতু নির্ম্মিত হইয়া সাধারণের ব্যবহার জন্য উম্মুক্ত হইবার সময়ে যে প্রকাশ্য ভোজ হইয়াছিল, ইংলণ্ডেশ্বর তাহাতে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার উপাধি কখন স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সর জে. সি. হব্‌হাউস ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক রামমোহন রায়ের সম্মানের জন্য প্রকাশ্য ভোজ

১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই দিবসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রামমোহন রায়কে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য প্রকাশ্য ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন।

তখন আংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের এই ভাবের পরিবর্ত্তন বিশেষ রূপে দেখা গিয়াছিল। কোম্পানির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এই ভোজ সভারও সভাপতি ছিলেন। ইহা ভিন্ন, অশীতি জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজে উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন ; এবং এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, ইংলণ্ডে রামমোহন রায়ের যেরূপ অভ্যর্থনা হইল, তাহাতে অন্যান্য ক্ষমতাশালী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু ইংলণ্ডে আসিতে উৎসাহী হইবেন।

রামমোহন রায় উত্তরে বলিলেন যে, যে দিন অন্যান্য হিন্দু ইংলণ্ডে আসিতে আরম্ভ করিবেন, তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে সেই দিনের প্রত্যাশা করিতেছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যে সকল ভদ্রলোক সহৃদয়তা ও দয়ার সহিত ভারতরাজ্য শাসন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এরূপ লোকের সহিত আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ইংরেজরা ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পূর্ব্বে সে দেশে যে অরাজকতা ছিল তিনি তাহার সহিত উহার বর্ত্তমান শান্তি ও উন্নতির তুলনা করিলেন। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া সে দেশের উপকার করিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নামই বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলেন,—"তিনি ভারতবর্ষবাসীগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ এবং তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যতেও এইরূপ সহৃদয়তার সহিত সে দেশের রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে, ও সে দেশের রাজ-শাসন সর্ব্বজনপ্রীতিপ্রদ হইবে।

এই ভোজের বিবরণ-লেখক বলিয়াছিলেন ;—ইহা দেখিতে বিশেষ কৌতুকাবহ হইয়াছিল যে, যখন অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণ কূর্ম্ম ও মৃগমাংস আহারে ও সাম্পেন পানে, অনুরাগের সহিত নিযুক্ত ছিলেন ; তখন এই ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র ভাত ও শীতল জল সেবন করিতেছিলেন।

১৮৩৩ সালের নবেম্বর মাসের এসিয়াটিক জারনাল পত্র বলেন যে, ইংলণ্ডাধিপতির মন্ত্রীগণ রামমোহন রায়ের রাজা উপাধি এবং তাঁহাকে দিল্লীর বাদ্‌সার প্রেরিত দূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। তাহা এই যে, ইংলণ্ডবাসীগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষবাসীগণের প্রতিনিধি বলিয়া সহজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত কথাটি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী-দিগের ভাল না লাগিলেও, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে। এ কথা যথার্থ বটে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার 'রাজা' উপাধি এবং তাঁহাকে দিল্লীর বাদ্‌সার দূত বলিয়া

কখনই স্বীকার করেন নাই। তথাচ, সদরল্যান্ড সাহেব বলেন যে, ইংলণ্ডের লোক তাঁহার প্রতি যেরূপ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করেন, তাহাতে কলিকাতা অপেক্ষা ইংলণ্ডে তাঁহার প্রতি আংগ্লো ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। যে সকল লোক ভারতবর্ষে তাঁহার প্রতি ঘৃণার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারাই, তিনি ইংলণ্ডে আসিলে, তাঁহার সম্মান দেখিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। ১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রামমোহন রায়কে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য প্রকাশ্য ভোজ প্রদান করেন, তখন রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহাদের ভাবের পরিবর্ত্তন বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়াছিল।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেক সময় রামমোহন রায় হুইগ্‌দিগের (উন্নতিশীল) অপেক্ষা টোরিদিগের (রক্ষণশীল) সঙ্গে অধিক থাকিতেন। ডিউক অব কম্‌বারল্যান্ড তাঁহাকে পার্লেমেন্টের লর্ড সভায় উপস্থিত করেন। রামমোহন রায়েরই অনুরোধে, লর্ড সভার টোরি সভ্যগণ ভারতবর্ষীয় জুরি বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। টোরিগণ রিফরম্‌ বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া, রামমোহন রায় তাঁহাদের মুখের উপরে তাঁহাদিগকে যেরূপ অনুযোগ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে, তাঁহার প্রতি টোরিগণের সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁহাদের অনেক প্রশংসা করিতে হয়। সদরল্যান্ড সাহেব বলেন যে, লর্ড ব্রুহ্যামের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা হইয়াছিল। অত্যন্ত বিপরীত মতের লোক সকল তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিতেন।

হেয়ার সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ

প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ছিলেন। লণ্ডন নগরে বেডফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার ভ্রাতারা বাস করিতেন। রামমোহন রায় ইংলণ্ড গমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যেন তাঁহারা যথাসাধ্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিদেশীয়; বিদেশীয় বলিয়া যে সকল কষ্ট ও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল বিষয়ে যেন তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। যতদূর সম্ভব তিনি অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিতে চেষ্টা করিতেন। সুতরাং হেয়ার সাহেবের ভ্রাতারা আন্তরিক ইচ্ছাসত্ত্বেও কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোন সাহায্য দান করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। অনেক চেষ্টা করাতে রামমোহন রায় তাঁহাদের বাটীতে থাকিতে সম্মত হইলেন। রামমোহন রায় যখন ফরাসীদেশে গিয়াছিলেন, তখন হেয়ার সাহেবের একজন ভ্রাতা তাঁহার অনুচর হইয়া তথায় গমন করেন।

তাঁহার সম্মানার্থ প্রকাশ্যসভা

ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানগণ লণ্ডন নগরে এক প্রকাশ্য সভায় রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। উহা সম্ভবতঃ ৩১ সালের মে মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। মন্থলি রিপজিটারী নামক পত্রিকায়, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে, উক্ত সভার একটি বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় উক্ত সভায় অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গৃহীত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, রাজা রামমোহন রায়কে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছে যে, উহা তিনি (রামমোহন রায়)

সহজে বুঝিতে পারিবেন না। সুপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ পত্রের সম্পাদক, খ্যাতনামা সর্ জন্ বাউরিং উক্ত সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার এক-স্থলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই;—"প্লেটো বা সক্রেটিস্, মিল্টন বা নিউটন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, তদনুরূপভাবে অভিভূত হইয়া আমি রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনার জন্য হস্ত-প্রসারণ করিয়াছি।"

বাউরিং সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই;—"রামমোহন রায়ের বিলাত আসা যে কতদূর বীরত্বের কার্য্য তাহা ইয়োরোপবাসীরা বুঝিতে পারেন না। যখন রুষ দেশের সম্রাট্ পিটর (Peter the Great) দক্ষিণ ইয়োরোপের সভ্যতা শিক্ষা করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন,—যখন তিনি তাঁহার রাজসভার সম্মান পরিত্যাগপূর্ব্বক সার্ড্যাম নগরে জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন, তখন তাঁহার যে মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বড় বড় যুদ্ধজয়েও হয় নাই; পিটর জানিতেন যে, তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার কার্য্যে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী; —তিনি জানিতেন যে, যখন তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহার প্রজাগণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। রামমোহন রায় পিটর অপেক্ষা কঠিনতর কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণজাতির উচ্চতম সম্মানের অধিকারী হইয়াও যে কার্য্য করিতে সাহস করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই করে নাই। তিনি সাহসপূর্ব্বক যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং তজ্জন্য তিনি ভবিষ্যতে উচ্চতম সম্মান লাভ করিবেন।

আমি যদি আমাদের অদ্যকার সুমহৎ অতিথির (রামমোহন রায়) জীবনের ইতিহাস বলিতে থাকি,—তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধির জন্য তিনি যেরূপ প্রভূত পরিমাণে নিয়ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা যদি বলিতে থাকি, তাহা হইলে সময়ে কুলাইবে না। এই মুহূর্ত্তে যে ভারতবর্ষে জীবন্ত বিধবাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য চিতানল প্রজ্বলিত হইতেছে না, তাহা কেবল তাঁহারই হস্তক্ষেপ, উপদেশ ও যুক্তি তর্কের জন্য। যিনি এমন উপকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কি আমরা আমাদের ভাই মনে না করিয়া থাকিতে পারি? তিনি যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন কি আমরা উৎসাহধ্বনিতে তাঁহাকে না বলিয়া থাকিতে পারি যে, আমরা কেমন মনোযোগের সহিত তাঁহার কার্য্যের উন্নতি দেখিতাম? তাঁহার কার্য্যের জন্য আমরা জয়ধ্বনি প্রদান না করিলেও, অন্ততঃ আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কি আমরা থাকিতে পারি? একদিন যে আমরা তাঁহাকে এই ইংলণ্ডভূমিতে অভ্যর্থনা করিতে পারিব, ইহা আমাদের নিকটে একটি সুখময় স্বপ্ন স্বরূপ ছিল। উহা একটি আশা হইলেও অতি ক্ষীণ আশা ছিল। উহা যে কখন বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইবে তাহা বিশ্বাস করিতে আমরা সাহস করি নাই।"

তৎপরে বাউরিং সাহেব বলিলেন;—"রামমোহন রায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই স্মৃতি আমাদের পক্ষে এতদূর আনন্দজনক হইবে, যে অদ্যকার দিন আমাদের ইতিহাসের একটি যুগসৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। অদ্য এই ব্রাহ্মণ আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার অতীত ও ভাবী কার্য্যের প্রতি আমরা যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলাম, ইহা কখন কেহ ভুলিতে পারিবে না। তিনি যে সকল মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, আমরা যদি কোন প্রকারে তাহার সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইবে।"

বাউরিং সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

(Harvard University) সভাপতি ডাক্তার কারক্লাণ্ড বলিলেন, "ইহা সকলেই জানেন যে আমেরিকাবাসীগণ রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি একবার আমেরিকা গমন করেন, ইহা সেখানকার লোক অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত প্রত্যাশা করিতেছেন।"

কারক্লাণ্ড সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে, সভাপতির প্রস্তাবে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি একত্রে দণ্ডায়মান হইয়া করতালিধ্বনিদ্বারা রামমোহন রায়ের সম্মানসূচক প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

তৎপরে রামমোহন রায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যে তাঁহার শরীর ভাল নাই, অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং অধিক কিছু বলিতে তিনি অক্ষম। বাউরিং ও কারক্লাণ্ড সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইউনিটেরিয়ানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলিলেন ;—"আমিও এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি।" তিনি বলিলেন, "আপনারা যে সকল মতে বিশ্বাস করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি।

"আমি আপনাদের জন্য কি করিয়াছি? আমি কি করিয়াছি জানি না। যদি কিছু করিয়া থাকি, তাহা নিশ্চয়ই অতি সামান্য।" তৎপরে রামমোহন রায় স্বদেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তথায় "আমাকে অনেক অসুবিধার মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেরা (যাঁহাদিগের সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ) সকলেই আমার কার্য্যের বিরোধী। সেখানে এমন অনেক খ্রীষ্টিয়ান আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও আমাদের কার্য্যের বিরোধী। একেশ্বরবাদমূলক খ্রীষ্টধর্ম্মই বাইবেলসঙ্গত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে অনেক খ্রীষ্টিয়ান উক্ত রূপ একেশ্বরবাদের বিরোধী। তাঁহারা খ্রীষ্টের সরল উপদেশ অপেক্ষা কতকগুলি অবোধ্য মতে অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।" তিনি ভারতবর্ষে তাঁহার মতপ্রচারে অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রামমোহন রায় তাঁহার বক্তৃতায় এই সকল বিষয়ে কথা বলিলেন। পরিশেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন। "একদিকে বুদ্ধি, শাস্ত্র ও সহজজ্ঞান ; অপর দিকে ধন ক্ষমতা ও কুসংস্কার এই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। এই শেষ তিনটির সহিত পূর্ব্বোক্ত তিনটির বিরোধ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই আপনাদের জয় হইবে। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি উহা কখনও বিস্মৃত হইব না।"

উক্ত সভায় রেভারেণ্ড ফক্স সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ;—"সে দিবস রাজা আমাকে বলিলেন যে, তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া খ্রীষ্টের একখানি ছবি দেখিয়াছেন। উহার বর্ণ ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায়। চিত্রকর মনে করেন নাই যে, যীশু খ্রীষ্ট ইয়োরোপীয় ছিলেন না, পূর্ব্বমহাদেশবাসী ছিলেন। রাজার এই সমালোচনা ঠিক্ হইয়াছিল। সেই-রূপ, যে সকল ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত খ্রীষ্টধর্ম্মকে নীরস বুদ্ধিগত ধর্ম্মরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহারাও উহা প্রকৃতভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বাইবেলশাস্ত্র যে-রূপ পূর্ব্বদেশীয় কল্পনা ও ভাবের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে, এবং কেবল মানবের মন নয়, হৃদয় ও আত্মার ভাব উক্ত শাস্ত্রের মধ্যে যেরূপ বিদ্যমান্ রহিয়াছে, উক্ত পণ্ডিতেরা সে প্রকারে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। হায়! হৃদয় ও আত্মার ভাবে আমাদের ধর্ম্ম প্রকাশ হউক, এবং সমগ্র মানবজাতি পরমেশ্বরের প্রতিকৃতিতে গঠিত হউক!"

রবার্ট ওয়েনের সহিত তর্ক

রামমোহন রায় ইংলণ্ডের প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিলেন। এক দিবস আর্নট সাহেবের বাটীতে একটি ভোজে, রামমোহন রায়ের সহিত, চিরস্মরণীয় সাম্যবাদী রবার্ট ওয়েনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রবার্ট ওয়েন ইংলণ্ডে সাম্যবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি তাঁহাকে আপনার মত বুঝাইয়া দিতে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় পুর্ব্ব হইতেই উক্ত বিষয়টি ভালরূপ বুঝিতেন। সুতরাং তিনি ওয়েন সাহেবকে তাঁহার মতের দোষ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘোরতর তর্ক বাধিয়া গেল। মিস্ কার্পেণ্টার এই বিষয়ে একজন চাক্ষুষদর্শীর যে পত্র তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রবার্ট ওয়েন রামমোহন রায়ের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের ধীরভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই।*

পার্লেমেন্টের কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান
জমিদার ও প্রজা

১৮৩১ এবং ১৮৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য পার্লেমেণ্ট হইতে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এদেশীয় ইয়োরোপীয় বণিক, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি অনেকে উক্ত কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ও অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, ও সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে কমিটির প্রশ্নসকলের উত্তর পরে পরে লিখিয়া বোর্ড অব কণ্ট্রোলের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহা ব্লু বুকে (Blue Books) উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন তিনি ঐ সকল প্রশ্ন ও উত্তর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সাক্ষ্য হইতে দুই একটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Q. What is the condition of the cultivator under the present Zemindary system of Bengal, and Ryotwary system of the Madras Presidency ?

A. Under both systems the condition of the cultivators is very

* "I only met Raja Ram Mohun Roy once in my life. It was at a dinner party given by Dr. Arnott. One of the guests was Robert Owen who evinced a strong desire to bring over the Raja to his socialistic opinions. He persevered with great earnestness; but the Raja who seemed well acquainted with the subject, and who spoke our language in marvellous perfection, answered his arguments with consummate skill, until Robert somewhat lost his temper, a very rare occurrence which I never witnessed before. The defeat of the kind-hearted philanthropist was accomplished with great suavity on the part of his opponent." The Last Days in England of the Raja Ram Mohun Roy. P. 111.

miserable; in the one, they are placed at the mercy of the Zemindars' avarice and ambition; in the other, they are subjected to the oxtortion and intrigues of the surveyors and other Government revenue officers. I deeply compassionate both; with this difference in regard to the agricultural peasantry of Bengal, that there the landlords have met with indulgence from government in the assessment of their revenue, while no part of this indulgence is extended towards the poor cultivators. In an abundant season, when the price of corn is low, the sale of their whole crops is required to meet the demands of the landholder, leaving little or nothing for seed or subsistence to the labourer or his family.

Q. Can you propose any plan of improving the state of the cultivators and inhabitants at large?

A. The new system acted upon during the last forty years, having enabled the landholders to ascertain the full measurement of the lands to their own satisfaction, and by successive exactions to raise the rents of the cultivators to the utmost possible extent, the very least I can propose, and the least which government can do for bettering the condition of the peasantry, is absolutely to interdict any further increase of rent on any pretence whatsoever.

সিভিল্ সরভিস্

সিবিলিয়ানদিগকে অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত কিনা, কমিটির এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর করিয়াছিলেন ;—এই বিষয়ে ব্যবস্থাপকদিগের গভীর চিন্তার প্রয়োজন। যদি তরুণবয়স্ক সিবিলিয়ানদিগকে তাঁহাদের চরিত্র সুগঠিত না হইতে এবং উপযুক্ত শিক্ষালাভের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়,—সেখানে গিয়া তাঁহারা উচ্চ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন,—ভারতবর্ষে পেঁাছিয়াই সেখানে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। সেখানে তাঁহাদের পিতামাতার শাসন নাই, কোন নিকট আত্মীয় তথায় তাঁহাদিগকে পরামর্শ দ্বারা চালাইতে বা দমন করিতে পারেন না। যে সকল লোকের দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বদা পরিবৃত থাকেন, তাহারা অনুগ্রহলাভের আশায় সর্ব্বদা তাঁহাদের তোষামোদ করে, এবং তাঁহাদিগের অতি সহজে উত্তেজিত প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতার জন্য বহু অর্থ প্রদানে প্রস্তুত। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের অনেক প্রকার ভ্রম ও ত্রুটি হইবার এবং লোকের প্রতি কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের সম্ভাবনা। এই সকল অদূরদর্শী যুবকের চিত্তে যে কিছু নীতি ও ধর্ম্মের ভাব থাকে, এরূপ অবস্থায় পড়িলে তাহা শিথিল হইয়া যাইতে পারে। অল্প বয়সে সিবিলিয়নদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইবার পক্ষে এই একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, তাঁহারা অল্প বয়সে তথায় গমন করিলে দেশীয় ভাষা সকল উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অতি অসার কথা। যে সকল মিসনরী খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হন, তাঁহাদের বয়স ২৫ হইতে ৩৫-এর মধ্যে। তাঁহারা তথায় গিয়া দুই কিম্বা তিন বৎসরের মধ্যে দেশীয় ভাষা এমন উত্তমরূপে শিক্ষা করেন যে, দেশীয় লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে

পারেন, এবং দেশীয় শ্রোতাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান্ হইয়া দেশীয় ভাষায় অবাধে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন। যখন মিসনরীরা অধিক বয়সে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন, তখন সিবিলিয়নেরা পারিবেন না কেন? অল্প বয়সে হউক, বা পরিণত বয়সেই হউক, সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিলেই সহজে ভাষা শিক্ষা করা যায়। বিশেষতঃ দেশীয় আসেসর, দেশীয় জুরি এবং অন্যান্য উপায়ে সাহায্য পাইলে, এবং পারস্য ভাষার* পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ আদালতে ইংরেজী ভাষা চলিত হইলে, দেশীয় ভাষার জ্ঞান এখনকার ন্যায় এত অধিক প্রয়োজন হইবে না। সংক্ষেপতঃ বর্ত্তমান্ সময়ে যেরূপ অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে সিবিলিয়নরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের নিজের পক্ষে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এবং জনসাধারণের পক্ষে গুরুতর অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, অনেক সময় অল্পবয়স্ক সিবিলিয়নদিগের এমন মন্দ অভ্যাস ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যনাশ ও ধনহানি উপস্থিত হয়। অনেক সময় তাঁহারা এরূপ ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকেন যে, তাহা হইতে অনেকেই অন্যায় উপায় অবলম্বন ব্যতীত মুক্ত হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি ও জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের যে কর্ত্তব্য তাহা পালন করার পক্ষে গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যে সকল লোকের নিকটে তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হন, তাহারা তাঁহাদের সাহায্যে আপনাদিগের সুখৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, অল্পবয়সে বিবেচনাশক্তির উপযুক্ত বিকাশ হইবার পূর্ব্বে অনুপযুক্ত পাত্রকে কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করাতে, এবং অল্প বয়সে ক্ষমতা লাভ করিয়া অবিবেচনার ফলস্বরূপ অনেক মন্দ অভ্যাস হওয়াতে জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট সংঘটিত হয়। সেই জন্য কোন চিহ্নিত কর্ম্মচারীকে চব্বিশ বৎসরের নীচে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত নয়, অন্যূন ২২ বৎসরের নীচে তাঁহাদিগকে কখনই সিবিলিয়নরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত নহে। উক্ত বয়সে যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি কোন একজন ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপকের (Professor of English Law) নিকট হইতে প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিয়া প্রমাণ করিবেন যে, উক্ত আইন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান আছে, তিনিই বিচারবিভাগে কর্ম্ম পাইবেন। অন্য সিবিলিয়নেরা পাইবেন না। যদিও তাঁহাকে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র (English Law) অনুসারে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে না, তথাচ উক্ত ব্যবস্থাশাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা থাকিলে বুঝা যাইবে যে, আইন শিক্ষা সম্বন্ধে এবং বিচারকের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা জন্মিয়াছে; এবং এক প্রকার ব্যবস্থাশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিলে তাঁহার পক্ষে অন্য প্রকার ব্যবস্থার জ্ঞান সহজ হইবে। যেমন প্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষা সকল শিক্ষা করিলে, আধুনিক ও প্রচলিত ভাষা শিক্ষার সুবিধা হয়। এই বিষয়টি এত প্রয়োজনীয় যে, এই নিয়মটি লঙ্ঘন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগের মধ্যে কেহ, ব্যবস্থাশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ সিবিলিয়নকে বিচারকের আসন কখন প্রদান করিবেন না।

ভারতবর্ষীয়দিগের পদোন্নতি

রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষীয়দিগের পদোন্নতি বিষয়ে পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যাহাতে এদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ উচ্চপদ সকল লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, রাজা রামমোহন রায় অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে তাহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন।

* রামমোহন রায়ের সময়ে আদালতে পারস্য ভাষা চলিত ছিল।

জজের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ইয়োরোপীয় জজের সঙ্গে, একজন দেশীয় বিচারককে একত্রে বিচার করিতে দেওয়া হয়। ইয়োরোপীয়েরা দেশের ভাষা, আচার ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অনুষ্ঠান বিষয়ে অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। এক একজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ দেশীয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বিচারকরূপে বসিয়া কার্য্য করিলে, বিচার-কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। কালেক্টারের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃত যাহা কার্য্য তাহা দেশীয় কর্ম্মচারীরাই করিয়া থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষবাসীগণকে কালেক্টারের পদ প্রদান করিলে একদিকে যেমন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, অপরদিকে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় লাঘব হইবে।

রামমোহন রায়ের সময়ে এ দেশীয়েরা কালেক্টারের বা জজের দেওয়ানের পদ অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি বিলাতে গিয়া পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর পদ সকল প্রদান করা একান্ত আবশ্যক।

ইংলণ্ডে পুস্তক প্রকাশ

রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ডে রাজনীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও ভারতবর্ষীয় লোকের সাধারণ অবস্থা বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।*

* ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের খ্রীষ্টিয়ান রিফরমার (Christian Reformer) নামক বিলাতি পত্রিকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ;—"The following Publications are announced from the pen of Rajah Ram Mohun Roy. An essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property, according to the Law of Bengal with an Appendix. Containing Letters on the Hindoo Law of Inheritance, and Remarks on East India Affair; comprising the Evidence to the Committee of the House of Commons on the Judicial and Revenue Systems of India, with a Dissertation on its Ancient Boundaries; also Suggestions for the Future Government of the Country illustrated by a Map, and further enriched with Notes."

১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মন্থলি রিপজিটরী (Monthly Repository) পত্রিকায় রামমোহন রায় কর্ত্তৃক রচিত নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তকের সমালোচনা বাহির হয়।

1 "Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue Systems of India. By Raja Rammohun Roy. London; Smith, Elder & Co., 1832."

2. "Translation of Several principal books, passages and texts of the Veds, and of some controversial works on Brahminical Theology. By the same. London: Parbury, Allen & Co. 1832."

রাজনৈতিক দল সকলে তাঁহার প্রভাব

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত উদারমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার মত সকল অসঙ্কুচিতভাবে সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিলেও, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক দল সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তিনি একখানি পত্র লেখাতে রক্ষণশীলেরা হাউস অব লর্ডস্ সভায়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একটি আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করিতে বিরত হন।

ফরাসী দেশে গমন ; সম্রাটের সহিত একত্রে ভোজন ; টমাস মুরের রোজনামচা

১৮৩২ সালের শরৎকালে তিনি ফরাসী দেশ দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা তাঁহার অনুচর হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসী-গণের ন্যায় ফরাসীরাও তাঁহাকে যার পর নাই সমাদর করিয়াছিলেন। সম্রাট্ লুই ফিলিপ্ অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি রাম-মোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে ফরাসী সম্রাটের সহিত ভোজনকালে রামমোহন রায় কেবল মাত্র ফল-মূল ভোজন করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধিতে চমৎকৃত হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার প্রতি সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। তত্রত্য সোসাইটি এসিয়াটিক নামক সভা রামমোহন রায়কে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশে অবস্থিতিকালে রামমোহন রায় একদিবস পারিস নগরস্থ কোন হোটেলে সুপ্রসিদ্ধ সর্ টমাস মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন। কবি টমাস মুর তাঁহার রোজনামচায় রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাতের বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার এবং উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কথা উহাতে লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা উক্ত রাজনামচা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

6th June 1831. Dined with Macdonald at eight. Company Fazakar Aly, T Baring, Wilmot Horton, Sir A. Johnstone, Robert Grant, and the Brahman, Ram Mohun Roy, a very remarkable man, speaking English perfectly, and knowing all about Christian institutions, even to the detail of Scotch boroughs, said: that most of the Brahmins are Deists, gave an account of a Society at Calcutta formed of persons of all countries, religions, and sects—Hindus, Mussulmans, Protestants, Catholics. A sort of service performed at their meetings, from which all such names as marked any particular faith, as Christ, Mahomet, &c. &c. were excluded, but the name of God in all languages and forms whether Jehova, Brahma, or any other such title, retained.

ফরাসী দেশে অবস্থিতি কালে রামমোহন রায় ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ও ইংলণ্ডীয় সমাজ

১৮৩৩ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদিগের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রসমাজে যার পর নাই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি সকলের সহিত এমন চমৎকার ও মধুর ব্যবহার করিতেন যে, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কথোপকথন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাঁহার সংসর্গে সকলেই আনন্দলাভ করিত। কুমারী লুসী একিন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার চ্যানিংকে যে সকল পত্র* লেখেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রশংসা আছে। ১৮৩১ সালের ২৮শে জুনের একখানি পত্রে তিনি এইরূপ বলিতেছেন ;—

"All accounts agree in representing him as a person of extraordinary merit. With very great intelligence and ability, he unites a modesty and simplicity which win all hearts. He has a very great command of the language, and seems perfectly well versed in the Political state of Europe and an ardent well-wisher to the cause of freedom and imporvement everywhere."

ইহার সার মর্ম্ম এই ;—সকলেই তাঁহাকে (রামমোহন রায়কে) একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। প্রভূত ক্ষমতা ও বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিনয় ও সারল্য সকলের হৃদয়কে জয় করিতেছে। ইংরেজী ভাষার উপরে তাঁহার অতিশয় দখল আছে, এবং ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। তিনি সর্ব্বত্র স্বাধীনতা ও উন্নতির একান্ত পক্ষপাতী।

১৮৩১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আর একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন ;—

Just now my feelings are more cosmopolite than usual ; I take a personal concern in a *third* quarter of the Globe, since I have seen the excellent Rammohun Roy, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রামমোহন রায়কে দেখিয়া অবধি আমার মনের ভাব অধিকতর উদার ও সার্ব্বভৌমিক হইয়াছে। আমি এক্ষণে পৃথিবীর এক-তৃতীয় খণ্ডের বিষয়ে (অর্থাৎ এসিয়া খণ্ড) মনোযোগী হইতে পারিতেছি। আর এক স্থলে রামমোহন রায়ের বিষয়ে বলিতেছেন ;—

He is indeed a glorious being,—a true sage, as it appears, with the genuine humility of the character, and with more fervour, more sensibility, a more engaging tenderness of heart than any *class* of character can justly claim.

কুমারী একিন্ উক্ত পত্রের আর একস্থলে বলিতেছেন যে, রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের বিষয় উল্লেখ করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সম্বন্ধে বলিলেন, "May God *load* him with blessings." কুমারী একিন্ উক্ত পত্রে

* Memoirs, Miscellanies and Letters, of the late Lucy Ackin. London. Longman.

বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডীয় রমণীকুলের প্রতি এবং সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা। কুমারী একিন্ আরও বলিতেছেন যে, যাহাতে ভারতবর্ষে জুরির বিচার প্রবর্ত্তিত হয়, তিনি তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

রাজা ইংলণ্ডে প্রথমে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় বাস করিতেন। ধনী লোকের ন্যায় জাঁকজমকে থাকিতেন না। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি আত্মস্বার্থ চরিতার্থের জন্য, ধনবান বড় লোকের ন্যায় থাকিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। রাজার ন্যায় বুদ্ধিমান, ও সুচতুর ব্যক্তিও ঐ পরামর্শে ভ্রমে পড়িলেন। তিনিও মনে করিলেন যে, ইংলণ্ডে তাঁহার বড় লোকের ন্যায় জাঁকজমকে থাকা আবশ্যক। ঐ প্রকারে থাকিলে, যে কার্য্যের জন্য তিনি তথায় আসিয়াছেন, তাহা সফল হওয়ার পক্ষে সুবিধা হইবে। রিজেণ্ট পার্কে, কম্বারল্যাণ্ড টেরাম নামক প্রাসাদতুল্য সুন্দর বড় বাটীতে বড় লোকের ন্যায় জাঁকজমকে বাস করিতে লাগিলেন। যে সকল লোকের পরামর্শে রাজা এই ভুল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার সেক্রেটারি স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট একজন।

রাজা শীঘ্রই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে, ঐ ভাবে ইংলেণ্ড বাস করার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তখন ঐ প্রাসাদতুল্য বাটী ত্যাগ করিয়া, বেড্ফোর্ড স্কোয়ারে কলিকাতার হেয়ার সাহেবের সহোদরগণের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। যত দিন লণ্ডনে ছিলেন, ঐ স্থানে থাকিতেন। একখানি ঘোড়ার গাড়ী রাখিয়াছিলেন। একজন কোচম্যান ও একজন সহিস রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক দিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় থাকিলেও, দেশের প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সংসর্গপ্রার্থী হইতেন।

রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে তত্রত্য পরিচিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণকে কোন কোন ভাল পুস্তক উপহার প্রদান করিতেন। একবার একখানি হিন্দুশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ একটি স্ত্রীলোককে উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উহাতে বেদ বা উপনিষদের কিয়দংশের অনুবাদ ছিল। একখানি পত্রে তদ্বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিতেছেন ;—"ইয়োরোপ মহাদেশ দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে, আমি শ্রীমতী ডাব্লিউকে যে বেদের অনুবাদ উপহার দিয়া গিয়াছিলাম তাহা তাঁহার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আমার আনন্দ হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই মত দৃঢ় হইল যে, তাঁহার যেরূপ বিবেচনাশক্তি এবং তিনি যেরূপ জ্ঞানের সহযোগে ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি কোন যুক্তিসিদ্ধ মত কোন বিশেষ পুস্তকে নাই বলিয়া কখন অগ্রাহ্য করিবেন না।"

রিফর্ম বিল্ (Reform Bill) পাস হইবার সময়ে ইংলণ্ডে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, রামমোহন রায় একখানি পত্রে তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিতেছেন ;—"এই বিরোধ কেবল সংস্কারক ও সংস্কারবিরোধীদিগের মধ্যে নহে, ইহা স্বাধীনতা ও অত্যাচারের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিরোধ ; ইহা ন্যায় ও অন্যায় এবং উচিত ও অনুচিতের মধ্যে বিরোধ। কিন্তু ভূতকালের ঐতিহাসিক ঘটনা সকলের বিষয় চিন্তা করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা এবং গোঁড়ারা অন্যায় দৃঢ়তার সহিত বাধা দিলেও ধর্ম্ম ও রাজনীতির উদার মত সকল ক্রমে ক্রমে অথচ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের ব্যবহার অতি সুন্দর ও চমৎকার ছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইত। কোন ব্যক্তির মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়াও তিনি এমন ধীর ও শান্তভাবে তাহা করিতেন যে, সে ব্যক্তির মনে কোন ব্যথা না লাগে। একদিন ইংলণ্ডের কোন ভদ্রলোকের

বাটীতে বসিয়া তিনি এমনভাবে মৌলিক পাপ (Original Sin) বিষয়ে একটি কথা বলিলেন, যাহাতে বুঝা গেল যে, তিনি উক্ত মতে বিশ্বাস করেন না। সেখানে এমন একটি ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন. যিনি ইহাতে চমকিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি উক্ত মতে অবশ্য বিশ্বাস করেন?" রামমোহন রায় স্ত্রীলোকটির মুখ পানে চাহিলেন। স্ত্রীলোকটির মুখে লজ্জা প্রকাশ পাইল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই রাজা সকলই বুঝিয়া লইলেন এবং অতি ধীরভাবে অবনত হইয়া বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, এই মতদ্বারা অনেক সৎলোকের পক্ষে, খ্রীষ্টীয় নীতির মধ্যে উচ্চতম ধর্ম্ম যে বিনয় তাহার উন্নতি হইয়াছে। আমার পক্ষে, আমি বলিতে পারি যে, আমি এই মতের প্রমাণ কখন প্রাপ্ত হই নাই।" সেই স্ত্রীলোকটি রামমোহন রায়কে যাহা বলিয়াছিলেন তজ্জন্য পরদিন প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিলেন ; আসিয়া বলিলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহার কথার যেরূপ ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, তিনি কখন কোথাও কোন ভদ্রসমাজে এমন সুন্দর কিছু দেখেন নাই।

লণ্ডনে অবস্থিতিকালে তিনি তাঁহার পালিত পুত্র রাজারামকে শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড ডি. ডেভিস্‌ন এম্. এ. সাহেবের নিকট সুশিক্ষার জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। রাজারামকে কেমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। কখন কখন রাজারামকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গমন করিতেন। ডেভিস্‌ন পরিবারেরা রামমোহন রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এক দিবস উক্ত পরিবারে একটি শিশুর নামকরণ অথবা দীক্ষা উপলক্ষে রামমোহন রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের নামে শিশুটির নামকরণ করিলেন। এই ইংরেজ শিশুর নাম 'রামমোহন রায়' হইল। এই শিশুটিকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। রামমোহন রায় ঐ শিশুটিকে দেখিবার জন্য ডেভিস্‌ন সাহেবের বাটীতে যাইতেন। ডেভিস্‌ন সাহেবের সহধর্ম্মিণী তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"নিশ্চয়ই এমন বিনয়ী মানুষ আর নাই। যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত তিনি আমার সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে আমার লজ্জা হইত। যদি আমি আমাদের দেশের মহারাণী হইতাম. তাহা হইলেও আমার নিকটে আসিবার সময় এবং আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় ইহা হইতে কেহ অধিক সম্মান প্রদর্শন করিত না। একটি ঘটনায় আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। এক দিবস তিনি আমাদের বাটীতে আসিয়া আমাকে কিম্বা বালকটিকে না দেখিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, ঐ শিশুটিকে আমি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। এই ঘটনাটি ব্রিষ্টলে কুমারী কাসেলের বাটীতে যাইবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

ইহা স্থির হইল যে, রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রিষ্টল নগরে গমন করিবেন, তথায় ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ নামক একটি সুন্দর ভবনে কুমারী কিডেল্ এবং কুমারী কাসেলের অতিথিরূপে অবস্থিতি করিবেন। কুমারী কাসেলের অনেক সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তখন তিনি নাবালিকা। মিস্ কার্পেণ্টারের পিতা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্পেণ্টার তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। কুমারী কিডেল্, কাসেলের মাতুলানী এবং তাঁহার অভিভাবিকা। ডাক্তার কার্পেণ্টার এই দুইটি স্ত্রীলোকের সহিত লণ্ডন নগরে রামমোহন রায়ের পরিচয় করিয়া দেন।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় সমাজের সহিত বিশেষরূপে মিশিয়াছিলেন। সকল প্রকার সামাজিক আমোদপ্রমোদেও অবকাশানুসারে যোগ দিতেন। তাঁহার একখানি পত্রে আমরা জানিতে পারিতেছি যে. তিনি এক দিবস তাঁহার বন্ধুগণের সহিত আস্‌লিস্ থিয়েটার নামক নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।

রাজার প্রকৃতিতে বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য ছিল। একদিকে যেমন তিনি গম্ভীর স্বভাব, অন্যদিকে, আবার, সুরসিক, আমোদপ্রিয়। কাব্যরসাস্বাদনে, নাটকাদির মাধুর্য্য-গ্রহণে বিশেষ সক্ষম ছিলেন। কাব্যরসে পরিতৃপ্ত হইতেন।

বেসিল মণ্টেগু সাহেবের বাটীতে, রামমোহন রায়ের সহিত, একজন তৎকালীন সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী, ফ্যানি কেম্বলের (Fanny Kemble) সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি কোন কোন হিন্দু নাটকের বিষয় অবগত আছেন দেখিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাস প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'শকুন্তলা' নাটকের বিষয় অবগত নহেন, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। রাজা মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শকুন্তলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জর্ম্মান কবি গেটি (Goethe) শকুন্তলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—"The most wonderful production of human genius"। রাজা তাঁহাকে পরে, সর্ উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদিত শকুন্তলা একখণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ফ্যানি কেম্বল উহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হন নাই। ১৮৩১ সালের ২২শে ডিসেম্বর দিবসের দৈনন্দিন লিপিতে ফ্যানি কেম্বল লিখিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহাদের নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। সেদিন ইজাবেলা নামক নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ডিভনসায়ারের ডিউকের বসিবার স্থানে রাজা বসিয়াছিলেন। তিনি নাটকাভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অতিশয় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। উক্ত অভিনেত্রী, তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে, আর এক দিনের কথা লিখিয়াছেন। ১৮৩২ সালের ৬ই মার্চ্চ, মণ্টেগুদের বাটীতে অনেকগুলি ভদ্রলোক সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ফ্যানি কেম্বল তথায় এক ঘণ্টাকাল নৃত্য করিয়াছিলেন। রাজা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফ্যানি কেম্বল আরও লিখিয়াছেন যে. রাজার সহিত তাঁহাদের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদজনক কথোপকথন হইয়াছিল। উহাতে তিনি (ফ্যানি কেম্বল) অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত অভিনেত্রী, আরও বলিতেছেন ; তাঁহার (রাজার) মূর্ত্তি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। লণ্ডনের যে সকল গৃহে নৃত্যাদি হয় (Ball-rooms) তথায় তাঁহার সুচিত্রিত পোষাক ও তাঁহার বর্ণ, তাঁহাকে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় করিয়াছে। তাঁহার আকৃতিতে সুতীক্ষ্ম বুদ্ধি, অতিশয় মধুরতা ও শান্তভাব প্রকাশ করে। ফ্যানি কেম্বল বলিতেছেন যে, রাজার সহিত হাস্যরসাত্মক কথোপকথনে তাঁহারা উভয়েই অতিশয় হাস্য করিয়াছিলেন। অভিনেত্রী বলিতেছেন যে, এই সাক্ষাতের তিন দিবস পরে, তিনি রাজার নিকট হইতে একখানি মনোরম পত্র ও কয়েকখানি ভারতবর্ষীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন ;—"A charming letter and some Indian books from that most amiable of all the wisemen of the East." রামমোহন রায় ইংলণ্ডে সবান্ধবে নাট্যশালায় যাইতেন। ১৮৩৩ সালের ১২ জুন তিনি কুমারী কিডেলকে লিখিতেছেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে ও তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে সায়াহ্নে আস্‌লিস থিয়েটারে গমন করিবেন।

ব্রিষ্টলগমনের সংকল্প ও ভারতবর্ষীয় রাজনীতি

এই সময়ে ভারতবর্ষীয় রাজনীতি সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে বিচার হইতেছিল। সেইজন্য রামমোহন রায়ের লণ্ডনে অবস্থিতি এবং সর্ব্বদা পার্লেমেণ্ট ভবনে গমন করা একান্ত আবশ্যক ছিল। স্বদেশের রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য এই সময়ে, তিনি বিবিধ প্রকারে, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছিলেন। একজন লেখক বলিয়াছেন যে, এই সময়ে তাঁহাকে,

সর্ব্বদা পার্লেমেণ্ট ভবনে দেখা যাইত। কুমারী কাসেলকে একখানি পত্রে, রামমোহন রায় লিখিতেছেন ;—"অদ্য কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হইবে। কার্মাটিতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়া সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্ক বিতর্ক দ্বারা কার্য্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইয়াছে। কমন্স সভায় এই পাণ্ডুলিপি পাস হইলে, লর্ডদিগের সভায় কি হইবে, তাহা আমি শীঘ্র নির্দ্ধারণ করিতে পারিব। তখন আমি উহার শেষ ফল শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া লণ্ডন পরিত্যাগ করিব। পরসপ্তাহে আমি ব্রিষ্টল যাত্রা করিব। লণ্ডন হইতে যাইবার পথে আমি বাথ নগরে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে আমার পরিচিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়া যাইব।" এই সময়ে রামমোহন রায় স্বদেশের রাজনৈতিক কল্যাণসাধনের জন্য যার পর নাই ব্যস্ত থাকিতেন। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডের নানা স্থানে পত্র লিখিতেই তাঁহার অনেক সময় যাইত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

স্বর্গারোহণ

১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর

ব্রিষ্টল নগরে আগমন

১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরের নিকট-বর্ত্তী ষ্টেপল্‌টন্‌ গ্রোভ নামক মনোরম ভবনে উপনীত হইলেন। রামমোহন রায়ের সহিত কলিকাতার ডেভিড হেয়ার সাহেবের ভগিনী* কুমারী হেয়ার আসিয়াছিলেন। কুমারী হেয়ার লণ্ডনে বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার পিতৃব্যদিগের ভবনে থাকিতেন। রামমোহন রায়ের সহিত রামহরি দাস ও রামরত্ন মুখোপাধ্যায় নামক তাঁহার দুই জন হিন্দু ভৃত্যও ব্রিষ্টলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পালিত পুত্র রাজারাম তাঁহার পূর্ব্বেই ষ্টেপল্‌টন গ্রোভে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

কুমারী কাসেলের বিষয় আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। শ্রীযুক্ত মাইকেল কাসেল ব্রিষ্টল নগরের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়চরিত্র বণিক ছিলেন। তিনি ডাক্তার কার্পেণ্টারের উপাসকমণ্ডলীর একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তখন ডাক্তার কার্পেণ্টারের উপরে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান কুমারী কাসেলের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল।

রামমোহন রায় লণ্ডন হইতে ব্রিষ্টল আসিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। লণ্ডনের গোলমাল ও ব্যস্ততার মধ্য হইতে আসিয়া, ব্রিষ্টলের শান্তভাব তাঁহার পক্ষে বিশেষ তৃপ্তিকর হইল। তিনি প্রায় প্রতিদিন ষ্টেপল্‌টন গ্রোভ ভবনে অথবা ডাক্তার কার্পেণ্টারের ভবনে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার রামমোহন রায়কে যতই দেখিতে লাগিলেন, ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রীতি ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে উপাসনালয়ে ডাক্তার কার্পেণ্টার আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, রাজা রামমোহন রায় তথায় দুই রবিবার উপস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় রবিবারে ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহযোগী রেভেরেণ্ড আর বিস্‌ল্যাণ্ড, ডাক্তার কার্পেণ্টারের প্রতিনিধিস্বরূপ উপাসনালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারের নূতন কলেজের জন্য উপাসকমণ্ডলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে কোন সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত কোন সময়ে সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহাদ্বারা উক্ত কলেজে কিছু অর্থসাহায্য প্রেরণ করিবেন।

* কুমারী কার্পেণ্টার রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে The Last Days in England of the Raja Ram Mohun Roy লিখিয়াছেন যে, কুমারী হেয়ার কলিকাতার হেয়ার সাহেবের কন্যা। ইহা তাঁহার ভুল হইয়াছে। তিনি হেয়ার সাহেবের সহোদরা। হেয়ার সাহেব চিরকুমার ছিলেন।

কুমারী কার্পেণ্টার বলেন যে, ব্রিষ্টলের লোক রাজা রামমোহন রায়কে প্রায় আট বৎসর পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। কলিকাতায় একটি ইউনিটেরিয়ান মতে উপাসনালয় সংস্থাপনের জন্য উক্ত উপাসকমণ্ডলীর নিকটে একবার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কিরূপ মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহা তাঁহাদিগকে অবগত করা হইয়াছিল। সেই জন্য, তিনি যে দিন উক্ত উপাসনালয়ে আসেন, তাঁহাকে উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয় ভিন্ন, রামমোহন রায় ব্রিষ্টলের অন্যান্য খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার হৃদয় সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ ছিল না। লণ্ডনে অবস্থিতিকালে, তিনি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রকার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, সপ্তদশবর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। কেরি সাহেব তাঁহাকে একখানি ওয়াট সাহেবের ধর্ম্ম-সঙ্গীত পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উপহার পাইয়া বলিয়াছিলেন, আমি ইহা আমার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিব। বাস্তবিকই তিনি উহা তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন ;—"রামমোহন রায় কোন উপাসনালয়ে গমন করিবার পূর্ব্বে ওয়াট সাহেবের রচিত শিশুদিগের জন্য ঈশ্বরসঙ্গীতগুলি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন।" মহামনা রামমোহন রায় আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে শিশুদিগের জন্য রচিত ঈশ্বরসঙ্গীত পাঠ করিতেন! তাঁহার হৃদয় কেমন সুন্দর ও মধুর ছিল! ওয়াটের রচিত সামাজিক উপাসনাবিষয়ক একটি সঙ্গীতের কিয়দংশ তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আবৃত্তি করিতেন।*

সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক রেভারেণ্ড জন ফষ্টর, ষ্টেপল্‌টন্‌ গ্রোভ ভবনের পার্শ্ববর্ত্তী একটি বাটীতে বাস করিতেন। তিনি রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেন। ফষ্টর সাহেবের জীবনচরিতপুস্তকে এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যে কোন কারণে হউক, রামমোহন রায়ের প্রতি প্রথমে ফষ্টর সাহেবের ভাল ভাব ছিল না। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখিতেছেন :—"তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়ের) বিরুদ্ধে আমার প্রবল কুসংস্কার ছিল। তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত না। কিন্তু যখন কুমারী কাসেলের বাটীতে আসিলেন, তখন না গিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সংসর্গে বসিয়া তাঁহার প্রতি আমার কুসংস্কার অর্দ্ধ ঘণ্টাও থাকিতে পারিল না। তিনি অতিশয় আনন্দপ্রদ ও মনোরম ব্যক্তি। তিনি যে বুদ্ধিমান্‌ ও সুপণ্ডিত, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তিনি সরল বন্ধুভাবাপন্ন এবং অতি সুভব্য। অনেক লোকের সঙ্গে একত্রে আমি তাঁহার সহিত দুই দিবস সায়ংকাল অতিবাহিত করিয়াছি। শেষবারে ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের কয়েকটি মত বিষয়ে এবং হিন্দুদিগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বিশেষভাবে আমার কথোপকথন হইয়াছিল।"

* সঙ্গীতের সেই অংশটি এই :—
"Lord ! how delightful, 'tis to see
A whole assembly workship thee :
At once they sing, at once they pray ;
They hear of heaven and learn the way."

কুমারী কার্পেণ্টার

ব্রিষ্টলে স্বর্গীয় কুমারী কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মিস্ কার্পেণ্টারের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ই তাঁহার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।

ব্রিষ্টলের সভায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাপ্রকাশ

১১ই সেপ্টেম্বর দিবসে, ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ ভবনে, রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কথোপকথনের জন্য বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন যে, উক্ত দিবসের সভায় ভারতবর্ষের ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং উহার ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে কথাবার্ত্তা এবং ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের কয়েকটি মত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফষ্টর সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান প্রধান সুপণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টাকাল ক্রমাগত দণ্ডায়মান্ থাকিয়া উপস্থিত পণ্ডিতগণের সকল প্রকার সুকঠিন প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে অসাধারণ প্রতিভার উন্মেষ দেখিয়া বঙ্গভূমির এক সামান্য গ্রামবাসীগণ চমৎকৃত হইয়াছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ ভাষা ও বিবিধ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়া লোককে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিয়াছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা হিন্দু, মসলমান, খৃষ্টিয়ান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গকে বিচারযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভাগীরথীতীরে পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমেশ্বরের বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিল, অদ্য ব্রিষ্টল নগরে সমবেত মহাপণ্ডিতবর্গ সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু হায়! ইহাই তাঁহার শেষ কার্য্য! তাঁহার সুমহৎ জীবন-নাটকের ইহাই শেষ অঙ্ক! কি বলিতেছি! যে আত্মা অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের অধিকারী,—অনন্তকাল যে আত্মার পরমায়ু, তাহার কার্য্যের কি শেষ আছে?

ডাক্তার কার্পেণ্টার বলিতেছেন ;—পরদিন প্রাতঃকালে (১৭ই সেপ্টেম্বর) আমার সহিত তাঁহার ইহজীবনের শেষ দেখা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে আহার করিতে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আমি অনুভব করিলাম যে, পূর্ব্বদিনের পরিশ্রম ও উৎসাহে তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি ব্যগ্রভাবে ইচ্ছা করিলাম যে, তিনি সে দিন বিশ্রাম করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময় যে নিকটবর্ত্তী, তাহা তাঁহার নিজের অন্তঃকরণ ভিন্ন অন্য কেহ তখন মনে করিতে পারিত না। তথাচ মানসিক শক্তিহানির কোন চিহ্ন তখন প্রকাশ পায় নাই। সেই দিবস সায়াহ্নকালে তিনি তাঁহার বন্ধুগণের সহিত এবং এস্‌লিন্ সাহেবের বুদ্ধিমতী মাতার সহিত ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ ভবনে কয়েক ঘণ্টা কথোপকথন করিয়াছিলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, রাজা জ্বরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমেই জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; ক্রমে বিকারে পরিণত হইল। প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ অত্যন্ত যত্নসহকারে চিকিৎসা করিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার সাহেবের ভগিনী কুমারী হেয়ার দিবারাত্র রাজার সেবা করিলেন। কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির দুই ঘটিকা ২৫ মিনিটের সময় প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল!—ভারতের দুঃখ-রজনীর প্রভাত তারা আর কোন্ অদৃশ্য, অলক্ষ্য

দেশে গিয়া উদয় হইল! ইংলণ্ড কাঁদিল! ভারত কাঁদিল! হা ঈশ্বর! তোমার কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য কে বুঝিবে!

মৃত্যুশয্যার বর্ণনার কিয়দংশ কুমারী কলেটের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

"বোধ হইল যে, অধিকাংশ জাগ্রত সময় তিনি উপাসনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মনে কি বিশেষ কষ্ট ছিল, এবং কি কথা ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইতে-ছিলেন, তাহা জানিবার আমাদের কোন উপায় ছিল না। যে সকল শেষ কথা তাঁহাকে উচ্চারণ করিতে শুনা গিয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি পবিত্র **'ওঁকার'** উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, জীবনে বহু লোকসমাগমের মধ্যে এবং মৃত্যুর নির্জ্জন দ্বারে সর্ব্বত্রই ভগবৎচিন্তাই তাঁহার আত্মার প্রধান কার্য্য ছিল। শীঘ্রই তিনি সংজ্ঞা ও বাক্‌শক্তি হারাইতে লাগিলেন; তথাচ সময়ে সময়ে জ্ঞানলাভ করিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুগণকে তাঁহাদের সেবার জন্য সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছিলেন।

চিকিৎসকের দৈনন্দিন লিপি

রাজা রামমোহন রায়ের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত এস্‌লিন্ সাহেবের দৈনন্দিন লিপি হইতে কুমারী কার্পেণ্টার, রামমোহন রায়ের পীড়া ও মৃত্যুশয্যার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম দিলাম।

ব্রিষ্টল, সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩। ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ ভবনে আমি রাম-মোহন রায়কে দেখিতে গেলাম। তাঁহার সহিত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইল; তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, তিনি খৃষ্টের জীবনে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন। তাঁহার বিবেচনায় খৃষ্টধর্ম্মের আন্তরিক প্রমাণ, (Internal evidence) নূতন বাইবেলের ঐতিহাসিক প্রমাণ অপেক্ষা প্রবলতর। হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে অনুবাদিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, অধ্যাপক **লি** বলেন যে, তিনি (রামমোহন রায়) খৃষ্টধর্ম্মের ঐশিক উৎপত্তি অস্বীকার করেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টের জীবনে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন নাই।

বুধবার ১১ই সেপ্টেম্বর। ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহিত ষ্টেপল্‌টন্ ভবনে আহার করিতে গমন করিলাম। সেখানে ডাক্তার জেরার্ড এবং সিমন্স এবং শ্রীযুক্ত ফষ্টর, ব্রুস, ওয়ার্সলি, স্প্যাণ্ড ইত্যাদি ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আহারের সময়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল। যে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রণালীদ্বারা রাজা তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মীমাংসা সকলে উপনীত হইয়াছেন, তিনি তাহার বিবরণ আমাদিগকে বলিলেন।

১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আমি এখানে নিদ্রা গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালীন আহারের সময়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল। আমি রামমোহন রায়কে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কাফ্রিদিগের কিছু বিবরণ বলিলাম। উক্ত জাতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান তিনি খৃষ্টিয়ান মিসনরীদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন; সুতরাং আমার বিবরণ শুনিবার জন্য তাঁহার চিত্ত প্রস্তুত ছিল না। কুমারী কিডেল্, কুমারী কাসেল্, রাজা ও আমি তাঁহাদের গাড়ীতে ব্রিষ্টল নগরে আসিলাম। আমার মধুমক্ষিকা সকল দেখিবার জন্য রাজা ৪৭নং পার্ক ষ্ট্রীট ভবনে নামিলেন। মধুমক্ষিকা সকল দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

১৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। দুইটার সময় রোগী সকলকে দেখিলাম। চারিটার সময়

ফ্রেঞ্চে গেলাম। সেখানে ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। রাজা, কুমারী কিডেল, কুমারী কাসেল্, ডাক্তার জেরার্ড, ডবলিননিবাসী কারী সাহেব, শ্রীযুক্ত ব্রুস সাহেব, জে কোটস্ ইত্যাদি সকলে তথায় ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে কথোপকথন হইল। রিফরম্ বিল পাস্ হইবার সময় হুইগদল যেরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছিলেন, রামমোহন রায় তাহা আক্রমণ করিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার। আমি ষ্টেপল্টন্ গ্রোভ ভবনে গমন করিলাম। সেখানে ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহিত দেখা হইল। রাজার সহিত আনন্দপ্রদ কথাবার্ত্তা হইল এবং সেইখানেই আহার করিলাম।

১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। কুমারী কিড্লের গাড়ীতে রাজা যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে ও মেরিকে সেই গাড়ীতে উপাসনালয়ে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে ডাক্তার প্রিচার্ডের 'Physical History of man' নামক পুস্তক প্রদান করিলাম। আমি উহা রামমোহন রায়ের পাঠের জন্য ডাক্তারের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলাম।

১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। রামমোহন রায়কে দেখিবার উদ্দেশ্যে আমার মাতা অদ্য সায়াহ্নে দুই এক দিনের জন্য ষ্টেপল্টন্ গ্রোভ্ ভবনে গমন করিলেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আমি আমার মাতাকে দেখিবার জন্য ষ্টেপল্টন্ ভবনে অশ্বারোহণে গমন করিলাম ইত্যাদি। দেখিলাম রাজার জ্বর হইয়াছে। তিনি আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আমি তাঁহার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম।......... আট ঘটিকার সময় রাজার গাড়ী আমাকে লইতে আসিল। আমি দেখিলাম, তিনি পুর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল আছেন, কিন্তু এখনও অল্প জ্বর আছে। শ্রীযুক্ত জন্ হেয়ার্ এবং কুমারী হেয়ার সেখানে ছিলেন। ইঁহারা রামমোহন রায়ের সহিত তথায় বাস করিতেছেন। আমি তথায় নিদ্রা গেলাম।

২০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। রাজা পুর্ব্বাপেক্ষা ভাল নাই। রাজার গাড়ীতে ২টার সময়, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পুনর্ব্বার তথায় আহার করিতে গেলাম। রাজার শিরঃপীড়া হইতেছিল, ঔষধের গুণে তাহা নিবারণ হইল। সায়ংকালে তিনি নিদ্রা গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু অত্যন্ত খোলা ছিল। একাদশ ঘটিকার সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি দেখিলাম, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শেষ ভাগ সকল অতিশয় শীতল হইয়াছে এবং তাঁহার নাড়ী ১৩০ একশত ত্রিশ, এবং দুর্ব্বল : ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে-ছিল। গরম জল প্রভৃতি, কিঞ্চিৎ সুরা এবং বাহ্যিক উত্তাপে উপকার হইল। কিন্তু তাঁহার অস্থিরতা অত্যন্ত অধিক। একবার শয্যায়, একবার মাটির উপর একটি সোফায় (Sofa) পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমি অদ্য তাঁহাকে বলিলাম যে, তিনি কুমারী হেয়ারকে তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতে দেন। তিনি বলিলেন, উহা অন্যায় হইবে। আমি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিলাম, এদেশের প্রথা অনুসারে উহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কার্য্য। তিনি তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। কুমারী হেয়ার শয্যায় গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে উঠাইয়া রাজার নিকটে থাকিতে বলিলাম। আমি তাঁহার যেরূপ সেবা করিতেছিলাম, তাহাতে রাজা আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। অদ্য রাত্রে আমি তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। আমার মাকে বলিলাম, যদি কল্য রাজা ইহা অপেক্ষা ভাল না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করিব যে, প্রিচার্ড সাহেব আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখেন।

২১শে সেপ্টেম্বর, শনিবার। কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে বসিয়াছিলেন। রাত্রে তিনি কেমন ছিলেন, আমাকে তাহার সংবাদ দিয়াছিলেন। আমি প্রাতঃকালে তাঁহাকে

দেখিলাম ; তাঁহার নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন। জিহ্বার অবস্থা ভাল নহে। কুমারী কিডেল্ প্রস্তাব করিলেন যে, ডাক্তার প্রিচার্ডকে আনাইয়া দেখান হউক। ইহাতে আমি আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। ব্রিষ্টল গমন করিলাম। দুইটার সময় কয়েকজন রোগীকে দেখিলাম, এবং ষ্টেপল্‌টন্ ভবনে পাঁচটার সময় আহার করিবার জন্য প্রিচার্ডের সহিত গমন করিলাম। যতক্ষণ না প্রিচার্ড বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ প্রিচার্ডের আগমনের কথা আমি রাজাকে বলি নাই। প্রিচার্ড আসাতে রাজা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। প্রিচার্ডের মুখশ্রীতে কিরূপ বুদ্ধি প্রকাশ পায়, রাজা তাহা আমাকে পরে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রিচার্ডকে আনয়ন করার অতিশয় অনুমোদন করিলেন। আমি একাদশ ঘটিকার সময় শয্যায় গমন করিলাম। কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে পুনর্ব্বার বসিয়া রহিলেন।

২২শে সেপ্টেম্বর, রবিবার। অতি প্রত্যূষ পর্য্যন্ত রাজা অতিশয় অস্থির ছিলেন। প্রত্যূষে নিদ্রা গিয়াছিলেন ; চক্ষু অতিশয় খোলা। সার্দ্ধএকাদশ ঘটিকার সময় প্রিচার্ড আসিলেন। আমি তাঁহার সহিত ভিতরে গেলাম। হেয়ার সাহেবও বাহিরে আসিলেন। সায়ংকালে রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিলেন............রাজা বলিলেন, যখন প্রিচার্ড, হেয়ার এবং আমি তাঁহার নিকটে রহিয়াছি, তখন যদি তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তথাচ তাঁহার এই সন্তোষ থাকিবে যে, ব্রিষ্টল নগরে চিকিৎসা সম্বন্ধে যতদূর সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহার পক্ষে ঘটিয়াছে। মেরি এবং আমার মাতা, কুমারী কাসেলের গাড়ীতে উপাসনালয়ে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কুমারী হেয়ার অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রান্তিবিরহিত হইয়া রাজার সেবা করিতেছেন। রাজার উপরে তাঁহার ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। আমার অপেক্ষা তিনি অত্যন্ত সহজে রাজাকে ঔষধ খাওয়াইতে পারেন। রাজা তাঁহাতে অতিশয় স্নেহ করেন। তিনিও রাজাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর, সোমবার। আমি পাঁচটার একটু পূর্ব্বে উঠিলাম। রাজা রাত্রে বড় অস্থির ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অন্য লোক যে নিকটে আছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে যখন সচেতন করা হইত, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মসংযম থাকিত। কিরূপ ঘটিবে সে বিষয়ে আমার অধিকতর ভয় হইয়াছিল ; তথাচ তাঁহার আরোগ্য বা মৃত্যু উভয়ই সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে কুমারী হেয়ার বলিলেন যে, অন্য চিকিৎসক আনাইয়া পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আমিও সেরূপ অনুরোধ করিলাম। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার নিজের বিবেচনায় আবশ্যক না হইলেও, এরূপ একজন খ্যাতনামা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য আরও চিকিৎসক আনাইয়া পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। প্রধানতঃ হেয়ার সাহেবের পরামর্শে ডাক্তার ক্যারিককে আনয়ন করা হইল। তিনি সায়ংকালে প্রিচার্ডের সহিত আসিলেন। শারীরিক যন্ত্র সকলের মধ্যে মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রোগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। মস্তকে জোঁক বসান হইল। অদ্য রাত্রে রাজা কিছু ভাল ছিলেন। আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম বলিয়া, তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন ; অত্যন্ত স্নেহের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বদা আমার হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে গরম জলের দ্বারা তাঁহার অঙ্গ ধৌত করিয়া দিয়াছিলাম। বোধ হইল, রাত্রে কিছু ভাল ছিলেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। হেয়ার সাহেব ও কুমারী হেয়ার এবং বালক রাজা-

রাম রাজার নিকটে বসিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ১১টার সময় চলিয়া গিয়াছিলাম। পাঁচটার সময় পুনর্ব্বার রোগীর নিকটে ফিরিয়া আসিলাম। গত রাত্রি অপেক্ষা রাজার নাড়ী কিছু ভাল। গড়ের উপর তিনি তদপেক্ষা মন্দ নাই। ক্যারিক ও প্রিচার্ড দুই প্রহরের সময় আসিলেন। দিবাভাগে অধিকতর স্থির ছিলেন, এবং অধিকতর শান্তভাবে নিদ্রা গিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু খোলা ছিল। সায়ংকালে ও রাত্রে অবস্থা মন্দ থাকে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। গত রাত্রে অধিকাংশ সময় হেয়ার সাহেব তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। রাত্রি তিনটা এবং চারিটার মধ্যে তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, কখন কখন রাজার নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং দ্রুত হইয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহার অতিশয় উদ্বেগ হইয়াছিল। রাত্রে রাজার ভাল নিদ্রা হয় নাই; অধিকাংশ সময় চক্ষু খোলা ছিল। ডাক্তার ক্যারিক ১১টার সময় আসিলেন। প্রিচার্ডের আসিবার পূর্ব্বেই কুমারী হেয়ার আমাদিগকে রোগীর ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম, রোগীর ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে ও মুখ বাঁকিয়া যাইতেছে। এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে এইরূপ চলিল। বোধ হইল, আমরা যে ঘরে আসিয়াছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। যদিও প্রাতঃকালে যখন আমি তাঁহার নিকটে গমন করিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়া মৃদুহাস্য করিলেন, এবং সস্নেহে আমার হস্তমর্দন করিলেন। আমরা তাঁহার চুল কাটিয়া মাথায় শীতল জল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। ধনুষ্টঙ্কার থামিয়া গেলে বোধ হইল, তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। চক্ষু এখনও খোলা। চক্ষুর পুত্তলিকা ছোট হইয়া গিয়াছে। বোধ হইল, বাম বাহু এবং পদ অবশ হইয়া গিয়াছে। আমরা স্থির করিলাম, সায়ংকালে ডাক্তার বার্ণার্ডকে ডাকিতে হইবে। আমি সমস্ত দিন এখানে থাকিলাম। কি ঘটিবে, তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় ভয় হইতেছিল। অপরাহ্নে তাঁহার শরীর অধিকতর গরম হইল এবং নাড়ী আর একটু প্রবল হইল; কিন্তু সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় আবার ধনুষ্টঙ্কার হইতে লাগিল। অনেক ঘণ্টা ধরিয়া অনেক কষ্টে কিছু খাদ্য তাঁহার গলাধঃকরণ হইয়াছিল। সুতরাং, তাঁহার পুষ্টির জন্য আরও কিছু খাইতে দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রাতঃকালে যখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে ধন্যবাদ করিলেন, তাহার পর হইতে তাঁহার প্রায়ই কিছু জ্ঞান ছিল না। ডাক্তার বার্ণার্ড আসিতে পারিলেন না। প্রিচার্ড এবং ক্যারিক রাজাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। দুই প্রহরের পূর্ব্বে কেহ শয্যায় গমন করিল না। কুমারী কিডেল্ অনেক সময় রাজার নিকটে ছিলেন। কুমারী কাসেল্ মধ্যে মধ্যে ছিলেন। কুমারী হেয়ার এবং শ্রীযুক্ত জন হেয়ার ও রাজারাম প্রায়ই রোগীর ঘরের বাহিরে আসেন নাই। আমার মাতা মধ্যে মধ্যে রোগীর নিকটে গিয়াছিলেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। প্রতিমুহূর্ত্তে রাজার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার নিশ্বাস শীঘ্র শীঘ্র অথচ বাধা প্রাপ্ত হইয়া চলিতে লাগিল। তাঁহার নাড়ী অনুভব করা যায় না। তাঁহার দক্ষিণবাহু তিনি ক্রমাগত নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার বাম বাহু নাড়িয়াছিলেন। অদ্য চন্দ্রালোকপূর্ণ সুন্দর রাত্রি। কুমারী হেয়ার, কুমারী কিডেল্ এবং আমি জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, নিশীথের শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যদৃশ্য। একদিকে এই, অপরদিকে এই অসাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে। এই মুহূর্ত্তের কথা আমি কখনই ভুলিব না। কুমারী হেয়ার এক্ষণে হতাশ ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার যখন আশা ছিল, তখন যেমন তিনি তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বা কিছু আহার দিবার জন্য তাঁহার শরীরের দিকে অবনত হইয়া পড়িতেন, এখন সেরূপ করিতে তাঁহার সাহস হয় না। নিকটবর্ত্তী একখানি কেদারার

উপরে বসিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। বালক রাজারাম রাজার হাত ধরিয়াছিলেন। গতকল্য প্রাতঃকালের পূর্ব্বে রাজারাম কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দেহ হইতে জীবনস্রোত শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইতেছিল, এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সকলের পক্ষে, অভিনিবিষ্টচিত্তে তাঁহার শেষ নিশ্বাস দর্শন করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য ছিল না, আমি কুমারী কিডেলের সন্তোষার্থে আমার পোষাক না ছাড়িয়াই শয্যায় শয়ন করিলাম। রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিঘটিকার সময় হেয়ার সাহেব আমার ঘরে আসিলেন; আসিয়া বলিলেন সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে। রামরত্ন রাজার চিবুক ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কুমারী হেয়ার, বালক রাজারাম, কুমারী কিডেল্, শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব, আমার মাতা, কুমারী কাসেল, রামহরি এবং একজন কিম্বা দুইজন ভৃত্য সেখানে ছিল। রাত্রি দুইটা বাজিয়া ২৫ মিনিট হইলে রাজা রামমোহন রায়ের শেষ নিশ্বাস পতিত হইয়াছিল। রাজার অন্তিম সময়ে হেয়ার সাহেব ইচ্ছা করিলেন যে, ব্রাহ্মণ রামরত্ন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত কোন সময়োপযোগী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। রামরত্ন হিন্দুস্থানী ভাষায় কিছু প্রার্থনা করিলেন।* স্ত্রীলোকেরা গৃহ হইতে চলিয়া গেলে পর, আমরা রাজার দেহ মাদুরের উপর সোজা করিয়া শয়ান করিলাম। তাঁহার হিন্দু ভৃত্যদিগের সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। প্রায় সাড়ে তিনটা কিম্বা ৪টার সময় আমরা সকলেই সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। পার্শ্বের ঘরে কয়েকজন ভৃত্য বসিয়া রহিল। আমি শয্যায় গমন করিলাম; কিন্তু রাত্রের ঘটনায় এত কষ্ট হইয়াছিল যে, ভাল নিদ্রা হইল না।............ কুমারী হেয়ার শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। পূঃ নামক ভাস্কর (মার্ব্বেল প্রস্তরের মিস্ত্রী) একজন ইতালীদেশবাসীর সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার মস্তক ও মুখের একটি প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব এবং আমি ব্রিষ্টল নগরে গেলাম। রাজার দেহ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম। ডাক্তার কার্পেণ্টার আমাদিগের নিকট প্রাতঃকালে আসিলেন।† আমরা অদ্য সকলেই মৃতদেহের নিকটে বসিয়াছিলাম। দেহটি সুন্দর ও গম্ভীর দেখাইতেছিল। এই ঘটনায় আমরা সকলেই অভিভূত হইয়াছিলাম।

রাজা তাঁহার পীড়ার সময়ে তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুগণের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা এবং তাঁহার চিকিৎসকদিগের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস তেজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময়ে তিনি প্রায়ই কথা কহিতেন না। দেখা যাইত যে, তিনি সর্ব্বদাই উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি রাজারামকে এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তিনি রক্ষা পাইবেন না।

শনিবার দিবসে তাঁহার দেহ পরীক্ষা হইল। পরীক্ষায় জানা গেল যে, মস্তিষ্কের প্রদাহ হইয়াছিল। উহাতে কিছু জলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হইল এবং উহা পূঁযের দ্বারায় আবৃত ছিল। মস্তকের খুলির সহিত মস্তিষ্ক সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল; সম্ভবতঃ উহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রোগের ফল। বক্ষস্থল এবং উদরের যন্ত্র সকল সুস্থাবস্থায় ছিল। জ্বর হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য জীবনীশক্তির অত্যন্ত ক্ষীণতা এবং মস্তিষ্কের প্রদাহ হইয়া-

* রামরত্ন হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। তিনি সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ অথবা বাঙ্গালায় প্রার্থনা করিয়া থাকিবেন।

† ডাক্তার কার্পেণ্টার পীড়িত ছিলেন বলিয়া রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই।

ছিল। কিন্তু সচরাচর উহার যে পরিমাণে বাহ্য চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে, বর্ত্তমান স্থলে সে প্রকার হয় নাই।

তাঁহার সমাধি ও সমাধিমন্দির

পাছে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার বিষয়াধিকারে বঞ্চিত হন, সেই জন্য রাজা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ইয়োরোপীয় বন্ধুগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের সমাধিস্থানে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের মতানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে সমাহিত করা না হয়; কোন স্বতন্ত্র স্থানে তাঁহার দেহ প্রোথিত করা হয়। বাস্তবিক তিনি আইন অনুসারে তাঁহার জাতি রক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন। তাঁহার মৃতশরীরে যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার এই অনুজ্ঞানুসারে ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভের নিকট-বর্ত্তী একটি নির্জ্জন বৃক্ষবাটীকায় ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার, নিঃশব্দে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হইল। রামরত্ন ও রামহরি চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত গমন করিয়া উক্ত স্থান হইতে আরনোস্ ভেল (Arno's Vale) নামক স্থানে শব অন্তরিত করিয়া তাহার উপরে একটি সুন্দর সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের সর্ব্বাঙ্গীণ মহত্ত্ব

শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল

রাজা রামমোহন রায়ের শরীর, বিদ্যাবুদ্ধি, হৃদয়, ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিক বীরত্ব সকলই অসাধারণ ছিল। তাঁহার শরীর ছয় ফুট অর্থাৎ প্রায় চারি হাত দীর্ঘ, সুশ্রী ও সুগঠিত ছিল। তিনি অতিশয় বলশালী ছিলেন। শারীরিক গঠনের সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যেরা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা 'আজানুলম্বিতবাহু' প্রভৃতি চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অধুনাতন কালে জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বল ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ফিজিয়নমি ও ফ্রেনলজি নামক বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা মানবদেহের সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। পরলোকগত স্পার্জিন্ সাহেব ফ্রেনলজি (হৃত্তত্ত্ববিদ্যা) বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে তাঁহার সহিত রামমোহন রায়ের বন্ধুতা হইয়াছিল। তিনি রামমোহন রায়ের মস্তকের গঠন দেখিয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। হৃত্তত্ত্ববিদ্যানুসারে রামমোহন রায়ের মস্তক অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক বলিয়া বিলাতের হৃত্তত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ উহার একটি নকল (cast) প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের মস্তিষ্ক, সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বহুল পরিমাণে বৃহৎ ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের চিকিৎসক তাঁহার পাগড়িটি বিগত প্রায় ষাট বৎসর, যার পর নাই যত্নের সহিত আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি পাগড়িটি এদেশে আনীত হইয়াছে!* ঐ পাগড়িটি এত বড় যে, যাঁহাদের মস্তক স্বভাবতঃ বড়, তাঁহাদের মস্তকেও উহা বড় হয়। রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি, সৌন্দর্য্য ও অসাধারণত্ব প্রকাশ করিত। কুমারী কার্পেণ্টারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, ইংলণ্ডের লোক তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট ও প্রীত হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহার চেহারার অতিশয় প্রশংসা করিতেন।

রামমোহন রায়ের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ ছিল। এত আহার করিতে পারিতেন যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, একটি সমগ্র ছাগমাংস একাকী ভোজন করিতে পারিতেন।† সমস্ত দিনের মধ্যে দ্বাদশ সের

---

* শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উহা বিলাত হইতে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন।

† রামমোহন রায়ের বৈষ্ণববংশে জন্ম। সেই জন্য তিনি শৈশবাবধি অনেক বয়স পর্য্যন্ত কখন মাংসভোজন করেন নাই। রংপুরে যখন কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়েই প্রথমে তিনি মাংস ভোজন করেন। মাংসভোজন করিবার একটি বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি যে খেসারি দাইল খাইতেন উহাতে ঘৃত না দিয়া রন্ধন করা হইত। সেই জন্য তাঁহার কিছু রক্তের দোষ হইয়াছিল। হাকিম অর্থাৎ মুসলমান

দুগ্ধ পান করিতেন। * পরলোকগত ভরত শিরোমণি মহাশয় বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিতেন। আমাদিগের কোন বন্ধুর † নিকট তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, একদিন অপরাহ্নে তথায় উপস্থিত হইলে, রামমোহন রায় তাঁহাকে বলিলেন,—"দেবতা! অদ্য গোটা পঞ্চাশ আম্র জলযোগ করা গেল।"

খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলনিবাসী গুরুদাস বসু নামক এক ব্যক্তি হুগলীতে মোক্তারি করিতেন। রামমোহন রায় একবার হুগলী গমন করিয়া গুরুদাসের বাসায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় একটি নারিকেল বৃক্ষে সুন্দর নারিকেল হইয়া রহিয়াছে। গুরুদাসের নিকট ফলভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গুরুদাস একটি ডাব কাটিয়া আনিয়া দিলেন। রামমোহন রায় বলিলেন "ও গুরুদাস! উহাতে আমার কি হইবে? ঐ কাঁদি-সুদ্ধ নারিকেল পাড়িয়া ফেল। তখন তিনি প্রায় এক কাঁদি নারিকেল ভক্ষণ করিলেন। ‡

শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ না হইলে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ষোড়শ বৎসরের এক বালক ব্যাঘ্রদস্যুসংকুল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, হিমগিরি উত্তীর্ণ হইয়া, কি তিব্বৎ দেশে গমন করিতে পারিত? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ না হইলে রাজা রামমোহন রায় যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারিত? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলের অভাব, ব্যক্তিগত বা জাতীয় উন্নতির একটি গুরুতর অন্তরায়। বাঙ্গালী যুবকদিগের শারীরিক অস্বাস্থ্য ও ক্ষীণতা, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে গুরুভর প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি পরীক্ষায়, মনে হয়, যেন তাঁহাদের শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত হ্রাস হইয়া গেল। বি. এ. বা এম. এ. পাস করিয়াই অনেকে একান্ত নির্জীব হইয়া পড়েন। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়!

প্রভূত শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য থাকাতে রামমোহন রায় প্রবল পরাক্রমে আপনার সুমহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার, সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে আপনার শরীর, মন,

---

চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে ছয় মাসের পাঁঠা না কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া পবে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতে পরামর্শ দেন। রাজা অবশ্য উক্তরূপ নিষ্ঠুরভাবে ছাগবধ করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ছাগমাংস ভোজনে সম্মতি প্রকাশ করেন।

সেই সময়ে তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ জেঠতুত ভাই নবকিশোর রায় রংপুরে তাঁহার নিকটে ছিলেন। নবকিশোর রায় মহাশয় কিছুদিন অবৈতনিকভাবে খুড়তুত ভাই জগন্মোহন ও রামমোহনের বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি রংপুরে গিয়াছিলেন। নবকিশোর রংপুর হইতে শুনিয়া আসেন যে, রামমোহন রায়ের ছাগমাংস ভোজনে প্রবৃত্তি হইতেছে। তিনি গ্রামে প্রত্যাগত হইয়া রামমোহন রায়ের মাতাকে বলিলেন ;—"খুড়ী, রামমোহন খৃষ্টিয়ান হইয়াছে। বিষ্ণুভক্তের ছেলে পাঁঠা খেলেই তো জাত গেল।" রামমোহন রায়ের জননী নবকিশোরকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন। নবকিশোর রায়, রামমোহন রায়ের বিষয়কর্ম্ম তত্ত্বাবধানকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। গ্রামের লোক রামমোহন রায়কে খৃষ্টিয়ান বলিতে লাগিলেন।

* স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম।

† পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

‡ প্রবন্ধলেখকের জনৈক বন্ধু ললিতমোহন সিংহের (জমিদার) নিকট গুরুদাস বসু নিজে এই গল্পটি করিয়াছিলেন।

প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করিতেছেন,—প্রতিমা-পূজার অসারত্ব দেশের লোককে বুঝাইয়া দিতেছেন বলিয়া গোঁড়া পৌত্তলিকেরা আপনার প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে, একদিন আপনাকে পথে ধরিয়া প্রহার করিবে।" রাম-মোহন রায় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আমাকে মারিবে? কলিকাতার লোক আমাকে মারিবে? তাহারা কি খায়?"

বিদ্যাবুদ্ধি

পাঠকবর্গ রাজা রামমোহন রায়ের অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; তথাচ তদ্বিষয়ে আমরা আরও কয়েকটি কথা বলিব। পণ্ডিতবর ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, এই দশ ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই সকল ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, ডাক্তার কার্পেণ্টার প্রভৃতি তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ডব্লিউ. জে. ফক্স সাহেব রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বিষয়ে এই-রূপ লিখিয়াছেন;—"The wide field over which his acquirements spread, comprising sciences, and languages, which individual knowledge rarely associates together." ইহার তাৎপর্য্য এই;—বিজ্ঞান ও ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার (রামমোহন রায়ের) জ্ঞান এরূপ সুবিস্তৃত ছিল যে, কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ প্রায়ই ঘটে না।

এদেশের পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছিল। অনেক বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, সে সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দেশের সর্ব্বত্র হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। এদেশে তখন বেদ বেদান্তের চর্চ্চা ছিল না। রামমোহন রায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিতগণ বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে তিনি যে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন পৌরাণিক, স্মার্ত্ত, ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় প্রতিপক্ষের সহিত তর্কের সময় কেমন সুকৌশলে তাহার নিজের কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন;—তাঁহার তর্কচাতুর্য্যে, তাঁহার প্রতিবাদী, তাহার আপনার ফাঁদে আপনি পড়িতেন। এক দিবস প্রাতঃকালে রামমোহন রায় তাঁহার মাণিকতলার ভবনে মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বসাইয়া মুখ ধৌত করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মধ্যে একজন দেখিলেন যে, রামমোহন রায় পূর্ব্ব দিবসের ব্যবহৃত দন্তকাষ্ঠে দন্তমার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অনাচার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তিনি রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিলেন। বলিলেন, "মহাশয়! এ আপনার কেমন ব্যবহার?" রামমোহন সে কথার বিশেষ কোন উত্তর করিলেন না। মুখপ্রক্ষালন করিয়া তিনি অধ্যাপক

মহাশয়দিগের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার করিতে করিতে উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে তামাক দিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য তামাক দিলে পর, রামমোহন রায় ভৃত্যকে বলিলেন, একটা ভাল করিয়া নল প্রস্তুত করিয়া দাও। যে ভট্টাচার্য্যটি পূর্ব্বদিনের উচ্ছিষ্ট দন্তকাষ্ঠে দন্তমার্জ্জন জন্য রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত নলসংযোগে ধূমপান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর, রামমোহন রায় তামাক দিবার জন্য পুনর্ব্বার ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যটি পুনর্ব্বার নলসংযোগে তাম্রকূট সেবন আরম্ভ করিলেন। তখন রামমোহন রায় উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন ; বলিলেন, "দেবতা! এ আপনার কেমন ব্যবহার? আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, নিজে কেন তাহার বিপরীত ব্যবহার করেন? যে দন্তকাষ্ঠ একবার উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করা যদি অনাচার ও অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যে নল একবার উচ্ছিষ্ট করিয়াছেন, কি বলিয়া তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করিতেছেন?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামমোহন রায়ের কৌশলে ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও নিরুত্তর হইলেন।

মেধাশক্তি বিষয়ে একটি গল্প

আমরা এস্থলে তাঁহার আশ্চর্য্য মেধাশক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি। একদা এক পণ্ডিত আসিয়া কোন একখানি তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায় দেখিলেন যে, তিনি কখনও উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। পণ্ডিতকে বলিলেন যে, আপনি আগামী কল্য ঠিক এই সময়ে আসিবেন, বিচার হইবে।

পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। রামমোহন রায়ের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল না। সুতরাং তৎক্ষণাৎ শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে পুস্তক লইয়া আসিলেন, এবং মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলেন। একবার অধ্যয়নমাত্র তাঁহার অসাধারণ মেধা উহা আয়ত্ত্বাধীন করিয়া লইল। তৎপরদিবস ঠিক সময়ে বিচারার্থী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। ঘোরতর বিচার হইল। পরিশেষে তিনি রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া গৃহপ্রস্থান করিলেন।

তর্কপ্রণালী বিষয়ে একটি গল্প

তাঁহার তর্কের প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। অতি সহজে বিপক্ষকে তাহার আপনার কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন।

রামমোহন রায়ের বাটীর প্রাঙ্গণে এক উদ্যান ছিল। এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া লইয়া যাইতেন। এক দিবস ব্রাহ্মণ আসিয়া একটা বৃক্ষের শাখায় উত্তরীয় রক্ষা করিয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে বাটীর কোন ব্যক্তি আমোদ করিবার জন্য সেখানি তথা হইতে অন্তরিত করিল। ব্রাহ্মণ কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া দেখেন যে, যথাস্থানে উত্তরীয় নাই। অনেক অন্বেষণেও উহা প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় তখন বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া সকল বুঝিতে পারিলেন ; বলিলেন, "দেবতা! (তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দেবতা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন) আপনি স্থির হউন, আপনার উত্তরীয় গিয়াছে, একখানা উত্তরীয় অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে রাজার ইঙ্গিতে উত্তরীয় আসিয়া উপস্থিত হইল। উত্তরীয়খানি ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন, "এই গ্রহণ করুন, কেমন

সন্তুষ্ট হইলেন তো?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার দ্রব্য আমি পাইলাম, তাহাতে আর সন্তুষ্ট কি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পুষ্পগুলি কাহার?" "কেন? দেবতার পুষ্প"। "দিবেন কাহাকে?" "দেবতাকে দিব।" তখন রাজা বলিলেন "তবে দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন কেন?" ব্রাহ্মণের মুখে আর কথা সরিল না।

খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের সহিত রামমোহন রায়ের বিচারের বিষয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। রামমোহন রায় মূল হিব্রু ও গ্রীক্ বাইবেল হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া, মার্সম্যান প্রভৃতি মহাপণ্ডিত খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগকে অবাক্ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে তাঁহারা কেমন পরাস্ত ও নিরুত্তর হইয়াছিলেন! ইণ্ডিয়া গেজেটের ইয়োরোপীয় সম্পাদক রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"We say distinguished, because he is so among his own people, by caste, rank, and respectability; and among all men he must ever be distinguished for his philanthropy, his great learning, and his intellectual ascendancy in general."

মার্সম্যান সাহেবের সহিত বিচার বিষয়ে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ;—

"It still further exhibited the acuteness of his mind, the logical power of his intellect, and the unrivalled good temper with which he could argue;" it roused up "a most gigantic combatant who, we are constrained to say, has not yet met with his match here."

খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয়শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য যেমন অসাধারণ, হিন্দু ও মুসলমানশাস্ত্র সম্বন্ধেও তদনুরূপ। রামমোহন রায় ভট্টাচার্য্যের নিকট মহা শাস্ত্রজ্ঞ, খ্রীষ্টিয়ান মিসনরীর নিকট Great Theologian (মহা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ), মৌলবিদিগের নিকট "জবরদস্ত মৌলবি" ছিলেন। পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় পারস্য ভাষায় 'তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন' নামক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত।

কেবল ইহাই নহে। রামমোহন রায় ভাষাবিৎ পণ্ডিতের নিকট বহুভাষাভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত; সাহিত্যশাস্ত্রের পণ্ডিতের নিকট শাব্দিক ও সাহিত্যজ্ঞ; দার্শনিকের নিকট দার্শনিক; রাজনীতিজ্ঞের নিকট রাজনীতিজ্ঞ; বিষয়ীর নিকট একজন সুতীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

রামমোহন রায়ের ভাষাজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা করিবার শক্তি বিষয়ে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। এস্থলে আর একটি গল্প বলিব। দাক্ষিণাত্য হইতে কোন ব্যক্তি তৎপ্রদেশীয় ভাষায় রামমোহন রায়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহা বুঝিতে পারিলেন না। কলিকাতাপ্রবাসী সেই প্রদেশের একটি লোককে ডাকাইয়া উহা পড়াইয়া লইলেন। পড়াইয়া লইয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, সেই ভাষা শিক্ষা করেন। সেই ব্যক্তির নিকটে, তিন মাসে ভাষাটি শিখিয়া ফেলিলেন। শিক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় স্বয়ং উত্তর লিখিয়াছিলেন।

ইংরেজী ভাষায় রামমোহন রায়ের কিরূপ অধিকার ছিল, অনেকেই তাহা বিশেষরূপে অবগত নহেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার জন্য এদেশীয় ও ইংলণ্ডীয় ইংরেজদিগের নিকটে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। কুমারী

কার্পেণ্টার বলিতেছেন যে, প্রকাশ্যপত্রে বা পুস্তকাকারে, ধর্ম্ম বা রাজনীতি বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিতে হইলে, তিনি সম্মুখস্থ কোন ব্যক্তিকে তাহা অনর্গল বলিয়া যাইতেন, উপস্থিত ব্যক্তি তাহা লিখিয়া লইতেন। কোন সুশিক্ষিত ইংরেজ তাহা একবারও দেখিয়া দিতেন না। অথচ কুমারী কার্পেণ্টার বলিতেছেন, উহা নির্দ্দোষ ইংরেজী হইত।

রাজা অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। তথাচ তিনি ইংরেজী ভাষায় আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বিলাতে গিয়া ইংরেজী ভাষায় যে সকল পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কোন ইংরেজের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; অথচ কেমন সুন্দর ইংরেজী লিখিয়াছেন। কি ভারতবর্ষে কি ইয়োরোপে, এই একটি তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, অনেক সময় তিনি বলিয়া যাইতেন, নিকটস্থ কোন ব্যক্তি লিখিতেন। যখন লণ্ডন নগরে হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, তখনও ঐরূপ করিতেন; লেখান হইয়া গেলে, শেষে কখন কখন কিছু কিছু সংশোধন করিতেন। ডাক্তার কার্পেণ্টারের লেখা হইতে আমরা এ বিষয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

Mr. Joseph Hare—his brother fully agreeing with him—assures me, that the Raja was constantly in the habit of dictating to those who were for the time acting as amanuenses, in phraseology requiring no improvement, whether for the press or for the formation of official documents—such verbal amendments only excepted, as his own careful revision supplied before the final completion of the manuscript: that he often had recourse to friends to write from his dictation; among others to himself and the members of his family: that it is his full conviction, that, from the day of the Rajah's arrival in this country, he stood in no need of any assistance except that of a mere *Mechanical* hand to write: and that he has often been struck—and recollects that he was particularly so at the time the Rajah was writing his 'Answers to the queries on the Judicial and Revenue Departments'—with his quick and correct diction, and his immediate perception of occasional errors when he came to revise the matter. These facts I and others have repeatedly heard from the Mr. Hares; and I rest with conviction upon them. It is happy for the Rajah's memory that he lived in the closest intimacy and confidence with friends who are able and willing to defend it, wherever truth and Justice require."

আমরা বলিয়াছি, রামমোহন রায় দার্শনিকদিগের মধ্যে একজন দার্শনিক ছিলেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্পেণ্টার প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে Philosopher বলিয়া প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে তাহা অবিদিত নাই। বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁহার বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বেদান্ত জ্ঞান ও বেদান্ত ব্যাখ্যার যার পর নাই প্রশংসা করিয়াছেন। বসু মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন

তাহার মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। ইংলণ্ডীয় দর্শনের প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের অধিক শ্রদ্ধা ছিল না।* কুমারী কার্পেণ্টারের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই ইংরেজদিগের নিকট রামমোহন রায় বলিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় দর্শনের সহিত তুলনা করিলে, ইংলণ্ডের দর্শন কিছুই নহে। বাস্তবিক, রামমোহন রায়ের সময়ে ইংলণ্ডীয় দর্শনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার অধিক শ্রদ্ধা না হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

রামমোহন রায় আইনজ্ঞদিগের মধ্যে আইনজ্ঞ। তাঁহার রচিত আইন সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল তাঁহার আইন বিষয়ক গভীর জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। রামমোহন রায়ের একটি স্মরণার্থ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, রামমোহন রায় আইন সম্বন্ধে যেরূপ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, ঐরূপ লিখিতে পারিলে, যে কোন ব্যবহারজীবের পক্ষে উহা সম্মান ও প্রশংসাপ্রদ হইত।

তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির কথা কি বলিব! একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত লোকও অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন।

তাঁহার সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি, অনেক জমিদার, বৈষয়িক বিষয়ে, তাঁহার নিকটে সৎপরামর্শ লাভ করিয়া উপকৃত হইতেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার সমাজে অর্থ-সাহায্য করিতেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের তাঁহারা কিছু বুঝিতেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু তাঁহার পরামর্শে তাঁহাদের বৈষয়িক উপকার হইত বলিয়া তাঁহারা তাঁহার সমাজে সাহায্যদান করিতেন।

আমরা বলিতেছি তিনি রাজনীতিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে হিতকর জ্ঞানপ্রচারের জন্য তিনি সংবাদপত্র প্রচার করেন। উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের চিফ্‌জস্‌টিস্‌ সার চার্লস্‌ গ্রে সাহেবের অন্যায় নিষ্পত্তির প্রতিবাদ করিয়া তিনি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। হিন্দুদিগের দায়াধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত, পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক পুস্তকে অখণ্ডনীয় যুক্তিসহকারে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাবাসী জমিদারদিগকে লইয়া অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমি সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, এবং উক্ত বিষয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তিপূর্ণ আবেদনপত্র স্বয়ং রচনা করিয়া গবর্ণর জেনারলের নিকটে প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডে গিয়া ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য পার্লেমেণ্টের কমিটির নিকট আপনার সাক্ষ্য প্রেরণ করেন ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করেন। পাঠকবর্গ ইহা সকলই অবগত হইয়াছেন।

রামমোহন রায় শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন। এ দেশের লোককে যাহাতে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্যজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে গবর্ণর জেনারলকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহা তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। তিনি হিন্দুকালেজের একজন সংস্থাপক। স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে তিনি ডফ্‌ সাহেবের বিশেষ সাহায্যকারী। তিনি একটি ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করিয়া, তাহার সমুদায় ব্যয়ভার নিজে বহন করিতেন।

* ২৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

তাঁহার বন্ধুগণের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি কোমল ও মধুর ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে সকলে চাপকান ও বাঁধা পাগড়ি পরিধানপূর্ব্বক আগমন করেন। তিনি মনে করিতেন যে, ব্রাহ্মসমাজ পরমেশ্বরের দরবার; সুতরাং সেখানে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসাই কর্ত্তব্য। কথিত আছে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় এক দিবস অফিস হইতে আসিয়া পুনর্ব্বার পোষাক পরিধান করিতে কষ্টবোধ হওয়ায়, ধুতি চাদরেই সমাজে আসিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং তেলিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি দ্বারকানাথ বাবুকে তদ্বিষয়ে কিছু বলেন। অন্নদাবাবু জানিতেন যে, রামমোহন রায়ের অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা, এবং সে জন্যই তিনি নিজে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন "মহাশয়ই কেন বলুন না?"

তিনি শিষ্যদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদিগকে "বেরাদার" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কেবল শিষ্যদিগকে কেন, প্রায় সকল লোককেই তিনি ঐরূপ স্নেহসম্ভাষণ করিতেন। অনেক সময় কোন আহ্লাদের কারণ উপস্থিত হইলে, প্রেমালিঙ্গন করিতেন। কোন শিষ্য তাঁহার কোন দুর্ব্বলতা দেখিয়া বিদ্রূপ বা তিরস্কার করিলে তিনি যার পর নাই উদারভাবে তাহা গ্রহণ করিতেন। তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাঁহার বাব্‌রী চুল ছিল; চুলগুলির প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন; প্রতিদিন স্নানের পর দর্পণের সম্মুখে কেশবিন্যাসে অনেক সময় নষ্ট হইত। তজ্জন্য একদিবস তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন "মহাশয়! 'কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে' এই গীতটি কি কেবল পরের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন?" রামমোহন রায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন "বেরাদার! ঠিক্ বলিয়াছ, ঠিক্ বলিয়াছ।"

বালক-বালিকাদিগকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। অনেক সময়ে তাহাদিগকে লইয়া আমোদ করিতেন। একজন ভক্তিভাজন প্রাচীন ব্যক্তি* বলেন যে, "তিনি বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে বয়স্যদিগের সহিত রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। বালকেরা আমোদ করিবে বলিয়া তিনি বাটীতে একটি দোল্‌না করিয়া রাখিয়াছিলেন। বালকেরা দোল্‌নায় দুলিত, তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে দোলাইতেন। কিয়ৎকাল এইরূপ দোল্ দিয়া বলিতেন "এখন আমার পালা"; এই বলিয়া নিজে দোল্‌নায় বসিতেন: সকল বালকে মিলিয়া মহা উল্লাসে তাঁহাকে দোলাইত। প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ শিশুর ন্যায় সরলতা কেমন সুন্দর!

এক দিবস রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত এইরূপ দোল্‌নায় দোল খাইতেছেন, এমন সময় কলিকাতার একজন বড় পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়া দেখেন এত বড় লোক হইয়াও রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত দোল্‌নায় দুলিতেছেন! অভ্যাগত পণ্ডিত, রামমোহন রায়কে বলিলেন, "একি মহাশয়? এ কি করিতেছেন?" রামমোহন রায়ের অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল: বলিলেন, 'মহাশয়, ইহাতে আমার ভবিষ্যতে উপকার হইবে।' পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনার কি উপকার হইবে? রামমোহন রায় উত্তর করিলেন, "আমার বিলাত যাইবার

*মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইচ্ছা আছে ; সমুদ্রে বাতাস হইলে জাহাজ অত্যন্ত আন্দোলিত হয় ; সেই আন্দোলনে আরোহীদিগের সমুদ্রপীড়া (Sea-sickness) বলিয়া এক প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়। এইরূপ দোলনায় দোলায়মান হওয়া অভ্যাস থাকিলে উক্ত সমুদ্রপীড়া হওয়ার সম্ভাবনা অল্প।”

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি চমৎকার ছিল। স্ত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় বলেন যে, তিনি যখন বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন স্ত্রীলোককে তিনি তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিতে দিতেন না। হয়, স্ত্রীলোকটিকে বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। পাঠকবর্গ অবগত তিব্বত দেশে স্ত্রীজাতির দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সেই অবধি স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কি ভারতবর্ষ, কি তিব্বতদেশে, কি ইংলণ্ডে, বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে তিনি চিরদিন স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন! সতীদাহ নিবারণের জন্য তিনি কি না করিয়াছিলেন? কেবল রাশি রাশি পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া, ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ করিয়া, দেশে বিদেশে বিতরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সতীর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে গিয়া অবমানিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার ভৃত্য অপমানকারীর প্রতি রাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই!

বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রামমোহন রায় কি করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। দুঃখিনী ভারত রমণীর জন্য রামমোহন রায়ের সুকোমল হৃদয় সর্ব্বদাই ক্রন্দন করিত। পাঠকবর্গ জানেন যে, তিনি তাঁহার সতীদাহবিষয়ক একখানি পুস্তকে কেমন কাতরভাবে, উজ্জ্বল বিশদভাষায় এদেশীয় রমণীগণের দুঃখ দুর্গতি বর্ণনা করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে বোধ হয় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়, পাষাণ চক্ষেও জল আসে।

রামমোহন রায় চিরদিনই বহুবিবাহের অতিশয় বিরোধী ছিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের বিবাহের সম্বন্ধের সময়, তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য প্রতারণা করিয়া একটি সুন্দরী বালিকাকে দেখাইয়াছিলেন। নন্দকিশোর সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া বিবাহে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের সময় একটি কৃষ্ণ-বর্ণা বালিকাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। নন্দকিশোর, সেই জন্য, শ্বশুরের প্রতিহিংসা করিবার অভিপ্রায়ে, নিজে মনোনীত করিয়া আর একটি বিবাহ করিবেন, মনে করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে এরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এরূপ বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ;—যে বৃক্ষ উত্তম ফল প্রসব করে, তাহাই সুন্দর বৃক্ষ। সেইরূপ তোমার স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও যদি তিনি সৎপুত্র প্রসব করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে অবশ্য সুন্দরী বলিতে হইবে। বিধাতার ইচ্ছায় এমনই সংঘটিত হইয়াছে যে, নন্দকিশোর বসুর সেই স্ত্রীর গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমাজসংস্কার কার্য্যে রাজনারায়ণ বাবু যেরূপ জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ আর একজন করিয়াছেন?

গরিব দুঃখীর প্রতি রামমোহন রায়ের যার পর নাই সহানুভূতি ও দয়া ছিল। দুঃখীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ক্রন্দন করিত। দুঃখী লোকের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তিনি কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহার নিবাসগ্রামে তাঁহার একটি বাজার ছিল। যে সকল ব্যাপারীরা বাজারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র

রাধাপ্রসাদ তাহাদিগের নিকট হইতে তোলা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ তোলা গ্রহণ করিবার নিয়ম সর্ব্বত্রই আছে এবং উহা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। তথাচ ইহাতে ব্যাপারীরা বড়ই কষ্টবোধ করিতে লাগিল। এক সময় রামমোহন রায় তথায় গমন করিলে, তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আহবান করিলেন, এবং তাহার মুখে ঘটনাটির বিষয় শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাতপূর্ব্বক বলিলেন, "হা পরমেশ্বর! এই সকল দুঃখীলোক সামান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উদরান্নের সংস্থাপন করে, ইহাদের উপরেও অত্যাচার!" রাধা-প্রসাদ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সেইদিন অবধি তোলা গ্রহণ করা বন্ধ হইল।

দুঃখীলোকদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে প্রকাশ পাইত। একদিবস তিনি চোগা চাপকান প্রভৃতি পোষাক পরিধান করিয়া বহুবাজারে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; এমন সময় দেখিলেন যে, একজন তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া আর উহা তুলিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া মোটটি তাহার মস্তকে তুলিয়া দিলেন।

হরিনাভি নিবাসী পরলোকগত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি একদিবস দেখিলেন যে, রাজা রামমোহন রায় একজন মুটিয়ার সহিত বসিয়া কথা-বার্ত্তা বলিতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মুটিয়ার সহিত বসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া শিরোমণি ময়াশয় আশ্চর্য্য হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া শুনিলেন, রাজা মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কলিকাতা নগরে সর্ব্ব-শুদ্ধ কত মুটিয়া আছে। তিনি মুটিয়াদিগের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সকল তাহার নিকট অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইতেছিলেন।

একজন দরিদ্র ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিতেন। উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে তিনি কয়েক দিবস তাঁহার নিকটে আসিতে পারেন নাই শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আপনি জানিবেন যে, আমি কখন পোষাক দেখিয়া মানুষ চিনি না।"

কোন প্রকার নির্দ্দয় কার্য্য দেখিলে তিনি যার পর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। রামসুন্দর নামে তাঁহার এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, সে এক দিবস মাংস রন্ধন করিবে বলিয়া বঁটী দিয়া একটি ছাগল কাটিতেছিল! রামমোহন রায় ছাগের চীৎকার শুনিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন এবং এই নির্দ্দয় কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত যষ্টিহস্তে রন্ধনশালার দিকে চলিলেন। রামসুন্দর দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। রামমোহন রায় তাহার পাঁচ টাকা অর্থদন্ড করিলেন ; এবং বলিলেন যে, "আমি মাংস ভোজন করি বলিয়া এপ্রকার জীবহিংসা করা অতি মূঢ়ের কর্ম্ম।"

আজ কাল দেখিতে পাই যে, এককাঠা জমির অধিকারীও আপনাকে জমিদার বলিয়া অহঙ্কার করেন এবং দুঃখী প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারের পক্ষসমর্থন করিতে উৎসাহী হন। রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। তিনি জমিদারের পুত্র ; নিজে জমিদার ; তাঁহার সাহায্যকারী বন্ধুগণ অনেকেই প্রধান প্রধান জমিদার,—বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির কালীনাথ রায়, তেলেনীপাড়ার অন্নদা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই বড় বড় জমিদার ;—অথচ রামমোহন রায়, কি ভারতবর্ষে, কি ইংলণ্ডে, চিরদিন দুঃখী প্রজাগণের পক্ষপাতী। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, পার্লেমেণ্টের কমিটির নিকট তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে, ভারতের দুঃখী প্রজার পক্ষ হইয়া, রামমোহন রায় কিরূপ সুযুক্তিপূর্ণ কথা সকল লিখিয়া পাঠাইয়া-

ছিলেন ;—যাহাতে প্রজার দুঃখ দূর হয়, যাহাতে আর তাহাদিগকে করভারে বিপন্ন হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় প্রাণগত যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ড বাসকালে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ লিখিতেছেন ;—"With besech-ing any and every authority to devise some mode of alleviating the present miseries of the agricultural peasantry of India, and thus discharge their duty to their fellow-creatures and fellow-subjects."

রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়, একটি গ্রাম, একটি নগর বা একটি দেশে বদ্ধ ছিল না। তাঁহার বিশ্বজনীন হৃদয়, সমগ্র পৃথিবীর সকল জাতির সুখে দুঃখে, উন্নতি অবনতিতে সহানুভূতি অনুভব করিত। কোথায় স্পেন্ দেশে নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, রামমোহন রায় তজ্জন্য আনন্দ করিয়া কলিকাতার টাউন হলে ভোজ দিলেন! কোথায় নেপল্‌স্ দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে, স্বাধীনতাপক্ষ পরাজিত হইতে লাগিলেন, রামমোহন রায় কলিকাতায় বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত দেখা করিতে পারিলেন না! কেমন আগ্রহের সহিত তিনি ফরাসীবিপ্লবের সংবাদ লইতেন! গ্রীস দেশের সহিত তুরস্কের সংগ্রামের সময়ে গ্রীসবাসীদিগের প্রতি তিনি কেমন প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন! বিলাত যাইবার সময়ে সমুদ্রে একখানি ফরাসী জাহাজের স্বাধীনতার পতাকাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে অভিবাদন করিতে গিয়া তাঁহার চরণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের যেমন পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি, তেমনই ধর্ম্মভাব ছিল। সমাজে বিষ্ণু যখন গান করিতেন, তাঁহার গণ্ডদেশ ধৌত করিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। তাঁহার সম্মুখে কেহ একটি সদ্ভাবের কথা বলিলে বা সুসংগীত গান করিলে, তিনি ভাবপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন।

উপাসনা রাজার চিরসংগী ছিল। যখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তখনও মনে মনে উপাসনা করিতেন, যখন কোথাও যাইতেন, পথে যাইতে যাইতে উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইংলণ্ডে যখন তিনি হেয়ার সাহেবের ভ্রাতৃগণের বাটীতে বাস করিতেন, তখন কুমারী হেয়ার সর্ব্বদা তাঁহার ভাব দেখিয়া বিবি এস্‌লিনকে তদ্বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, বিবি এস্‌লিন তাহা এইরূপে লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"He was also in a constant habit of prayer, and was not inter-rupted in this by her presence; whether sitting or riding he was frequently in prayer. He told Miss H. that whenever an evil thought entered into his mind he prayed. She said "I do not believe you ever have an evil thought." He answered, "Oh yes, we are all liable to evil thoughts."

নিষ্ঠা ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। ষোড়শবর্ষ হইতে ঊনষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এক দিনের জন্যও বিচলিত হইল না। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্মের যে জয়পতাকা তিনি বাল্যকালে ধারণ করিয়াছিলেন ; সুখে, দুঃখে সম্পদে বিপদে, রোগে সুস্থতায়, দেশে বিদেশে, বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত চিরদিন তাহা বহন করিয়াছিলেন। নাস্তিকতা ও সংশয়-বাদকে তিনি অতিশয় ভয় করিতেন। পৌত্তলিকতা অপেক্ষা নাস্তিকতাকে বহুল পরিমাণে অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতার কতকগুলি ভদ্র-লোক নাস্তিক ও সংশয়বাদী হইয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করিতেন। নাস্তিকতাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, ধর্ম্ম যে

একান্ত আবশ্যক, ইহা তাঁহার হৃদ্‌গত বিশ্বাস ছিল; সুতরাং নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাবে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়! অমুক পূর্ব্বে Deist (একেশ্বরবাদী) ছিলেন, এখন Atheist (নাস্তিক) হইয়াছেন।" তিনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আর কিছুদিন পরে Beast (পশু) হইবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে সংশয় প্রকাশপূর্ব্বক তর্ক করিতেন বলিয়া, রামমোহন রায় তাঁহাকে Country Philosopher বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার নিষ্ঠা, দৃঢ়তা অসামান্য, তাঁহার হিতৈষী বন্ধুগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন যে, তিনি উপযুক্ত প্রহরী সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। তাঁহার প্রতি অনেক পৌত্তলিকের যেরূপ বিষম বিদ্বেষভাব, কোন সময়ে তাঁহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিতে পারে। রামমোহন রায় আত্মরক্ষার জন্য পোষাকের মধ্যে একখানি কিরিচ রাখিয়া অকুতোভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতেন—কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না।

এক দিকে লোকের অত্যাচার, অপর দিকে অর্থকষ্ট; রামমোহন রায় সত্যের অটল ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া অবিচলিত চিত্তে সকলই সহ্য করিয়াছিলেন। নিষ্ঠা ও নির্ভীকতা তাঁহার চরিত্রে হিরণ্ময় অক্ষরে চিরদিন লিখিত ছিল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া অবধি ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার প্রভৃতি যে সকল মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। স্কুল সংস্থাপন করিয়া তাহা নিজ-ব্যয়ে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় বহুসংখ্যক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে কে তাঁহার পুস্তক মূল্য দিয়া ক্রয় করিবে? সুতরাং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিতরণ করিলেন। কেবল একবার নয়, এক একখানি পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ এইরূপে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইত।

অন্যান্য কারণেও তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। আড্যাম সাহেব ট্রিনিটেরিয়ান খৃীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ইউনিটেরিয়ান মত অবলম্বন করাতে তিনি একেবারে জীবিকা-চ্যুত হইয়া পড়েন। রামমোহন রায় তাঁহার কষ্টনিবারণ ও ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিবার জন্য বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য করিতেন। এতদ্ভিন্ন, অনাথ দুঃখীদিগের সাহায্যের জন্যও তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন; সুতরাং অর্থের অত্যন্ত অসচ্ছলতা হইয়াছিল; এমন কি প্রয়োজনীয় সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়াও সুকঠিন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিতেছেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল; তাঁর ধন গেল, সমুদায় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী পর্য্যন্ত হইয়া জীবন-পোষণ করিতে হইয়াছে।"

এখানে যেমন পরিশ্রম ও অর্থাভাব, ইংলণ্ডে তাহা আরও অনেক পরিমাণে অধিক হইয়াছিল। তথায় ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে অহোরাত্র ব্যস্ত থাকিতে হইত। যাহাতে প্রিভিকৌন্‌সিলে সতীদাহ নিবারণ বিষয়ক গবর্ণমেণ্টের আদেশ রহিত করিবার জন্য ধর্ম্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য হয়,* যাহাতে ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য সুব্যবস্থা সকল প্রচলিত হয়, যাহাতে ইংলণ্ডীয় ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান লোকের চিত্ত ভারতের

* যখন প্রিভিকৌন্‌সিলে ধর্ম্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া রায় দেওয়া হইয়াছিল, তখন রাজা রামমোহন রায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার কত আনন্দ হইয়াছিল।

কল্যাণসাধনে আকৃষ্ট হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন। বড় লোকদিগের সহিত দেখা করা, তাঁহাদিগকে এদেশের বিবিধ জটিল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া, নানাস্থানে রাশি রাশি পত্র লেখা ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। যত সবল ও সুস্থ হউক না কেন, মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়? তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার পীড়ার আর একটি কারণ ছিল। সংস্কৃত কলেজসংস্থাপক শ্রীযুক্ত উইল্‌সন্‌ সাহেব বলেন যে, ইংলণ্ডে তাঁহার অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছিল। দিল্লির বাদসাহের নিকট হইতে অথবা তাঁহার বাটী হইতে কিছুমাত্র অর্থ প্রেরিত হইত না; সুতরাং তাঁহাকে ক্রমাগত ঋণ করিতে হইতেছিল। কেমন করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন, তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছিলেন না। একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়, এমন কি, আহারাদি নির্ব্বাহ হওয়াও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। উইল্‌সন্‌ সাহেব বলেন, এই অর্থাভাবজনিত দুর্ভাবনা তাঁহার রোগের একটি কারণ। তিনি ভারতের জন্য প্রাণগত পরিশ্রম করিয়া, ভারতের জন্য দুঃসহ দরিদ্রতা সহ্য করিয়া, প্রাণ হারাইলেন! তাঁহার এই স্বার্থত্যাগ ও মহত্ত্ব ভারত একদিন বুঝিবে কি?

রামমোহন রায় পুরুষকারের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি যখন বিলাত গমন করেন, তখন তাঁহার পুত্র রমাপ্রসাদ "বাবা কোথা যাও" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রের ক্রন্দনে রামমোহন রায় অটল! গম্ভীরভাবে, তেজের সহিত, বলিলেন 'পুরুষবাচ্ছা! কাঁদ কেন?'

রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনভাব অতিশয় ভালবাসিতেন। নীচতা ও ক্ষুদ্রতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আড্যাম সাহেব তাঁহার বিষয়ে বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, রামমোহন রায় একবার কলিকাতায় বিসপ মিডিলটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিসপ তাঁহাকে ক্ষমতা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির কথা বলিয়া, তাঁহাকে সাংসারিক প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক খৃষ্টিয়ান হইতে অনুরোধ করায় তিনি এত দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন,—বিসপের প্রতি তাঁহার এতদূর অশ্রদ্ধা হইয়াছিল যে, তিনি আর জীবনে কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে কোমলতা ও কঠিনতা;—বজ্র ও পুষ্প একত্রে জড়িত থাকে। রামমোহন রায়ের চরিত্রে তাহাই ছিল। তাঁহার আশ্চর্য্য অটলভাব বিষয়ে আমরা আর একটি গল্প বলিব। কলিকাতার সান্‌কি ভাঙ্গার ভবানীচরণ দত্ত* এবং কলুটোলার নীলমণি কেরাণী, রামমোহন রায়ের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মনে করিলেন যে, রামমোহন রায় কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তিনি শোকে তাপে অধীর হন কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ কৃষ্ণনগরে কর্ম্ম করিতেন। ভবানী ও নীলমণি উভয়ে মিলিয়া রাধাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদসম্বলিত একখানি জাল পত্র রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সে সময় ডাক ছিল না। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে কাসিদ অর্থাৎ একপ্রকার হরকরার দ্বারা পত্রাদি প্রেরণ করা হইত। ভবানীচরণ ও নীলমণি একটি লোককে কাসিদ সাজাইয়া তাহাকে রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি সেই জাল চিঠি লইয়া রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পত্রখানি রামমোহন রায়ের হস্তে দিয়া

* ইহাঁর নামে কলিকাতায় একটি গলি আছে।

বলিল, আমি কৃষ্ণনগর হইতে আসিতেছি। রামমোহন রায় পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণ ও নীলমণি পূর্ব্বে আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন। পত্র পাঠ করিয়া রামমোহন রায়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রাম-মোহন রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে কার্য্য করিতেছিলেন তাহাতে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন। ভবানীচরণ ও নীলমণি দৃঢ়তা ও অটল ভাবের এই অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবাক্ হইলেন, একেবারে তাঁহার চরণের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

রামমোহন রায় কি? রামমোহন রায় মহাপণ্ডিত, রামমোহন রায় দার্শনিক, রাম-মোহন রায় ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ,—যাহা কেন বলনা, এরূপ কোন কথাতেই তাঁহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ হয় না। এ দেশে, এ জাতির সম্বন্ধে তাঁহার জীবনে যিনি বিধাতার হস্ত দর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রকৃতভাবে দেখেন। রামমোহন রায় বিধাতার হস্তের যন্ত্র। রাম-মোহন রায় হইতে এ দেশে নবযুগের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে, এ দেশের উন্নতির সকল দ্বার তিনিই উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, ইংরেজী শিক্ষা প্রচার, সতীদাহনিবারণ, বহুবিবাহনিবারণ চেষ্টা, সকলেরই মূলে তিনি। তাঁহারই জীবনক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ভারতের সর্ব্বাধিক কল্যাণের স্রোত বিধাতা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজীশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজ একই সময়ে আরম্ভ হইয়াছে। রামমোহন রায় উভয়েরই মূলে। ইংরেজীশিক্ষা, জঙ্গল উৎপাটিত করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ বীজ বপন করিতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের তেজস্বিনী লেখনীবিনিশ্রিত কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম।

"ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞান-রূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময়-পঙ্কিল-ভূমি-পরিবেষ্টিত একটি অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য-পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতি-ধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয়সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ীস্বরূপে রণ-দুর্ম্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তর-কালীন সুমার্জ্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত সম্পদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়-ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু

বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।

"একদিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করিয়া জন্মভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপরদিকে সংকটময় সুগভীর সমুদ্রসমূহ উত্তরণপূর্ব্বক বৃটিস্ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানাবিষয়ে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কান্ড! কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলন্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপন্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকারসম্বলিত এরূপ একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ বা নিউটন্ ধরণী-মন্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু! কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ, অবনীমন্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল, বোধ হয় না।

"সহমরণনিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের পদোন্নতিসাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছে! না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্দ্ধভূমন্ডল অতিক্রম করিতে কৃত-সংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূরস্থিত ভূখন্ডবাসী সুপ্রতিষ্ঠ সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মনে মনে কতই শুভ সংকল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়া-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না।—বৃষ্টল!—বৃষ্টল! তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদফলরাশি উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোকসামান্য বৃক্ষ-মূলে সাংঘাতিক কুঠারপ্রহার করিয়াছ!

"সেই বিপদের দিন কি ভয়ংকর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারতরাজ্যের কল্যাণ-শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজীৎশূন্য শিক্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ! দুঃখজীবী কৃষিজীবীগণ! যে সময় তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রুনয়নে অত্যপকৃষ্ট তন্ডুল গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময় যিনি ঐ দুঃসহ দুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, এবং তজ্জন্য বৃটিস্ রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন, সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয়লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ। ভারতবর্ষীয় চিরনিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখবিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতিসাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান সংকল্প ছিল, এবং যে হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের লোক-সন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রু-বারি সমস্তই নিবারণপূর্ব্বক ভারতমন্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান,

সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারাইয়াছ! বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারতভূমি! যে আশা নরলোকের জীবনস্বরূপ, সেইদিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে!!

"পূর্ব্বতন লোকসম্বাদ নবীভূত হইয়া উঠিল। অশ্রু-জল নিবারণে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। এসময়ে বিষয়ান্তর স্মরণ করিয়া উহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। একটি প্রবোধের বিষয়ও আছে। আমাদের রাজা একেবারে নির্ব্বাণ হইবার বস্তু নন। তিনি ভূলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তথাচ চিরাবলম্বিত হিত-ব্রত উদ্যাপন করিয়া যান নাই। তদীয় সমাধিক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোৎসাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ সংকল্প সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে! অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎ-কালের সদভিপ্রায়-বলে ও নিজ চরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। কেবল আমাদের নয়, ইয়োরোপ আমেরিকাও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

"তিনি জীবদ্দশায় স্বদেশীয় লোককর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, উত্তরকালীন লোক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাঁহার তাদৃশ কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলন্ডভূমিতে গমন করেন, তাই তাঁহার একটি রীতিমত সমাধিমন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল ভারতবর্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় প্রতিরূপাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বেণ্টিংক্ মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন-চরিত সংকলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম!

"আনুষঙ্গিক কথা-প্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু প্রিয়তম পাঠকগণ! যিনি ভারতভূমির দুঃখহরণ ও শুভসাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন, "মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা" এই মহার্থবোধক পরম পবিত্র পার্সিক বচনটি যিনি সতত আবৃত্তি করিয়া নিজ চরিতে নিরন্তর সম্যক্‌রূপে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতা গুণের একত্র সংযোগ, ভূমন্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় না; যিনি একাধারে সেইরূপ ঐ সমস্ত গুণ ধারণপূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, এবং ভূস্বর্গ সমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা, ভক্তিপূর্ব্বক যে অসামান্য পুরুষের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহার গুণবর্ণন ও মহিমাকীর্ত্তন করে, যাঁহার সর্ব্ব-শুভকর উদারচরিত্র আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণের সহিত তাহার অনুকরণ প্রার্থনা করে, এবং এক সময়ে যাঁহার সহিত সহবাস ও সদালাপ বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া তল্লাভার্থে যার পর নাই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, ও পরে যাঁহার অসদ্ভাবে শোকাকুল হইয়া দুঃসহ ক্লেশানুভবপূর্ব্বক বিলাপ ও ক্রন্দন করে, উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহারই পুণ্য-প্রসঙ্গ বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিও।

"এটি যদি একটি খ্যাতাপন্ন ইংরাজের নিৰ্ম্মাণের সংকল্প হইত, তাহা হইলে, কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব, কত রাজ্য-শূন্য রাজোপাধিকের রাজস্ব-ভাগ, কত -পদের বেতন-মুদ্রা, কত বাণিজ্য-লাভাংশ ও কত কত অন্যতম স্বাধীন বৃত্তির আয়উঙ নপুস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশিকৃত হইয়া কার্য্যসাধন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই স্মরণচিহ্ন-সংস্থাপনার্থ যদি একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ উদ্‌যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন্‌কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভপ্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদায় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত। আমাদিগকে ধিক্‌!—শত ধিক্‌! সহস্রবার ধিক্‌! এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও হিন্দুজাতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে! যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, তখন এরূপ ধিক্কার উচ্চারণ ও আৰ্ত্তনাদ প্রকাশ করা শোভা পায় না। কিন্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও জ্বলন্ত দাবানলের সুদীর্ঘশিখাসমুদ্গম কে নিবারণ করিতে পারে? প্রচুর বারিবর্ষণ না হইলে, দাবানল আপন আধারকে ভস্মীভূত না করিয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দূরে থাকুক, চেষ্টা দূরে থাকুক, বাক্যস্ফুরণেরও শক্তি নাই! পূৰ্ব্বোক্ত পংক্তিগুলি আমার চিতা-ভস্মের অন্তর্গত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয়। তাহাতে কুত্রাপি কিছু উৎসাহানল উদ্দীপন করিলে সৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল, ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত হইল; কিন্তু তালপত্রের অগ্নি, প্রদীপ্ত হইয়াই নিৰ্ব্বাণ হইয়া গেল! সকলই আক্ষেপের বিষয়! মনস্তাপ! মনস্তাপ! মনস্তাপ! অনেকে শৃগালপ্রতিমা নিৰ্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহপ্রতিমূর্ত্তিদর্শনে অনুরাগী ও উৎযোগী হইবেন না। এদেশের মানবপ্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে!—ও ইয়োরোপ! ও আমেরিকা! একবার এদিকে নেত্রপাত কর! যদি রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়বর্গের কতদূর অধঃপাত ঘটিতে পারে দেখিতে চাও, তবে আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর! উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপে নীচাশয় হয় ও মনুষ্যদেহ কিরূপে অমানুষের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর। পৰ্ব্বত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয় ও জ্বলন্ত কাষ্ঠ কিরূপে ভস্মরাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই বৰ্ত্তমান অকৃতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর!!!"

ষোড়শ অধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত

শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ

প্রচারার্থ অবলম্বিত ভাষা

আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তাঁহার মতামত বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, ধর্ম্মপ্রচারার্থ রাজার অবলম্বিত ভাষা সম্বন্ধে অনুষঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

ধর্ম্মপ্রচারে রাজা কি ভাষা প্রথম অবলম্বন করেন? মার্টিন লুথার যেমন লাটিন ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক জার্ম্মান ভাষায় (Modern High German) বাইবেল গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তিনি যেমন দেশের প্রচলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্কার সম্পন্ন করেন, রাজা রামমোহন রায়ও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্ত শাস্ত্র অনুবাদ করেন, এবং সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রচলিত ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, স্থির করেন। কি ভাষা প্রথমে অবলম্বন করেন, তদ্বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। ষোড়শ বৎসর বয়সে পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া ও একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হস্তলিপি মাত্র,—মুদ্রিত হয় নাই। বোধ হয়, তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থ লিখিত নহে। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের মধ্যে, স্বমতপ্রকাশ ও বিচারের জন্যই লিখিত। উক্ত পুস্তক সম্ভবতঃ বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত হইয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে, বোধ হয়, সংস্কৃত শ্লোকও ছিল। উহা যে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই, তাহা রাজার বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যার অনুষ্ঠানপত্রে আভাস পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানপত্রে বাঙ্গালা গদ্যপাঠের যেরূপ নিয়মাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রাজার বেদান্তভাষ্যই প্রথমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

রংপুরে থাকিতে রাজা শাস্ত্রীয় বিচার করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকও লিখিতেন। সে সময়ে বাঙ্গালা গদ্যে পুস্তক রচনার প্রথা ছিল না;—লিখিলে লোকে বুঝিতেও পারিত না। সে সময়ে আদালতের দলিলাদি সচরাচর পারস্যভাষায় লিখিত হইত। শিক্ষিত লোকেরা অনেকেই পারস্যভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও মুসলমান-রাজশাসনকালের ন্যায়, পারস্য রাজভাষা ছিল না, তথাচ পারস্যভাষার চর্চ্চা অনেক পরিমাণে প্রবল ছিল। বিশেষতঃ আদালতে পারস্য ভাষার ব্যবহার ছিল। রংপুর তখন একটি মুসলমানপ্রধান স্থান। মুসলমানদের সহিত রাজার আত্মীয়তা ছিল। রাজা মুসলমান শাস্ত্রাদির চর্চ্চা করিতেন। মৌলবীদের সহিত মুসলমানশাস্ত্র বিষয়ে বিচার করিতেন। মৌলবীরা তাঁহাকে 'জবরদস্ত মৌলবী' বলিতেন। রংপুরে অবস্থিতিকালে তিনি যে পারস্যভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতক লিখিয়াছিলেন, 'জ্ঞানাঞ্জন' নামক পুস্তকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সেখানে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিতও বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেদান্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যে, 'জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, রাজা বাঙ্গালা গদ্যেই বেদান্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত রাজার ইংরেজি গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পৃষ্ঠাতেও এ কথা লিখিত আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, রাজা একেশ্বরবাদ প্রচারার্থ প্রথমে পারস্য ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা গদ্যে বেদান্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার কোন প্রচলিত প্রণালী ছিল না বলিয়া মৌলিক (Original) পুস্তক বাঙ্গালা গদ্যে লেখেন নাই। কেবল কোনপ্রকারে সামান্য অনুবাদকার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে, সামান্য বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই।

'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' প্রকাশ

রংপুর কিম্বা মুরসিদাবাদে রাজা 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' নামক পুস্তক পারস্য ভাষায় রচনা করিয়া প্রচার করেন। এই পুস্তকে রাজা তাঁহার পূর্ব্বলিখিত একখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিস্তৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। উহাও পারস্য ভাষায় লিখিত। এই পুস্তকখানির নাম 'মনাজারাতুল আদিয়ান'। এই নামটির অর্থ বিবিধ ধর্ম্মের বিচার। ঐ পুস্তকখানি 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীনে'র কিছু পূর্ব্বে কিম্বা একই সময়ে রচিত হইয়াছিল। ইহা বিলক্ষণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, এই মনাজারাতুল নামক পুস্তক রাজা রংপুরে অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকে রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষযুক্তিবাদ (Rationalism) এবং একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তহ্‌ফাতুল পুস্তকেও তাহাই করিয়াছেন। মনাজারাতুল পুস্তকখানি এখন পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে বড়ই আহ্লাদের বিষয় হইত। উক্ত পুস্তকে বিবিধ ধর্ম্মের সমালোচনা কিরূপভাবে করিয়াছিলেন, জানিতে পারা যাইত। জগতে প্রচলিত বিবিধ ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া তাহা হইতে সাধারণ তত্ত্ব রাজাই প্রথমে প্রকাশ করেন। উক্ত মনাজারাতুল পুস্তক যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে উহাতে রাজা বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর সমালোচনা করিয়া কোন সাধারণ ধর্ম্ম-তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন কি না, জানা যাইতে পারিত। উক্ত পুস্তকের নামদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, উহা কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। বোধ হয়, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম-সাহেবের অনুকরণে রাজা উহা কথোপকথনচ্ছলে লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তক যাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। রাজা নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' তিনি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লিখিবার ভঙ্গিতে ইহাও বোধ হয় যে, মনাজারাতুল পুস্তক কখনও মুদ্রিত করেন নাই। হস্তপ্রতিলিপি হইয়া উহা প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র।

প্রচারার্থ বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বন

যখন রাজা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন, এবং জীবনের মহাব্রত বলিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রচারে ব্রতী হইলেন, তখন তিনি পারস্য ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বন করিলেন। বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিবার অনেক কারণ ছিল। প্রথম, কলিকাতা হিন্দুপ্রধান স্থান। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করাই সুবিধা। দ্বিতীয়, তখন মুসলমানদিগের আধিপত্য

চলিয়া গিয়াছে। পারস্য ভাষা শিক্ষা করা হ্রাস হইয়া আসিতেছিল; ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হইতেছিল; সুতরাং রাজা বাঙ্গালা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তৃতীয়, কেরী, ওয়ার্ড প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ান মিসনরীগণ কিছু-কাল পূর্ব্বে হইতে বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত রাজার বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বনের একটি কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তের কোন কোন অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু পারস্য ভাষাই প্রধান অবলম্বন ছিল। এক্ষণে খ্রীষ্টিয়ান মিসনরীদিগের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাকেই প্রধান অবলম্বন করিলেন।

খ্রীষ্টিয়ান মিসনরীদিগের নিকটে তিনি যে বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন, এমন নহে। মিসনরীদিগের অনেক পূর্ব্বে ষোড়শ বৎসর বয়সে, বোধ হয় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে বাঙ্গালা গদ্য লিখিয়াছিলেন। রংপুরে কোন প্রকার সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়াও তিনি বেদান্তাদির বাঙ্গালা গদ্য অনুবাদ এবং বোধ হয় কিছু কিছু বাঙ্গালা বিচারগ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ী-কান্ত ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা গদ্য অবলম্বনে তাঁহার প্রবন্ধের উত্তর দিতেন।

যে সময়ে তিনি 'তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থ লেখেন, সে সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের কিরূপ অবস্থা ছিল, আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। ইংরেজি শিক্ষা করিবার অনেক পূর্ব্বেই রাজা বেদান্ত পাঠদ্বারা পৌত্তলিকতার অসারতা বুঝিতে পারেন এবং একেশ্বরবাদে উপনীত হন। কোরান ও মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠেও রাজার মনে একেশ্বরবাদ দৃঢ়ীকৃত হয়। যদিও এই সমস্ত উপায়ে রাজার মনে ধর্ম্মভাব বিশুদ্ধ ও সরল আকার ধারণ করিয়া একেশ্বরবাদে, পরিণত হইয়াছিল, যদিও তিনি বহুদেবোপাসনা ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাচ বেদান্ত ও কোরানে এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা অলৌকিক প্রত্যাদেশ, ও অনৈসর্গিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস এবং অন্যান্য কুসংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্র যে মনুষ্যের রচিত, ঈশ্বরের আদেশ নহে, ধর্ম্মযাজকেরা যে মনুষ্যের উন্নতিপথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস যে ভ্রান্তিমাত্র, ইহা বুঝিতে পারা কেবল বেদান্তাদি শাস্ত্রপাঠে হয় না। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার উচ্ছেদ করিয়া, ঐতিহাসিক ও অলৌকিক অভ্রান্ত শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র প্রকৃতি বা ব্রহ্মাণ্ডগ্রন্থ পাঠ করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানোপার্জ্জন, এবং মনুষ্যজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উন্নতিচেষ্টাই যে ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃষ্ট উপায়, এই সকল ভাব ও মত রাজা বেদান্তশাস্ত্র, কোরান কিম্বা অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হন নাই। আরবদেশীয় মতাজল এবং মওয়াহিদ্দীন সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ সকল, এবং ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিমূলক গ্রন্থসকলে রাজা এই সকল মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ইহা তাঁহার একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন। তিনি এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া এবং ইয়োরোপের মধ্যযুগের কুসংস্কার শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতার আলোকে উপনীত হইলেন।

বর্ত্তমান যুগের মূলমন্ত্র

মানবের মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। শাস্ত্র, জনশ্রুতি, দেশাচার এবং কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবের মুক্তি, ইহাই বর্ত্তমান যুগের মূলমন্ত্র। মানুষ এখন

সাবালক হইয়া আত্মরক্ষা এবং আত্মাবলম্বন করিতে শিখিয়াছে। এই মূলমন্ত্র, এই মোহিনী শক্তি, ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকের মন ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইহার পরিণাম। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেকন, এবং উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে লক্, মানবের বুদ্ধিকে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যান। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সকলের বিরুদ্ধে বেকন অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মমত এবং আরিষ্টটলের দর্শনশাস্ত্র, দুই দুইটি মিলাইয়া মানবের চিন্তাকে বন্ধ করিবার জন্য একটি লৌহনিগড় প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মধ্যযুগে সমস্ত বিষয়ে কতকগুলি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। মনুষ্যকে কোন বিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে, কোন স্বাধীন মত গ্রহণ করিতে, কিংবা স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান করিতে দেওয়া হয় নাই। বেকনের পূর্ব্বে কোপার্নিকাস্, গায়োরার্ডেনো, ব্রুনো, গ্যালিলিও, টাইকোব্রেহি, কার্ড্যান ভেসালিয়াস প্রভৃতি অনেক মহাত্মা ভৌতিক বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া অনেক নূতন মত স্থাপন করিয়া মধ্যযুগের দর্শনশাস্ত্রকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানকে মহাপণ্ডিত রেথাস্ বিশেষভাবে আক্রমণ করেন। বেকন এই সকল দৃষ্টান্তদ্বারা উৎসাহিত হইয়া স্থির করিলেন, যে, জ্ঞানের সকল বিভাগেরই উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই জন্য তিনি সমগ্র জ্ঞানরাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। যত প্রকার বিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহার সময়ে প্রত্যেক বিজ্ঞানে কি পরিমাণ সত্য ছিল, কি কি অভাব ছিল, কি কি বিষয়ে নূতন গবেষণা আবশ্যক, তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিলেন।

বেকন একটি নূতন প্রণালী স্থির করিলেন। এই প্রণালী দ্বারা বিজ্ঞানের সকল বিভাগে গবেষণা ও উন্নতি চলিতে পারে। (Novum organum, New organ)।

বেকনের পূর্ব্বে, আরিষ্টটলের প্রদর্শিত ন্যায় (Syllogism) কিংবা অনুমান (Deduction) প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের প্রণালী ছিল। বেকন প্রদর্শন করিলেন যে, উক্ত প্রণালীদ্বারা সত্যের আবিষ্কার হয় না। গবেষণা ও পরীক্ষাদ্বারা যে ব্যাপ্তিনির্ণয় (Induction) বা কার্য্যকারণসম্বন্ধ-নির্ণয় হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাই নূতন সত্যের আবিষ্কার হয়। সত্য-নির্ণয়ের পথে কি কি বিঘ্ন আছে, বেকন তাহা পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিলেন। কি কি ভ্রান্তি ও কুসংস্কারদ্বারা মনুষ্য সত্যনির্ণয়ে অকৃতকার্য্য হইতেছে, বেকন তাহাও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

প্রথম, প্রাচীন শাস্ত্র বা ভক্তিভাজন লোকের নামে কোনও মত প্রচারিত হইলে, লোকে তদ্বিষয়ে স্বাধীনভাবে বিচার করিতে পারে না। সুতরাং সত্যনির্ণয়ে অসমর্থ হয়। প্রাচীনকালের ভক্তিভাজন ব্যক্তিগণ কিংবা পিতৃপিতামহাদির প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি-বশতঃ তাঁহাদের অবলম্বিত বা প্রচারিত মতের যাথার্থ্যবিষয়ে মানুষ অনুসন্ধান করিতে পারে না। বেকন চারি প্রকার উপাস্য প্রতিমা, (Idols) অর্থাৎ একদেশদর্শিতা প্রভৃতি ভ্রান্তির চারি প্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনুষ্য কিরূপে সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, বেকন তাহা প্রদর্শন করিলেন। জনশ্রুতি, কুসংস্কার, ও বড়লোকের শাসন-বাক্য* হইতে মুক্ত হইয়া কিরূপে সত্যনির্ণয় করিতে

* Idols of the tribe, idols of the cave, idols of the market place, idols of the theatre.

হয়, এবং প্রকৃতি বা ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিরূপে অসীম জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হয়, বেকন তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লক্ বেকনের এই কার্য্যের আরও উন্নতি সাধন করিলেন। বেকন মানববুদ্ধিকে যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া গেলেন, লক্ তাহার আরও উন্নতিসাধন করিয়া, উহাকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলেন। লক্ বলিলেন যে, সত্যনির্ণয়ের পূর্ব্বে ইহা স্থির করা আবশ্যক যে সত্য কি? জ্ঞান কি? জ্ঞেয়ই বা কি? মনুষ্যের কি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে, এবং কি কি বিষয় জানিবার শক্তি মানুষের একেবারেই নাই। এই সকল বিচার করা আবশ্যক। এই জন্য জ্ঞান কি, তাহার ভিত্তি কি, তাহার উৎপত্তির প্রণালী কি, তাহার লক্ষণ কি, তাহার যাথার্থ্যতার পরিমাণ কি? লক্ তাহার মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিলেন (Essay concerning the Human Understanding)।

লক্ জ্ঞানের লক্ষণ স্থির করিলেন। জ্ঞানলাভের সম্ভাবনার পরিমাণ কোন্ বিষয়ে কত দূর আছে, এবং কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া, লক্ বেকনের নূতন প্রণালীর ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত করিলেন। লক্ প্রদর্শন করিলেন যে, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের অধিকাংশ কথা অর্থশূন্য বাক্যমাত্র ; তাহাতে পদার্থের জ্ঞান নাই। লকের মতে মানসপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের অতীত যাহা কিছু আছে, তাহা জানিবার আমাদের শক্তি নাই। সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, জ্ঞানাভাষ মাত্র, জ্ঞান নহে। লক্ আরও প্রদর্শন করিলেন যে, আমাদের কোন জ্ঞান বা ধারণার বাস্তবতা বিষয়ে পরীক্ষা করিতে হইলে, দেখা উচিত যে, সে জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে ;—কিরূপ অভিজ্ঞতার (Experience) ভিত্তির উপরে ঐ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ বা মানসক্রিয়ার উপরে উক্ত জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য। অভিজ্ঞতার (Experiencc) ভিত্তি অনুসারে স্থির করিতে হইবে যে, সে জ্ঞান যথার্থ কি না, অথবা কতদূর সম্ভবপর। ঐ জ্ঞান কতদূর যথার্থ স্থির করিতে হইলে বেকনের প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ভূয়োদর্শন, পরীক্ষা ও ব্যাপ্তিনির্ণয় (Induction) অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে, উহা সত্য কি অসত্য? কুসংস্কার, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের শাসনবাক্য, প্রাচীনকালের মহাত্মাদিগের প্রতি ভক্তি, জনশ্রুতি, এই সকলের দ্বারা যে সকল ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়, বেকনের ন্যায়, লক্ তদ্বিরুদ্ধে লেখনীচালনা করেন। তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের মূলসূত্র রাখিয়া যান। তাঁহার মতে কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান, কোন বিষয়সম্বন্ধীয় কোন একটি মতে সায় দিতে হইলে, তদুপযুক্ত প্রমাণ আবশ্যক।

লক্ রাজনৈতিক বিষয়েও এইরূপ যুক্তিবাদ, স্বাধীনচিন্তা ও অনুসন্ধান প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, গবর্ণমেণ্টের কোন মৌলিক ক্ষমতা নাই। সমাজের লোকদিগের প্রতিনিধি বা ট্রষ্টী বলিয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা। সকলেই নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত, স্বাধীনভাবে, সমাজের নিয়মাধীন থাকিতে মত দিয়াছে বলিয়াই সমাজ চলিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ সাধনই সমগ্র সমাজের উদ্দেশ্য। সমাজে থাকিতে গেলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছু খর্ব্ব হয়, সত্য ; কিন্তু এইটুকু ক্ষতি, অধিকতর মঙ্গল বা অধিকতর লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীকার করিতেছে। যখন দেশের রাজশাসন বা সমাজের নিয়ম এরূপ হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গল সাধিত হইতে থাকে, তখন সেই গবর্ণমেণ্ট বা সেই সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক! লকের মতে ব্যক্তিগত মঙ্গলসাধন করিবার নিমিত্তই লোকে সমাজভুক্ত

হইয়াছে, এবং গবর্ণমেণ্টের হস্তে শাসনক্ষমতা দিয়াছে। যদি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর গবর্ণমেণ্টের কিংবা সমাজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত নয়।

ধর্ম্মবিষয়েও, লক্ স্বাধীনচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। লক্ খৃষ্টিয়ান ছিলেন। কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতা, পাপের জন্য পারলৌকিক দণ্ড, এবং যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে অনেক পরিমাণে আর্ম্মেনিয়ানমতাবলম্বী, সোসিনিয়ান কিংবা ইউনিটেরিয়ান ছিলেন। লক্, ধর্ম্মবিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। লক্ বলিতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত চিরাগত মতের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিজের বিচার-শক্তি পরিচালনাপূর্ব্বক ধর্ম্মমত স্থির করেন, যে কোন ধর্ম্মমত জ্ঞানের বিরোধী, তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে। যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব, সে বিষয়ে বুদ্ধিচালনা করিয়া সত্য নির্ণয় কর। কিন্তু যেখানে মানবের অভিজ্ঞতা অসম্ভব, যেখানে মানবীয় জ্ঞান সম্ভব নহে, সেখানেই কেবল বিশ্বাস সম্ভব। কিন্তু বিশ্বাস যেন জ্ঞানের বিরোধী না হয়। বিশ্বাসের বিষয় মানবজ্ঞানের অতিরিক্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না ; হওয়া উচিত নহে। এইরূপে লক্, পরমেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ শাস্ত্র লাভের স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস সম্বন্ধে লকের মত সংক্ষেপতঃ এই :—যেখানে মানবের অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি পেঁছিতে পারে না সেখানেই বিশ্বাসের স্থান। সেই বিশ্বাস, মানবজ্ঞানের বিরোধী হইবে না, জ্ঞানাতিরিক্ত হইতে পারে। মানবজ্ঞানের বিরোধী হইলে, উহা পরিত্যাজ্য।

বেকনও অলৌকিক শাস্ত্রের এইরূপ একটি স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। জগৎ দেখিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে সকল বিশেষ তত্ত্ব, জগৎ দেখিয়া জানা যায় না, সেই সকল তত্ত্বের জন্য অলৌকিক শাস্ত্রের প্রয়োজন ; কিন্তু তাঁহার মতে এই অলৌকিক শাস্ত্র যেন স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়। স্বাভাবিক ধর্ম্মে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত কথা অলৌকিক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ডীয়িষ্ট্‌গণ

এক্ষণে লকের পরবর্ত্তী সময়ের কথা বলি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি, বেকন এবং লক্ প্রদর্শিত যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তা বিশেষভাবে ধর্ম্ম-বিষয়েও নিয়োজিত করিলেন। এই সকল লোককে একেশ্বরবাদী (Deists) বলে। কলিনস্, টিণ্ডাল, টোল্যাণ্ড, চব্‌স, মরগ্যান স্যাফ্‌টস্‌বেরী প্রভৃতি লোক প্রধান একেশ্বরবাদী (Deists) ছিলেন। বহির্জগৎ এবং মানবের জ্ঞান তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি ছিল। এই জগৎকে জ্ঞানদ্বারা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা স্বাভাবিক ধর্ম্মে উপনীত হইয়াছিলেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাঁহাদের প্রধান প্রধান মতগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। একেশ্বরবাদ। একজন জগতের কর্ত্তা আছেন, ইহা তাঁহারা কার্য্যকারণসম্বন্ধ এবং কৌশল সম্বন্ধীয় যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতেন।

২। ঈশ্বর নিয়ন্তা। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল এবং অপরিবর্ত্তনীয় নীতি সকল, এই দুই প্রকার নিয়মে জগৎ পরিচালিত হইতেছে।

৩। মনুষ্যের আত্মা অমর। পরলোকে আত্মা কর্ম্মফলভোগ করে। মানবাত্মা স্বাধীন। আপনার কার্য্যের জন্য মনুষ্য পরমেশ্বরের নিকট দায়ী। পাপ পুণ্যের জন্য,

পারলৌকিক দণ্ড-পুরস্কার আছে। মনুষ্যের নৈতিক ও ধর্ম্মগত প্রকৃতি এবং সামাজিক অবস্থা বিচার করিয়া তাঁহারা এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে পরমেশ্বর মানবের বিধাতা ও বিচারক।

৪। পরলোকে পরমেশ্বরের পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রকাশিত হইবে।

৫। বহির্জগৎ এবং মনুষ্যের বুদ্ধিগত ও নৈতিক প্রকৃতি, সকল যুগে, জাতি-নির্ব্বিশেষে, মনুষ্যমাত্রকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে। বিশেষ কোন যুগে, বিশেষ জাতিকে বা ব্যক্তিকে পরমেশ্বর বিশেষ কোন শাস্ত্র দিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের বিষয়ে ধর্ম্মের কোন প্রকার বিশেষ বিধান করিয়াছেন, তাহা এই সকল একেশ্বরবাদীরা কোন ক্রমেই স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, পরমেশ্বরের বিধাতৃত্ব বিশ্বজনীন। সকলের প্রতি সমান। প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্য্যকারণসম্বন্ধ দ্বারা তাঁহার বিধাতৃত্বের ক্রিয়া হইয়া থাকে।

৬। সকল দেশে ও সকল জাতীয় লোকে স্বাভাবিক ধর্ম্মের আলোক দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন, অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে এবং বিবেকের বাণী অনুসারে কার্য্য করিলে, মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারে। ধর্ম্মসাধন করা, কর্ত্তব্য পালন করাই পরিত্রাণের একমাত্র ও বিশ্বজনীন পন্থা।

৭। নৈতিক নিয়মের উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ। উহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

উপরে তাঁহাদের ভাবাত্মক মত সকলের বিষয় বলা হইল। নিম্নে তাঁহাদের কয়েকটি অভাবাত্মক মতের কথা বলিতেছি ;—

১। ঐতিহাসিক শাস্ত্র অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্র, মুসলমান শাস্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রকে তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। শাস্ত্র সকল যে, বিশেষ কোন ঈশ্বরানুপ্রাণিত ব্যক্তি দ্বারা অলৌকিক বা অনৈসর্গিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের মতে বিশেষ কোন ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র মানিলে দুইটি দোষ ঘটে।

প্রথম, পরমেশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতি দোষারোপ হয়। পরমেশ্বর সমগ্র মনুষ্য-জাতির পিতা। তাঁহার প্রতি কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির বিশেষ দাবি নাই। এইটি ঈশ্বরপ্রেরিত বিশেষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে নৈতিক আপত্তি।

দ্বিতীয়, বিশেষ শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ঐ প্রকার শাস্ত্র মানিতে হইলে, এমন কিছু মানিতে হয় যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম, মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞান এবং নৈতিক প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। ঐ প্রকার শাস্ত্র মানিতে হইলে, অলৌকিক ও অনৈসর্গিক ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা অনৈসর্গিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া শাস্ত্রই অস্বীকার করিয়াছিলেন।

২। উপরি-উক্ত কারণে, এই সকল একেশ্বরবাদীরা (Deists) পরমেশ্বরের বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করিতেন না।

৩। যাহা কিছু অলৌকিক ও অনৈসর্গিক সে সমস্ত বিষয়ই অস্বীকার করিতেন। সুতরাং বাইবেল শাস্ত্রে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না।

৪। যাহা কিছু জ্ঞান এবং বিবেকের বিরোধী, তাহা যে শাস্ত্রেই থাকুক, তাঁহাদের মতে তাহা পরিত্যাজ্য। জ্ঞান, বিবেক এবং নীতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম সকল আমাদের নেতা। ইহাই ধর্ম্মের কষ্টি পাথর। শাস্ত্রে ও প্রচলিত ধর্ম্মে, জ্ঞান এবং নীতির

অনুমোদিত যাহা কিছু আছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আর সকলই পরিত্যাজ্য।

ইঁহারা প্লেটোর দর্শনশাস্ত্র এবং সক্রেটিসের নীতি উপদেশকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহারা খ্রীষ্টের উপদেশ সকল মানিতেন। খ্রীষ্টের উপদেশের পরই অথবা প্রায় সমভাবে প্লেটো এবং সক্রেটিসের দার্শনিক উপদেশ সকলের সম্মান করিতেন। ইঁহারা কেবলই যে য়ীহুদী ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ স্বীকার করিতেন, এমন নহে ; সকল শাস্ত্র ও জ্ঞানী লোকের উপদেশেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

৫। খ্রীষ্টধর্ম্মকে তাঁহারা এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে সত্য গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মতে পুরাতন বাইবেলে মুসার নিয়ম এবং প্রফেটদিগের উপদেশ ব্যতীত অধিকাংশ পরিত্যাজ্য। নূতন বাইবেলের অলৌকিক ক্রিয়া সকল পরিত্যাজ্য। তাঁহাদের মতে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মে ত্রিত্ববাদ, যীশুর পুনরুত্থান, যীশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, যীশুর প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা পাপীর মুক্তি, অবতারবাদ অথবা যীশুর ঈশ্বরত্ব, যীশুর মানবীয় ও ঐশিক প্রকৃতি ইত্যাদি মত যুক্তি ও নৈতিক বুদ্ধির বিরোধী। তাঁহাদের মতে জলসিঞ্চন দ্বারা ধর্ম্মদীক্ষা প্রভৃতি কোন প্রকার বাহ্য অনুষ্ঠানের উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে না। খ্রীষ্টধর্ম্মের অবোধ্য বিষয় সকল (Mysteries) তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেন।

তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের এক অংশ স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে উহাই খ্রীষ্টধর্ম্মের সার অংশ। মুসার দশ আজ্ঞা, প্রফেটদিগের উপদেশ এবং সকলের উপর যীশুর উপদেশ। এই সকলকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিতেন। যীশুর উপদেশ সকলের মধ্যে একটি বিশেষ উপদেশ,—"অন্যের নিকটে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেইরূপ ব্যবহার কর" এই বিশেষ উপদেশটিকে তাঁহারা অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

এইভাবে তাঁহারা বলিতেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যতদিন জগৎ, ততদিন খ্রীষ্টধর্ম্ম বর্ত্তমান। তাঁহারা বলিতেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম অবোধ্য (Mysterious) নহে। কারণ, খ্রীষ্টধর্ম্মের যে মতগুলিকে অবোধ্য বলা হয় যেমন ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, অনৈসর্গিক প্রণালীতে যীশুর জন্ম, প্রভৃতি মত পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের নৈতিক উপদেশ,—কর্ত্তব্যপালনবিষয়ক উপদেশ নিচয়, পাপ ও পুণ্যের জন্য দণ্ড পুরস্কার, তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের সার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই-জন্য তাঁহারা বলিতেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম কোন অবোধ্য বিষয় নহে।

৬। সেণ্টপল ও কাল্‌ভিনের একটি বিশেষ মত তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতেন। ঈশ্বর কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া সুপথে লইয়া যান আর কাহাকেও লইয়া যান না, ইহা তাঁহারা মানিতেন না। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ হয়। যিনি ধর্ম্মসাধন করেন, তিনিই ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্র, তাঁহারই মুক্তিলাভের অধিকার হয়। তিনি ধর্ম্মসাধনদ্বারা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন ; অর্থাৎ স্বর্গে যান ; আর যে ব্যক্তি নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে দণ্ডিত হয়। এইরূপে তাঁহাদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্রাণ তাহার নিজের হস্তে।

৭। যাহা কিছু স্বাভাবিক তাহাই তাঁহারা ঈশ্বরকৃত বলিয়া মনে করিতেন ; আর যাহা স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম, তাহাই তাঁহাদের মতে ভ্রান্তিমিশ্রিত। তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে, স্বভাব ও স্বাভাবিক পদার্থের পক্ষপাতী ছিলেন।

১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বিসপ্‌ বাট্‌লার সাহেব তাঁহার Analogy গ্রন্থে এই সকল একেশ্বরবাদী (Deists)-দিগের মতের উত্তর দেন। বাট্‌লারের সময় হইতে ইংলণ্ডের ডীয়িষ্ট্‌গণ (Deists) ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়েন; কিন্তু ফরাসীদেশে ইঁহাদের শিষ্যবর্গেরা প্রভূত শক্তিসহকারে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশেষরূপে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মসমাজকে আক্রমণ করিতেন। এই যুদ্ধের মহারথীদের মধ্যে ভল্টেয়ার, ডিডিরো, হেল্‌ভিটিয়াস্‌, ডালেম্‌বের, হোলব্যাক্‌, কণ্ডর্‌সে, কণ্ডেয়াক্‌, এবং রুশো ও ভল্‌নি এই কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। ডিডিরো এবং ডালেম্‌বের কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছিল। ইঁহারা অজ্ঞান ও কুসংস্কার-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, জগতে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের বিরুদ্ধে, মানবের জ্ঞান ও স্বাধীনতার নামে, সমর-ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইঁহারা গবর্ণমেণ্ট এবং বর্ত্তমান সামাজিক প্রণালীর বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই যাহা তাঁহারা দূষণীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন।

তাঁহারা চতুর, স্বার্থপর ধর্ম্মযাজক এবং রাজনীতিজ্ঞদিগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, কতকগুলি চতুর স্বার্থপর লোক সমবেত হইয়া সাধারণ লোককে কুসংস্কারান্ধকারে ফেলিয়া, তাহাদিগকে দুর্ব্বল, ও অসহায় অবস্থায় রাখিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ধর্ম্মযাজকেরা এবং রাজনীতিজ্ঞেরা মিলিত হইয়া এইরূপ অত্যাচার করিতেছে। তাঁহারা মনে করিতেন যে, মানবজাতির ইতিবৃত্তে, মনুষ্যসমাজে, যত অত্যাচার, মূর্খতা, পাপ দরিদ্রতা, নিষ্ঠুরতা, যথেচ্ছাচারিতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চতুর স্বার্থপর ধর্ম্মযাজক এবং রাজনীতিজ্ঞ-দিগের প্রভুত্বের ফল। সেইজন্য ইঁহারা ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মসমাজ (Church) মাত্রকে ঘৃণা করিতেন এবং যে স্থানে রাজা বা রাজপুরুষদিগেরই সম্পূর্ণ ক্ষমতা, প্রজাদিগের কোন ক্ষমতা নাই, সেরূপ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, যে ধর্ম্মযাজকেরা, অজ্ঞ সাধারণ লোকদিগকে স্বর্গের প্রলোভন এবং নরকের বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি করে। তাহাদের নিজের ধন মান রক্ষা করিয়া বিলাসপ্রিয়তা ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। তাহারা ধর্ম্মের জন্য হত্যাকাণ্ড করিয়া জগৎকে নরশোণিতে প্লাবিত করে। ইঁহারা মনে করিতেন যে, অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এই-রূপে আপনাদের প্রভুত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া ধর্ম্মযাজকদিগের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার পন্থা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে ইঁহারা একমত ছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা নাস্তিক জড়বাদী, কেহ সংশয়বাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, এবং কেহ বা একেশ্বরবাদী ছিলেন। এই একেশ্বরবাদীদিগের মধ্যে ভল্টেয়ার, রুশো এবং ভল্‌নি প্রধান। ভল্টেয়ার এবং ভল্‌নি থিওফিল্যান্‌থ্রপিষ্ট ছিলেন। রুশো ভক্তি-পথাবলম্বী খ্রীষ্টিয়ান একেশ্বরবাদী ছিলেন। থিওফিল্যানথ্রপিষ্ট্‌রা ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌-দিগেরই সন্তানস্থানীয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মমত পরমেশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম। মানবজাতির হিতসাধন বিষয়ে তাঁহাদের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল।

ভল্টেয়ার দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, বেদে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম ও মনুষ্যের

প্রতি প্রেম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভল্টেয়ার যাহাকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক বেদ নহে ; একটা জাল বেদ। যাহা হউক, থিওফিল্যান্থ্রপিস্টদের মত এই যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে, ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক অসত্য, কুসংস্কার ও নীতিবিরুদ্ধ কথার মধ্যেও কতক্ পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও মনুষ্যের প্রতি প্রেমের উপদেশ আছে। তবে তাঁহাদের মতে, চতুর ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই নীতিবিরুদ্ধ কথা, অলৌকিক ক্রিয়া এবং নানা প্রকার কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। স্বার্থপর, চতুর ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই কলুষিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, কোন ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কোন প্রচলিত ধর্ম্ম ঈশ্বরপ্রেরিত নহে। সকলই মনুষ্যের সৃষ্ট ও কৃত্রিম। ভল্নি তাঁহার রচিত 'Ruins of Empires, or Reflections on the Revolutions of Empires' নামক গ্রন্থে এবং উহার পরিশিষ্টে, থিওফিল্যানথ্রপিষ্ট্দিগের ধর্ম্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ইয়োরোপ, এসিয়া এবং মিশরদেশের প্রাচীন ধর্ম্ম এবং আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদিগের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আদিম অবস্থায় মনুষ্যের মন প্রাকৃতিক ঘটনা সকলের বিষয় চিন্তা করিত। এইরূপ চিন্তার ফলস্বরূপ নানাপ্রকার ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মযাজকেরা অলৌকিক ক্রিয়া, কুসংস্কার ও অনেক নীতিবিরুদ্ধ মতের দ্বারা ঐ সকল ধর্ম্মকে পূর্ণ করিয়া তাহাদের বাসনা চরিতার্থ করিতেছে। ভল্নির মতে, যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার জন্ম, তাঁহার ক্রুশে হত হওয়া এবং মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থান এ সকল সূর্য্যসম্বন্ধীয় একটি রূপক মাত্র ; অর্থাৎ তিনি ঐ সকল ঘটনাকে সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্ত রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম

ফরাসী দেশের এন্সাইক্লোপিডিয়া-লেখকদিগের সময়ে, ইংলণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম সাহেব সন্দেহবাদ প্রচার করেন। হিউম সাহেবের এই কয়েকটি বিশেষ মত। প্রথম, তিনি অলৌকিক ক্রিয়া (Miracles) অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়, পরকাল এবং পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন ; বলেন যে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। তৃতীয়, তাঁহার মতে কার্য্যকারণসম্বন্ধমূলক যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না ; কিন্তু কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব যে প্রমাণ হয়, ইহা তিনি একপ্রকার স্বীকার করেন। হিউম বলেন, কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বর নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে ; কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। চতুর্থ, তিনি স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা ধর্ম্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। ধর্ম্ম সকলের উৎপত্তি কিরূপে হইল, ইহা তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন, এবং প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা করেন। পঞ্চম, ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও বিশেষ বিশেষ মত সকলকে, চতুর ধর্ম্মযাজকদিগের সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন ; অথচ কতক্গুলি ধর্ম্মমত ও বাহ্য অনুষ্ঠান জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে আপামর সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করেন।

যুক্তিবাদের মূলসূত্রসঞ্চারক বেকন ও লকের গ্রন্থ, এবং ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্গণের, ফরাসী দেশীয় থিওফিল্যানথ্রপিষ্ট্ ও এনসাইক্লোপিডিষ্টদিগের ও টমাস পেনের গ্রন্থ এবং সংশয়বাদী হিউমের গ্রন্থপাঠে, রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব ও বিশ্বাস, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ বিষয়ে বিকসিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থদ্বারা তাঁহার উপরে অধুনাতন ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও স্বাধীনচিন্তার প্রভাব পতিত হয়। এই প্রকার

মনের ভাব লইয়াই তিনি তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে লক্, বেকন ও অন্যান্য স্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, হিউম, গিবন্ প্রভৃতি এবং ফরাসী পণ্ডিত ভল্টেয়ারের নাম ও তাঁহাদের মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

আরবদেশীয় মতাজল সম্প্রদায়

যুক্তিবাদ বিষয়ে রাজা আরবদেশীয় মতাজল নামক দার্শনিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক বলিয়া আমরা নিম্নে মতাজলদিগের বিষয় বলিতেছি। মতাজল সম্প্রদায়, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বোগদাদের খলিফ্ আলমমন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফ্দিগের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মতাজলদিগকে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী বলা যায় না। কেননা তাঁহারা কোরান মানিতেন। তাঁহাদের মতের সহিত অনেক পরিমাণে যুক্তিবাদ মিশ্রিত ছিল। মতাজল শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ত্যাগী, অর্থাৎ মূল মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের মতভেদ হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। সারস্তানী, তাঁহার মিলাল্ওয়ানাহাল নামক গ্রন্থে মতাজলদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মত বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহাদিগের কতকগুলি মত নিম্নে লিখিত হইল।

১। পরমেশ্বর অনাদি অনন্ত। অনাদ্যনন্তত্ব তাঁহার স্বরূপের একটি বিশেষ লক্ষণ। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপের অনাদি অনন্তকালস্থায়ী বিশেষ বিশেষ গুণ বলিয়া তাঁহারা মানিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, সর্ব্বজ্ঞতা পরমেশ্বরের স্বরূপ, গুণ নহে। সর্ব্বশক্তিমত্তা তাঁহার স্বরূপ, গুণ নহে। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গুণরূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই। অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞানময়, ইচ্ছাময়, প্রাণময়। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপ (Essence) ; ঐ সকল তাঁহার ধর্ম্ম বা গুণ নহে। পরমেশ্বরে ধর্ম্মধর্ম্মী বা গুণগুণী ভাব থাকিতে পারে না। মতাজলদিগের মতে তাহাতে দুইটি দোষ হয় ; প্রথম, পরমেশ্বর তাঁহার গুণের অধীন হইয়া পড়েন। পদার্থ সকল যেমন তাহাদের গুণের অধীন, সেইরূপ তিনিও তাঁহার গুণের অধীন হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়, পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার করিলে, তাঁহার একত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার করিলে 'ওয়াহদৎ' অর্থাৎ একত্ব বজায় থাকে না। সুফীদিগের এবং বেদান্তেরও এই প্রকার মত। স্বরূপলক্ষণ সকল ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে : ঐ সকল তাঁহার স্বরূপ। যেমন সৎ, চিৎ, আনন্দ। কিন্তু যে যে স্থলে ঐ সকল গুণের কথা আছে, সেই সকল স্থলে তটস্থ লক্ষণদ্বারা ঐরূপ বলা হইতেছে, মনে করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায়েরও এই প্রকার মত ছিল। মহম্মদ বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের দান বা অনুগ্রহের বিষয় চিন্তা কর, তাঁহার স্বরূপের বিষয় চিন্তা করিও না! সে সম্বন্ধে তোমার কোন শক্তি নাই।

২। মতাজলেরা বলিতেন যে, কোরানশাস্ত্র একটি নূতন বস্তু। উহা ঈশ্বরের সৃষ্ট, দেশকালে বদ্ধ। সুতরাং উহা একটি ঘটনা। পরমেশ্বরের স্বরূপের অন্তর্গত নহে ; সুতরাং উহা নষ্ট হইতে পারে। সেই জন্য, কোরানকে অনাদি অনন্তকালস্থায়ী বলা যাইতে পারে না। গোঁড়া মুসলমানেরা কোরানকে নিত্য বলেন। হিন্দুরাও সাধারণতঃ বেদকে নিত্য বলেন। 'শব্দোনিত্যঃ' (মীমাংসক মত)। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন 'শব্দোঽনিত্যঃ' অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র অনিত্য। যে সকল মুসলমানেরা কোরানকে নিত্য বলিতেন, মতাজলেরা তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণ করিতেন যে, কোরান অনিত্য।

৩। কোরানে যে যে স্থানে পরমেশ্বরের মুখ, হস্ত, সিংহাসন প্রভৃতি বর্ণিত আছে, তাহা মতাজলাদিগের মতানুসারে 'মতসাবি', অর্থাৎ সেগুলিকে রূপকবর্ণনা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু, পরমেশ্বর নিরাকার সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার মূর্ত্তি হইতে পারে না। ইহা বেদান্তের ও রাজা রামমোহন রায়েরও মত।

৪। মনুষ্য তাঁহার নিজের কার্য্যের কর্ত্তা। ভাল কি মন্দ কার্য্য, যাহাই হউক, মনুষ্য আপনার কার্য্য আপনি করিয়া থাকে, এবং আপনার সৎকার্য্যদ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে। পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বান্। তাঁহা হইতে কোন অমঙ্গল বা অত্যাচার আসে না। যেমন পল এবং ক্যাল্‌ভিনের মত অস্বীকার করিয়া ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌রা বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য স্বাধীন, আপনার কর্ম্মদ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে; সেইরূপ মতাজলেরা, গোঁড়া মুসলমানদিগের মধ্যে পল ও ক্যাল্‌ভিনের অনুরূপ মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন যে, মনুষ্য আপনার কর্ম্মদ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে। রাজা রামমোহন রায় মীমাংসাশাস্ত্রের কর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মানুসারে ফলবিধান করেন। তিনি 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' পত্রিকায় পল এবং ক্যাল্‌ভিনের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

৫। মতাজলেরা বিশ্বাস করিতেন যে, যে সকল জাতি পরমেশ্বরের নিকট হইতে কোন শাস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সকল প্রতিপালন করিতে পারেন। মনুষ্য স্বাভাবিক বুদ্ধিদ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং প্রকৃতভাবে এই স্বাভাবিক জ্ঞানের অনুসরণ করিয়া মনুষ্য, মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। পরমেশ্বর যে, তাঁহার পয়গম্বরদিগের দ্বারা মনুষ্যের নিকটে ধর্ম্ম-নিয়ম প্রেরণ করেন, ইহা তাঁহার পক্ষে একটি বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র।

এস্থানে দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌দিগের সহিত মতাজলাদিগের মতের আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের মতও এইরূপ ছিল। তবে ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌রা, প্রফেট্ বা পয়গম্বরে বিশ্বাস করিতেন না। তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, রাজা রামমোহন রায়ও প্রফেট্ বা পয়গম্বর একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌দিগের মত এই যে, মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞানই যথেষ্ট। পয়গম্বরদিগের দ্বারা যে পরমেশ্বর বিশেষ জ্ঞান প্রেরণ করেন, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মতাজলেরা তাহা স্বীকার করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের মত, এ বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি এ বিষয়ে ডীয়িষ্ট্‌দিগের মত পরিত্যাগ করিয়া মতাজলাদিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরে, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ মানিতেন। তবে রাজা রামমোহন রায়ের মতানুসারে, স্বাভাবিক জ্ঞানে যাহা বুঝা যায়, মহাপুরুষেরা তাহাই অধিকতর পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। মহাপুরুষ সম্বন্ধে তিনি অলৌকিক কিছুই মানিতেন না।

৬। পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞানদ্বারা কেবলই জীবের কল্যাণ সাধন করেন। তিনি তাঁহার ভৃত্যগণের সৎকার্য্যের পুরস্কার প্রদান করেন। পরমেশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, ন্যায়-স্বরূপ এবং পবিত্রস্বরূপ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ডীয়িষ্ট্‌রা যেরূপ পুরাতন বাইবেলে বর্ণিত জিহোবার ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, ও ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন, মতাজলেরাও সেইরূপ গোঁড়া মুসলমানদিগের বর্ণিত পরমেশ্বরের ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার অস্বীকার করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ও সেইরূপ, পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত অবতারদিগের নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এস্থলে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

প্রথম, মতাজলাদিগের দ্বারা আরবদেশীয় দর্শনশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সারস্তানি জালালুদ্দীন আসুইতি এবং অন্যান্য অনেকে আরবী ভাষায় মতাজলাদিগের বিবরণ লিখিয়াছেন। আরব দেশীয় দর্শনশাস্ত্রে, মতাজলাদিগের মত সকলের প্রভাব এককালে বিশেষরূপে প্রকাশ হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় আরবী ভাষায় লিখিত ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ও মনোবিজ্ঞান বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন পুস্তকে ইহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আরবদেশীয় তর্কশাস্ত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, তিনি কোরান বিষয়ে মুসলমান মৌলবীদের সহিত বিচার করিয়া তাঁহাদের পরাস্ত করিয়া, কোরান ও মুসলমান দর্শন-শাস্ত্রদ্বারা একেশ্বরবাদ ও মওয়াহিদ্দীবাদ প্রচার করিতেন। তাঁহাকে মৌলবীরা 'জবরদস্ত মৌলবী' বলিতেন। মতাজলেরা মুসলমান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা কোরানের ভিত্তির উপর তাঁহাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজা যে সকল আরবী গ্রন্থে মওয়াহিদ্দীদিগের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রন্থেই মতাজলাদিগের মতের বিচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মওয়াহেদী ও মতাজলাদিগের গ্রন্থসকলদ্বারা রাজার মত অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়াছিল।

মোয়াহ্‌হেদী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত

আমরা এস্থলে মোয়াহ্‌হেদী (মওয়াহিদ্দী) সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠক-বর্গকে অবগত করিতেছি। মোয়াহ্‌হেদী শব্দের অর্থ ঈশ্বরের একত্ববাদী; যাঁহারা 'ওয়াহদৎ' অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপের একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই মোয়াহ্‌হেদী। এই মোয়াহ্‌হেদী সম্প্রদায় কোরানকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে মুসলমান বলা হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপের একত্ববাদী মুসলমান বলা হয়। এই মোয়াহ্‌হেদী সম্প্রদায়ের লোক অনেক পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে, আফ্রিকা ও স্পেনদেশে আল মোহেদী নামে একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহম্মদ ইবুতাউমর্ত নামক একব্যক্তি উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি পরমেশ্বরের একত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লেখেন, এবং একটি রাজবংশ সংস্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের লোক আপনাদিগকে একমাত্র যথার্থ মুসলমান বলিতেন। ইঁহাদের কিছু কিছু নূতন ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। ইঁহারা পয়গম্বর ও কোরানে বিশ্বাস করিতেন। মোয়াহ্‌হেদীরা পরে সুফী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। মোহিয়দ্দীন ইব্‌নুল আরবী তাঁহার রচিত ফসুসুল হেকাম (তত্ত্বজ্ঞানকৌস্তুভ) গ্রন্থে এই সুফীমোয়াহ্‌হেদীমত বিশেষরূপে প্রচার ও বিস্তার করেন। তিনি আবদুল কাদের গিলানীর শিষ্য। তাঁহার মত 'ওয়াহ্‌দতুল্‌ ওজুদ্‌' এবং 'হামাহ্‌উস্‌ত্‌'; এ কথার অর্থ এই যে, কেবল একমাত্র সত্যপদার্থ আছে;—এই সকলই ঈশ্বর। ইহা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শঙ্করের অনুরূপ মত। তবে, শঙ্করের মত বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই সুফীমোয়াহ্‌হেদীদিগের মত কোরানশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর একদল সুফী ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম 'সুফীমোসায়েখ'। তাঁহারা বিশিষ্ট-ভাবে 'ওয়াহ্‌দৎ বা পরমেশ্বরের একত্ব মানিতেন। তাঁহারা বলিতেন, 'ওয়াহ্‌দতুল্‌ সহুদ্‌' —'হামাহ্‌আজ উস্‌' ইহার অর্থ, পরমেশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার প্রকাশের একত্ব; —এই সকল যাহা কিছু পরমেশ্বরের। ইঁহারা রামানুজের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা নিম্বার্কের

ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তবে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইঁহাদের মত কোরানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল মোয়াহ্‌হেদীই মুসলমান; তাঁহারা কোরান ও পয়গম্বরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা যেরূপে কোরান ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের মতে ভ্রমাত্মক। তাঁহারা কোরান এবং পয়গম্বরের উক্তির আধ্যাত্মিক, রূপক, দার্শনিক, অথবা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মুসলমান স্মৃতি সরিয়ৎ অনুসারে যে সকল কর্ম্মকাণ্ড হইয়া থাকে, তাহা ইঁহারা অনেক ছাড়িয়া দেন। অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যুক্তিসঙ্গত করিয়া লন। একেবারে অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু যাঁহারা 'মজ্জুব্' অর্থাৎ "পরমহংস" তাঁহারা একেবারেই সরিয়ৎ মানেন না।

আরবী ভাষায় লিখিত ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে ও দর্শনশাস্ত্রে নানা ধর্ম্মমতের বিচার আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মোয়াহ্‌হেদী ও মতাজলাদিগের মতের বিচার আছে। রাজা যে মনাজারাতুল আদিয়ান অর্থাৎ বিবিধ ধর্ম্মের বিচার নামে আরবী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহাতে তিনি কতক্ পরিমাণে আরবী দর্শনশাস্ত্রের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাৎ মতাজলদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একটি নাস্তিক সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে জিন্দিগ্ বলিত। বোধ হয়, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র ও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বলিতেন যে, মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, পরস্পরের উপকার করেন এবং মানবহৃদয়ে স্বভাবতঃ যে নীতিসূত্র সকল লিখিত রহিয়াছে, তাহা পালন করেন।

মতাজলাদিগের পঞ্চাশ বৎসর পরে সরল ভ্রাতৃমণ্ডলী (Sincere Brethren) নামে এক মুসলমান দার্শনিক সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ইঁহারা ফ্রি মেসন্‌দের ন্যায় অনেক বিষয় গোপন রাখিতেন। এই সম্প্রদায় সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যে, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র সভ্যজগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই সময়ে যে সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল, ইঁহারা সেই সকলের একটি প্রকাণ্ড বিশ্বকোষ (Encyclopedia) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইঁহারা ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন্ গ্রন্থের প্রথমেই, রাজা বলিতেছেন যে, তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া, অনেক জাতির ধর্ম্মপ্রণালী দেখিয়া ও সেই সকল ধর্ম্মকে পরস্পর তুলনা করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় জানিতে পারিয়াছেন।

বিশ্বজনীন ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস

প্রথম, সকল ধর্ম্মেই জগতের কর্ত্তা ও বিধাতা, একজন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়, যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে একমত দেখা যায়, সেইরূপ, ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবং ধর্ম্মবিষয়ক অন্যান্য মত সম্বন্ধেও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে পরস্পর প্রভেদ লক্ষিত হয়। রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মত ও বিশ্বাস বিভিন্ন প্রকার। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, লোকে যেমন পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম, জিহোবা, আল্লা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানও ভিন্ন প্রকার। কেহ কৃষ্ণকে ভজনা করিতেছেন, কেহবা খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এই উভয় প্রকার লোকের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান ঠিক্ এক প্রকার নহে।

ধর্ম্মবিষয়ক অন্যান্য মত সম্বন্ধেও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কে আমাদের পরিত্রাতা, ইহা লইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ। কেহ বলেন খ্রীষ্ট, কেহ বলেন কৃষ্ণ, কেহ বলেন মহম্মদ পয়গম্বর। পরিত্রাণ কিসে হয়? কর্ম্মে কি ভক্তিতে? এ বিষয়ে অত্যন্ত মতভেদ। পরিত্রাণ কাহাকে বলে? পরলোক কি? পারলৌকিক অবস্থা কিরূপ? এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত মতভেদ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মের কার্য্যগত বিভাগেও বিশেষ প্রকার বিভিন্নতা দেখা যায়। শুদ্ধ কি, অশুদ্ধ কি, ব্যবহার্য্য কি, অব্যবহার্য্য কি, বিধি কি, নিষেধ কি, হারাম কি, হালাল কি, ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যার পর নাই ভিন্নতা লক্ষিত হয়। সাধনপ্রণালী ও উপাসনাপ্রণালী বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্ত্তমান।

এই সকল কারণে রাজা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ এক অনাদি পুরুষকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন। সুতরাং ইহা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। এক জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস, কোন কৃত্রিম উপায়ে, কেবল অভ্যাসদ্বারা উৎপন্ন হয় না। যে বিশ্বাস সমগ্র মনুষ্যজাতিতে দেখা যায়, তাহা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়া সকল জাতির মধ্যে পরমেশ্বরে বিশ্বাস বর্ত্তমান; অথবা ঈশ্বরবিশ্বাসের দিকে মনুষ্যের মনের স্বাভাবিক গতি।

যখন দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে এবং ধর্ম্মের মতগত ও কার্য্যগত বিষয়ে, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন প্রকার মত রহিয়াছে, তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এ সকল মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। বিশেষ বিশেষ প্রকার দেবতায় ও বিশেষ প্রকার উপাসনাপ্রণালীতে বিশ্বাস, শিক্ষার ফল। এ সকল স্বাভাবিক নহে। জনশ্রুতি, শাস্ত্র, ও চতুঃপার্শ্বের অবস্থাদ্বারা এই সকল মত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রচলিত ধর্ম্ম সকল কি সত্য ?

রামমোহন রায় তৎপরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জগতে প্রচলিত সকল ধর্ম্মই কি সত্য? অথবা সকল ধর্ম্মই মিথ্যা? কিম্বা কোন কোন ধর্ম্ম সত্য এবং কোন কোন ধর্ম্ম মিথ্যা? তিনি বলিতেছেন, এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর হইতে পারে। প্রথম, এই এক উত্তর হইতে পারে যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কেননা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ঈশ্বরসম্বন্ধে বিপরীত প্রকার মত দৃষ্ট হইতেছে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে যে, এক ধর্ম্মে যে কার্য্যের বিধি রহিয়াছে, অন্য ধর্ম্মে তাহাই নিষিদ্ধ। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা নিচয় কখন সকলই সত্য হইতে পারে না। (এ স্থলে রাজা আরবী ভাষায় তর্কশাস্ত্র হইতে Principle of noncontradiction-এর সূত্র উদ্ধৃত করিতেছেন।) সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মই সত্য হইতে পারে না।

কোন একটি বিশেষ ধর্ম্ম কি সত্য ?

দ্বিতীয় উত্তর এই হইতে পারে যে, প্রচলিত সকল ধর্ম্মের মধ্যে একটি বিশেষ ধর্ম্ম সত্য। অবশিষ্ট সকল ধর্ম্মই মিথ্যা। এই উত্তর সম্বন্ধে রাজা বলেন যে, কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মকে কেন সত্য বলিব, আর অপরগুলিকে কেন মিথ্যা বলিব, তাহার যথেষ্ট হেতু পাওয়া চাই। যদি বল, একটি বিশেষ ধর্ম্ম সত্য; তাহা হইলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, সে কোন্ ধর্ম্ম? কি জন্য তুমি একটি বিশেষ ধর্ম্মকে সত্য বলিতেছ এবং অবশিষ্ট সকল ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতেছ? একটি বিশেষ ধর্ম্মকে সত্য বলিলে এবং অবশিষ্ট ধর্ম্ম সকলকে মিথ্যা বলিলে, তাহার উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। কিন্তু

ঈশ্বরের স্বরূপ, পরকাল, মুক্তি ও ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে, কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসসম্বন্ধে, এমন কোন যুক্তি পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, এই বিশেষ ধর্ম্মপ্রণালী সত্য এবং অবশিষ্ট সকলগুলি মিথ্যা। এই সকল বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, এবং জ্ঞানের আয়ত্তও নহে। সুতরাং যখন কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ সত্য, এবং অন্য সকল ধর্ম্ম ভুল, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই অমূলক কথা বলেন।

যথেষ্ট হেতুবাদ

রাজা এই স্থলে আরবী ভাষার তর্কশাস্ত্র হইতে যথেষ্ট-হেতুবাদের যুক্তি (Principle of sufficient reason) উদ্ধৃত করিতেছেন। এই যথেষ্ট-হেতুবাদ কাহাকে বলে, তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অনেকগুলি ঘটনা, একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে, যদি তন্মধ্যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা, সেই কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে স্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইবে যে, অন্য কোন ঘটনা উৎপন্ন না হইয়া ঐ বিশেষ ঘটনার উৎপত্তি কেন হইল, ইহার যথেষ্ট-হেতুবাদ প্রদর্শন করা আবশ্যক। বিজ্ঞান আলোচনার পক্ষে, এই যথেষ্ট-হেতুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। আরবদেশীয় দার্শনিক ও তর্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তর্কশাস্ত্রের এই নিয়মটি বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লাইবনীজ্ (Leibnitz) আরবদেশীয় তর্কশাস্ত্রের এই তত্ত্বটি ইয়োরোপীয় তর্কশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেন। বিজ্ঞানচর্চ্চার পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম।

প্রচলিত সকল ধর্ম্মই কি মিথ্যা ?

তৃতীয়। সকল প্রচলিত ধর্ম্মই মিথ্যা কি না? রাজা বলিতেছেন যে, যখন সকল ধর্ম্মই সত্য, এ কথা স্বীকার করা যায় না ; এবং কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম সত্য, ইহাও স্বীকার করা যায় না, তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মই মিথ্যা।

রাজার কথার উপরে একটি সমালোচনা হইতে পারে। সকল ধর্ম্মই মিথ্যা, ইহা রাজার যুক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয় না। ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোন ধর্ম্মই সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় না। অথবা কোন ধর্ম্মকেই সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। যখন কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় লোক বলেন যে, তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মই নিশ্চিত সত্য এবং অন্য সকল ধর্ম্ম মিথ্যা, তখন তাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ কথা বলেন না। বাস্তবিক, রাজার ইহাই অভিপ্রায়। রাজা বলিতেছেন, অসত্য সকল ধর্ম্মের পক্ষেই সাধারণ। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, যদি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা নিশ্চয়ই অমূলক। এ স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, রাজা সকল ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরে বিশ্বাস বিশ্বজনীন। এই বিশ্বজনীন স্বাভাবিক বিশ্বাস, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধীয় যুক্তি এবং কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তির দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। রাজার মতে পরমেশ্বরের অস্তিত্বরূপ সত্য, সকল ধর্ম্মেই বর্ত্তমান। রাজার মতে, সকল ধর্ম্মের লোক যখন পরমেশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তখন সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল ধর্ম্মেই যখন বিশেষ বিশেষ অমূলক মত এবং বিশেষ বিশেষ অযুক্তিসিদ্ধ বাহ্য অনুষ্ঠানসকল রহিয়াছে, তখন সকল ধর্ম্মেই অসত্য বর্ত্তমান।

কিরূপে সত্যানুসন্ধান করিবে ?

তৎপরে রাজা বলিতেছেন যে, লোকে স্বাভাবিক বিশ্বাস, এবং অভ্যাসসম্ভূত ও বাহ্য কারণে উৎপন্ন সংস্কারের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারে না। এ বিষয়ে রাজার মত অষ্টাদশ শতাব্দীর ডীয়িষ্ট্‌দিগের তুল্য। তাহার পর রাজা বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক যে, কি স্বাভাবিক ও কি অস্বাভাবিক, কি আন্তরিক, এবং কি বা বাহ্য ও আকস্মিক কারণে উৎপন্ন। সত্যনির্ণয় করিত হইলে, এরূপ অনুসন্ধান আবশ্যক ; লোকে তাহা করে না। সুপ্রসিদ্ধ ইয়োরোপীয় দার্শনিক লক্‌ও এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। রাজা বলেন যে, সকল বিষয়েই দুইটি বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পদার্থ সকলের বাস্তব প্রকৃতি ও গুণ। দ্বিতীয়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের জ্ঞান, সেই সকল কার্য্যের ফল এবং ফলের তারতম্য। এই দুইটি বিষয় জ্ঞানোপার্জ্জনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

কেন লোকে সত্যানুসন্ধান করে না ?

এই কথাটি আরবদেশীয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে, সরল ভ্রাতৃমণ্ডলীর (Sincere brethren) কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক লকের রচিত 'Essay concerning the human understanding' নামক পুস্তকেও আছে। রাজা এই মতটি আরবদেশীয় দর্শনশাস্ত্রে ও তৎপরে লকের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলেন। রাজা বলিতেছেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ এ প্রকার ধর্ম্মালোচনা করেন না। সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যের জ্ঞানলাভেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মনুষ্য ধর্ম্মবিষয়ে সে প্রকার অনুসন্ধান করে না। কেন করে না, রাজা তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নেতৃগণ আপনাদের সম্মান ও গৌরবের জন্য কতক্‌গুলি যুক্তিশূন্য মতের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়, অলৌকিক শক্তি এবং অলৌকিক ক্রিয়াদ্বারা তাঁহারা আপনাদের মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। তৃতীয়, এই প্রকারে তাঁহারা লোকদিগকে পরিত্রাণের আশা দেন বলিয়া অনেক লোক তাঁহাদের শিষ্য হয়। চতুর্থ, এই সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা মনুষ্যের স্বাভাবিক বিচারশক্তি ও বিবেকের ক্রিয়া রহিত করিয়া দেন। লোকে আপনাদিগের বিচারবুদ্ধি এবং বিবেককে বলিদান দিয়া, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের আজ্ঞানুসারে চলিতে থাকে। পঞ্চম, লোকে অলৌকিক ক্রিয়া এবং অসম্ভব গল্প সকল পাঠ করিয়া আপনাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের এমনই মনের ভাব যে, তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে যতই অধিকতর অসম্ভব ব্যাপার শ্রবণ বা পাঠ করেন, ততই তাঁহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়। মনুষ্যের জ্ঞান ও বিচারশক্তি এমনই শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ষষ্ঠ, লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, যে সকল কার্য্য ইহলোকে জনসমাজের পক্ষে অনিষ্টকর এবং পরলোকে দুর্গতির কারণ, তাহাও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের নিকট পরিত্রাণপ্রদ কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মিথ্যা বাক্য, চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যভিচার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। প্রচলিত কোন কোন হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সপ্তম, যদি কখনও কেহ ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনভাবে সত্য নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, সে নিজেই হয়ত এবং অপর সকলে ঐ ইচ্ছাকে পাপবুদ্ধি বা শয়তানের কার্য্য

বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে ; এবং সে নিজেই হয়ত ঐরূপ ইচ্ছাকে দুর্ব্বুদ্ধি বলিয়া উহা মন হইতে দূর করিয়া দিবে।

এ স্থলে রাজা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। ফরাসী দেশের এনসাইক্লোপিডিষ্টগণ (Encyclopædist), ভল্টেয়ার (Voltaire) ডিডিরো (Diderot) হেল্ভিটিয়াস (Helvetius) এবং ভল্নি (Volney) চতুর স্বার্থপর ধর্ম্ম-যাজকদিগকে এইরূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও বিবেক যে কতদূর বিকৃত ও বিশৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মের বিষয় বলিতে গিয়া রাজা তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্বাসের বিষয় যত অদ্ভুত ও অসম্ভব হয়, ততই তাহা বিশ্বাসকে বর্দ্ধিত করে, রাজা এই একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন। প্রাচীনকালের একজন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজক টার্টুলিয়ান, (Tertullian) (Christian father) ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন বিশেষ মত বিষয়ে বলিয়াছেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস করি। ("I belicve, because it is impossible") রাজার আর একটি বিশেষ কথা এই যে, উপধর্ম্মের প্রভাবে লোকে পাপকার্য্যকেও পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। একথা ভল্টেয়ারও বলিয়াছেন।

জনসমাজ ও ধর্ম্ম

তৎপরে রাজা একটি গুরুতর কথা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহা নিশ্চিত যে, সমাজ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ধর্ম্মের একটি ভিত্তি। কিন্তু এই কথাটি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি অনেকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম, সিসিরো এবং বার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, মনুষ্যসমাজ পরমেশ্বরের সৃষ্ট। পরমেশ্বর ধর্ম্মরাজ ; মনুষ্য সমাজের কর্ত্তা ও নেতা। তিনি সমাজে ধর্ম্মসংস্থাপন ও ধর্ম্মসংরক্ষণ করেন। সেইজন্য আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্যসকল, কেবল সামাজিক নহে। সামাজিক কর্ত্তব্য সকলও পরমেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য। সামাজিক কর্ত্তব্যসকল একদিকে যেমন সামাজিক, আর একদিকে সেইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। সমাজ ও সামাজিক জীবন, ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ ; ধর্ম্মের পরিপুষ্টির জন্য। দ্বিতীয়, কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্ম সামাজিক জীবনের অঙ্গ-স্বরূপ :—সামাজিক জীবন পরিপালনের জন্য ধর্ম্ম ; অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের জন্য পরলোকে বিশ্বাস, পাপ পুণ্যে বিশ্বাস, এবং পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তায় বিশ্বাস আবশ্যক। এইরূপ বিশ্বাস কৃত্রিম নহে। ইহা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যাঁহারা এই সকল কথা বলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। আর কেহ কেহ এই সকল বিশ্বাসের সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিয়াও বলিয়া থাকেন যে, এ সকল সত্য হউক বা না হউক, এই সকল বিশ্বাস, সামাজিক জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এই সকল মত কার্য্যতঃ সত্য। যেহেতু, এই মত ও বিশ্বাসগুলি না থাকিলে, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের উচ্ছেদ হইত।

তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন যে, আত্মায় বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস, কৃত্রিম বা মনুষ্যকৃত। রাজা বা রাজপুরুষেরা, চতুর ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই সকল মত ও বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা এইরূপে জনসমাজকে শাসন ও পরিপালন করার সুবিধা হয়। এই সকল কৌশল বা উপায় সৃষ্টি না করিলে সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজশক্তি রক্ষা পাইত না।

এখন দেখা যাউক, ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌গণ এবং ফরাসীদেশীয় এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট্‌-গণ, এ বিষয়ে, উপরি-উক্ত মতের মধ্যে কে কোন্‌টি সমর্থন করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌গণ সকলেই আত্মা, পরলোক এবং পাপপুণ্যের পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস করিতেন ; তাঁহারা বলিতেন যে, ইহসংসারেই পরমেশ্বরের ধর্ম্মশাসন রহিয়াছে। সমাজে পাপপুণ্যের ফলাফলের ঐশ্বরিক নিয়ম রহিয়াছে। তবে, ইহজীবন মনুষ্যের পরীক্ষার অবস্থা। এখানে পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কার যাহা অপূর্ণ থাকে, পরলোকে তাহা পূর্ণ হইবে।

ফরাসীদেশীয় এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট্‌দিগের মধ্যে দুই দল ছিল। প্রথম ভল্টেয়ার, ভল্‌নি এবং রুশো। ইঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। রুশো খ্রীষ্টিয়ানদিগের স্বর্গাদি সকলই বিশ্বাস করিতেন। ভল্টেয়ার খ্রীষ্টিয়ানদিগের স্বর্গ ও নরক বিষয়ক বিশেষ মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত মতকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরলোক এবং পাপ-পুণ্যের পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে সাধারণভাবে বিশ্বাস করিতেন ; অর্থাৎ স্বর্গনরক বিষয়ক প্রচলিত মত যত দূর পর্য্যন্ত জ্ঞানানুমোদিত, ততদূর পর্য্যন্ত তিনি বিশ্বাস করিতেন। এ বিষয়ে ভল্‌নির মত ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌দিগের ন্যায় ছিল। তবে, ভল্টেয়ার এবং ভল্‌নি বলিতেন যে, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে ও অন্যান্য শাস্ত্রে পরমেশ্বর পরলোক এবং স্বর্গনরক বিষয়ে যে সকল মত আছে, তাহা অত্যন্ত বিকৃত ও কুসংস্কারাপন্ন। তাঁহাদের মতে, পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান ও সাধনাদির ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাও কুসংস্কারপূর্ণ। ধর্ম্মযাজকেরা, অনেক সময় আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি ও গৌরবের জন্য, এবং অনেক সময় রাজাদিগের সুবিধা ও লাভের জন্য ঐ সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত ও অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন। ভল্‌নি বলেন যে, রাজারা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ, এই মত ধর্ম্মযাজক স্যামুয়েল প্রথম সৃষ্টি করেন। এ স্থলে চতুর ধর্ম্মযাজক ও চতুর রাজা একত্র হইয়া কার্য্য করিয়াছে।

২। ফরাসীদেশীয় এন্‌সাইক্লোপিডিষ্টদিগের মধ্যে আর এক দল ছিল। তাহারা নাস্তিক। হোলব্যাক্‌ (Holbach) হেল্‌ভিটিয়াস্‌ (Helvetius) লা মেট্রি (La Mettrie) এই দলভুক্ত ছিলেন। ডিডিরো (Diderot) কিছুকাল এই দলভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানবাত্মার অমরত্ব, এবং পাপ ও পুণ্যের পারলৌকিক দণ্ড-পুরস্কারে বিশ্বাস করিতেন না। বলা বাহুল্য যে, ধর্ম্মের অন্যান্য মত ও অনষ্ঠান সকলও ইঁহারা অস্বীকার করিতেন। ইঁহারা বলিতেন যে, ধর্ম্মযাজকেরা সাধারণ লোককে ভ্রমে ফেলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব, স্বর্গনরকের অস্তিত্ব প্রভৃতি মত সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহারা বলিতেন যে, বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানসকল, এবং পরমেশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস, এ সকলই স্বার্থপর ধর্ম্মযাজকদিগের সৃষ্টি। কেবল শাস্ত্র ও শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকে বিনাশ করিতে হইবে, এমন নহে, স্বাভাবিক ধর্ম্মও (Natural Religion) কুসংস্কার। উহাও অনিষ্টকর। উহাও ধর্ম্মযাজক ও রাজাদিগের সৃষ্টি। ইঁহাদের মতে, ধর্ম্মমাত্রকেই উচ্ছেদ করিয়া, জগৎকে, মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করা আবশ্যক।

এইরূপে মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করিবার উপায়, ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা। মানবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল, মানবের শারীরিক অভাবসকল, এবং জ্ঞানানুমোদিত স্বার্থের উপরে লোকশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সামাজিক অধিকার ও কর্ত্তব্যের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট, দেশের প্রত্যেক বালক ও

বালিকাকে এই প্রকার শিক্ষা প্রদান করিবেন। এই দলের লোকই প্রথমে জাতীয় সাধারণশিক্ষার মত প্রচার করেন। এই দলের অনেকে বলিতেন যে, ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, কেবল পরের মঙ্গল করিয়া আপনার মঙ্গল সাধন করিবার পন্থামাত্র। ধর্ম্ম কেবল জ্ঞানানুমোদিত স্বার্থসিদ্ধি।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম

আর একজন মহারথীর কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক। ইনি সংশয়বাদী হিউম। হিউম মনে করিতেন যে, পাপপুণ্যের পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কার প্রমাণ করা যায় না; অপ্রমাণও করা যায় না। মানবাত্মার অস্তিত্ব, মানবাত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্যের বুদ্ধি কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। কিন্তু হিউম বলেন যে, জগতের কৌশল দেখিলে আভাস পাওয়া যায় যে, একজন জ্ঞানময় নির্ম্মাণকর্ত্তা আছেন। তাঁহার স্বরূপ বা অন্যান্য লক্ষণ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার মতে, যদিও এই সকল বিষয় মানববুদ্ধির অতীত, তথাচ ঈশ্বর, পরলোক ও স্বর্গনরকে বিশ্বাস এবং ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান নিচয়, সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্ব্বসাধারণ লোকে এই সকল মতে বিশ্বাস করিলে সামাজিক শৃংখলা ও নীতি সুরক্ষিত হয়। হিউম্ বলেন, গুণাতীত পদার্থ (Substance), ঘটনার উৎপাদক কারণ, (Cause), আত্মা (Soul), ব্যক্তিগত একত্ব (Personal identity), জড় (Matter), এই সকল বিষয়ে কোন-রূপেই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই সকল বিষয়ে চলিত মত ও বিশ্বাস, যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। তথাচ, কার্য্যগত জীবনের জন্য এই সকল বিশ্বাস প্রয়োজনীয়। সেইরূপ ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস এবং ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান সকলে বিশ্বাস, যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও, উহা সর্ব্বসাধারণ লোকের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ।

এই সকল বিষয়ে তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন পুস্তকে রাজা কি মত প্রকাশ করিয়াছেন অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। রাজা বলিতেছেন যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ সামাজিক জীব। মনুষ্যের প্রকৃতিই এই যে, একত্র হইয়া সমাজে বাস করে।

এ স্থলে, জনসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে রাজার মত পাওয়া যাইতেছে। হব্‌স্ (Hobbes) লক্ (Locke) রুশো (Rousseau), ভল্‌নি (Volney) প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, চুক্তিদ্বারা প্রথমে জনসমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। মনুষ্য প্রথমে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বাস করিত। তৎপরে, তাহাদের নিজের সুবিধার জন্য, অধিকতর কল্যাণ-লাভের প্রত্যাশায়, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর একত্র হইল। উপরি-উক্ত পণ্ডিতগণের মতে এইরূপে জনসমাজের উৎপত্তি।

জনসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে এই চুক্তির মত (Contract) রাজা অবশ্য জানিতেন। কেননা রাজা লক্ প্রণীত গ্রন্থসকল বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। লকের গ্রন্থে এই মতের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। আইন ও দেশাচারের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজা এই মত কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জনসমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি উক্ত মত একেবারেই স্বীকার করেন নাই। জনসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে তিনি বলেন যে, জনসমাজ কোন কৃত্রিম পদার্থ নহে। কেহ মন্ত্রণা করিয়া উহা সৃষ্টি করে নাই। স্বভাবতঃ উহার উৎপত্তি হইয়াছে। জনসমাজ যে চুক্তি (Contract) করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতি হইতে মানবের সামাজিক অবস্থা। যদিও

এডমণ্ড বর্ক, কোন কোন স্থলে জনসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে এই চুক্তির কথা বলিয়াছেন, তথাচ বর্কেরও প্রকৃত মত এই ছিল যে, জনসমাজ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে বিজ্ঞান, ক্রমবিকাশের মত (Evolution) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানে মানবসমাজের স্বাভাবিক উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মনুষ্য স্বভাবতঃ সামাজিক জীব। মানবসমাজ কৃত্রিম পদার্থ নহে। কোন প্রকার চুক্তি বা মন্ত্রণাদ্বারা ইহার উৎপত্তি হয় নাই। মনুষ্য স্বভাবতঃ আসঙ্গলিপ্সু। মনুষ্য, আদিম অবস্থায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তাহার পর, সেই দলের মধ্যে এক একটি পরিবার সংগঠিত হইল। তাহার পর, Patriarchal Society; অর্থাৎ বংশের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বা প্রধান, তাঁহাদ্বারা পরিচালিত ও শাসিত সমাজ। তাহার পর, Theocratic Stage of the Patriarchal Society; অর্থাৎ বংশের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি ধর্ম্মাচার্য্যরূপে, যে সমাজ পরিচালিত ও শাসিত করিতেন। তাহার পর, রাজা ও রাজশাসনের উৎপত্তি। সমাজ-সংগঠনের পক্ষে কি কি বিষয় একান্ত আবশ্যক, রাজা তাহা বলিয়াছেন। প্রথম, পরস্পর আলাপ-পরিচয়ের জন্য ভাষা। দ্বিতীয়, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার জন্য আইন ও সামাজিক নিয়মাদি। তৃতীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূল সত্যে বিশ্বাস; যেমন দেহাতিরিক্ত আত্মাতে বিশ্বাস, এবং পরলোক ও পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস।

এ স্থলে রাজা ধর্ম্মের দুইটি ভিত্তির কথা বলিলেন। প্রথম, দেহাতিরিক্ত আত্মায় বিশ্বাস। দ্বিতীয়, পরলোকে পাপপুণ্যের ফলভোগে বিশ্বাস। রাজা ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলিলেন না কেন? এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বাসটিতে অর্থাৎ পরলোকে পাপপুণ্যের ফলভোগে বিশ্বাসে ঈশ্বরবিশ্বাস উহ্য রহিয়াছে। কেননা ঈশ্বরই ফলদাতা। সমাজের অঙ্গ কি? এই প্রসঙ্গে পরমেশ্বরের পূর্ণত্ব, ও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ সকল কথার সহিত সামাজিক প্রসঙ্গের সম্বন্ধ নাই। তবে পরমেশ্বর যে, পাপপুণ্যের দণ্ডদাতা ও পুরস্কর্ত্তা, তিনি যে বিধাতা, একথা সহজেই আসিয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ রাজা বলিতেছেন যে, এই সকল ধর্ম্মবিশ্বাস সমাজ সংগঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এগুলি সমাজের অঙ্গস্বরূপ। এ স্থলে রাজা সমাজকে ধর্ম্মের অঙ্গ না বলিয়া ধর্মকে সমাজের অঙ্গ বলিতেছেন। ইহা ইয়োরোপীয় পণ্ডিত হিউম এবং ক্যাণ্ট, এবং ফরাসীদেশীয় এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট্‌দিগেরও মত।

তৃতীয়তঃ রাজা তিনটি বিষয়কে, সমাজের অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় আইন ও আচার-ব্যবহার, তৃতীয় ধর্ম্ম।

ধর্ম্মবিশ্বাসকে রাজা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস, যেমন আত্মায় বিশ্বাস এবং পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস। এই মূল বিশ্বাস, জনসমাজসংগঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন, রাজার মতে এমন অনেক প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস আছে, যাহা জনসমাজসংগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে; বরং অনেক স্থলে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। যেমন, শুভ ও অশুভ, শুচি ও অশুচি, এবং আহারপান ও উপবাসাদি বিষয়ক অযুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস ও নিয়মসকল জনসমাজের পক্ষে অহিতকর।

ভল্টিয়ার ও রুশো, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় সমাজের অযুক্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রবল পরাক্রমে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন, রোমানক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানদিগের যুক্তিশূন্য বাহ্য অনুষ্ঠান, বৃথা বৈরাগ্য, প্রায়শ্চিত্ত, কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাসাদি, ধর্ম্মযাজকের নিকট পাপস্বীকার, ইত্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের

অসারতা, তাঁহারা যেরূপ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, রাজাও সেইরূপ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মের কুসংস্কার ও অনিষ্টকর অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে লেখনী চালনা করিয়াছেন।

ঈশ্বর ও পরলোক

এ স্থলে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, দেহাতিরিক্ত আত্মাকে বিশ্বাস এবং পাপপুণ্যের পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস, এই যে দুটি ধর্ম্মের মূল সত্য, ইহার প্রমাণ কি? রাজা বলিতেছেন যে, এগুলি জনসমাজসংগঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস, সমাজের অঙ্গস্বরূপ। এই দুটি বিশ্বাসের উপরে সমাজ-সংগঠন নির্ভর করে। ধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস ভিন্ন, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ রাজা বলিতেছেন যে, আদৌ এই দুটি বিশ্বাস ভিন্ন, ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, এই মূল বিশ্বাস, সত্য কিনা?

রাজা বলিতেছেন যে, আত্মা ও পরলোকের বাস্তব অস্তিত্ব মানববুদ্ধির অগম্য বিষয়। এ স্থলে, রাজা যে বাস্তব অস্তিত্বের কথা বলিতেছেন, উহার তাৎপর্য্য কি? উহার অর্থ, স্বরূপ সত্তা, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ ও পরলোকের প্রকৃত অবস্থা। রাজা বলেন, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং পরকালের প্রকৃত অবস্থা, মনুষ্যের পক্ষে অবোধ্য।

এ স্থলে এমন কেহ মনে না করেন যে, রাজা আত্মা ও পরলোকে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিতেছেন। তাঁহার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা ও পরলোকের প্রকৃত স্বরূপ মানববুদ্ধির অতীত বিষয়।* তথাচ তিনি বলিতেছেন যে, সাধারণের জন্য আত্মা ও পরলোক বিষয়ে কতকগুলি আভাস প্রয়োজনীয়। আত্মা ও পরলোক এবং স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে সাধারণের উপযোগী স্থূল ধারণা, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। রাজার মতে, এ সকল গূঢ়তত্ত্ব হইলেও এ-সকলের লৌকিক আভাস বা অধ্যাস আবশ্যক। প্রচলিত ধর্ম্মসকলে, আত্মা, পরলোক এবং স্বর্গনরকবিষয়ে, স্থূল ভাবে যে সকল আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা তিনি উপকারী ও প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে এ প্রকার আভাস না থাকিলে সমাজশাসন ও সংরক্ষণ চলিতে পারে না।

তাহার পর, তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে রাজা প্রমাণ করিতেছেন যে, এই সামঞ্জস্য-পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের একজন স্রষ্টা, নিয়ন্তা এবং বিধাতা আছেন। তিনি তাঁহার অনন্ত জ্ঞান-দ্বারা এই জগৎকে পরিচালিত করিতেছেন। জনসমাজের মঙ্গলই জগদীশ্বরের ইচ্ছা। জগদীশ্বরের ইচ্ছা জানিবার জন্য জ্ঞান ও বিবেকরূপে আমাদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি রহিয়াছে। স্বাভাবিক জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া আমরা পরমেশ্বরের নিকট হইতে সত্য-লাভ করি। পরমেশ্বর যে, বিশেষ কালে বা বিশেষ দেশে কোন বিশেষ শাস্ত্র দিয়াছেন, ইহা রাজা স্বীকার করিতেন না। রাজার মতে, সমাজের হিতসাধন করা আমাদের পরম ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন, যে সকল ধর্ম্মবিধি আছে, তাহা নিষ্ফল অথবা অনিষ্টকর। এই দুটি রাজার স্থিরসিদ্ধান্ত।

---

* কোন শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়কে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পরলোক বিষয়ে তিনি কি জানেন? রাজা তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, মাতৃগর্ভস্থ শিশু পৃথিবীর বিষয় যেরূপ জানে, তিনিও পরলোকের বিষয় সেইরূপ জানেন।

তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থের এই সকল মত রাজা চিরজীবনই এক প্রকার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর ও আত্মা যে, স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় তাহা তিনি তাঁহার রচিত বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পরলোকাদির স্বরূপ বিষয়ে কিছু না বলিয়া রাজা চিরদিনই বলিয়াছেন, শমদমাদি সাধন ও লোকহিতপালনই পরম ধর্ম্ম।

সত্যাসত্য বিচার

তৎপরে রাজা বলিতেছেন যে, মনুষ্যের এমন একটি স্বাভাবিক মানসিক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা মনুষ্য সত্য এবং অসত্যের প্রভেদ বুঝিতে পারে ; অর্থাৎ ন্যায়বান্ ও অপক্ষপাতী হইয়া কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে মনুষ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানের আলোচনাদ্বারা ধর্ম্মবিষয়ে সত্যাসত্য বিচার করা একান্ত আবশ্যক।

ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞানদ্বারা সত্যনিরূপণ করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত লক্, বিশেষভাবে এই মতটি প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা শাস্ত্রনিরপেক্ষ-যুক্তিবাদের মূলসূত্র। ইংলণ্ডীয় ডীয়িস্ট্‌গণ এবং ফরাসীদেশীয় এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট্‌গণ ইহা স্বীকার করিতেন। মতাজল নামক যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও ইহা বিশেষভাবে মানিতেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এইরূপে কুসংস্কারবিবর্জ্জিত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অনুসন্ধান করিলে, মনুষ্য অন্যান্য ধর্ম্মমত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র মূলধর্ম্মবিশ্বাসে উপনীত হয় ; অর্থাৎ মনুষ্য তখন বুঝিতে পারে যে, একজন জগতের মূল কারণ ও নিয়ন্তা আছেন, এবং সমাজের হিতসাধনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম।

বিশেষ বিধান

তৎপরে রাজা বলিতেছেন যে, বিধাতা অপক্ষপাতী ও সমদর্শী হইয়া জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার নিয়মসকল বিশ্বজনীন। প্রাকৃতিক সমুদয় নিয়ম সার্ব্বভৌমিক এবং সকলের প্রতি সমান। যখন বহির্জগতে পরমেশ্বরের কার্য্য-প্রণালী এই প্রকার, তখন ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, তিনি কোন বিশেষ মনোনীত জাতির নিকটে বিশেষ কোন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ কোন শাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। যেমন বহির্জগৎ সম্বন্ধে তিনি বিশ্বজনীন নিয়মদ্বারা কার্য্য করিতেছেন, সেইরূপ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও তিনি সাধারণ নিয়মদ্বারাই কার্য্য করেন। বহির্জগতের ন্যায় তিনি অন্তর্জগতেও জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছেন। বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ জাতির জন্য তিনি বিশেষ কোন বিধান করিয়াছেন, রাজা তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে এরূপ মত অস্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্য, রাজা উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আমরা স্বাভাবিকরূপে পরমেশ্বরের নিকট হইতে অন্তরে যে জ্ঞানলাভ করি, তাহাই যথেষ্ট। উহার পরিচালনার দ্বারাই মনুষ্যের উন্নতি হয়। উহার পরিচালনার জন্য মনুষ্য দায়ী। মনুষ্য কোন প্রকার অলৌকিক প্রণালীতে পরমেশ্বরের নিকট হইতে ধর্ম্ম জানিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং রাজা খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্র, মুসলমান শাস্ত্র এবং হিন্দুশাস্ত্রকে অলৌকিকরূপে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ঐ সকল শাস্ত্র মনুষ্যের জ্ঞান ও বিবেক পরিচালনার ফল। মনুষ্য স্বভাবতঃ জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া শাস্ত্রের সত্য লাভ করিয়াছে। পরমেশ্বর অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক-রূপে উহা প্রদান করেন নাই।

রাজা তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, টোল্যাণ্ড এবং টিণ্ডেল প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্‌গণও ঐ প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ ('Christianity not mysterious', and 'Christianity as old as the creation') পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

মতাজলরাও বলিতেন যে, কোরান নশ্বর। কোরান ভিন্ন, ঈশ্বর মনুষ্যকে বুদ্ধি ও জগৎ দিয়াছেন। মনুষ্য নিজের বুদ্ধির সাহায্যে জগৎকার্য্যের আলোচনাদ্বারা উন্নতি-সাধন করিতে পারে। কিন্তু মতাজলরা বলিতেন যে, পরমেশ্বর সময়ে সময়ে অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ কোন পয়গম্বরকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন। মহম্মদ সেইরূপ একজন ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বর।

তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে মতাজলদিগের সহিত রাজার মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। রাজার এই মত পরে কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, আমরা তাহা ক্রমে প্রদর্শন করিব।

দুই প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস

রাজা তৎপরে, তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থে, ধর্ম্মবিশ্বাস সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছেন। প্রথম, জগতের আদিকারণ পরমেশ্বরে বিশ্বাস। তিনি আপনার জ্ঞানদ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছেন। এই বিশ্বাসটি বিশ্বজনীন। রাজা মনে করিতেন যে, এই বিশ্বাসটি যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইতে পারে। জগৎকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা দ্বারা একজন জ্ঞানময় আদিকারণের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা বর্ত্তমান ;—গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র সকলের সুশৃঙ্খলাময় গতিবিধি, বিভিন্নপ্রকার জীব ও উদ্ভিজ্জনিচয়ের বিভিন্ন প্রকার জীবনপ্রণালী, এবং জীব উদ্ভিজ্জ সকলের বংশরক্ষার জন্য সুকৌশলময় ব্যবস্থা ; জন্তুদিগের মধ্যে স্বাভাবিক অপত্য স্নেহ ; এই সকল হইতে পরমেশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ করিবার জন্য কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। পেলি সাহেব এই কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চামার্স সাহেব বাহ্য ও অন্ত-র্জগৎ এবং জড় ও জীবনবিশিষ্ট পদার্থের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তকে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। পেলি এবং চামার্সের গ্রন্থ, রাজা অবশ্যই পাঠ করিয়া থাকিবেন। পেলি এবং চামার্স উভয়েই উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত (Theologian)। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া রাজা অবশ্যই উক্ত দুই-খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকিবেন।

পরমেশ্বরে এই প্রকার বিশ্বাস ভিন্ন, লোকে তাঁহার বিশেষ বিশেষ স্বরূপলক্ষণে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল বিশেষ বিশেষ মত আছে, তাহা বিশেষ শিক্ষা এবং বিশেষ অভ্যাসের ফল। স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত সংস্কার সকল লোকে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। লোকে পরমেশ্বরকে কেবল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করে, এমন নহে, তাঁহার সম্বন্ধে অন্যরূপ সংস্কারও পোষণ করিয়া থাকে। এমন সকল লোক আছেন, যাঁহারা সৃষ্টিশক্তিকে প্রকৃতি কিম্বা কাল বলিয়া মনে করেন। অনেকে এই জগৎকেই পরমেশ্বর বলিয়া মনে করেন। ইহা এক প্রকার অদ্বৈতবাদ। অনেকে পরমেশ্বরে মানবীয় মনোবৃত্তি, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি আরোপ করেন। বহুলোকে সৃষ্টপদার্থ বা জীবকে পরমেশ্বর মনে করিয়া তাহার পূজা করেন। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান ধর্ম্ম-জগতে লক্ষিত হয়। যেমন বিশেষ কোন নদীতে স্নান করিয়া লোকে মনে করে, তাহাদের

পাপক্ষয় ও পরিত্রাণ হইবে। লোকে বিশ্বাস করে যে, ধর্ম্মযাজককে অর্থ দিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাপের ক্ষমা ও পরিত্রাণ ক্রয় করা যায়। অভ্যাস এবং দেশাচার লোকের এই প্রকার বিশ্বাসের কারণ। কার্য্যকারণসম্বন্ধ বিষয়ে লোকে অন্ধ বলিয়াই এই প্রকার বিশ্বাস জনসমাজে তিষ্ঠিতে পারে। এ সকল বিশ্বাসের কোন জ্ঞানমূলক ভিত্তি নাই। লোকে মনে করে যে, এই সকল অনুষ্ঠানের কোন প্রকার অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক শক্তি আছে।

অলৌকিক ক্রিয়া

রাজা রামমোহন রায় অলৌকিক ক্রিয়া (Miracles) সম্বন্ধে তুহ্ফাতুল গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিতেছি। প্রথম, লোকে বলিয়া থাকে যে, এমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা আছে, যাহা এতই আশ্চর্য্য যে, ঐ সকলকে অলৌকিক ক্রিয়া বলা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। যখন সাধারণ লোকে কোন ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে পারে না, তখন তাহারা মনে করে যে, উহা অলৌকিক ঘটনা, ঐশীশক্তিদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ঘটনার স্বাভাবিক কারণ বিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন লোকে মনে করে যে, উহার কোন স্বাভাবিক কারণ নাই। উহা কোন অলৌকিক বা দৈবশক্তিদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। লোকের এই প্রকার অজ্ঞতা দেখিয়া ধর্ম্মযাজকেরা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণের মধ্যে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন। অলৌকিক বা দৈব ঘটনায় বিশ্বাস ভারতবর্ষে এত অধিক যে, যে স্থলে কোন আশ্চর্য্য ঘটনার স্বাভাবিক কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়, সে স্থলেও লোকে মনে করে যে, উহা পরলোকগত কোন মহাজন দ্বারা অথবা কোন জীবিত সাধুদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে অলৌকিক ক্রিয়ার অযুক্ততা বিষয়ে, যে সকল যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি।

প্রথমতঃ ব্যাপ্তিনির্ণয় (Inductive reason) দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এই জগতের ঘটনাসকল পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বন্ধ। এ জগতের সকল বিষয়ই বিশেষ কারণ এবং বিশেষ অবস্থার উপরে নির্ভর করে। বাস্তবিক এরূপ বলা যায় যে, প্রকৃতির অন্তর্গত যে কোন একটি বিষয়ের সহিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এ স্থলে রাজা যে প্রকারে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা যথার্থই আশ্চর্য্য। ঘটনা নিচয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কথা বলিয়া, রাজা প্রদর্শন করিতেছেন যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশের সহিত সম্বদ্ধ। জগতের সকল ঘটনা ও সকল পদার্থের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিউম সাহেব কারণবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রাজার ব্যাখ্যা তদপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

(ক) এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার কারণ আমরা প্রথমে স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি না ; কিন্তু বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে, অথবা অন্যের নিকটে তদ্বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিলে, তাহার কারণ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। ইয়োরোপীয়গণ অনেক আশ্চর্য্য যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে আমরা উহার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারি না ; কিন্তু কিরূপে যন্ত্রের কার্য্য হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিলে উহা বুঝা যায়। বাজিকরেরা অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া লোককে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করে। আমরা প্রথমে তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না ; কিন্তু সে বিষয় অনুসন্ধান ও শিক্ষা করিলে, উহার সকল তত্ত্বই বুঝা যায়। এই সকল বিষয় আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, ইহা নিশ্চয় যে, কার্য্যকারণসম্বন্ধদ্বারা সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(খ) এমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা আছে, লোকে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও যাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে না। এই সকল ঘটনা, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সংঘটিত হইয়াছে, না বলিয়া ইহাই বলা উচিত যে, আমরা ঐ সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে অক্ষম হইতেছি। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোন ঘটনা উৎপন্ন হয়, এ কথা নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ।

(গ) যদি আমরা এমন কোন আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় শ্রবণ করি, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতা (Experience)-বিরুদ্ধ তাহা হইলে আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি কেহ বলেন যে, কোন লোক মৃতব্যক্তিকে জীবনদান করিয়াছে ; অথবা কোন ব্যক্তি সশরীরে স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে এরূপ কথা আমাদিগের অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ হইল। লোকে বলিতে পারে যে, এরূপ ঘটনা বহুকাল পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, উহা আমাদের অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

(ঘ) যখন দুইটি ঘটনার মধ্যে কোন সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না, তখন তাহার মধ্যে একটিকে কারণ এবং অপরটিকে কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেহ যদি বলেন যে, মন্ত্রপাঠমাত্র কোন ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার হইয়াছেন, তাহা হইলে আমরা এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। সাংসারিক ব্যাপারে দেখা যায় যে, যে সকল বিষয়ের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, লোকে তাহার মধ্যে একটিকে কারণ এবং অপরটিকে কার্য্য কখনই বলে না। কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে লোকের বিচার-শক্তি এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে, যে সকল বিষয়ের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, এমন সকল বিষয়ের মধ্যেও লোকে কার্য্যকারণসম্বন্ধ দেখিতে পায়।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মযাজকেরা বলেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অবোধ্য বিষয় আছে। বিশ্বাস এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহের উপর ধর্ম্ম নির্ভর করে। ধর্ম্ম কখন বুদ্ধি ও বিচারের বিষয় নহে। ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা উচিত নহে। রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, যে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, এবং যাহা আমাদিগের জ্ঞানের বিরোধী, তাহা কখন বিজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া সমর্থন করিবার জন্য লোকে এই একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, কিছুই ছিল না, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি অবশ্যই মৃতদেহে জীবনসঞ্চার করিতে সমর্থ।

এ কথার উত্তরে রাজা বলিতেছেন যে, এই যুক্তিদ্বারা কেবল এই মাত্র প্রমাণ হইতেছে যে, এরূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে ; কিন্তু প্রাচীনকালের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের দ্বারা এরূপ ঘটনা যে বাস্তবিক সংঘটিত হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান সময়েও সাধুদিগের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন হয় না।

এ বিষয়ে রাজা আর একটি কথা বলিতেছেন যে, কোন বিশেষ ঘটনা সত্য কিনা, এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে, কেহ যদি বলেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে পারেন, সুতরাং উহা যথার্থ হইতে পারে, তাহা হইলে সে কথা নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি সম্ভব এবং অসম্ভবের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকে, যদি সকল বিষয়কেই সমভাবে সম্ভব বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তর্কশাস্ত্রের সকল যুক্তিই বৃথা হইয়া যায় ; প্রমাণ ও প্রমেয় কিছুই থাকে না। কোন্ বিষয় কতদূর সম্ভব বা কতদূর নিশ্চিত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই যুক্তিশাস্ত্রানুসারে বিচার করা হইয়া থাকে। কিন্তু

যদি পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে প্রমাণ ও অপ্রমাণ সকলই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

রাজা উক্ত যুক্তির আর একটি উত্তর এইরূপে দিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া তিনি যে অসম্ভব বিষয় সৃষ্টি করিতে পারেন, এমন কখনই হইতে পারে না। মুসলমানদিগের পাঁচটি বিশেষ বিশ্বাস আছে। তন্মধ্যে একটি বিশ্বাস এই যে, তাঁহার কোন সরিক নাই। তাঁহার স্বত্বাধিকারের অংশী নাই। সিয়া এবং সুন্নি উভয় দলের লোকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বরের সরিক নাই। রাজা বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া কি তিনি আপনার সরিক সৃষ্টি করিতে পারেন? কখনই বলিতে পারিবে না যে, তিনি পারেন। কেননা যাহার সরিক আছে, সে ঈশ্বর হইতে পারে না। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া তিনি কি আত্মবিনাশ করিতে পারেন? যদি বল পারেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইলেন না। পরমেশ্বর নিত্য; যাহার বিনাশ সম্ভব, সে কেমন করিয়া পরমেশ্বর হইবে? দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় কখন সত্য হইতে পারে না। যেমন, একই সময়ে ও একই স্থানে আমি আছি ও নাই; ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইলেও দুই সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় (Contradictories) কখন সত্য হইতে পারে না।

মতাজল নামক মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকে স্পষ্টই বলিতেন যে, পরমেশ্বর কখন অসম্ভব বিষয় সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরমেশ্বর যে, আপনার সরিক সৃষ্টি করিতে পারেন না, এবং তিনি আত্মবিনাশে অক্ষম, এ দুটি দৃষ্টান্তই তাঁহারা প্রদান করিতেন। রাজা তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে মতাজলদিগের মতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এ সকল কথা লিখিয়াছেন। মতাজলরা বলিতেন যে, পরমেশ্বরের যে সকল গুণ, তাহা তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরমেশ্বরের শক্তি, তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। সুতরাং পরমেশ্বর তাঁহার স্বরূপ হইতে কখন বিচ্যুত হইতে পারেন না। সিফাতিয়ান নামক এক মুসলমান সম্প্রদায় এ বিষয়ে মতাজলদিগের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে, পরমেশ্বরের গুণ তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক। পরমেশ্বর তাঁহার শক্তিদ্বারা সম্ভব এবং অসম্ভব সকলই করিতে পারেন।

তৎপরে রাজা অলৌকিক ক্রিয়ার প্রমাণস্বরূপ শব্দপ্রমাণের বিষয় বিচার করিতেছেন।

(ক) লোকে বলিয়া থাকে যে, শব্দপ্রমাণদ্বারা অলৌকিক ক্রিয়ার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। প্রাচীনকালে এমন সকল লোক ছিলেন, যাঁহাদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব। অলৌকিক ক্রিয়ার বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তৎপরে, হস্তলিপি-দ্বারা বা মুখেমুখে বংশ-পরম্পরায় সেই সংবাদ চলিয়া আসিতেছে। প্রথম বংশের লোকের নিকট শুনিয়া দ্বিতীয় বংশের লোকে উহা বলিয়াছে, এবং দ্বিতীয় বংশের লোকের নিকট শুনিয়া তৃতীয় বংশের লোকে উহা বলিয়াছে, এইরূপে অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বর্ত্তমান বংশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। অথবা, হস্তলিপিদ্বারা উহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। এই যে জনশ্রুতি বা শব্দপ্রমাণ, ইহা অবশ্য অলৌকিক ক্রিয়ার যাথার্থ্য বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, শব্দপ্রমাণ অবশ্য প্রমাণ বটে। কিন্তু যাঁহারা শব্দপ্রমাণদ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া সমর্থন করিয়া থাকেন, শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রকৃত জ্ঞান নাই। তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীনকালের এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অলৌকিক ক্রিয়ার সংবাদ আসিয়াছে, যাঁহাদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব ছিল। কিন্তু এরূপ এক শ্রেণীর লোক যে, প্রাচীনকালে ছিলেন, তাহার প্রমাণ

কি? সুতরাং এই প্রকার জনশ্রুতি বা শব্দপ্রমাণদ্বারা প্রাচীনকালের ঘটনা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ ঘটনা দেখিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইতেছে, তাঁহাদের সত্যবাদিত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক।

ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ

রাজার মতে নিম্নলিখিত দুই প্রকার প্রমাণদ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথম, এরূপ চাক্ষুষদর্শীর সাক্ষ্য আবশ্যক, যাঁহাদের কথায় অন্য কেহ প্রতিবাদ করেন নাই; অথবা অন্য কেহ অন্যরূপ বলেন নাই। উক্ত চাক্ষুষদর্শী সাক্ষীদিগের সত্যবাদিত্ব বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ থাকিলে উক্ত ঘটনার যাথার্থ্য বিষয় আরও দৃঢ়ীকৃত হয়। দ্বিতীয়, উক্ত ঘটনাটি আমাদের অভিজ্ঞতা (Experience) বিরুদ্ধ না হয়: অর্থাৎ উক্ত ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ না হয়। কোন ঘটনায় এই সকল লক্ষণ থাকিলে, তাহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে; অর্থাৎ উহা সম্ভবপর (Probable) বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে অল্প লোকেই সাক্ষ্য দান করুন, বা অধিক লোকেই সাক্ষ্য দান করুন, তাহাতে কিছু আসে যায় না; উহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

কিন্তু রাজা বলিতেছেন যে, অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী রহিয়াছে, তাহা এ প্রকার নহে। তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ এবং আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ। কিম্বদন্তী সকল পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়াতে, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহা অমূলক। কিম্বদন্তী সকল জ্ঞানের বিরুদ্ধ ও পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাসের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আমরা সমুদায় ঐতিহাসিক ঘটনা শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অলৌকিক ক্রিয়ার পক্ষসমর্থনকারীগণ বলেন যে, যদি তুমি প্রাচীনকালের রাজাদিগের বৃত্তান্ত শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস করিতে পার, তাহা হইলে সেই প্রকার প্রমাণেই অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস কর না কেন? বোধ হয়, পেলি এবং হোয়েট্‌লি সাহেবের যুক্তি স্মরণ করিয়া, রাজা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। হোয়েট্‌লি বলিয়াছেন যে, যদি নেপোলিয়ান বোনাপার্টির বৃত্তান্ত বিশ্বাস কর, তাহা হইলে যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থানে কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিতে পার? উভয় প্রকার ঘটনাই এক প্রকার প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

রাজা এই যুক্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকৃত প্রমাণ কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অর্থাৎ তাহার বিবরণ আমাদের জ্ঞান-বিরুদ্ধ এবং পরস্পরবিরুদ্ধ না হয়। ইতিহাসে যে সকল রাজাদিগের বৃত্তান্ত আছে, তাহা এই প্রকার। রাজাদিগের সিংহাসনারোহণ, শত্রুদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ প্রভৃতির বৃত্তান্ত ঐ প্রকার বলিয়া, অর্থাৎ উহা আমাদের জ্ঞানবিরুদ্ধ ও পরস্পরবিরুদ্ধ নহে বলিয়া আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। কিন্তু অলৌকিক ক্রিয়ার বৃত্তান্ত সেরূপ নহে। উহা আমাদের জ্ঞানবিরুদ্ধ এবং পরস্পরবিরুদ্ধ।. সুতরাং আমরা উহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না।

রাজা এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা এই বলিতেছেন যে, যদিই বা ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাচ অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নিঃসংশয়বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায় না। পরোক্ষ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা কখন সম্ভব নহে। যে সকল ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ নহে, এবং যাহা প্রত্যক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, (যেমন অতীত কালের

ঘটনাসকল) তাহা কেবল সম্ভবপর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। (সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক লক্‌ও এই কথা বলিয়াছেন।) রাজা বলিতেছেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাসকল সত্য হওয়া যে অত্যন্ত সম্ভব, শব্দপ্রমাণে কেবল এই পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হয়। ইতিবৃত্তে রাজাদিগের বংশাবলি, জন্ম, এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা সম্ভবপর ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐতিহাসিক ঘটনায় বিশ্বাস এই প্রকার। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস কখন এ প্রকার হইতে পারে না। উহা নিঃসংশয় ও নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যে প্রকার প্রমাণে ঐতিহাসিক ঘটনায় আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেই প্রকার প্রমাণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস কখন সমর্থিত হইতে পারে না। ঐতিহাসিক ঘটনায় বিশ্বাস এবং ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাস কখন এক প্রকার হইতে পারে না। সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ, এবং ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাসের প্রমাণ কখন একরূপ হইতে পারে না।

এ স্থলে রাজা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিলেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্য, আমাদের দুই বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। ঐতিহাসিক ঘটনা, আমরা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি ; কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য, অবশ্যম্ভাবীরূপে অথবা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণীকৃত বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন, তর্ক করিয়া কোন বিষয় প্রমাণ করা এক, আর মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ, বা আধ্যাত্মিক তৃপ্তি ও সন্তোষ, এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

এতদ্ভিন্ন, প্রকৃতরূপ প্রমাণ না থাকিলে, ঐতিহাসিক ঘটনাও নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। যেমন, কেহ কেহ বলেন যে, আলেক্‌জাণ্ডার বা সেকেন্দার সা চীনদেশ জয় করিয়াছিলেন। যদিও এ বিষয়ে মুসলমানদিগের মধ্যে এবং মধ্যআসিয়া-বাসীদিগের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে, তথাচ পারস্যদেশীয় এবং গ্রীক ইতিবৃত্তলেখকগণ উহা লিপিবদ্ধ করেন নাই বলিয়া আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন সেকেন্দার সা'র জন্ম সম্বন্ধে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা অলৌকিক বলিয়া গৃহীত হয় না।

এস্থলে রাজা ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা ও মৌলিকত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। জর্ম্মানদেশীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিত নিবুর ঐতিহাসিক সমালোচনার (Historical Criticism) সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি রোমদেশীয় পুরাতত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল এইরূপে পরীক্ষা করিয়া উহার আদিবিবরণের অধিকাংশই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। ইংলণ্ডে, আর্ণল্ড, লিউইস্‌ প্রভৃতি ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিবুরের শিষ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। সার জর্জ্জ কর্ণওয়াল লিউইস্‌ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ বিষয়ে (On the Canons of Historic Credibility) একখানি গ্রন্থ লেখেন। রাজা নিবুরের অল্পদিন পরে, এবং আর্ণল্ড ও লিউইসের পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে এ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন, তাহা যথার্থই আশ্চর্য্য। রাজা জর্ম্মান ভাষা জানিতেন না। তাঁহার সময়ে নিবুরের গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদিত হয় নাই। অথচ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও মৌলিকত্বই প্রকাশ পাইতেছে। সেকেন্দার সা'র চীনদেশবিজয়ের দৃষ্টান্তদ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বন্ধীয় প্রমাণের বিষয়টি কেমন পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ঐতিহাসিক সমালোচনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তাঁহার সময়ে উহা কিছুই ছিল না। সুতরাং তাঁহার ঐতিহাসিক সমালোচনা যথার্থই বিস্ময়কর।

অলৌকিক ক্রিয়াবাদীগণ বলেন যে, কে কাহার পুত্র, ইহা শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস করিতে

হয়। সুতরাং শব্দপ্রমাণে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করা কখনও যুক্তিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। রাজা এই যুক্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, পুত্রের পিতা নির্ণয় সম্বন্ধে, অবশ্য, শব্দপ্রমাণের প্রতি নির্ভর করিতে হয়। এক জাতীয় জীবের মধ্যে সন্তানের উৎপত্তি জগতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ কোন ঘটনার কথা বলিলে, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। যেমন খৃষ্টিয়ানেরা বলেন, যীশুখৃষ্টের জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হয় নাই। ইহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অপর গ্রন্থে রাজা বলিয়াছেন যে, এক জাতীয় পিতামাতার সন্তান, যদি ভিন্ন জাতীয় জীব বলিয়া কথিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, উক্ত সন্তানের জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হয় নাই। এইরূপ অস্বাভাবিক জীবের কথা রাজা উপহাসের সহিত উড়াইয়া দিয়াছেন।

মধ্যবর্ত্তিবাদ

তৎপরে, রাজা মধ্যবর্ত্তিবাদ খণ্ডন করিতেছেন। তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে রাজা পয়গম্বরদিগের মধ্যবর্ত্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে, পয়গম্বরগণ যে, মধ্যবর্ত্তী, এবং তাঁহাদের মধ্য দিয়া পরমেশ্বর শাস্ত্র প্রেরণ করেন, রাজা ইহা স্বীকার করেন নাই। মধ্যবর্ত্তিবাদীরা বলেন যে, জগদীশ্বর স্বাভাবিক নিয়মে জগতের কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন। স্বাভাবিক কার্য্যকারণসম্বন্ধদ্বারা জগতের পদার্থসকলের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া সম্ভব হইতেছে, এ বিষয়ে জীবের কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এ স্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, পয়গম্বর বা প্রফেট্‌দিগের নিকট পরমেশ্বর কি স্বয়ং প্রকাশিত হন, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন? পয়গম্বরদিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান, না পরোক্ষ জ্ঞান? যদি বল যে, অপরোক্ষ জ্ঞান, ঈশ্বর স্বয়ং পয়গম্বরদিগের নিকট অব্যবহিতরূপে প্রকাশিত হন, তাহা হইলে সপ্রমাণ হইতেছে যে, মধ্যবর্ত্তিব্যতীত পরমেশ্বর মনুষ্যের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন। অর্থাৎ মানবাত্মার উপযুক্ত অবস্থায়, মনুষ্য অপরোক্ষ ভাবে, পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে পারে ; অথবা এরূপও বলা যায় যে, পরমেশ্বর মনুষ্যের আত্মাতে প্রকাশিত হন। তাহা হইলে, ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন থাকিল না। আর যদি বল যে, পয়গম্বরদিগের নিকটও অন্য ব্যক্তির মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশিত হন, তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তীর আবার মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন। মিডিয়মের নিকট প্রকাশিত হইবার জন্য, অপর মিডিয়ম আবশ্যক। এইরূপে অনাদিপরম্পরা আসিয়া পড়ে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, মধ্যবর্ত্তিবাদ অযুক্তিসিদ্ধ।

প্রকৃতির অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পয়গম্বর এবং শাস্ত্র, স্বাভাবিক। জনসাধারণের শিক্ষার জন্য অলৌকিকরূপে পয়গম্বরদিগের আবির্ভাব হয় না। পরমেশ্বর স্বাভাবিক প্রণালীতে বিশ্বকার্য্য পরিচালিত করিতেছেন। যেরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধে সকল ঘটনা সম্বদ্ধ, মহাপুরুষ ও শাস্ত্র সেই স্বাভাবিক প্রণালীর অন্তর্গত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রাজা মধ্যবর্ত্তিবাদের বিরুদ্ধে আর একটি কথা বলিতেছেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ বিভিন্ন পয়গম্বর ও শাস্ত্র স্বীকার করেন। এই সকল পয়গম্বর ও শাস্ত্র পরস্পরবিরোধী। এক ধর্ম্মাবলম্বী লোকে যাঁহাকে, প্রকৃত নেতা বলিয়া মনে করেন, অপর ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকেই ভ্রান্ত বা প্রতারক বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং ইহা বলিতেই হইবে যে, অন্ততঃ এক পক্ষে ভ্রম আছে। যদি পরমেশ্বর স্বয়ং পয়গম্বর ও শাস্ত্র পাঠাইতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকিত না। আর এ কথাও বলা যায়

না যে, একটি জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র ও পয়গম্বর আবদ্ধ; অপর সকলে তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ কথা বলিবার যথেষ্ট যুক্তি কিছুই নাই, এবং এরূপ কথা বলিলে পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হয়। পরমেশ্বর সমদর্শী; সুতরাং সকল পয়গম্বরের ও সকল শাস্ত্রে ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ এই সকল ভ্রান্তি ও বিরোধ মনুষ্যের। যাহা কিছু মনুষ্যকৃত, মনুষ্যের বুদ্ধি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন, তাহাতেই ভ্রান্তি ও পরস্পরবিরোধ থাকিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্র ও মহাপুরুষবাদের মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ থাকা সম্ভব। মহাপুরুষবাদ ও শাস্ত্রে, অলৌকিক ও অতিমানুষিক ব্যাপার কিছুই নাই।

ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান স্বাভাবিক

রাজা এ স্থলে মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ানদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পয়গম্বর ও প্রফেট্-বাদীদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন। হিন্দুরা বলেন যে, ঋষিদিগের নিকট পরমেশ্বর সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, উহা খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের মতের ন্যায় নহে। ঋষিদিগের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা পরমেশ্বরের কোন অলৌকিক বিশেষ ক্রিয়া নহে। উহা আত্মার অবস্থাবিশেষে পরমেশ্বরের প্রকাশ। যে কোন ব্যক্তি সেই অবথায় উপনীত হন, তিনিই সেই অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভ করেন। পরমেশ্বর তখন তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন। উপনিষদাদি শাস্ত্রে যে আত্মজ্ঞান আছে, তাহা এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ঋষিদিগের অপরোক্ষভাবে লব্ধজ্ঞান। তাহা বিশেষ কোন অলৌকিক প্রত্যাদেশ নহে। হিন্দুদিগের মধ্যে যে অবতারবাদ রহিয়াছে, তাহাও এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গুরুবাদে, কতক্ পরিমাণে উপনিষদের ভাব আছে, এবং কতক্ পরিমাণে মধ্যবর্ত্তিবাদও রহিয়াছে।

সকল ধর্ম্মই কি ঈশ্বরপ্রেরিত ?

পূর্ব্বে রাজা বলিলেন যে, বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে অতিশয় বিরোধ রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ সকলেই যে বিশেষভাবে ঈশ্বরপ্রেরিত ইহা হইতে পারে না। রাজার এই আপত্তির উত্তরে কোন কোন লোক বলেন যে, যদিও বিভিন্ন ধর্ম্মের বিধি বিষয়ে পরস্পর বিরোধ আছে, তথাপি সে সকল ধর্ম্মকে মিথ্যা বলা যায় না। সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরপ্রেরিত। সকল ধর্ম্মই পরমেশ্বরের বিধান। যাঁহাদের এই প্রকার মত, তাঁহাদের যুক্তি কি? তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যেমন রাজার নিয়ম দেশকালানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, সেইরূপ, পরমেশ্বরের ধর্ম্মবিষয়ক বিধান, দেশকাল অনুসারে বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। দেশকালের বিভেদ অনুসারে, পরমেশ্বর পরস্পরবিরোধী ও বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রেরণ করিয়াছেন। রাজাদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, এক সময়ে তাঁহারা যে আইন প্রচার করেন, জনসমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে, আবার তাহা রহিত করিয়া নূতন আইন প্রচার করেন। সেইরূপ, জনসমাজের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা অনুসারে, পরমেশ্বর বিভিন্নকালে ও দেশে, বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী প্রেরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে এক প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী রহিত হইয়া অন্য প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রকার মতাবলম্বী লোকে বলিয়া থাকেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে যে সকল বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা এমন প্রমাণ হয় না যে, সেই সকল ধর্ম্মপ্রণালী মিথ্যা। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী, সকলই সত্য। দেশ ও কালের ভিন্নতা অনুসারে, উহা পরমেশ্বরের বিভিন্ন বিধান।

রাজা এই যুক্তিটি খণ্ডন করিতেছেন। প্রথমে তিনি বলিতেছেন যে, এইরূপ পরস্পরবিরোধী মত ও বিধি এক ঈশ্বরের প্রেরিত হইতে পারে না। রাজাদের প্রচারিত আইনের সহিত এ বিষয়ের তুলনা, সংগত হয় না। রাজারা যে পুরাতন আইন রহিত করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন বা বিরোধী ব্যবস্থা প্রচার করেন, রাজাদিগের পক্ষে তাহা সম্ভব। প্রথমতঃ, রাজারা মনুষ্য। সুতরাং তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রমাদ আছে। একবার রাজনিয়ম প্রচার করিবার সময় যে ভ্রম হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া অন্য সময়ে তাঁহারা নূতন প্রকার রাজনিয়ম প্রচার করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজা ও কর্ম্মচারী প্রভৃতির মধ্যে স্বার্থপরতা, প্রতারণা ও কপটতা থাকিতে পারে; সুতরাং অন্যায় আইন প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা। সেরূপ আইন রহিত হওয়া আবশ্যক, এবং সময়ে রহিত হইয়াও থাকে। তৃতীয়তঃ, রাজা ও রাজপুরুষদিগের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাঁহারা ভাবী ঘটনা সকল দেখিতে পান না। তাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যের পরিণাম বুঝিতে পারেন না। সুতরাং ভবিষ্যতে উক্ত প্রকার আইন রহিত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে।

রাজা ও রাজপুরুষদিগের ভবিষ্যৎ বিষয়ে অজ্ঞতা মনুষ্যস্বভাবসুলভ। ভ্রমপ্রমাদ, স্বার্থান্ধতা ও কুটিলতানিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রচারিত রাজনিয়মে এরূপ দোষ ও অপূর্ণতা থাকে যে, তজ্জন্য উহা রহিত করা আবশ্যক হয়। এখন যে রাজনিয়ম প্রচারিত হইল, ভবিষ্যতে তাহার বিপরীত নিয়ম প্রচারিত হওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, তিনি সমস্ত কার্য্যকারণশৃঙ্খলার পরিচালক। তিনি প্রাণীগণের ইচ্ছার নিয়ন্তা ও শাসয়িতা; তাঁহার স্বার্থ বা স্বেচ্ছাচারিতা নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এক সময়ে এক প্রকার নিয়ম প্রচার করিয়া, অন্য সময়ে তাহার বিরোধী নিয়ম প্রচার করা সম্ভব নহে। এক সময়ে এক প্রকার নিয়ম প্রচার করিলেন, পরে দেখিলেন, উহা খাটিল না, তখন উহা রহিত করিয়া অন্য নিয়ম প্রচার করিলেন, ইহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পক্ষে কখনই সংগত হইতে পারে না। রাজাদিগের রাজনিয়ম প্রচারের সহিত পরমেশ্বরের নিয়মের কখনও তুলনা হয় না। উহা তর্কশাস্ত্রানুমোদিত উপমিতি নহে। এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ লক্ষণের পার্থক্য আছে। সুতরাং উপমিতি যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ হেত্বাভাসকে* আরবদেশীয় তর্কশাস্ত্রে কিয়াম্ মালফারেক বলা হয়। রাজা এই নামটি আরবী তর্কশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রাজার এই আপত্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মসকলকে অলৌকিকভাবে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান বলা যায় না; পরমেশ্বর যে সময়ে সময়ে স্বাভাবিক প্রণালী অতিক্রম করিয়া অলৌকিকভাবে ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করেন, এ কথা যুক্তিসংগত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইরূপ অলৌকিক বিধান স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, জগৎসম্বন্ধে ও জগৎশাসনসম্বন্ধে পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এরূপ বিশেষ বিধান স্বীকার করিলে পরমেশ্বরে ভ্রমপ্রমাদ আরোপ করিতে হয়। এ প্রকার মতে, পরমেশ্বরকে মনুষ্যতুল্য করিয়া দেখা হয়। সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম উল্লংঘন করিয়া অলৌকিকভাবে তিনি যে, কোন বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। তবে এমন বলা যাইতে পারে যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীসকল, স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরপ্রেরিত বিধান; অর্থাৎ প্রকৃতির প্রণালী অনুসারে, স্বাভাবিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধের মধ্য দিয়া, ঐতিহাসিক বিকাশের সংগে সংগে, এই সকল ধর্ম্ম উৎপন্ন

* Fallacious Analogy.

হইয়াছে। মানবের ইতিবৃত্তের বা প্রকৃতির প্রণালী বা ক্রম অনুসারে, এই সকল ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে। উহা পরমেশ্বরের বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। মানবেতিহাস ও প্রকৃতির প্রণালী অনুসারে এই সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি। ইহার মধ্যে বিধাতার ইচ্ছা বর্ত্তমান। দেশ ও কালানুসারে এই বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীকে বিভিন্ন ধর্ম্মবিধান বলা যাইতে পারে।

যাঁহারা বলেন যে, সকল ধর্ম্মই সত্য, তাঁহাদের কথার উত্তরে রাজা আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল বিরোধী বিধি রহিয়াছে, সে সকলকে সাময়িক বা আপেক্ষিক বলা হয় না। সেই সকল পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মবিধি, চিরকালের জন্য মনুষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিধি-নিচয়কে চিরস্থায়ী বলা হয়। আবার মুসলমানেরা কোরান হইতে বিধি দেখাইয়াছেন যে, পৌত্তলিকদিগকে নির্য্যাতন বা বধ করা মুসলমানদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। সুতরাং এক ধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান চিরকালের জন্য কর্ত্তব্য। আবার অন্য ধর্ম্মমতে মুসলমানদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে নির্য্যাতন বা বধ করা তাহা-দিগের ঈশ্বরাদিষ্ট বিধি। এ স্থলে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই উভয় ধর্ম্মই পরমেশ্বরের বিধান? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান, দয়া ও অপক্ষপাতিত্বের সহিত এই সকল পরস্পরবিরোধী বিধি ও আদেশের সামঞ্জস্য নাই ; এ সকল মনুষ্যকৃত।

এ স্থলে রাজা প্রমাণ করিলেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসকলকে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান বলা যায় না। তৎসঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে পরমেশ্বরের পূর্ণনীতি ও সত্য প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ণনীতি ও পূর্ণসত্য কোন ধর্ম্মেই প্রকাশিত হয় নাই। ধর্ম্ম সকল, আপেক্ষিক এবং মানবীয়। কোন ধর্ম্মই অপ্রাকৃতিক ও অতি-মানুষিক নহে।

রাজার তৃতীয় উত্তর এই যে, এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে, যে বিরোধ রহিয়াছে, তাহা কেবল বিধি, কর্ত্তব্য বা মত বিষয়ে নহে। ঘটনা সম্বন্ধেও বিরোধ রহিয়াছে। বিধি হইলে তাহা প্রচলিত, পরিবর্ত্তিত ও রহিত হইতে পারে। কিন্তু ঘটনা পরিবর্ত্তিত বা রহিত হওয়া সম্ভব নহে। যেমন য়ীহুদী, খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান শাস্ত্রের মধ্যে, পয়গম্বর বা মহাপুরুষের আবির্ভাব লইয়া বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। কোন শাস্ত্রে বলা হইতেছে যে, আর পয়গম্বর আসিবে না। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আখেরী পয়গম্বর বলা হইতেছে, তিনিই শেষ পয়গম্বর। কোন সম্প্রদায়ের লোক বলিতেছেন যে, দাউদের বংশে ভবিষ্যতে পয়গম্বর আসিবেন। খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান শাস্ত্রানুসারে মহাপুরুষের আগমন শেষ হইলেও, দেখা যাইতেছে যে, অন্য সম্প্রদায়ের লোক নূতন নূতন মহাপুরুষ স্বীকার করিতেছেন। নানক প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পয়গম্বরের আবির্ভাব অলৌকিক ব্যাপার নহে। যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে অলৌকিকভাবে ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের চিন্তাবিহীনতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, নিজ নিজ ধর্ম্মপ্রচারেচ্ছা অথবা সম্মানেচ্ছা বা যশোলিপ্সা উক্তরূপ বিশ্বাসের কারণ।

এ স্থলে রাজা বিভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস রহিয়াছে, সে সকলকে ঐশিক না বলিয়া মানবের অজ্ঞতা এবং দুর্ব্বলতাপ্রসূত বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। রাজার মতে, ইহাতে কেবল ভ্রম কুসংস্কার প্রকাশ পায়, এমন নহে ; অনেক সময়, এই সকলের মধ্যে শঠতা ও প্রবঞ্চনাও থাকে।

অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাসসম্বন্ধে চারি শ্রেণীর লোক

রাজা এ বিষয়ে মানবজাতিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, যে সকল ব্যক্তি প্রতারণা করে এবং যাহারা প্রতারিত হয়, এবং যাহারা প্রতারক এবং প্রতারিত, এবং যাহারা এই উভয়ের মধ্যে কিছুই নহে, এই সকলকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

১। এমন এক শ্রেণীর প্রতারক আছে, যাহারা লোকসংগ্রহের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মমত সকল সৃষ্টি করে। লোকদিগকে অনেক কষ্ট দেয়, এবং লোকের মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত করে।

২। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা বিশেষ কোন অনুসন্ধান না করিয়া প্রতারিত হইয়া প্রতারকদিগের অনুবর্ত্তী হয়।

৩। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা প্রতারক এবং প্রতারিত উভয়ই। তাহারা অন্য লোকের কথায় বিশ্বাস করে, এবং নূতন লোককে তাঁহাদের মতে আনিতে চেষ্টা করে।

৪। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা পরমেশ্বরের কৃপায় প্রতারক বা প্রতারিত এই দুইয়ের কিছুই নহেন।

রাজা তৎপরে সুফীকবি হাফেজের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছেন। সে কবিতাটির অর্থ এই যে, কোন জীবের অনিষ্ট করিও না। কোন জীবের অনিষ্ট না করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। কারণ, আমাদের মতে, অপরের অনিষ্ট করা ভিন্ন অন্য কোন পাপ নাই।

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজার যে সকল মতের কথা বলিলাম, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, জগতে প্রচলিত ধর্ম্মসকল অলৌকিকভাবে পরমেশ্বরের বিধান নহে। সকল ধর্ম্মই সত্য, কেননা সকল ধর্ম্মই পরমেশ্বরের বিধান, এ মতও যুক্তিবিরুদ্ধ। কোন ধর্ম্মে পূর্ণ-নীতি ও পূর্ণসত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্মসকল আপেক্ষিক, মনুষ্যকৃত। স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক কারণে, পরমেশ্বরের বিধাতৃত্বের অধীনে, সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই একটি মধ্যবর্ত্তী সত্য আছে। কিন্তু মানবীয় ভ্রমপ্রমাদ, অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতাজনিত দোষসকল, ঐ সত্যের আবরণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাজা কোন বিশেষ বিধানে কেন বিশ্বাস করিতেন না, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থ লিখিবার পরবর্ত্তী সময়ে, অর্থাৎ বেদবেদান্ত ও বাইবেল বিষয়ক গ্রন্থ লিখিবার সময়ে, রাজা আর একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে কেবল যুক্তিবাদ, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ। পরে রাজা, শাস্ত্র স্বীকার করিতেন, কিন্তু অলৌকিকভাবে শাস্ত্র বা বিধান কখনই স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থের অভাবাত্মক মতগুলি রাজার চিরকালই ছিল। তবে, পরে কতকগুলি ভাবাত্মক মতের বিকাশ হইয়াছিল। যেমন, যুক্তিসম্মত শাস্ত্র-স্বীকার, বিধান স্বীকার, ঋষি ও মহাপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি, তাঁহাদের উপদেশে শ্রদ্ধা, আত্মজ্ঞানলাভের জন্য গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার, ব্যক্তিগত যুক্তিবাদ অতিক্রম করিয়া, জাতীয় সমষ্টীকৃত জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা, কোন প্রচলিত শাস্ত্রানুযায়ী জাতীয় আচার ব্যবহার নিয়মিত হওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার, এই সকল মত ও ভাব রাজার চিন্তাশীল চিত্তে ক্রমে বিকশিত হইয়াছিল। কিন্তু তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিরোধী মত কখনও পোষণ করেন নাই। যাহাতে সামাজিক শৃঙ্খলা, সামাজিক শাসন, জাতীয়তা এবং মানবজাতির সমষ্টীকৃত জ্ঞানের সহিত যুক্তিবাদ

এবং ব্যক্তিগত জ্ঞানের সামঞ্জস্য হয়, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত বিচার-শক্তি এবং শাস্ত্র ও সামাজিক শাসন, রাজা এই উভয়েরই আবশ্যকতা অনুভব করিতেন। তজ্জন্য এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মবিধান

এ বিষয়ে দুটি মূল কথা আছে :—প্রথম, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেবল যুক্তি বা ব্যক্তিগত জ্ঞান সত্যনির্ণয়ে সমর্থ নহে। সেই জন্য, রাজা ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং শাস্ত্র, এই উভয়ের সমন্বয়পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক বলিতেন, এবং কার্য্যতঃও তাহা করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন জাতির পক্ষে শাস্ত্রের শাসন আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিতেন। কিন্তু জ্ঞানালোচনাদ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য তিনি স্বাভিমত ও শাস্ত্র মিলাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র, খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্র এবং মুসলমান শাস্ত্রের জ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রগুলিকে বিভিন্ন জাতির পক্ষে বিধান বলিয়াও স্বীকার করিতেন। যেমন, খ্রীষ্টিয়ান বিধান, য়ীহুদী বিধান এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিধান। কিন্তু তিনি কখনও অলৌকিকভাবে বিধান স্বীকার করেন নাই। তিনি মনে করিতেন যে, প্রচলিত শাস্ত্রগুলি মানবেতিহাসে স্বাভাবিকরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্ত্রসকলের উৎপত্তি পরমেশ্বরের সাধারণ বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন, এই সকল শাস্ত্র-ভাণ্ডারে সাধুপুরুষ ও মহাপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারূপ রত্ননিচয় সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রের মধ্যে মানবজাতির সমষ্টীকৃত জ্ঞান বর্ত্তমান। সুতরাং শাস্ত্রের শাসন (Authority) অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। রাজা যখন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের ভিত্তির উপরে, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য লেখনী চালনা করিয়াছেন, তখন তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ (প্রফেট্) দিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত ধর্ম্মকে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান বলিয়াছেন। তিনি যখন হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তির উপরে, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তখন তিনি ঋষিদিগের যোগলব্ধ সত্য মানিয়াছেন। ঋষিরা যোগযুক্ত অবস্থায় আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতেন, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় এবং হিন্দু-শাস্ত্রের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান্ হইয়া তিনি এই সকল কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ইহা বিশেষরূপে বলা আবশ্যক যে, যখন তিনি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিষয়ে ঈশ্বরপ্রেরিত প্রফেট্ এবং বিশেষ বিধান স্বীকার করিযা লইতেছেন, তখনও তিনি এইগুলি অলৌকিক-ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকটে উহা সকলই স্বাভাবিক। তাঁহার মতে মানবেতিহাসে মহাপুরুষেরা স্বাভাবিকভাবে সত্যলাভ করিয়াছেন এবং উহা স্বাভাবিকভাবে প্রচার করিয়াছেন। ঐ সকল সত্য, সময়ে, জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। এ সকলই পরমেশ্বরের সাধারণ বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিকভাবে না হইলেও এই সকল সত্য যথার্থই পরমেশ্বরের বিধান।

রাজা কিভাবে শাস্ত্র স্বীকার করিতেন ?

রাজা কিভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, ঋষিরা যোগযুক্ত হইয়া সত্যলাভ করিয়াছিলেন? ইহাতে কিছু অলৌকিক আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। শমদমাদি সাধন, সনাতন ধর্ম্মপালন, অর্থাৎ জীবের প্রতি প্রেম ও জীবের সেবা, ভক্তি ও আত্মচিন্তা বা উপাসনায় সিদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞানী, সর্ব্বদা নিত্যযুক্ত অবস্থায় থাকেন। এই-রূপ ব্রহ্মযোগের অবস্থায় যে সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাই উপনিষদাদি দেশীয়

শাস্ত্রে, এবং বাইবেল প্রভৃতি বিদেশীয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিশূন্য রাজা কখনও এরূপ মনে করিতেন না। তথাচ তিনি ঐ সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। ঐ সকল অভিজ্ঞতা আপেক্ষিক হইলেও উহা সম্মানযোগ্য। সাধুপুরুষ ও মহাপুরুষদিগের যে সকল অভিজ্ঞতা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের অভিজ্ঞতা বলিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে, উহা মূল্যবান্ ও আদরণীয়। এক সময় ছিল, যখন শাস্ত্র বলিলেই অভ্রান্ত বা অলৌকিক বুঝাইত। এখন ক্রমবিকাশবাদের (Evolution) ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া শাস্ত্রসকলকে আমরা নূতন ভাবে দেখিতে শিক্ষা করিতেছি। এখন শাস্ত্র বলিলেই অভ্রান্ত বা অলৌকিক মনে করিতে হয় না। উহাতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া উহা সম্মানাস্পদ, শ্রদ্ধাযোগ্য এবং ধর্ম্মজীবনের সাহায্যকারী। রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশক ও প্রচারক। ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

ব্যক্তিগতজ্ঞান ও শাস্ত্রের সামঞ্জস্য

মওয়াহিদ্দীন প্রকাশের পরবর্ত্তী সময়ে রাজার যেরূপ মানসিক বিকাশ
ন, তদ্বিষয়ে একটি প্রধান কথা বলা হইল। দ্বিতীয় কথা এই যে, রাজা জনসমাজ সম্বন্ধে মনে করিতেন যে, ব্যক্তিগত জ্ঞান বা ইচ্ছাদ্বারা সামাজিক জীবন পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি জনসমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যকতা অনুভব করিতেন। সমাজতত্ত্ব কি নীতি বা রাজনীতি অথবা ব্যবস্থাশাস্ত্র, সকল বিষয়েই তিনি মনে করিতেন যে, ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন নিয়ামক থাকা আবশ্যক। রাজা মনে করিতেন যে, এমন কিছু চাই যদ্দ্বারা সামাজিক বন্ধন ও শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। তিনি বলিয়াছেন যে, কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রবল হইলে সমাজ উৎসন্ন যাইবে; অর্থাৎ এমন কিছু চাই যদ্দ্বারা সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা ও শাসন হইতে পারে। জাতীয়তা সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন যে, জাতীয়তার একটি জাতীয় ঐতিহাসিক আকার বা বিকাশ আবশ্যক। এ স্থলে তিনি ব্যক্তিগত জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত জাতীয় ব্যবস্থা বা শাস্ত্রের সামঞ্জস্য আবশ্যক মনে করিতেন। রাজা দুইদিক সমভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখিতেন, যাহাতে যুক্তিবিরুদ্ধ কিছু স্বীকার করা না হয়। সেইরূপ আবার দেখিতেন যে, সামাজিক শৃঙ্খলা বা সামাজিক শাসন রক্ষা করিতে গিয়া সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত না হয়, লোকহিতসাধনের ক্ষতি না হয়। যাহা লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাই সনাতনধর্ম্ম। সুতরাং রাজার মতে, কি সমাজতত্ত্ব, কি নীতি, কি রাজনীতি, কি ব্যবহারশাস্ত্র, কি লোকশিক্ষা, সকল বিষয়েই দেখিতে হইবে যে, যদ্দ্বারা লোকশ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই কর্ত্তব্য। ইহাই সকল বিষয়ের পরীক্ষা। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই গ্রহণযোগ্য, আর যাহা তাহার বিপরীত, তাহাই পরিত্যাজ্য। এইরূপে বিচার বা পরীক্ষা করিয়া জাতীয় আচার ব্যবহার, ও সামাজিক প্রণালী, সকলই সংশোধন ও বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

সার্ব্বভৌমিকতা ও জাতীয়তা

যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, তাহা সার্ব্বভৌমিক হইলেও উহাকে জাতীয় আকারে পরিণত করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। কেবল সার্ব্বভৌমিকতা শক্তিহীন। আবার জাতীয়

সংকীর্ণতাও অনিষ্টকর। জাতীয় সংকীর্ণতা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বিরোধী। উহা অনেক সময়ে উন্নতির প্রতিকূল। সুতরাং রাজার প্রণালী অনুসারে জাতীয়ভাবে সার্ব্বভৌমিক, কিংবা সার্ব্বভৌমিকভাবে জাতীয় হওয়াই আবশ্যক। এ বিষয়েও হিগেল প্রচারিত সমাজতত্ত্ব এবং ক্রমবিকাশবাদমূলক সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সহিত রাজার এক মত। বর্ত্তমান সময়ের সমাজতত্ত্বের মূলসূত্র, রাজা পরিষ্কাররূপে বহু পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সামান্য বিস্ময়কর নহে।

তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন পুস্তকে প্রকাশের পরবর্ত্তী সময়ে দুইটি বিষয়ে কিরূপে রাজার মানসিক বিকাশ হইয়াছিল, আমরা তাহা প্রদর্শন করিলাম। আর দুইটি বিষয়ে তাঁহার মানসিক বিকাশ দেখাইলেই, এ বিষয়টির আলোচনা শেষ হয়।

আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভ

'তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থে রাজা পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বা পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। সেগুলি ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্দিগের অনুরূপ। যেমন, পরমেশ্বরকে স্রষ্টা ও বিধাতা বলিয়া বিশ্বজনীন বিশ্বাস। এই বিশ্বজনীন বিশ্বাস কয়েকটি যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কার্য্যকারণসম্বন্ধীয় যুক্তি, কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তি, এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিমূলক যুক্তি, এই ত্রিবিধ যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় বিশ্বজনীন বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। এই সকল প্রমাণ ইংলণ্ডীয় ডীয়িষ্ট্দিগের একমাত্র অবলম্বন ছিল। রাজাও এই সকল প্রমাণ দিয়াছেন। আমাদের দেশে ন্যায়দর্শনসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'কুসুমাঞ্জলি' নামক ন্যায়-দর্শনসম্বন্ধীয় গ্রন্থে, কার্য্যকারণসম্বন্ধীয় যুক্তি এবং নৈতিক যুক্তি (Moral argument) দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ে মানবজাতির বিশ্বজনীন বিশ্বাস ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থের অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত ঈশ্বরানুমান বিষয়ক প্রস্তাবে, এই সকল যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ন্যায়াদি হিন্দুদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে, এই সকল প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রকার প্রমাণ আছে। উহা শব্দপ্রমাণ বা বেদপ্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও তাঁহাদের গ্রন্থে ঐরূপ দুই প্রকার প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; অর্থাৎ বহির্জগৎ ও মানবপ্রকৃতি হইতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় প্রমাণ, এবং উক্ত বিষয়ে বাইবেল শাস্ত্রের প্রমাণ। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় 'তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থে এ বিষয়ে শাস্ত্রকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন নাই।

'তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থপ্রকাশের পরবর্ত্তী সময়েও রাজা কখনই অলৌকিক-ভাবে শাস্ত্র বা আপ্তবাক্য বিশ্বাস করেন নাই। তিনি চিরকালই বিশ্বাস করিতেন যে, বহির্জগৎ ও আত্মাতেই পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ করেন। জ্ঞানী বা সাধুপুরুষেরা যে আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহা স্বাভাবিকরূপেই হয়, অলৌকিকভাবে নহে। মানবাত্মার বিশেষ অবস্থায় পরমেশ্বর তাহাতে প্রতিভাত হন। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

'তুহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থপ্রকাশের পরবর্ত্তী সময়ে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি প্রমাণের ভিত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জগৎ ও সত্য পদার্থের দার্শনিক বিশ্লেষণদ্বারা উক্ত প্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন যেমন "অহং" ও "ইদং" অথবা বিষয় ও বিষয়ীর জ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মে উপনীত হইয়াছেন, রাজাও সেইরূপ বেদান্তমার্গে আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞানের দ্বার দিয়া ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছেন। মওয়াহিদ্দীন সুফী, ও নিও-প্লেটনিষ্ট (Neo-Platonist), খ্রীষ্টিয়ান মিষ্টিক (Christian Mystics)-দিগের ঈশ্বরপ্রমাণ এইরূপ। আধুনিক জর্ম্মান্দেশীয়

দার্শনিকগণ, এবং ইংলণ্ডীয় নিও-ক্যাণ্টিয়ান্ (Neo-Kantian) এবং নিও-হিগেলিয়ান্ (Neo-Hegelian) দার্শনিকেরাও এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা এই পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা যে কার্য্যকারণসম্বন্ধীয় যুক্তি, কৌশলসম্বন্ধীয় যুক্তি, এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানমূলক যুক্তি পরিত্যাগ করেন, এমন নহে। তবে তাঁহাদের হস্তে সেগুলি নূতন আকার ধারণ করে। প্রথমে পূর্ণ সত্যের জ্ঞান, এবং সেই পূর্ণ সত্য বা ব্রহ্মের সহিত জগৎ ও আত্মার সম্বন্ধের জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। তৎপরে, কারণ, কৌশল, কর্ত্তব্য এই সকল শব্দের নূতন অর্থ বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ সেগুলি বাহ্যিক না হইয়া আন্তরিক হয়, সর্ব্বাতীত না হইয়া সর্ব্বগত হয়। বেদান্তে ইহাকে "তাদাত্ম্য" সম্বন্ধ বলে। এই-রূপ পুরাতন প্রমাণগুলি নূতন ভাবে, নূতন আকারে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বস্বরূপ এক-মাত্র প্রমাণের অধীন হইয়া পড়ে।

রাজার আর একটি মানসিক বিকাশ এই যে, যেমন মওয়াহিদ্দীন সুফী এবং বেদান্তের প্রভাবে রাজা স্থির করিলেন যে, আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান, বা ব্রহ্মজ্ঞানই ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি, সেইরূপ জীবনগত বা কার্য্যগত ধর্ম্মের দিকেও শমদমাদি সাধন ও লোকশ্রেয়ঃ বা মনুষ্যপ্রেমকে কেবল একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ না করিয়া ব্রহ্মোপাসনাকেই মূলভিত্তি করিলেন। ব্রহ্মোপাসনার সিদ্ধাবস্থায়, যখন ব্রহ্মই সর্ব্বময় হন, যখন উপাসক, কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, কোন অবস্থাতেই কদাপি ব্রহ্মকে অতিক্রম করেন না, সেই অবস্থাই জীবাত্মার চরম লক্ষ্য বলিয়া রাজা সিদ্ধান্ত করিলেন। নিষ্ঠা ও উপাসনা-দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে রাজা দর্শনশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া মুক্তাবস্থার কথা বলিতেছেন। এই ব্রহ্মসাধনে, জনহিতসাধন প্রভৃতি সকলই আছে। কিন্তু মুক্তাবস্থায়, এগুলি বাহ্যিকরূপে থাকে না; আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্গত হয়; সর্ব্বভূতে পরমাত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত

পূর্ব্ব অধ্যায়ে তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে রাজার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিব। রাজা যে বিশেষ কোন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, অথচ সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বরপ্রেরিত সত্য আছে বলিয়া সকল শাস্ত্রকেই শ্রদ্ধা করিতেন, আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হিন্দুরা তাঁহাকে বেদান্তানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। তন্ত্রমতাবলম্বীরা* তাঁহাকে তান্ত্রিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে এ প্রকার মতভেদ অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও তাঁহাকে কেহ বেদান্তানুগামী বৈদান্তিক এবং কেহবা ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এরূপ গুরুতর বিষয়ে

* তন্ত্রমতাবলম্বীরা তাঁহাকে তান্ত্রিক বলিয়া প্রচার করেন। আমরা কোন কোন তান্ত্রিককে বলিতে শুনিয়াছি যে, রামমোহন রায় তাঁহাদের মতে সাধন করিতেন। চুঁচুড়ার অন্তর্গত ক্যাঁক্‌শিয়ালিতে মদন কামার নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। সুনিপুণ শিল্পকর বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। সে ব্যক্তি তন্ত্রোক্তসাধনে অনুরক্ত ছিল। তাহার গৃহপ্রাচীরে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি প্রতিমূর্ত্তি লম্বমান থাকিত। মদন প্রত্যহ প্রাতঃকালে রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে করিয়া রাজার প্রতিমূর্ত্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক প্রণাম করিত। মদনের প্রতিবাসী, প্রবন্ধলেখকের জনৈক বন্ধু, তাহাকে এরূপ প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে, "রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।"

রাজা রামমোহন রায়ের সিদ্ধপুরুষত্বের বিষয়ে আর একটি গল্প আছে। গল্পটি এই ;—শৈশবকালে তাঁহার মাতামহ কিছুদিন কাশীবাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার মাতার সহিত কিছুদিন কাশীতে মাতামহের নিকট ছিলেন। মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্য একজন ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি এক দিবস তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্র-পূত সুরা আনিয়া শিশু রামমোহনকে পান করাইয়াছিলেন। উপস্থিত সকলে ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন, "তোমরা রাগ করিও না। আমি এই শিশুকে যাহা পান করাইলাম তাহার গুণে সে একজন সিদ্ধপুরুষ হইবে।" রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে, তান্ত্রিকদিগের উক্তরূপ সংস্কার বিষয়ে, আমরা আর একটি কথা শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, পশ্চিমাঞ্চলে, ভজ্জির রাণার গুরু সুখানন্দ স্বামীর সহিত রামমোহন রায়ের বিষয়ে কথা কহিতেছিলেন। গুরু একজন তান্ত্রিক। তিনি বলিলেন ;—"রামমোহন রায় অবধূত থা।" তন্ত্রমতে সাধন করিয়া যাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা হন, তাঁহাদিগকে তান্ত্রিকেরা অবধূত বলেন।

আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধর্ম্মমত অবগত হওয়া কঠিন বিষয় নহে। যে কোন ব্যক্তি সরলভাবে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি তাহা নিশ্চয়ই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ। তিনি যে বেদাদিশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, ইহা প্রতিপন্ন করিতে কিছুমাত্র আয়াসস্বীকারের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন, যে রাজা রামমোহন রায় দেবাদিশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সেরূপ বিশ্বাসের অবশ্য যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, তিনি পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচারে বেদাদিশাস্ত্রের প্রমাণপ্রয়োগদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কখন বলেন নাই যে, বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র মিথ্যা। প্রত্যুত পৌত্তলিক মতাবলম্বীদিগের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল এই যুক্তিটি অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, রামমোহন রায় বেদাদিশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদিগের নিতান্তই ভ্রম হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত রামমোহন রায়ের বিচারপ্রণালী তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কখনই শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তির আশ্রয় লইয়া কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি শাস্ত্র, খৃীষ্টিয়ানের নিকট বাইবেল, এবং মুসলমানের নিকট কোরান অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার নিজ মত প্রচারের চেষ্টা করিতেন। "তোমার শাস্ত্র মিথ্যা" এ কথা তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে কখন বলিতেন না। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর নিকটে, স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বিচার-শক্তির সাহায্যে তাহার অবলম্বিত শাস্ত্র হইতে সত্য রত্নসকল উদ্ধার করিয়া দিতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যসহকারে তিনি হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র অনাদ্যনন্ত, অপ্রতিম পরমেশ্বরকেই প্রতিপন্ন করিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ, খৃীষ্টিয়ানদিগের শাস্ত্র সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ করিয়াছেন। খৃীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি কখনই বলেন নাই যে, বাইবেল মিথ্যাশাস্ত্র, অথবা বাইবেল ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত গ্রন্থ নহে। তিনি উক্ত গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মার্সম্যান্ সাহেবের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, খৃীষ্টিয়ানদিগের তিন ঈশ্বরের মত, খৃীষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি মত তাঁহা-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত নহে। তিনি বাইবেল অবলম্বন করিয়া এরূপ সুন্দররূপে আপনার মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, মার্সম্যান সাহেবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

এ স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যদি বলা হয় যে, রামমোহন রায় বেদাদিশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে, অবিকল সেইরূপ প্রমাণে তাঁহাকে বাইবেলবিশ্বাসী ইউনিটেরিয়ান খৃীষ্টিয়ান বলাও সঙ্গত হইতে পারে। যে প্রকার প্রমাণে হিন্দুরা বলেন যে, তিনি বেদাদিশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সেইরূপ প্রমাণে অনেক খৃীষ্টিয়ান তাঁহাকে ইউনিটেরিয়ান খৃীষ্টিয়ান বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। তিনি এই উভয় প্রকার মতাবলম্বী ছিলেন, অবশ্য এরূপ কখন হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ। কেহ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে,

এরূপ বিভিন্ন প্রকার মত হইয়াছিল; অর্থাৎ তিনি এক সময়ে বেদাদিশাস্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পরে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা মত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদিগের মত অবলম্বন করেন। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই এ কথার অসারত্ব বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার রচিত হিন্দু-শাস্ত্রসম্বন্ধীয় ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক সকল একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাকারবাদী হিন্দুদিগের সহিত এবং ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ানদিগের সহিত বিচার, তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয় নাই।

১৭৪২ শকে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, 'কবিতাকারের সহিত বিচার' এবং 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায় উক্ত উভয় গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইয়া বিচার করিয়াছিলেন। উক্ত সালেই 'Precepts of Jesus, a guide to peace and happiness' নামক পুস্তক এবং 'First Appeal in defence of the Precepts of Jesus' নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম দুইখানি পুস্তকে যেমন হিন্দুশাস্ত্রকে মানিয়া লইয়া বিচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই শেষ পুস্তকে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইয়া বিচার করিয়াছেন। প্রথম দুই-খানি পুস্তক অনুসারে যদি তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে ঐ সালেই প্রকাশিত ইংরেজী পুস্তকখানি অনুসারে তাঁহাকে বাইবেল-বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে।

১৭৪৩ শকে, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি 'ব্রাহ্মণসেবধি' নামক পত্রিকায় শাস্ত্রাবলম্বী হিন্দু হইয়া পাদ্রি সাহেবদিগের সহিত বিচার করিয়াছিলেন। আবার সেই সালেই 'The Second Appeal in defence of Precepts of Jesus' বাহির হয়। 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' পত্রিকায় তিনি শাস্ত্রাবলম্বী হিন্দু এবং এই দ্বিতীয় বিচারগ্রন্থে তিনি খ্রীষ্ট-শাস্ত্রাবলম্বী একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ান। অথচ এই উভয়প্রকার বিচারপুস্তক, একই শকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, 'পথ্যপ্রদান' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তকে তিনি হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন, এবং উক্ত শকেই তিনি 'Final Appeal in defence of the Precepts of Jesus' নামক পুস্তকে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষে মার্সম্যান সাহেব যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করেন। উহাতে বাইবেলশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইয়া বাইবেল হইতেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পাদ্রি সাহেবদিগের প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক অনেকগুলি মত বাইবেলশাস্ত্রবিরুদ্ধ। 'পথ্যপ্রদান' পাঠ করিলে যেমন মনে হইতে পারে যে, তিনি হিন্দুশাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ব্রহ্মজ্ঞানী, সেইরূপ 'Appeal to the Christian Public' পাঠ করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, তিনি বাইবেলবিশ্বাসী প্রাচীন তন্ত্রের একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ান। বাস্তবিক কথা এই যে, তিনি কোন একটি বিশেষ শাস্ত্রকে পরমেশ্বরপ্রেরিত অভ্রান্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন।

রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কুমারী কার্পেন্টার তাঁহার প্রণীত 'The Last Days in England of the Raja Ram Mohun Roy' নামক পুস্তকে অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি এজন্য রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত কয়েকজন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর, কুমারী কার্পেন্টারের পিতা ডাক্তার কার্পেন্টার, রাজার পরিচিত কয়েকজন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার সেই পত্র কয়েকখানি আপনার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। কুমারী কার্পেণ্টারের আহূত সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য আমরা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছি। তথাচ আমরা রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান মতাবলম্বী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। সাক্ষীগণ সকলেই প্রায় বলিতেছেন যে, তাঁহারা রামমোহন রায়কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিতেছেন যে, রামমোহন রায় যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'I have denied his divinity, but not his commission' কিন্তু কেবল এই কথা বলিলেই কোন ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান হইতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ঐরূপ কথা বলিতে পারেন। খ্রীষ্টকে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিলেই কেহ খ্রীষ্টিয়ান হয় না। "আমি বাইবেলকে ঈশ্বরনির্দিষ্ট অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করি" রামমোহন রায় কি কখনও এপ্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন? তাঁহার প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ সকলে কেহ এপ্রকার কোন বাক্য প্রদর্শন করিতে পারেন না। মিস্ কার্পেণ্টারের আহূত সাক্ষীগণের মধ্যে কেহই সেরূপ কোন কথা বলেন নাই। এস্থলে আমাদিগের আর একটি বিশেষ বক্তব্য এই যে, রামমোহন রায় বিলাতে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ হইয়া কিছুই নূতন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষে থাকিতে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই সে সকল কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, সেই সকল পুস্তকের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহাকে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে।

কুমারী কার্পেণ্টারের সাক্ষীদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্যসকলে এবং মৃত্যুর পর তাঁহার পুনরুত্থানে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রাজা রামমোহন রায় উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করুন আর নাই করুন, শ্রোতা যে তাঁহার বাক্যের উক্তপ্রকার অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানবপ্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, লোকে অনেক সময় আপনার মানসিক ভাব ও ইচ্ছানুরূপ অপর ব্যক্তির বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কুমারী কার্পেণ্টারের সাক্ষীর পক্ষেও সেই প্রকার হওয়াই সম্ভব। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, খ্রীষ্টের জীবন ও তাঁহার কার্য্যাদি সম্বন্ধে বাইবেল-শাস্ত্রানুসারে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত, তাহাই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। লোকে বুঝিতে না পারিয়া সেইগুলিকে তাঁহার নিজের বিশ্বাস বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছে। ভারতবর্ষে অবস্থিতিকালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে, যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন স্থান পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া, মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থান প্রভৃতি বাইবেলবর্ণিত বিষয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, তাঁহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র ছিল। তিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার পুস্তকে একস্থলে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "যে শাস্ত্রপ্রমাণে ব্রহ্মকে মান, সেই শাস্ত্রপ্রমাণে দেবতাদিগকে কেন না মান?" রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—"ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে জন্ম ও মৃত্যুর

অধীন বলিয়া স্বীকার করেন।* এস্থলে কে বলিবেন যে, রামমোহন রায় বাস্তবিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার সত্তায় বিশ্বাস করিতেন? তাঁহার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব ও তাহাদিগের নশ্বরত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বাইবেলশাস্ত্র সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ। উক্ত শাস্ত্রবিষয়ক বিচারগ্রন্থসকলের যে যে স্থল পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থানে, এবং তাঁহার অনৈসর্গিক ক্রিয়াসকলে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাসের কথা নহে। ঐ সকল স্থলের প্রকৃত তাৎপর্য্য কেবল এইমাত্র যে, অনৈসর্গিক ক্রিয়া প্রভৃতি উক্ত শাস্ত্রসংগত বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়া লইতেছেন। তিন ঈশ্বরের মত, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানদিগের কয়েকটি মত যে বাস্তবিক তাঁহাদিগের শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, ইহা তিনি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের অনৈসর্গিক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থান, এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং উহা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অদূরদর্শী লোকে তাঁহার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস বলিয়া মনে করিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় দেখিলেন যে, লোকেরা যেরূপ কুসংস্কারান্ধ, তাহাতে তাহারা শাস্ত্রনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তির বল অনুভব করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, কোন কথাই তাহাদিগের গ্রাহ্য হইবে না। সুতরাং তিনি যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্র হইতেই স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকে কোন প্রকার সৃষ্টজীব বা অপর কোন পদার্থের উপাসনা না করিয়া একমাত্র নিরাকার অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত হয়, ইহারই জন্য তিনি যাবজ্জীবন প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতেই হিন্দুদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, সকল প্রকার সাকার দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা মাত্র, তাহাদিগের উপাসনাদ্বারা মুক্তিলাভের আশা নাই, বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্য, এবং তদ্দ্বারাই জীব মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। তিনি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র হইতে খ্রীষ্টিয়ানদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার নহেন, তিন ঈশ্বরের মত খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রসঙ্গত নহে। একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনাদ্বারাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়। তিনি এই প্রকারে প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তাঁহাদিগের নিকট স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, তিনি তাঁহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রেরিত অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু একদেশদর্শী লোকেরই এ প্রকার ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে। হিন্দু কি খ্রীষ্টিয়ানশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার সকল প্রকার পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রামমোহন রায় সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন।

তৃতীয়তঃ। কেবল তাঁহার বিভিন্ন শাস্ত্রসম্বন্ধীয় পুস্তক কেন? তাঁহার কার্য্য ও আচরণের বিষয় স্মরণ করিলেও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়পূজিত শাস্ত্রকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বেদ বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন; আবার উক্ত

---

* ৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

সমাজের অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষা করিবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ফিরিঙ্গি বালকদিগকে লইয়া আসিয়া তাহাদিগের মুখে দাউদের গীত শুনিতেন। যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রচারিত সত্যের প্রতি যার পর নাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াও তিনি আপনাকে চিরজীবন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। পৈতৃক বিষয়ে আপনার স্বত্ব রক্ষার জন্য তিনি আদালতে আপনাকে হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়াও তিনি হিন্দু আচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি তাঁহার ইয়োরোপীয় বন্ধুদিগকে স্পষ্টরূপে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ী তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হয়। পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণ অতি সাবধানে সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত শরীরে ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি বাইবেলকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন উন্নতমনা সত্যপ্রিয় দৃঢ়চিত্ত লোকের পক্ষে এ প্রকার অসংগত ব্যবহার কখনই সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতে পারি না।

চতুর্থতঃ। রাজা রামমোহন রায় যে, সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন করা কঠিন বিষয় নহে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড্ পত্র একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকভাবকে স্থান দান করেন নাই। যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে, যে সকল মত দেশকালে বদ্ধ, এ প্রকার কিছুই উক্ত ট্রষ্টডীড্ পত্রে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যে প্রকার উপাসনা ও উপদেশে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না, ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উক্ত পত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ গৃহে পরমেশ্বরকে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নামে পূজা করা হইবে না, এবং উপাসনার জন্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রণালী অবলম্বিত হইবে না। যে ব্যক্তি কোন একখানি বিশেষ শাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রেরিত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথবা যিনি ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত একমাত্র অভ্রান্ত গুরু ও নেতা বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার পক্ষে এ প্রকার অসাম্প্রদায়িক সমাজসংস্থাপন কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

পঞ্চমতঃ। আমরা পূর্ব্বে কবি টমাস্ মুরের দৈনন্দিন লিপি হইতে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি,* তাহাতে পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে রাজা রামমোহন রায়ের কি অভিপ্রায় ছিল। ট্রষ্টডীড্ পত্রে যাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিত আছে, রামমোহন রায় তাহাই টমাস্ মুরকে বলিয়াছিলেন। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা শাস্ত্রবিশ্বাসীর পক্ষে কি এরূপ অভিপ্রায়, এরূপ ভাব কখন সম্ভব হইতে পারে?

ষষ্ঠতঃ। রাজা যে, কোন বিশেষ শাস্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাঁহার সময়ে ইয়োরোপীয়গণ তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদী হিন্দু বা খ্রীষ্টিয়ান বলেন নাই। তাঁহাকে যুক্তিপথাবলম্বী একেশ্বরবাদীই বলিয়াছেন। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দের ব্যাপ্টিষ্ট্ মিসনারী সমাজের (Baptist Missionary Society) বিজ্ঞাপনীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের

* ২৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

১০৬ ও ১০৯ (Vol. VI. pp. 106, 109.) লিখিত হইয়াছে যে, রাজা এখন একজন একেশ্বরবাদী মাত্র। যীশুখ্রীষ্টকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতায় বিশ্বাস করেন না।

"He (Ram Mohun Roy) is at present a simple theist, admires Jesus Christ, but knows not his need of the atonement."

ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসমাজের (Church of England) ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'মিসনরী রেজিষ্টার' নামক পত্রিকার, ৩৭০ পৃষ্ঠায়, রাজা রামমোহন রায়ের বৃত্তান্ত লেখা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইতেছে যে, তিনি ক্রমে বাইবেল শাস্ত্রকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু একজন পত্রপ্রেরক তাঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি এখনও একজন আত্মনির্ভরকারী একেশ্বরবাদী মাত্র।

"His (Ram Mohun Roy's) judgement may possibly be convinced of the truth of divine Revelation, but one of our correspondents represents him to be, as yet, but a self-confident Deist;—disgusted with the follies of the pretended Revelations from heaven, with which he has been conversant, but not yet bowed in his convictions and humbled in his heart to the revelation of divine mercy. We do not mean to say that the heart of Ram Mohun Roy is not humbled, and that he has not received the Gospel as the only remedy for the Spiritual diseases under which he labours in common with all men; but we have as yet, seen no evidence sufficient to warrant us in this belief. We pray God to give him grace, that he may in penitence and faith embrace with all his heart the Saviour of the world."

১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের 'Monthly Repository of Theology and General Literature' নামক পত্রিকার ৫১২ পৃষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায়কে একজন হিন্দু একেশ্বরবাদী বলা হইয়াছে।

"Two literary phenomena of a singular nature have very recently been exhibited in India. The first is a Hindu Deist."

সপ্তমতঃ। রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য ও অনুচরগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের আর একটি গুরুতর প্রমাণ। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় নন্দকিশোর বসু মহাশয়, রাজা রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি রাজনারায়ণবাবুকে বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে বলিতেন যে, আমাদের ধর্ম্ম Universal, বিশ্বজনীন। নন্দকিশোর বসু মহাশয় বলিতেন যে, যখন রামমোহন রায় এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহার গণ্ডস্থল বিধৌত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

রাজনারায়ণবাবু তাঁহার পিতার নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার মৃত্যু হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।"

রাজা রামমোহন রায়ের আর একজন শিষ্য বাবু চন্দ্রশেখর দেবের সাক্ষ্য নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তিনি কোন সম্প্রদায়বিশেষের অন্তর্গত ছিলেন না: শাস্ত্রনিরপেক্ষ

অথচ সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবুর সহিত রাজা রামমোহন রায়ের যে সকল আলোচনা হইয়াছিল, তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তদ্বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবুর নিকটে রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণ য়ীহুদীদিগের অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন :—

"The Hindoos seem to have made greater progress in sacred learning than the Jews, at least at the time when the Upanisads were written. The self existing alone was living and he willed, the world came into existence, seem to me to give a more sublime idea of the creation than the words of the first chapter of the Bible, "God said Let there be light &c." There appears a degree of childishness in this latter representation."

খৃীষ্টধর্ম্ম ও বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর করিয়াছেন ;—

"If religion consist in the blessings of self-knowledge and of improved notions of God and his attributes, and a system of morality hold a subordinate place, I certainly prefer the Vedas.—

"But the moral precepts of Jesus are something most extraordinary. The Vedas contain the same lessons of morality, but in a scattered form, and Hinduism is a religion of toleration and peace which Christ indeed also taught his apostles and disciples, but which his followers soon forgot. It is a pity that the ministers of religion should foment quarrels amongst the several nations of the world.— In religious discussions we should always respect the ideas and feelings of our antagonists. The Vedas teach the only religion which considers toleration to be a duty of man."

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই ;—যদি নীতির অপেক্ষা আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অংশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি বেদ বেদান্তকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কিন্তু খৃীষ্টের নীতিউপদেশ সকল অতি অসাধারণ। বেদেও সেই সকল নীতিউপদেশ বিচ্ছিন্নভাবে আছে।* হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মসাধনের স্বাধীনতা শিক্ষা দেয়।

হিন্দুধর্ম্ম শান্তির ধর্ম্ম। যীশুখৃীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে শান্তির উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ তাহা শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন ইত্যাদি। একমাত্র বেদই কেবল ধর্ম্মসাধনে স্বাধীনতা প্রদান, মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিতেছেন।

"Q. Is it to be believed then that God has appeared to any man and given a law to him in person?

"A. This is a dream of many good and great men. It might

---

* রামমোহন রায় অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে উচ্চতম নীতি-উপদেশ রূপকের আকারে রহিয়াছে।

undoubtedly be one part of the providence of God to enlighten ; the minds of certain men so as to form them instructors of other men. The world is nothing but a manifestation of the power of the Almighty Creator who pervades all space, boundless as it is, and all time from eternity to eternity. Who can, therefore, say that he cannot so enlighten the minds of men ?"

পরমেশ্বর কখন অলৌকিকভাবে কোন মনুষ্যের নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কোন শাস্ত্র দিয়া গিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর করিলেন যে, ইহা অনেক সাধু ও মহৎ ব্যক্তির কল্পনামাত্র। বিধাতা নিশ্চয়ই কোন কোন লোকের চিত্ত ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়া তাঁহাদিগকে অন্য লোকের উপদেষ্টা করিয়া দিতে পারেন। এ জগৎ সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি অসীম আকাশ ও অনাদ্যনন্তকালে স্থিতি করিতেছেন ; সুতরাং কে বলিতে পারে যে, তিনি উক্ত প্রকারে মনুষ্যের মনকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন না ?

এ বিষয়ে উইলিয়ম আড্যাম সাহেব একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

"Ram Mohun Roy, I am persuaded, supports this institution, [Brahma Samaj] not because he believes in the divine authority of the Ved, but solely as an instrument for overthrowing idolatry. To be candid, however, I must add that the conviction has lately gained ground in my mind that he employs Unitarian Christianity in the same way, as an instrument for spreading pure and just notions of God, without believing in the divine authority of the Gospel."

—Miss Collet's* 'Life of the Raja', P. 90.

উপরি উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির সারমর্ম্ম এই ;—আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, রামমোহন রায় যে, বেদকে অভ্রান্তশাস্ত্র মনে করেন বলিয়া এই সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও ইহার পরিচালনা করিতেছেন, এমন নহে। বেদকে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস না থাকিলেও পৌত্তলিকতা বিনাশের জন্য উহাকে উপায়-স্বরূপ মনে করেন বলিয়া তিনি ঐ প্রকার করিতেছেন। যাহা হউক, সরলভাবে বলিতে গেলে অবশ্য বলিতে হয় যে, কিছুদিন হইতে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তিনি ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকার্য্যের সহায়তাও ঐ ভাবে করিয়াছেন। অর্থাৎ সুসমাচার সকলকে (Gospels) ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস না থাকিলেও পরমেশ্বরসম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ ও প্রকৃত জ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি ঐ প্রকার করিতেছেন।

'তুহ্ ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থ প্রকাশের পরবর্ত্তী সময়ে রাজা কিভাবে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে অধ্যায়ে বলিয়াছি। রাজা বিশ্বাস করিতেন যে, পরমেশ্বর মানবের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া সত্য প্রকাশ করেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া পরমেশ্বর যে সকল সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই প্রচলিত শাস্ত্র সকলে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* Sophia Dobson Collet, The Life and Letters of Raja Ram Mohun Roy, Sadharan Brahmo Samaj, 1962, P. 227.

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত বিষয়ে আমরা যাহা বলিলাম, পরিশেষে অতি সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা করিয়া, আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। প্রথমতঃ, পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থের সারমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, রাজা কোন সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। অথচ, মানবের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া পরমেশ্বর যে সকল অমূল্য সত্য প্রেরণ করেন, তাহাই প্রচলিত শাস্ত্রসকলে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, যখন দেখিতেছি যে, রাজা রামমোহন রায়, যে কোন সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই শাস্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহাদিগের শাস্ত্রকে মান্য করিয়া, উক্ত শাস্ত্র হইতে স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি বেদ বা বাইবেল প্রভৃতি কোনও শাস্ত্রবিশেষকে অভ্রান্ত আপ্ত-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন? যে যুক্তিতে হিন্দুরা তাঁহাকে বেদাদিশাস্ত্রের অভ্রান্ততায় দৃঢ়বিশ্বাসী হিন্দু বলিয়া মনে করেন, সেই প্রকার যুক্তিতে খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁহাকে বাইবেল-বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান বলিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ তিনি যে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্ত্রবিশ্বাসী ছিলেন না, ইহা তাঁহার বিভিন্ন শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বিচারগ্রন্থের সময়নির্দ্দেশদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থ এবং খ্রীষ্টিয়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থ একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থানুসারে যদি তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রবিশ্বাসী বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দেখিয়াও তাঁহাকে উক্ত শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ই এক সময়ে কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, তাঁহার কার্য্য ও আচরণ স্মরণ করিলেও বুঝা যায় যে, তিনি বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ইহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি, এ স্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

পঞ্চমতঃ, ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট্‌ডীড্‌ দ্বারা নিঃসংশয়ে ও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ শাস্ত্রবাদী বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না। উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্ম্মই রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ছিল।

ষষ্ঠতঃ, ফরাসীদেশে কবি টমাস্‌ মুরের সহিত একত্রে আহার করিবার সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। টমাস্‌ মুরের দৈনন্দিন লিপিতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন। উক্ত দৈনন্দিন লিপিতে যাহা আছে, ট্রষ্ট্‌ডীডের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতেছি।

সপ্তমতঃ, রামমোহন রায়ের শিষ্যগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন প্রধান ব্যক্তি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা কোন বিশেষ শাস্ত্রকে পরমেশ্বরপ্রেরিত, ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য, নন্দকিশোর বসু চন্দ্রশেখর দেব এবং আড্যাম সাহেবের সাক্ষ্য, এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তিনি বেদ বা বাইবেল কোন শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ অথচ সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্‌ ও সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্র হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিষ্কাশন করিতেন। "একমেবা-দ্বিতীয়ং" তাঁহার উপাস্য দেবতা ; এবং "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং" তাঁহার একমাত্র আদিশাস্ত্র।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা

ধর্ম্মতত্ত্ব

রাজা রামমোহন রায়ের সার্ব্বভৌমিক ও জাতীয়ভাব

রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার দুইটি প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, তাঁহার বিশ্বজনীন ভাব। তিনি জগতের হিতৈষী, জগতের সংস্কারক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার জাতীয়ভাব। তিনি জাতীয় সংস্কারক ও উন্নতিসাধক। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভাব ও কার্য্য তাঁহার বিশ্বজনীন ভাবের অন্তর্গত। সেইগুলির আলোচনা ভিন্ন তাঁহার বিশ্বজনীন ভাব কখনই প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

শাস্ত্রনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সমর্থন ও প্রচার, নীতি-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ব্যবস্থাশাস্ত্র, (Jurisprudence) রাজনৈতিক বিজ্ঞান, লোকশিক্ষা, ব্রহ্ম-বিদ্যা, ও ধর্ম্মতত্ত্ব, (Philosophy of Religion) বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত ও কার্য্য, এবং সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপরে সমাজপ্রতিষ্ঠা, এই কয়েকটি বিষয় তাঁহার বিশ্বজনীন ভাবের অন্তর্গত।

রাজার বিশ্বজনীন ভাব আলোচনা করিতে হইলে, যেমন উপরি-উক্ত বিষয়গুলির আলোচনা আবশ্যক, সেইরূপ তাঁহার জাতীয় ভাবের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, তিনি স্বজাতির ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে সংস্কারক ও উন্নতিসাধক। তিনি যে কেবল হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, এমন নহে ; খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মেরও সংস্কার বিষয়ে তিনি যত্নশীল হইয়াছিলেন। তিনি যেমন ধর্ম্ম-সংস্কারক, সেইরূপ তিনি সমাজসংস্কারক। তিনি হিন্দুসমাজের সংস্কার বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে জাতীয়সংস্কারক।

ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের মত

এখন রাজার যাহা বিশেষত্ব তদ্বিষয়ে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলিতে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার রচিত বেদান্তের ভাষ্যে, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জর্ম্মানদেশীয় পণ্ডিত হিগেল ব্যতীত এরূপ উচ্চভাব আর কোথাও দেখা যায় না। ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে রাজা, তাঁহার রচিত বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা এই পুস্তকের অন্যস্থানে প্রকাশ করিয়াছি। তথাচ এ স্থলে সংক্ষেপে উহার পুনরুক্তি করা আবশ্যক। রাজার মতে পরমেশ্বর জগতের আত্মা (God is the self of the universe) ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। তটস্থ লক্ষণ-দ্বারা, অর্থাৎ তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্য এই জগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার লক্ষণ বা সগুণ-ভাব জানা যায়। পরমেশ্বরই বাস্তবিক পারমার্থিক সত্তা,—তাঁহার অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। মায়ার অর্থ ঈশ্বরের শক্তি বা শক্তির কার্য্য। জগৎ মায়াকার্য্য, এ কথার তাৎপর্য্য এই

যে জগতের ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন বস্তু আছে, এরূপ বোধকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলে, ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানও বলা যায়। জগতের জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র। উহা স্বপ্নের ন্যায় অথবা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যেমন, জীবকে ছাড়িয়া স্বপ্নের ও রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের সত্তা নাই, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা বিহিত কর্ম্ম করিতে হইবে। যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। মুক্তির উপায়,—শমদমাদি সাধন, জ্ঞানালোচনা, এবং লোকের হিতসাধন।

সংসার ত্যাগ করা উচিত কি না ?

এক শ্রেণীর বৈদান্তিকদিগের মতে, জগৎ, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্রাদি সকলই মিথ্যা। সুতরাং সংসার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। রাজা এ প্রকার মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সগুণ, নির্গুণ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান, রাজা এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বেদ, কোরান ও বাইবেলের সাধারণ সত্য কি ?

বেদ, কোরান ও বাইবেল, এই তিনটি প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত তিন শাস্ত্রেই পরমেশ্বরের একত্ব ও মনুষ্যের প্রতি দয়া, এই দুই মহাসত্যের উপদেশ রহিয়াছে। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস এবং মানবের হিতসাধন ঐ তিন শাস্ত্রেরই সাধারণ উপদেশ। হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম এবং মুসলমানধর্ম্ম, এই তিন ধর্ম্মের উহা সাধারণ অংশ। একেশ্বরবাদ ও পরোপকার, ঐ তিন শাস্ত্রে, ঐ তিন ধর্ম্মেই রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মে জড়োপাসনা, বহু দেবোপাসনা, পিতৃপুরুষদিগের উপাসনা, পরলোকগত মহাজনদিগের উপাসনা এবং অবতারবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বীগণ কাল, স্বভাব ও বুদ্ধাদি মানিয়া থাকেন ; কিন্তু বেদ, বাইবেল ও কোরান এই তিনটি ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলে একেশ্বরবাদ। সময়ে এই তিন শাস্ত্রাবলম্বীদিগের মত বিকৃত হইয়া উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।

কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের মূল কারণ কি ?

বহু দেবোপাসনা ও কুসংস্কার, হিন্দু ও খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বলচিত্ত ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকে, সুচতুর ধর্ম্মযাজকদিগের উপদেশ প্রভাবে ঐ সকল উপধর্ম্মে সহজেই বিশ্বাস করিয়াছে। রাজার মতে ইহার মূলকারণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব। সর্ব্বসাধারণ লোকে বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা না করিলে, এই সকল কুসংস্কার দূর হইবার উপায় নাই।

রাজা রামমোহন রায় কিভাবে শাস্ত্র মানিতেন ?

অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ শাস্ত্র উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতি বা জগৎকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন। মনুষ্যসমাজের ইতিবৃত্তে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা মনুষ্যকৃত, কৃত্রিম,—সুচতুর রাজপুরুষ ও ধর্ম্মযাজকদিগের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এই সকল মত বিষয়ে রাজার মৌলিকতা দেখা যায়। তিনি যেমন জগতে সত্যের,—ঈশ্বরের আবির্ভাব মানিতেন, সেইরূপ মানবের ইতিবৃত্তে সত্যের,—ঈশ্বরের প্রকাশ স্বীকার করিতেন। রাজার মতে, যুক্তি ও তর্ক, ধর্ম্মনির্ণয়ের একমাত্র

উপায় নহে। তিনি যুক্তি মানিতেন, কিন্তু তাঁহার মতে শাস্ত্রই সমাজশৃঙ্খলার সাধারণ-ভূমি। অর্থাৎ তাঁহার এই মত ছিল যে, সমাজশৃঙ্খলার সাধারণভূমিস্বরূপ শাস্ত্রের সহিত ব্যক্তিগত যুক্তির সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিবে। এই শাস্ত্র যে অলৌকিকভাবে, ঈশ্বরাদেশে মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি অপ্রাকৃতিক ও অলৌকিক বিষয় কিছুই স্বীকার করিতেন না। তবে তিনি কিভাবে শাস্ত্র মানিতেন? তাঁহার মতে মানবসৃষ্টির একত্রীভূত জ্ঞানের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সত্য মানবেতিহাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি এইভাবেই শাস্ত্র মানিতেন। বিভিন্ন যুগ ও জাতির পক্ষে, বিভিন্ন শাস্ত্র পরমেশ্বরের বিধান বলিয়া মনে করিতেন। যুক্তিদ্বারা মিলাইয়া লইয়া সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা ও তদনুসারে সমাজের সংস্কার করা, আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন।

মূলশাস্ত্রের পরবর্ত্তী শাখা-প্রশাখা বিষয়ে রাজার মত

বেদ, বাইবেল ও কোরান, এই তিন প্রকার প্রধান শাস্ত্র হইতে, পরবর্ত্তী সময়ে শাখা-প্রশাখাস্বরূপ অনেক শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে। রাজা বলেন, এই সকল পরবর্ত্তী শাস্ত্রে অনেক পরিমাণে ধর্ম্মমত বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে,—অনেক কুসংস্কার প্রচারিত হইয়াছে। স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সংগ্রহাদি বেদের পরবর্ত্তী শাস্ত্র। Church councils, Creeds and Articles, Theological dogmas, Commentaries, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজে এই সকল, বাইবেলের পরবর্ত্তী। এই সকলে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের মতকে অনেক পরিমাণে বিকৃত করিয়াছে, অনেক কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছে। মুসলমান-দিগের মধ্যে সরিয়েৎ, হিদায়া, কোরানের পরবর্ত্তী। মূলশাস্ত্রের সহিত পরবর্ত্তী শাস্ত্র-সকলের যতদূর ঐক্য আছে, ততদূর তাহা গ্রাহ্য। রাজার মতে, শাস্ত্রের এই সকল পরবর্ত্তী শাখা-প্রশাখায়, কোন নূতন সত্য, কোন আধ্যাত্মিক আদর্শ, সাধন বা সাধনপ্রণালী প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন মূলশাস্ত্রের সহিত যতদূর তাহাদের ঐক্য, ততদূর সে সকল মান্য। মূলশাস্ত্রের সহিত যেখানে পরবর্ত্তী শাস্ত্রের অনৈক্য, সেখানে পরবর্ত্তী শাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য।

শাস্ত্রনির্ণয়ের নিয়ম

স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের বিষয়ে রাজা বলেন যে, এই সকল শাস্ত্রের কোন কথা বেদের বিরুদ্ধ হইলে তাহা পরিত্যাজ্য। অনেক পুরাণাদি ব্যাসের নামে প্রচলিত হইয়াছে। সে সকল এক ব্যক্তির রচিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাসরচিত বলিয়া পুরাণ সকলকে মানিয়া লইলেও উহার মধ্যে, কোন্ শ্লোক প্রকৃত, এবং কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিশেষ নিয়ম আছে। সে নিয়ম এই যে, যে তন্ত্র বা পুরাণের প্রসিদ্ধ টীকা নাই, কিম্বা যাহা শিষ্টপরিগৃহীত বা সংগ্রহকারধৃত নহে, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহা রাজার নিজকৃত নিয়ম নহে। পণ্ডিতেরা বিচারগ্রন্থে এই নিয়ম এবং ইহার অনুরূপ অন্যান্য নিয়মের অনুসরণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ঠিক্ আছে। তাঁহাদের এরূপ কোন নিয়ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতে ধর্ম্মের উন্নতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাশীল, শাস্ত্রঅগ্রাহ্যকারী বিশুদ্ধযুক্তিমার্গাবলম্বী পণ্ডিতগণকে রাজা অতিক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী শাস্ত্রে নূতন সত্য, ভাব

বা আদর্শ কিছু নাই, রাজার এ কথা, ভ্রান্তিশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। পরবর্ত্তী শাস্ত্রে মতবিকৃতি ও কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু উন্নতিও অনেক হইয়াছে। বৈষ্ণববৈদান্তিকদিগের মতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সে উন্নতি এই ;—কর্ম্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ভক্তি ; অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ ভক্তিমার্গে উপনীত হওয়া ; অথবা কাম্যকর্ম্ম কিম্বা প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তি মার্গের মধ্য দিয়া নিষ্কামধর্ম্মে পোঁছান। এই উন্নতির বিষয়ে, সংক্ষেপে আর এক প্রকারে বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম হইতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মা হইতে ভবগান্।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সমাজ

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজা কি বলিয়াছেন, আমরা উপরে তাহা বলিয়াছি। সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে, জীবনে পরিণত করিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনাই উক্ত সমাজের উদ্দেশ্য। বেদ, বাইবেল ও কোরানের যাহা সাধারণ মত, অসাম্প্রদায়িক মত, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের মত। সমাজের ট্রষ্ট্‌ডীড পত্রে, রাজা সেই সাধারণ অসাম্প্রদায়িক মত সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া গিয়াছেন।

জাতীয়ভাবে সংস্কার

প্রত্যেক জাতি ও দেশের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে রাজার মত আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজা বিশ্বাস করিতেন যে, বিভিন্ন যুগ ও জাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্র পরমেশ্বরের বিধান। কিভাবে তিনি শাস্ত্রসকলকে বিধান মনে করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন, সেইরূপ, সামাজিক ও পারিবারিক নীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন যে, প্রত্যেক জাতির কতকগুলি সাধারণগ্রাহ্য নিয়মাবলী আছে। সেইরূপ নিয়মাবলী প্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সকল নিয়ম একজাতি হইতে অন্য জাতির মধ্যে হঠাৎ প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে না। এই সকল নিয়ম বা দেশাচার সমগ্র জাতির ইচ্ছাপ্রসূত। অথবা, প্রথমে, দেশের রাজা বা ধর্ম্মাচার্য্যগণ ঐ সকল নিয়ম মনোনীত করিয়াছিলেন, ক্রমে সর্ব্বসাধারণ প্রজাবৃন্দ উহা গ্রহণ করিয়াছে। ঐ সকল নিয়ম বল-পূর্ব্বক কেহ প্রবর্ত্তিত করে নাই। ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকভাবে, দেশাচাররূপে, ঐ সকল নিয়ম বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির পক্ষে, বিভিন্ন প্রকার দেশাচার তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রাজা ভাবিতেন যে, এক প্রকার জাতীয় আচার ব্যবহার অন্য জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব নহে। তাঁহার মতে, প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হওয়াই উচিত। প্রত্যেক জাতির জাতীয় সংস্কারের জন্য স্বতন্ত্র প্রকার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়।

হিন্দু জাতির জাতীয় অবস্থা, প্রয়োজন, শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার অনুসারে তাঁহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার আবশ্যক। মুসলমান ও খৃীষ্টিয়ান জাতি সকলের পক্ষেও সেইরূপ হওয়া উচিত। সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্য কি হইবে? একমাত্র লক্ষ্য লোকশ্রেয়ঃ ;—শারীরিক, ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণই লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায়ের মতে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কারের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা।

রাজা জাতীয়ভাবে ধর্ম্মসংস্কারকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি উদার অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তথাচ, তিনি জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। যখন যে জাতির মধ্যে পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রচার করিয়াছেন, সেই জাতির শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই, আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন এবং খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন।

রাজার গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ

রাজা হিন্দুভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সকলকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ;—এমন কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার ধর্ম্মমতের সাধারণ ভূমি প্রদর্শিত হইয়াছে। 'অনুষ্ঠান', 'প্রার্থনা', 'ব্রহ্মোপাসনা', ইত্যাদি গ্রন্থে ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের মত উদার ও অসাম্প্রদায়িক হইলেও তিনি হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণদ্বারা তাঁহার প্রত্যেক কথা সমর্থন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহাই প্রকৃত বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম।

ব্রহ্মোপাসনাকে তিনি বেদান্তানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ের গ্রন্থসকলকে আমরা দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত করিলাম। 'বেদান্তদর্শনের ভাষ্য', 'বেদান্তসার', 'উপনিষদের ভাষা বিবরণ' হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের জন্য এই কয়েকখানি তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা বৈদান্তিক আকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থে, রাজা বেদান্তের ও শঙ্করাচার্য্যের প্রত্যেক কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ; যেমন মায়া, জগতের মিথ্যাত্ব, পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি মত মানিয়া লইয়াছেন। বেদান্তের মত স্বীকার করিলেও, তিনি বেদান্তদর্শন ও শঙ্করভাষ্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মৌলিকত্ব আছে। তাঁহার ব্যাখ্যা অতি সুন্দর! পণ্ডিতেরা উহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

রাজা, কতকগুলি গ্রন্থে বৈষ্ণবাদি, পৌরাণিক, পৌত্তলিক বা অবতারবাদী হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে, তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, এই সকল হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া লইয়াছেন। এই সকল শাস্ত্র হইতে তিনি গৃহস্থের ব্রহ্মোপাসনার অধিকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লোকশ্রেয়ঃসাধন যে সনাতন ধর্ম্ম, ইহাও তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণসহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অবতারবাদ, দেবপূজা ও পৌত্তলিকতার অধিকারী কে, এবং কোন্ পর্য্যন্ত উহার সীমা, অর্থাৎ লোকে কতদিন পর্য্যন্ত প্রতিমা পূজা করিবে, শাস্ত্রানুসারে তিনি তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রানুসারে নিঃসংশয়ে, প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৌত্তলিকতা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি হিন্দুশাস্ত্রসকলকে মানিয়া লইয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্র মানিয়া লইলে, যে সকল কথা অবশ্যই মানিয়া লইতে হয়, তাহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যেমন শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, দেবতাদের অবতার, যেমন বিষ্ণুর অবতার, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ইত্যাদি মানিয়া লইয়াছেন। রাজা বলেন, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে পরব্রহ্মের কোন অবতার নাই,—অবতার অসম্ভব। কিন্ত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার অবতার আছে। তিনি পুরাণতন্ত্রাদি মানিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী লোকে, পুরাণ, তন্ত্র বলিয়া কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক

ব্যাসাদি ঋষির নামে উহা প্রচলিত করিয়াছে। অধিকারিভেদ, অসংস্কৃত মদ্যমাংসের নিষেধ, ভক্ষাভক্ষ্য, শাস্ত্রানুসারে সকলই মানিয়া লইয়াছেন। জাতিভেদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এমনভাবে উহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহাতে ব্রহ্মোপাসনা, পরমার্থসাধন, নীতি ও কোনরূপ সামাজিক কল্যাণের ব্যাঘাত না হয়। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার', 'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'পথ্যপ্রদান', 'সহমরণবিষয়ক প্রবন্ধ', 'বজ্রসূচি', এই সকল গ্রন্থকে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম।

এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, রাজার লিখিত অন্য প্রকার গ্রন্থও আছে। পাদ্রি সাহেবেরা হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রের পক্ষসমর্থন করেন। তিনি সুতীক্ষ্ণ তর্কাস্ত্রে পাদ্রিদিগের আপত্তিসকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, হিন্দুশাস্ত্রের পক্ষসমর্থন করিতে গিয়া পাদ্রি সাহেবদিগের অযুক্ত মত সকলকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, খ্রীষ্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের মত অপেক্ষা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'Brahmanical Magazine', 'ব্রাহ্মণসেবধি', 'Correspondence of Ramdas with Dr. Tytler', 'Answer of a Hindoo why he frequents Unitarian places of worship etc.' রাজা এই সকল গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষসমর্থন ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমরা এই সকল গ্রন্থকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম।

প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থসকল রাজা নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসকলে রাজার নাম ছিল না, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই জানিত যে, উহা রাজার লিখিত এবং তিনি নিজেও সকলের নিকট আপনাকে লেখক বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকে রাজা আপনার নাম দেন নাই, কল্পিত নাম অথবা বন্ধুবান্ধবের নামে উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন, শিবপ্রসাদ শর্ম্মা, চন্দ্রশেখর দেব, রামদাস ইত্যাদি।

রাজা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রদ্বারা আপনার মত সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি 'The Precepts of Jesus, a guide to peace and happiness' নামক যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকাতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বই প্রকৃত ধর্ম্ম। উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় তিনি খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রকে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের ধর্ম্ম যে, ব্রহ্মোপাসনা তাহার নৈতিক বা কার্য্যগত অংশ প্রকাশ করাই উক্ত পুস্তক-প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে, খ্রীষ্টের উপদেশ সকলের মধ্যে, তদুপযোগী যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহাই উক্ত পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাইবেল গ্রন্থে অন্য অন্য যে সকল বিষয় আছে, তাহা উহাতে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার নিজের মতের উপযোগী যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহাই নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন। এই পুস্তকখানি আমরা পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম।

রাজা, কতকগুলি গ্রন্থে খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের সহিত, ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, যীশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করিয়াছিলেন। এই বিচারে তিনি খ্রীষ্টীয় সমস্ত শাস্ত্র মানিয়া লইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক একেশ্বরবাদ বাইবেল শাস্ত্রের প্রকৃত মত। ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, যীশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এ-গুলি বাইবেলের মত নহে। পরবর্ত্তী সময়ে, এই সকল কুসংস্কার ও কল্পনা, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণ, এবং যে সকল অসভ্যজাতীয়

লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা এই সকল কুসংস্কার খ্রীষ্টীয় ধর্ম-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। বাইবেলকে শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইলে, যাহা কিছু অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, রাজা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'Appeals to the Christian Public' নামক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিচার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ, ক্রমে ক্রমে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত করিলাম।

তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন নামে পারস্য ভাষায় রাজা একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। উক্ত গ্রন্থে রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিকে সপ্তম শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

রাজার প্রকৃত ধর্ম্মমত

রাজার প্রকৃত ধর্ম্মমত কি, এ বিষয়ে সাধারণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাজাকে কেহ বেদান্তানুগামী হিন্দু, কেহ বা একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ান, ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার গ্রন্থসকলের আমরা যেরূপ বিবরণ দিলাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিভিন্ন লোকে, তাঁহাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করে কেন? বাস্তবিক রাজা অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন। এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণসাধনকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। ইহার বিরোধী যাহা কিছু ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা তিনি অসার ও অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে জাতীয় আকারে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দু-দিগের মধ্যে নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাথমিক বিশুদ্ধতা উদ্ধার করিতে যত্ন করিয়াছেন। রাজা তাঁহার জীবনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজে, হিন্দু-ভাবে, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। তথাচ তিনি অন্য ধর্ম্মের গৌরব সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেন। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত তাঁহার হৃদয়কে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই। যদিও তিনি মনে করিতেন যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই প্রকৃত ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে, তথাচ তিনি, প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, যে উহা, অন্যান্য ধর্ম্মমত অপেক্ষা, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাতীয় উন্নতি পক্ষে অধিকতর অনুকূল। ("Genuine Christianity is more conducive to the moral, social and political progress of a people than any other known creed.")

বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধীয় জ্ঞান

রামমোহন রায়ের রচিত 'প্রার্থনাপত্র' এবং অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, রাজা বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধীয় জ্ঞানের (Comparative Religion) কতদূর উন্নতি করিয়া গিয়াছেন? এ বিষয়ে মোক্ষমূলর বলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে কার্য্যতঃ এইরূপে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলর রাজাকে "Father of Comparative Theology" বলিয়াছেন। বিভিন্ন কালে ও দেশে, বিভিন্ন প্রকারে বিকসিত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে, এ যুগে রাজা রামমোহন

রায়ই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখন দেখা আবশ্যক যে, রাজার পূর্ব্বে এইরূপে ধর্ম্মচর্চ্চা, কিভাবে ও কি পরিমাণে হইয়াছিল, এবং রাজাই বা উক্তবিষয়ের কতদূর উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে এবং অন্যান্য স্থানে নিও-প্লেটোনিষ্টদের (Neo-platonists) মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যজাতি এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধর্ম্মসকলের সংমিশ্রণ হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইঁহারা ধর্ম্ম-দর্শনের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন কালে ও দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, ধর্ম্মের যেরূপ আকার ও বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারা তদ্বিষয়েরও কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম কি বস্তু? ধর্ম্মের সঙ্গে মানবীয় জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের কি সম্বন্ধ? পরমাত্মা, জীবাত্মা ও জড়জগৎ, এই তিনের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কি? ধর্ম্মের প্রকার-ভেদ কিরূপ? ও মানবেতিহাসে ধর্ম্মের কি প্রকার ক্রমবিকাশ হইয়াছে? এই সকল বিষয় ধর্ম্মদর্শনের আলোচ্য। ধর্ম্মের প্রকারভেদ এবং মানবজাতির ইতিবৃত্তে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ, ধর্ম্মদর্শনের এই অংশটুকু একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে ও কালে ধর্ম্মের যেরূপ আকার ও বিকাশ হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

অগষ্টাইন, লাইব্‌নিজ্, স্পাইনোজা, লেসিং, ক্যাণ্ট, হার্ডার এই কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত একভাবে ধর্ম্মদর্শনের আলোচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিউম সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে উহার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইঁহারা ধর্ম্ম-দর্শনের আলোচনায়, ধর্ম্মের প্রকারভেদ ও ঐতিহাসিক বিকাশ বলিতে গিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রণালীর তুলনা ও তাহার শ্রেণীবিভাগও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রীক, রোমান, য়ীহুদী ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মেই আপনাদের চর্চ্চা আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

মহাপণ্ডিত হিউম ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্তভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা করেন। হিউম সাহেবের দৃষ্টান্তে ফরাসী দেশে ভল্‌নি প্রভৃতি থিওফিল্যানথ্রপিষ্টগণ বিভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক চর্চ্চা ও বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইয়োরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা, সকল দেশের ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইয়োরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্যদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহারা অধ্যয়ন করেন নাই। অন্য-দেশীয় ধর্ম্ম বিষয়ে, তাঁহাদিগকে পর্য্যটকদিগের কথার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা ও মীমাংসা নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, ইয়োরোপে, জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল। এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে। প্রথম, যাস্ক নিরুক্তে; দ্বিতীয়, কুমারিল্লভট্ট; তৃতীয়, সায়ন বেদের ত্রিদশদেবতার বিচারে, ধর্ম্মদর্শনের অনেক প্রকৃততত্ত্ব, নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত, সাংখ্য, ও পাতঞ্জলদর্শনে উপাসনা ও উপাস্যবিষয়ে অনেক বিচার আছে।*

* সাংখ্য, পাতঞ্জলে উপাস্য বা উপাসকের অবলম্বন অনুসারে উপাসনার শ্রেণী-বিভাগ আছে। যথা ভূত, সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, পুরুষ, জীব ও ঈশ্বর, এই সকল, পরে পরে ক্রমশঃ উচ্চতর অবলম্বনের কথা লেখা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে, ইন্দ্র, বরুণাদি বৈদিক দেবতাকে কখন ভূতের অধিষ্ঠাতা, কখন ইন্দ্রিয়

ভারতে ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিকাশ

ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিকাশ কিরূপ হইয়াছে? আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম বেদের পূর্ব্বভাগ, কর্ম্মকাণ্ড। তৎপরে বেদান্ত ও পাতঞ্জল;—জ্ঞান ও উপাসনা কাণ্ড। তৎপরে পুরাণ;—অবতারবাদ ও ভক্তিকাণ্ড। তৎপরে গীতা। ইহাতে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়। পুরাণানুসারে আর এক প্রকারে এই বিকাশের কথা বলা যাইতে পারে। প্রথম,—প্রবৃত্তিমার্গ. ইহার সহিত কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধ। দ্বিতীয়,—নিবৃত্তিমার্গ, ইহার সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ। তৃতীয়;—নিষ্কামকর্ম্ম, ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়।

এই বিকাশ প্রাচীনকালের অনেক জ্ঞানীগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের অবতরণিকায় এই স্তরভেদের কথা বলিয়াছেন;—প্রথম প্রবৃত্তিমার্গ, তৎপরে নিবৃত্তিমার্গ। শঙ্করাচার্য্যের পর, অনেক বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে, এই কথার সার-মর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা বলেন, কর্ম্মের পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর ভক্তি। প্রবৃত্তি-মার্গের পর নিবৃত্তিমার্গ, তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্ম। পরমেশ্বরের জ্ঞান সম্বন্ধে, প্রথমে ব্রহ্ম, তৎপরে পরমাত্মা, তৎপরে ভগবান্ এইরূপে ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি সংসাধিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মভিন্ন, অন্যান্য ধর্ম্মের মত ও তৎসম্বন্ধীয় বিচারগ্রন্থও এ দেশে ছিল, এক্ষণে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। দ্বাত্রিংশৎ প্রকার বিদ্যার মধ্যে, একত্রিংশ বিদ্যা যবনদিগের মত; উহার নাম শুক্রনীতিতে আছে। এই যবনমত, একেশ্বরবাদ; এবং ইহাতে যে সকল আচার ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বৈদিক নহে। যবনমত বিষয়ে এখন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর জ্ঞান সম্বন্ধে রাজা নূতন কি করিয়াছেন ?

মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মের সংঘর্ষণে ভারতবর্ষে অনেকগুলি উদারমতাবলম্বী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে; যেমন গুরুনানক ও কবীরের ধর্ম্ম। ইঁহাদের হৃদয়ে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। উদার অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ প্রচার বিষয়ে ইঁহারা, রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় যেমন,

মনাদির অধিষ্ঠাতা, এবং কখনও বা কর্ম্মফললব্ধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত জীব বলা হইয়াছে। উপনিষদে এই তিনেরই আভাস পাওয়া যায়।

এখন আমরা উপাস্য বা অবলম্বনকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি;—প্রকৃতি কোটির উপাস্য, জীব কোটির উপাস্য, ঈশ্বর কোটির উপাস্য। প্রথম,—প্রকৃতি কোটিতে উপাস্য দুই; (ক) বহিঃপ্রকৃতি;—ভূত, সূক্ষ্মভূতাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বেদের ত্রিদশ দেবতা ইহা ভিন্ন, আর কিছুই নহে। (খ) অন্তর প্রকৃতি;—ইন্দ্রিয়, মন; বুদ্ধি আদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উপনিষদে ত্রিদশ দেবতাকে এই উচ্চপদে উন্নীত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়; জীবকোটিতে উপাস্য;—যজ্ঞতপস্যাদিদ্বারা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত বা কর্ম্মফলানুসারে উচ্চলোকপ্রাপ্ত জীব। উপনিষদে, বিশেষতঃ স্মৃতিতে ইন্দ্র, বরুণাদি দেবতা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়;—ঈশ্বর কোটির উপাস্য,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অবতারগণ। মায়াশক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মসকল আলোচনা করিয়া তাহা হইতে ধর্ম্মতত্ত্বসকলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ আর কেহ করেন নাই।

এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ কার্য্য কি? প্রথমতঃ, ধর্ম্মের দর্শন সম্বন্ধে রাজা কি করিয়াছেন? রাজা শংকরাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী, বেদান্তদর্শনের অনুসরণ করিতেন। কিন্তু শংকরাচার্য্যের সহিত, তাঁহার সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। কি প্রভেদ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রাজার পূর্ব্বে, ইয়োরোপীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিষয়ে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়ার ও আফ্রিকার ধর্ম্মসকল সম্বন্ধেও অনুসন্ধান ও চর্চ্চা করেন। কিন্তু তাঁহাদের আলোচনায় একটি গুরুতর অভাব ছিল। তাঁহারা ইয়োরোপ ও আসিয়ার মূল ধর্ম্মশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন নাই। কিন্তু রাজা, মূল ভাষায় মূলশাস্ত্রসকল অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিয়া উহাদের পরস্পর তুলনাদ্বারা আলোচনা করেন। রাজার পূর্ব্বে এরূপ আর কেহ করেন নাই। রাজা, ইয়োরোপ আসিয়ার প্রধান প্রধান ধর্ম্মের মূলশাস্ত্রসকল মূল ভাষায় পাঠ করিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, য়ীহুদী, খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান শাস্ত্র সকল, অধ্যয়ন করিয়া সেই সকল শাস্ত্রের পরস্পর তুলনা করিলেন। তুলনা করিয়া তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি, সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হইলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ কার্য্য রাজাই প্রথমে করেন। তিনি তুলনীয় সাধারণ ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা।

রাজা কেবল মূল ভাষায় মূল শাস্ত্রসকল পাঠ করিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভ্রমণদ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণদ্বারা ভারতবর্ষীয় সমুদায় উপাসকসম্প্রদায়ের মত ও শাস্ত্র, এবং তিব্বৎ (Thibet) ভ্রমণদ্বারা তত্রত্য বৌদ্ধমত বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টিয়ানদিগের সহিত, আলাপ পরিচয় ছিল বলিয়া তাঁহার সময়ের খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় সকলের বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগের বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি মধ্যে মধ্যে চীন-দেশীয়দিগের ধর্ম্মের বিষয় বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি চীনদিগের শাস্ত্র মূল ভাষায় পাঠ করেন নাই। সম্ভবতঃ উহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন; এবং চীনদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে রাজার সিদ্ধান্ত

জগতে প্রধান প্রধান ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের আলোচনা ও পরস্পর তুলনাদ্বারা রাজা যে সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। রাজার রচিত 'অনুষ্ঠান', 'প্রার্থনাপত্র', এবং 'Precepts of Jesus, a guide to peace and happiness' গ্রন্থের ভূমিকায় এই সকল মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মানবজাতির স্বাভাবিক ও সাধারণ ধর্ম্মভাব

প্রথমতঃ;—রাজা জগতে প্রচলিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেন যে, মানবমনে একটি সাধারণ ধর্ম্মভাব আছে। এই জগতের আদি ও অন্ত কি, এবং ইহা কি কি নিয়মে শাসিত হইতেছে, এই গূঢ় রহস্যের উপরে মানবের ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপ? এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, ইহার

মূলে, এক অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। সেই অনন্ত শক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি ও ক্রিয়া হইতেছে। এই আদি শক্তিরূপ গূঢ় রহস্যের উপরেই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত। রাজা অনুভব করিয়াছিলেন যে, এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ;—ধর্ম্মের এক অস্পষ্ট জ্ঞান,—এই সকল পরিমিত পদার্থের অন্তরালে এক অনন্তের সত্তায় বিশ্বাস, সকল কালে ও সকল দেশে বর্ত্তমান। রাজা বলেন যে, যাঁহারা কাল, স্বভাব বা বুদ্ধতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূলে এক অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয় পদার্থের সত্তা স্বীকার করেন। সেই পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তি ও তাঁহাদ্বারাই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। যে সকল মনুষ্য অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে, কুসংস্কারান্ধ হইয়া বহুদেবোপাসনা করিতেছে, তাহাদের চিত্তেও উক্তরূপ একটি ভাবের আভাস আছে। রাজা একেবারে ধর্ম্মশূন্য লোকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন, মগদস্যু এবং গেঞ্জিস্ খাঁর **(Genghis Khan)** সৈন্যগণ। কিন্তু ইহা অবনতির ফলমাত্র।

আদিম অবস্থায় মানবজাতির ধর্ম্মভাব

মোক্ষমূলর এ বিষয়ে বলেন যে, মানবজাতি প্রথমাবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে দেবত্ব অনুভব করিয়াছিল। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মানবজাতির প্রথমাবস্থাতেই পরিমিত সৃষ্টপদার্থের মধ্যে অনন্তের সত্তা অনুভূত হইয়াছিল। হার্বার্ট স্পেনসার বলেন যে, আদিম অবস্থায় মানবজাতি ভূত পূজা করিত বা করে। মোক্ষমূলর বলেন যে, মনুষ্যজাতি এই ভূত পূজার পূর্ব্বেও প্রকৃতির মধ্যে অস্পষ্টভাবে অনন্তকে অনুভব করিত। মোক্ষমূলর প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই ভূত পূজার মধ্যেও অনন্তের পূজার অস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়।

একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে তাহার বিভিন্ন আকার

দ্বিতীয়তঃ ;—এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইলে উহা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের আকার ধারণ করে ; মনুষ্য তখন পরমেশ্বরকে জগতের স্রষ্টা ও বিধাতারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই একেশ্বরবাদ, প্রচলিত তিনটি প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিস্ফুটভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুজাতির বেদান্ত, য়ীহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাইবেল এবং মুসলমানদিগের কোরান, এই তিন ধর্ম্মশাস্ত্রে একেশ্বরবাদ, জাতীয় ইতিহাসানুরূপ, জাতীয় আকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে, হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানধর্ম্মের একেশ্বরবাদ, ইহার প্রত্যেকটিকে এক একটি বিধান বলা যাইতে পারে।

হিন্দুদের মধ্যে যে একেশ্বরবাদ, তাহার শাস্ত্র বেদবেদান্ত। তাঁহাদের ধর্ম্মের ব্যাবস্থাপক মুনিঋষিগণ, মনু ব্যাস ইত্যাদি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সনাতন ধর্ম্ম, ধর্ম্মের এই দুই প্রকার ব্যবস্থা। ইহাকে হিন্দুধর্ম্মের বিধান বলা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মে অজ্ঞানীদের জন্য মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে দেবপূজার বিধি আছে। য়ীহুদীদিগের মধ্যে যে একেশ্বরবাদ, তাহার শাস্ত্র বাইবেলের পূর্ব্বভাগ। তাঁহাদের ব্যবস্থাপক মুসা ও অন্যান্য মহাত্মাগণ। য়ীহুদীদের বিধানে মুসার ব্যবস্থানুসারেই ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

খ্রীষ্টিয়ানদিগের যে একেশ্বরবাদ, উহার শাস্ত্র বাইবেলের উত্তর ও পূর্ব্বভাগ। যীশুখ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ধর্ম্মের নিয়ম, বিশ্বজনীন নীতি। ইহাতে মূর্ত্তিপূজা একেবারে নিষিদ্ধ।

মুসলমানদিগের মধ্যে যে একেশ্বরবাদ, তাহার শাস্ত্র কোরান। মহম্মদ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা ব্যবস্থাপক। মহম্মদের প্রচারিত নিয়মসকল তাঁহাদের ধর্ম্মের নিয়ম। মহম্মদের পরে অন্যান্য গ্রন্থে মুসলমান ধর্ম্মের অনেক বিকাশ হইয়াছে।

এইরূপ বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ে যে একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই কয়েকটি বিষয় আছে।

প্রথম ;—একটি করিয়া শাস্ত্র। সেই সম্প্রদায়ের লোক উক্ত শাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয় ;—এক বা একাধিক ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরানুপ্রাণিত মহাজন। সেই সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস করেন যে, এই সকল মহাজনের ভিতর দিয়া, তাঁহারা শাস্ত্র ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল মহাজনেরা অনেক স্থানে আপনা-দিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের সম্বন্ধে লোক অনেক অলৌকিক ক্রিয়া ও অলৌকিক গল্প প্রচার করিয়াছে। কোন কোন স্থলে, তাঁহাদিগকে পরমেশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছে। যেমন হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে অবতারবাদ প্রচারিত হইয়াছে। য়ীহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে কখনই অবতারবাদ প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃতিক ও অদ্ভুত গল্প প্রচারিত হইয়াছে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থশূন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও অর্থশূন্য সামাজিক নিয়ম অপেক্ষা নৈতিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নিয়মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়। রামমোহন রায় খ্রীষ্টের নৈতিক নিয়ম বা উপদেশ সকলকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের কারণ এবং উহা নিবারণের উপায়

তৃতীয়তঃ ;—এইরূপে একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম, কোন সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করিলে পর দেখা যায় যে, ইহা চতুর ধর্ম্মযাজকদিগের চেষ্টায় এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের অজ্ঞানতাবশতঃ উহা ক্রমে ক্রমে বিকৃত আকার ধারণ করে, উহাব সহিত অনেক প্রকার কুসংস্কার জড়িত হয়, অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে এবং গোঁড়ামি বৃদ্ধি হইয়া বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ হয়।

মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই একটি একান্ত শোচনীয় বিষয় লক্ষিত হয় যে, লোকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত হইয়াও আবার ক্রমে কুসংস্কার ও উপধর্ম্মে অধঃপতিত হইয়া থাকে। রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, সর্ব্বসাধারণ লোকের অজ্ঞানতা এবং মানসিক দুর্ব্বলতাই উহার কারণ। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারদ্বারা উহা নিবারিত হইতে পারে। তাঁহার মতে বিজ্ঞানের বিশ্বজনীন প্রচার ও উন্নতি আবশ্যক। জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্মের অধঃপতন ক্রমে ক্রমে নিবারিত হইবে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সাদৃশ্য

চতুর্থতঃ ;—প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য আছে। এই দুই ধর্ম্মকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। উভয় ধর্ম্মেরই ভিত্তি অবতারবাদ। প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টিয়ানেরা এবং হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় কোন বাহ্যমূর্ত্তির পূজা করেন না। কল্পিত মানসমূর্ত্তিতে সন্তুষ্ট থাকেন। গ্রীক,

আর্ম্মেনিয়ান, এবং রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানগণ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় জগতের অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক লোক, অবতারবাদে বিশ্বাস করেন, এবং ধর্ম্মসাধনের জন্য বাহ্য কৃত্রিম মূর্ত্তি ব্যবহার করেন। গ্রীক, আর্ম্মেনিয়ান এবং রোমান কাথলিক খ্রীষ্টিয়ানগণ কেবল মূর্ত্তি ব্যবহার করেন, এমন নহে, অন্যান্য প্রকার বাহ্য উপকরণও ব্যবহার করিয়া থাকেন; যেমন ক্রুশ যন্ত্র, পবিত্র জল ইত্যাদি 'প্রভুর ভোজের' (Lord's Supper) সময় রুটিকে যীশুর মাংস এবং সুরাকে তাঁহার রক্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন।

ধর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ

পঞ্চমতঃ ;—ধর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ। রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত 'প্রার্থনাপত্র' 'অনুষ্ঠান' এবং অন্যান্য গ্রন্থে নিম্নলিখিত ধর্ম্মসকলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখন সেই সকল ধর্ম্মকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছি। রাজা নিজে শ্রেণীবিভাগ করেন নাই। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্ম্মের বিষয়ে তিনি স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার গ্রন্থ হইতে আমরা সেই সকল একস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম।

নিম্নতম ধর্ম্মসকল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত ধর্ম্মসকলের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথম, এমন সকল জাতি আছে, যাহারা ধর্ম্মশূন্য হিংস্র জন্তুর তুল্য। তাহারা ধর্ম্মকে উপহাস করে। রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মগদসুু এবং জেঙ্গিস্ খাঁ যে সকল তাতারদেশীয় সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

জড়োপাসনা

দ্বিতীয়, পাষাণাদি জড়পদার্থকে জ্ঞানবিশিষ্ট মনে করিয়া ঐ সকলের পূজা। তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা। সর্প এবং গাভী প্রভৃতি জন্তুর পূজা। ভারতবর্ষে হিন্দু-দিগের মধ্যে এবং আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে এরূপ পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে Fetichism বলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে জোড়াপাসনা বলা যাইতে পারে।

বহু দেবোপাসনা

তৃতীয়, আদিম শ্রেণীর বহু দেবোপাসনা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় দেব-দেবীগণকে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়াই বিশ্বাস করা হইত। কিন্তু বেদের পূর্ব্ব-ভাগে ইন্দ্র প্রভৃতি যে সকল দেবতার কথা আছে, রাজার মতে, উহা পরমেশ্বরের পূজার রূপক চিহ্নস্বরূপ। এই তৃতীয় শ্রেণীর ধর্ম্মে ভূতপ্রেতের পূজা, পিতৃপুরুষদিগের পূজা, পরলোকগত বীরদিগের পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা উন্নত জীব বলিয়াই পূজিত হন। এই শ্রেণীর ধর্ম্মে, বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দেবতা ও উন্নত জীবের পূজা হইয়া থাকে। প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশেষ বিশেষ দেবতার কর্ত্তৃত্ব। বলিদান প্রভৃতি দ্বারা ইঁহাদিগের তুষ্টিসাধন করা হয়। অনন্ত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্য এই সকল দেবতার পূজা করে।

রাজা যেরূপ ধর্ম্মকে আদিম শ্রেণীর বহু দেবোপাসনা বলিয়াছেন, হার্বার্ট স্পেনসার অবিকল তাহাই বলেন। হার্বার্ট স্পেনসার বলেন যে, মনুষ্য আদিম অবস্থায় সর্ব্বপ্রথমে প্রেতাত্মার উপাসনা করে। ক্রমে প্রেতাত্মাসকলের ক্রিয়া মনে করিয়া প্রাকৃতিক

শক্তি ও ঘটনাসকলের পূজা করিয়া থাকে। মোক্ষমূলর বলেন যে, এ মত ভুল। প্রেতাত্মার উপাসনার পূর্ব্বে, মনুষ্য প্রাকৃতিক শক্তিসকলের পূজা করিয়া থাকে। যেমন ঋগ্বেদে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা। ইহা জড়োপাসনাও নহে, এবং প্রেতাত্মার পূজাও নহে; আধ্যাত্মিক রূপকভাবে ব্রহ্মোপাসনাও নহে। ইহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার ধর্ম্মের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক শক্তি কিম্বা প্রাকৃতিক পদার্থের পূজা, রাজা দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হয়, উহা জড়োপাসনা, নতুবা রূপকল্পনা।

হিন্দু বহু দেবোপাসনায় আর একটি ভাব আছে। দেবতাদিগকে এক অনন্ত ঈশ্বরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানেরাও এইরূপ মনে করিতেন। আর একটি ভাব এই যে, ঈশ্বরোদ্দেশে এবং ঈশ্বর ভাবিয়া দেবতাদিগের পূজা। হিন্দুশাস্ত্রে অজ্ঞানী নিম্নাধিকারীর জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

দেবোপাসনার রূপকব্যাখ্যা

দেবোপাসনা সম্বন্ধে আর একটি স্তর। দেবতাদিগকে রূপকভাবে, অর্থাৎ পরব্রহ্মের বিবিধ শক্তি ও গুণের প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা। রাজা বলেন, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য আদি সকলে প্রথমে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গণ্য ছিলেন। পরে, পরমেশ্বরের অনন্ত গুণের রূপক চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদিগকে বিবেচনা করা হইল। রাজার মতে, বেদের পূর্ব্বভাগে ও বেদান্তে এইরূপ জীব-দেবতা সকলকে পরমেশ্বরের গুণের রূপক চিহ্নস্বরূপ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। যেমন পরমেশ্বরের সৃজন, পালন ও বিনাশ, এই যে তিন শক্তি, ইহার প্রত্যেকের রূপকমূর্ত্তি রহিয়াছে। সৃষ্টিশক্তির রূপকমূর্ত্তি ব্রহ্মা, পালনীশক্তির রূপকমূর্ত্তি বিষ্ণু, এবং সংহারশক্তির রূপকমূর্ত্তি শিব।

রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতী

উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে, এই সকল দেবতাকে উন্নত শ্রেণীর জীব এবং ব্রহ্মপূজার রূপক চিহ্নস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, দেখিয়া তিনি মনে করিতেন যে, বেদের পূর্ব্বভাগে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে, উহা আধ্যাত্মিক রূপকভাবে ব্রহ্মপূজার বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ বিষয়ে রাজার সহিত মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর মতের ঐক্য দেখা যাইতেছে।

ঈশ্বরের নানা গুণ, নানা ভাব, নানা শক্তি অনুভব করিবার জন্য নানা কৃত্রিম রূপকল্পনা করা হইয়াছে। এমনভাবে রূপকল্পনা করা হইয়াছে যে, উহাতে সেই সকল ভাব, গুণ বা শক্তি প্রকাশ হয়। পুরাণ ও তন্ত্রে এই প্রকার অনেক রূপকল্পনা আছে। ধ্যানযোগে যে সকল রূপসন্দর্শন হয়, তাহাও এইরূপ।

রূপকল্পনা বিষয়ে তিনটি পন্থা

এই প্রকারে ঈশ্বরের নানা ভাব ও শক্তির বাহ্য আকার দিতে গিয়া হিন্দুশাস্ত্রে তিনটি পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

প্রথম, সাঙ্কেতিকভাবে, পরমেশ্বরের গুণ ও শক্তি প্রকাশ করিবার জন্য, উপযুক্ত কৌশল করিয়া মূর্ত্তিকল্পনা। যেমন দুর্গামূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি, সরস্বতীমূর্ত্তি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়, ধ্যানযোগ, ও সমাধির অবস্থায় মুনিঋষিরা আপনার অন্তরে যে সকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, স্তব, স্তোত্রে, ধ্যানের বর্ণনায়, এই সকল মূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়। যেমন মহেশ্বরের রূপ, বিষ্ণুর রূপ, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মহেশ্বরী শক্তিরূপ ইত্যাদি।

তৃতীয়, অবতারদের লীলা। এই সম্বন্ধে নানারূপ প্রতিমূর্ত্তি, যেমন রাম, কৃষ্ণাদি বিষ্ণুর অবতারদিগের প্রতিমূর্ত্তি।

অবতারবাদ

মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য ভগবানের দেহধারণ। ইহার দুইটি প্রধান দৃষ্টান্ত। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মে যীশুখ্রীষ্ট অবতার, এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে রাম, কৃষ্ণাদি ভগবানের অবতার।

অবতারবাদের প্রকারভেদ

এই অবতারবাদের প্রকারভেদ আছে। কোন কোন সম্প্রদায় কৃত্রিমমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া অবতারের পূজা করেন। যেমন রোমানক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ান এবং পৌত্তলিক হিন্দুগণ। নিম্নতম শ্রেণীর অবতারবাদীরা পরমেশ্বরের এক চিরস্থায়ী প্রকৃত বিগ্রহ স্বীকার করেন। যেমন গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ।

অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর অবতারবাদীগণ মানসমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া অবতারের পূজা করেন, যেমন প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টিয়ানগণ এবং কোন কোন শ্রেণীর রামোপাসকগণ। রাজার মতে, পূর্ব্বে একেশ্বরবাদে পৌঁছিয়া পরে তাহার বিকৃতিস্বরূপ অবতারবাদ প্রচলিত হয়।

ইহা সত্য যে, পূর্ব্বে এক প্রকার একেশ্বরবাদে উপনীত হইয়া পরে অবতারবাদ প্রচলিত হয়। ইহা অবনতি হইলেও ইহাতেও বিকাশ দেখা যায়। এই অবতারবাদের সহিত ভক্তিতত্ত্ব, প্রেম, সেবা আদি আছে।

অনন্ত ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা

চতুর্থ, আধ্যাত্মিকভাবে সত্যস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বৈত পরমেশ্বরের উপাসনা। পরমেশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। জগতের স্রষ্টা ও নির্ব্বাহকরূপে জ্ঞেয়। নিম্ন অবস্থায় উপাসনা, কেবল তুষ্টির নিমিত্ত সেবা। উচ্চ অবস্থায় উপাসনা পরমেশ্বরের জ্ঞান ও চিন্তা। এই উপাসনার কার্য্যগত দিক্ লোকশ্রেয়ঃসাধন ; অর্থাৎ যাহাতে লোকের কল্যাণ হয়, এমন সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান।

একেশ্বরবাদের তিনটি বিভাগ

এই একেশ্বরবাদ প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে তিনভাগে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটিকে এক একটি বিধান বলা যাইতে পারে। যেমন, প্রথম, হিন্দুদিগের বেদান্ত। দ্বিতীয়, পুরাতন ও নূতন বাইবেল। তৃতীয়, কোরান। তবে প্রত্যেকটিই অধিকাংশস্থলে কুসংস্কার দ্বারা বিকৃত হইয়াছে। অনৈসর্গিক ক্রিয়া, অমূলক উপন্যাস এবং অর্থশূন্য বাহ্য অনুষ্ঠানদ্বারা সকলগুলিই বিকৃত হইয়াছে। গোঁড়ামি এবং বিপক্ষদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচারদ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে। আর কোন কোন স্থলে পৌত্তলিকতাদ্বারা একেশ্বরবাদ দূষিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ সমর্থিত হইতেছে। যেমন খ্রীষ্টিয়ান-দিগের মধ্যে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানগণ, মুসলমানদিগের মধ্যে সুফীগণ, হিন্দুদিগের মধ্যে নিরঙ্কারী শিখ, দাদুপন্থী, সন্তমতাবলম্বী, কবীরপন্থী।

এখন বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং নীতির ভিত্তির উপরে ব্রহ্মোপাসনা কিম্বা অদ্বৈত

ঈশ্বরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সামাজিক বাহ্য অনুষ্ঠানের (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের) যে বন্ধন ছিল তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আরও কোন কোন শ্রেণীর ধর্ম্ম

পঞ্চম, উপরি-উক্ত কয়েক প্রকার ধর্ম্ম ভিন্ন, রাজা রামমোহন রায় আরও কোন কোন প্রকার ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক ঈশ্বরাবতার ও দেবতার পূজা ত্যাগ করিয়া কাল কিম্বা স্বভাবকে জগতের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন; অথবা বুদ্ধকে (Perfected Humanity) উপাসনা করেন। রাজার মতে ই'হারাও লোক-শ্রেয়ঃ অর্থাৎ জীবের কল্যাণ সাধনকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, এবং জগতে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি কার্য্য করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ই'হাদিগকে রাজা ব্রহ্মোপাসনার বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন না। ই'হারা রাজার মতে উপরি-উক্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার ভিতর অজ্ঞেয়তাবাদীও পড়িয়া গেলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং অগস্ত কম্‌টের নরপূজা, এই উভয়েরই মধ্যবর্ত্তী। এই শেষোক্ত শ্রেণী-সকলের স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে এবং ঈশ্বরজ্ঞানশূন্য অজ্ঞান অসভ্য জাতীয় লোককে এক শ্রেণীর অন্তর্গত মনে করা কখনও যুক্তিযুক্ত নহে। বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অজ্ঞেয়তাবাদ বা একেশ্বরবাদ, এবং অজ্ঞান অসভ্যদিগের ধর্ম্মশূন্যতা কখনই এক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। হয়, তাহারা অত্যন্ত অবনতিপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের ধর্ম্মভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহারা অদ্যাপি এরূপ অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে যে, বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত বিকাশের অভাবে তাহারা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানে উপনীত হইতে পারে নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা

নীতি, ব্যবহারশাস্ত্র, লোকশিক্ষা, রাজনীতি

নীতির মূলতত্ত্ব

নীতি-তত্ত্ব বিষয়ে স্বার্থ ও পরার্থ সম্বন্ধে রাজা মনে করিতেন যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃ সহানুভূতি রহিয়াছে। সহানুভূতি মানব-প্রকৃতি-নিহিত একটি মৌলিক বৃত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বভাবতঃ মানবসমাজের অধীন। মানবপ্রকৃতি-নিহিত স্বার্থমূলক বৃত্তিসকল যেমন স্বাভাবিক, মানবের পরার্থমূলক সামাজিক বৃত্তিগুলিও সেইরূপ স্বভাব-জাত । রাজা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও এই স্বার্থ ও পরার্থমূলক বৃত্তিনিচয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু রাজা স্বার্থকে পরার্থের সহিত এবং পরার্থকে স্বার্থের সহিত একীভূত করেন নাই। তাঁহার মতে নীতির মূলতত্ত্ব মঙ্গল, জীবের সুখ। যাহাতে জীবের মঙ্গল হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিনিচয়ের উন্নতিসাধন দ্বারা মঙ্গললাভ হয়।

নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

রাজা মানবের কর্ত্তব্যসকলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; আপনার প্রতি কর্ত্তব্য, জনসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য এবং পরমেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য। রাজা নীতিতত্ত্ব বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কথা আছে।

প্রথম, মানব-প্রকৃতি-নিহিত স্বাভাবিক সহানুভূতি। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম সাহেবও সহানুভূতির মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়, স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয়। হার্বার্ট স্পেনসারের বহুপূর্ব্বে রাজা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে হার্বার্ট স্পেনসারের সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ, নীতির চরম লক্ষ্য। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিগেলের সহিত রাজার সাদৃশ দৃষ্ট হইতেছে। (Hegel's self-realization)।

চতুর্থ, সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিনিচয়ের উন্নতিসাধন ও অপরের হিতসাধন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত আরিস্টটল (Aristotle) ও প্লেটোরও এই মত।

পঞ্চম, রাজা বিশ্বজনীন নীতিসূত্র নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ে কোনস্থলে বলিয়াছেন, আপনার প্রতি যেমন, অন্যের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। অথবা কোন স্থানে কনফিউসস্ ও যীশুর অনুবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন, 'অপরের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর।' রাজা লোকহিত সাধনকেই নীতির লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন। রাজা ইংলণ্ডীয়

পণ্ডিত পেলির ন্যায় ধর্ম্মমূলক হিতবাদ (Theological Utilitarianism) সমর্থন করিতেন। রাজার মতে, জনসমাজের কল্যাণ, কেবল নীতিরই লক্ষ্য, এমন নহে, রাজবিধি ও রাজশাসনেরও ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সমাজশাসনের লক্ষ্য, লোকশ্রেয়ঃ বা জন-হিত-সাধন ভিন্ন অন্য কিছু হওয়া উচিত নহে।

ষষ্ঠ, রাজা, ইতর প্রাণীর মধ্যে নৈতিক বৃত্তির অঙ্কুর প্রদর্শন করাতে বুঝা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সত্যনির্দ্ধারণ করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। ডারউইন এবং হার্বার্ট স্পেনসার উভয়েই ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে নৈতিকবৃত্তির অংকুর প্রদর্শন করিয়াছেন।

সপ্তম, রাজা যে মনুষ্যের কর্ত্তব্যসকলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, উহা তাঁহার সমকালীন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি উহা পেলির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায় মনে করিতেন যে, জনহিত-সাধনই নীতির মূলতত্ত্ব। তাঁহার প্রচারিত এই নীতিতত্ত্ব, ঈশ্বরনিষ্ঠার সহিত জড়িত। একদিকে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, অন্যদিকে জীবের কল্যাণ সাধন, রাজার মতে ধর্ম্মের এই দুইটি দিক্। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাজা বলিতেন, পরমেশ্বর দয়াময়, সুতরাং তিনি তাঁহার জীবগণের কল্যাণ ইচ্ছা করেন। যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। সুতরাং জীবের হিতসাধন, ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মনিয়ম। ইহাই পরম ধর্ম্ম।

শিক্ষা

শিক্ষা সম্বন্ধে রাজার এই মত ছিল যে, লোককে কেবল প্রাচীন দর্শনাদি শাস্ত্র শিক্ষা দিলেই প্রার্থনীয় ফল উৎপন্ন হইবে না। কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাত্রদিগকে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তিনি দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা অপেক্ষা, এমন সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন, যাহাতে, লোকের কার্য্যগত জীবনে উপকার হয়, এবং জনসমাজের উন্নতি হয়। তিনি বিশেষরূপে ইচ্ছা করিতেন, যাহাতে কেবল বৃথা বাগ্-বিতণ্ডায় ছাত্রদিগের সময় পর্য্যবসিত না হয়। যাহাতে তাহারা এমন কিছু শিখিতে পারে, যদ্দ্বারা তাহাদের দৈনিক জীবনের উপকার হয়, রাজা শিক্ষা সম্বন্ধে তদুপযোগী ব্যবস্থা প্রার্থনীয় মনে করিতেন। চতুষ্পাঠী প্রভৃতি স্থানে ব্যাকরণ কি দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় অনেক অনাবশ্যক ও বৃথা তর্ক লইয়া ছাত্রগণের সময় নষ্ট হয়। রাজা উহা ভাল বাসিতেন না।* রাজা বিজ্ঞানশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ছাত্রদিগকে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং শারীরস্থান প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষা সম্বন্ধে বেকন, হেল্‌ভেসিয়স্, ভল্‌টেয়ার, লক্, প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত রাজার মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাব ও মত-সকল রাজার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মত বা ভাবসকলের মধ্যে, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত ও মূল্যবান্ তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি সমাজতত্ত্ব,

* ২০৬ পৃষ্ঠা দেখ। এদেশীয় লোককে ইংরেজী কিম্বা সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই বিষয়ে রাজা গভর্ণর জেনেরল্ লর্ড্ আম্‌হার্ষ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

কি রাজনীতি, কি ব্যবস্থাশাস্ত্র, সকল বিষয়েই যাহা কিছু অসার ও অযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহা কিছু প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনটেস্ক, বর্ক্, অ্যাডাম্ স্মিথ, বেন্থাম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার মতের অনেক পরিমাণে ঐক্য দৃষ্ট হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মতসকলের মধ্যে যাহা কিছু 'বাড়াবাড়ি' অতিরিক্ত ও অযুক্ত, রাজা তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সন্দেহবাদ, এবং মহাপুরুষবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যকে অবজ্ঞা করিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় স্বাধীন-চিন্তা, তিনি পরিহার করিয়াছিলেন। কি সমাজতত্ত্ব, কি রাজনীতি, কি ব্যবস্থাতত্ত্ব, সকল বিষয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর যাহা কিছু মন্দ, তাহার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। সকল বিষয়ে যুক্তিযুক্ত ও মূল্যবান্ ভাব, মত ও প্রণালী তিনি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা আশা করিতেন যে, লোকশিক্ষা প্রচারদ্বারা মানবজাতির উন্নতি হইবে। রাজার মতে, ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ খ্রীষ্টধর্ম্ম নহে। উহা বহুল পরিমাণে সাধারণ শিক্ষাদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। স্বার্থপর চতুর ধর্ম্মযাজক ও রাজনীতিজ্ঞদিগের দ্বারা জনসমাজের যে অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মূল কারণ সাধারণ লোকের অজ্ঞতা। সর্ব্বসাধারণ লোকদিগের মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইলে, এরূপ অত্যাচার আর থাকিতে পারিবে না। রাজার মতে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক অকল্যাণ সকল ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইবে। রাজা যে চিরাগত শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার এই কারণ। তিনি সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে নিজের কল্যাণ এবং অপরের কল্যাণ সাধন করিবার উপযুক্ত হয়, রাজার মতে এইরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের চিরাগত বিচারপ্রণালীর পরিবর্ত্তে, যাহাতে ব্যাপ্তিনির্ণয় (Induction) প্রণালীদ্বারা বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা হয়, তদ্বিষয়ে রাজা লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। ব্যাপ্তিনির্ণয় প্রণালীদ্বারা প্রাকৃতিক তত্ত্বের অনুসন্ধান, এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে জনহিতকর শিল্পাদির উন্নতিসাধন, লোকশিক্ষার প্রধান বিষয়। রাজার মতে গণিত ও পদার্থবিদ্যা এবং জনহিতকর শিল্পকার্য্য, সকলকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ দেশে সর্ব্বসাধারণ লোককে কেবল পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা না দিয়া যাহাতে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হয়, এবং ছাত্রদিগকে ইয়োরোপীয় দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, রাজা তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। রাজা গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, চতুষ্পাঠীসকলে অর্থসাহায্য করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দান করেন। এত দিনের পর, সার চার্লস ইলিয়টের শাসনকালে, রাজার মতানুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন অনেক চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে।

উৎকোচ গ্রহণাদি নিবারণের উপায়

হিন্দুসমাজের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজা যাহা বলিয়াছেন আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম ;—দেশের লোকের নীতি ও জ্ঞানের উন্নতি। রাজনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা তিনি নৈতিক ও বুদ্ধিগত উন্নতি অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। নৈতিক

উন্নতি সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন যে, বহু বংশপরম্পরা স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া এবং দাসত্ব ও অত্যাচার সহ্য করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক পরিমাণে নৈতিক দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। রাজা কতকগুলি নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; যেমন, রাজকর্ম্মচারী ও জমিদারদিগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উৎকোচগ্রহণ ও অন্যায়-পূর্ব্বক দুর্ব্বল প্রজার অর্থশোষণ। রাজা, উৎকোচগ্রহণাদি নিবারিত হইবার উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা দূর হইলে, এবং শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে উপযুক্ত বেতন দিয়া সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিলে, উৎকোচাদি গ্রহণ ক্রমে রহিত হইবে। রাজার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি নিবারণের উপায়

দ্বিতীয়;—রাজা বলেন, মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল, এই সকল পাপ, পল্লী-গ্রাম অপেক্ষা নগরে অধিক। আদালত সংক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে এই সকল পাপ অত্যন্ত অধিক। রাজার সময়ের আদালতের পণ্ডিত ও উকিলগণ নীতিবিগর্হিত কার্য্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে সংকুচিত হইতেন না। আদালতের পণ্ডিতেরা অর্থলোভে অনেক অন্যায় ব্যবস্থা দিতেন। রাজার মতে, ইহা নিবারণের উপায়, আদালতের পণ্ডিতদিগের ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি। জজেরা কৌন্সিলিদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, উকিল-দিগের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার আবশ্যক। উকিলেরা যাহাতে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক হন, এরূপ করিতে হইবে। যে সে লোককে আদালতের পণ্ডিত করিলে চলিবে না। রাজা এ বিষয়ে আরও বলিয়াছেন যে, হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে এবং ইয়োরোপীয় জজ্‌গণ অধিকতর উপযুক্ত, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইলে, এ সকল দুর্নীতি নিবারিত হইবে। দেশীয় বিচারক হইলে, কিম্বা দেশীয় বিচারক ইয়োরোপীয় বিচারকের সহিত একত্রে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলে, এবং পঞ্চায়েত বা জুরী, জজের সহিত বিচারে নিযুক্ত হইলে, মিথ্যাসাক্ষ্য অনেক কমিয়া যাইবে। রাজা বলিতেছেন যে, ইয়োরোপীয় বিচারকেরা, দেশীয় ভাষা ও দেশীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া আদালতে মিথ্যাসাক্ষ্য এত অধিক রহিয়াছে।

অসচ্চরিত্রতা নিবারণের উপায়

তৃতীয়;—তৎপরে রাজা অসচ্চরিত্রতা বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার কথা বলিতেছেন। কিছু ধন হইলেই অনেকে প্রকাশ্যভাবে উপপত্নী রাখিয়া থাকেন। রাজার মতে, স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা হইয়া উপযুক্ত সম্মান অধিকার ও শিক্ষা লাভ করিলে এই প্রকার দুর্নীতি সমাজ হইতে ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে।

হিতকর, অথচ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রথা প্রচলিত করিবার উপায় কি?

চতুর্থ;—কৌলীন্যপ্রথাজনিত বহুবিবাহ প্রচলিত থাকাতে, এবং বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া, সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুই কারণে, এবং ঐ দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক হইতেই পতিতা নারীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা নিবারণের উপায়, বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করা। বিধবাবিবাহ বিষয়ে রাজার স্পষ্ট মত পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এমন দেখা যায় যে, কোন প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত না করিলে অকল্যাণ হয়, অথবা প্রবর্ত্তিত করিলে কল্যাণ হয়, অথচ সে প্রথা যদি শাস্ত্রসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে

কি করিতে হইবে? যদি শাস্ত্রে তাহার নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে, তাহার কোন প্রতিবন্ধক নাই। উহা সমাজে প্রচলিত করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু যদি সেই হিতকর ও প্রয়োজনীয় প্রথাটি শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কি উপায় হইবে?

রাজা এক পথ রাখিয়া গিয়াছেন। রাজার মতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষে লোকশ্রেয়ঃই সনাতনধর্ম্ম। সেই সনাতনধর্ম্ম, শাস্ত্রানুসারে সেই হিতকর প্রথাটি, সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। যে প্রণালী অনুসারে বঙ্কিমবাবু সমুদ্রযাত্রার সমর্থন করিয়াছেন, ইহা তাহাই। এই এক পন্থা।

কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। সমগ্র সমাজের জন্য যে প্রথা আবশ্যক, তাহা কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে চলিবে কেন? হিন্দু রাজাদিগের সময়ে কোন বাধা ছিল না। হিন্দু রাজারা, এ বিষয়ে কি করিতেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সাধুগণের সভা ডাকিয়া, শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যাদ্বারা, কিম্বা নিজ সভাসদ্‌গণের দ্বারা, শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা করাইয়া, নূতন ব্যবস্থা চালাইয়া, অনেকরূপ হিতকর প্রথা প্রচলিত করিতে পারিতেন। প্রধান প্রধান টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা এইরূপে প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়, এই সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত জানিতেন। এইরূপ উপায়ে হিন্দুসমাজে পূর্ব্বে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, রাজা তাঁহার রচিত হিন্দু নারীর দায়াধিকার বিষয়ক প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ উপায় এক্ষণে আর নাই। এখন হিন্দু রাজা নাই, হিন্দু ব্যবস্থাপক নাই, এবং সেরূপ সমাজশাসন নাই।

তবে উপায় কি ? রাজা কোন স্থলে বলিয়াছেন যে, কোন কোন স্থলে, ক্রমে ক্রমে দেশাচার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এরূপ পরিবর্ত্তনের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দেশাচার, সদ্ব্যবহাররূপে দাঁড়াইলে, অর্থাৎ সাধুপরিগৃহীত হইলে, এবং লোকশ্রেয়ের বিপরীত না হইলে, উহা শাস্ত্রস্বরূপ হইয়া যায়। এইরূপে কোন শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিতকর প্রথা সমগ্রসমাজে কালে প্রচলিত হইতে পারে।

পঞ্চম ;—ধর্ম্মযাজক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা যে কোন প্রথা চালাইতেন, তাহাই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের জন্য চলিয়া যাইত। ইহাতে সমাজে অনেকগুলি অহিতকর প্রথা প্রচলিত হইয়াছে : যেমন, সতীদাহ, শিশুহত্যা ইত্যাদি। রাজা বলিয়াছেন, হিন্দুরা দয়াবান্ জাতি বটে, কিন্তু শৈশবকাল হইতে এই সকল ভীষণ ও নৃশংস কাণ্ড দেখিয়া, এই সকল বিষয়ে তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে।

রাজা এইরূপ সামাজিক অকল্যাণ, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের আইনদ্বারা রহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। রাজা জানিতেন, এই সকলের মূল অজ্ঞান ও কুসংস্কার। অজ্ঞান ও কুসংস্কার হইতে অনিষ্টকর কদাচারের উৎপত্তি। সেই জন্য, তিনি সুশিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার দ্বারা কুসংস্কারনাশের উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন ; অনিষ্টকর দেশাচারের অধীনতা স্বীকার করার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি লোকের বিবেচনাশক্তি ও নৈতিক জ্ঞানকে জাগ্রত করিতে যত্ন করিতেন। তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, লোকের জ্ঞানোন্নতি ও নৈতিকবুদ্ধির বিকাশ ভিন্ন সামাজিক কদাচারনিচয়ের বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ ;—এ দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতিবিরুদ্ধ কদর্য্য অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। ধর্ম্মের নামে অনেক অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ সকলের বিরুদ্ধে রাজা লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। তিনি লোকের নৈতিক বুদ্ধি জাগ্রত করিতে, ঈশ্বরাদেশ ও প্রাচীন শাস্ত্রসকলের প্রতি ভক্তিবৃদ্ধি করিতে, দেশের লোকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে, হীন ও নিকৃষ্ট ভাব রহিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তি

প্রচার করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকের যে সকল হীনভাব দেশে প্রচলিত, তিনি কখনও কখনও ফরাসীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ লেখক ভল্‌টেয়ারের ন্যায় তদ্বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ন শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক ভাষায় লেখনীচালনা করিয়াছিলেন।

সপ্তম ;—বাঙ্গালীজাতি বড় ভীরু ও দুর্ব্বল, সেজন্য সহজেই পরাধীনতা স্বীকার করে। বাঙ্গালীর ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার জন্য রাজা অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি এই দুর্ব্বলতা নিবারণের একটি উপায় বলিয়া গিয়াছেন। রাজা, মাংসভক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, নিয়মিতরূপে মাংসভক্ষণ করিলে কতক পরিমাণে দুর্ব্বলতা দূর হইতে পারে।

সাধারণ শিক্ষা

কি পুরুষ, কি স্ত্রীজাতি, রাজা সকলেরই পক্ষে, জ্ঞানোন্নতি ও সুশিক্ষা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডে শতকরা নব্বই জন সংবাদপত্র পাঠ করিত। রাজা ভাবিতেন, কবে ভারতে, নরনারী সকলে সেইরূপ লিখিতে পড়িতে পারিবে, এবং সেইরূপ সংবাদপত্র পাঠ করিবে। তিনি মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষীয় প্রজাবর্গের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য বৃটিস গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মতঃ দায়ী। প্রাচীনকালে রোমানেরা তাঁহাদের বিজিত দেশসকলে জ্ঞান ও সভ্যতাপ্রচার করিয়াছিলেন।

১৮১৩ সালে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দপুনর্গ্রহণ সময়ে, (Revision of the Charter) ভারতবর্ষীয় প্রজাবর্গের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, রাজা চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ অর্থ আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যয় না হইয়া, উহাতে ইংরেজী ভাষাদ্বারা এ দেশের লোককে বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজা বলিয়াছেন যে, ইয়োরোপে যেমন প্রাচীনকাল-প্রচলিত প্রণালী অনুসারে বিদ্যাচর্চ্চার পরিবর্ত্তে, (Scholastic Mediæval Learning) পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চ্চা প্রচলিত হইয়া ইয়োরোপীয় জাতিসকলের জ্ঞান ও সভ্যতার আশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধন করিতেছে, সেইরূপ, এ দেশে, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতিতেই বদ্ধ না থাকিয়া, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা, শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে বিদ্যা জনসমাজের পক্ষে উপকারী, কার্য্যগতজীবনে একান্ত হিতকর, সভ্যতার উন্নতিসাধক, সেইরূপ বিদ্যা ভারতের প্রজাবর্গের মধ্যে প্রচলিত হউক, রাজা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট চতুষ্পাঠীসমূহে অর্থসাহায্য করিয়া সাহিত্যদর্শনাদি শাস্ত্রচর্চ্চার সাহায্য করুন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার জন্য, ইংরেজী ভাষাদ্বারা বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত।

সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষার বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে এ দেশে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র, ও উপনিষদাদি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন, এবং বাঙ্গালা ও হিন্দিভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। কিন্তু স্কুল ও কালেজে, কেবল সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতশাস্ত্রের চর্চ্চা না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহায্য করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চার উন্নতিসাধন করিতে রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রায় সত্তর বৎসর পরে স্যার চার্লস্‌ ইলিয়ট এবং স্যার অ্যালফ্রেড্‌ ক্রফট্‌ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

রাজা যেমন লোকশিক্ষাবিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ইংরেজী স্কুল ও কালেজ

সংস্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেইরূপ, তিনি নিজে অন্য অন্য উপায়ে লোক-শিক্ষাবিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রথম ;—রাজা সুপ্রণালীতে বাঙ্গালা গদ্যরচনা ও উহার উন্নতিসাধন করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় ;—বহুতর শাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন।

তৃতীয় ;—সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ; এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং তজ্জন্য বিলাতে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।

চতুর্থ ;—'সংবাদকৌমুদী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, উহাতে বিজ্ঞান, শিল্প, এবং নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন এবং মিরাট আল আকবর নামক একখানি পারসী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

পঞ্চম ;—ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল, ক্ষেত্রতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে, বাঙ্গালাভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

যে সকল বিষয়কে বিশেষরূপে সমাজসংস্কার বলা যাইতে পারে, রাজা তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম ;—রাজা সহমরণ নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করেন। রাজপুতদিগের মধ্যে শিশুহত্যার বিরুদ্ধে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

দ্বিতীয় ;—কৌলীন্যপ্রথাজনিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন করিবার জন্য, গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। বহু-বিবাহ কিছু কমিয়াছে বটে কিন্তু উক্ত কদাচার এখনও প্রবল আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু চেষ্টাতেও আইন পাশ হয় নাই।

তৃতীয় ;—স্ত্রীলোকেরা যাহাতে শিক্ষিতা হয় ; তাহারা তাহাদের উপযুক্ত অধিকার ও সম্মান লাভ করে, তজ্জন্য রাজা লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যেরূপ প্রার্থনীয়, তাহার কিছুই হয় নাই।

চতুর্থ ;—একান্নভুক্তপরিবার প্রথাসম্বন্ধে রাজা বলিয়াছেন যে, উহাতে ভ্রাতৃবিরোধ ও স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট উপস্থিত হয়। একান্নভুক্তপরিবার প্রথা ক্রমে অল্পে অল্পে উঠিয়া যাইতেছে।

পঞ্চম ;—প্রাচীনশাস্ত্রানুসারে যাহাতে স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীধন ও দায়াধিকার সম্বন্ধে তাহাদের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, রাজা তদ্বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই।

ষষ্ঠ ;—তিনি হিন্দুর পৈতৃক সম্পত্তির উপর দানবিক্রয়াদির সম্পূর্ণ অধিকার সমর্থন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রাজার মত আদালতে জয়যুক্ত হইয়াছে।

সপ্তম ;—রাজা লিখিয়াছেন যে, বাল্যবিবাহ এ দেশের দরিদ্রতার একটি কারণ। বাল্যবিবাহ অল্পই নিবারিত হইয়াছে।

অষ্টম ;—রাজা বলেন যে, জাতিভেদ আমাদের জাতীয় অবনতির একটি প্রধান কারণ। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাতিভেদপ্রথা পূর্বাপেক্ষা শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে অধিক উন্নতি দেখা যায় না।

জাতিভেদ দ্বারা এ দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, রামমোহন রায় তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সালের ১৮ জানুয়ারি রামমোহন রায় এক খানি পত্রে এইরূপ লিখিতেছেন ;—

"ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসী খ্রীষ্টিয়ানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে অধিকতর দুষ্কার্য্যরত নহে, এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতের ঐক্য আছে। কিন্তু আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালী তাঁহাদের রাজনৈতিক উন্নতির অনুকূল নহে। জাতিভেদ, আর জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদিগকে স্বদেশানুরাগে (Patriotism) বঞ্চিত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন, বহুসংখ্যক বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের বহুপ্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাঁহাদিগকে কোন গুরুতর কার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছে। আমার বিবেচনায় তাঁহাদের ধর্ম্মে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ তাঁহাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

নবম ;—হিন্দুগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি, অর্থোপার্জ্জনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশগমন না করাতে দরিদ্রতাবৃদ্ধি। এ বিষয়ে রাজার সময়ে দেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন সেরূপ নাই। এখন লোকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশ যাইতে শিক্ষা করিয়াছে। এ বিষয়ে অনেক উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

দশম ;—সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া, অন্য দেশ ভ্রমণ না করাতে এবং অন্যান্য জাতির সহিত বাণিজ্য না থাকাতে, দেশের অনিষ্ট হইতেছে। রাজা এ বিষয়ে কেবল লেখনীচালনা করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি দেশব্যাপী কুসংস্কারকে পদবিদলিত করিয়া নিজে বিলাত-গমনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। দেশভ্রমণ বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বিদেশীয় জাতির সহিত বাণিজ্য বিষয়ে কোন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।

একাদশ ;—রাজা লিখিয়াছেন যে, চিরবৈধব্য প্রথার জন্য দেশে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এ বিষয়ে অতি অল্পই উন্নতি দেখা যাইতেছে। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ-প্রচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃতকার্য্য হন নাই।

দ্বাদশ ;—বাঙ্গালীর শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবারণের জন্য রাজা যে, মাংসাহারের পরামর্শ দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অধিক উন্নতি দেখা যাইতেছে না।

ত্রয়োদশ ;—বাগালী জাতির ভীরুতা এবং সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার অপ্রবৃত্তির জন্য রাজা আক্ষেপ করিয়াছেন। এ বিষয়ে উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।

মাংসভোজন

আহার সম্বন্ধে রাজা মাংসভোজনের পক্ষসমর্থন করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, উহাদ্বারা দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতির বলবৃদ্ধি হইতে পারে। পার্লেমেণ্টের কমিটির নিকটে তিনি যে সাক্ষ্যদান করেন, তাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের অবস্থার বিষয় বলিতে গিয়া মাংসভোজনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি দেখিয়াছেন যে, কোন হিন্দুবংশের কতকগুলি লোক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই যে এক বংশের দুই অংশ, হিন্দু ও মুসলমান, ইহার মধ্যে ঐ মুসলমান অংশের ব্যক্তি-গণ স্বাস্থ্য ও বলসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ। মাংসাহার ভিন্ন এই শ্রেষ্ঠতার অন্য কোন কারণ লক্ষিত হয় না।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, এবং জমিদার ও প্রজাসম্বন্ধীয়

রাজা এই সকল বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপে তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি।

কৃষির উন্নতি এবং ইয়োরোপীয় প্রণালীতে শিল্পশিক্ষা

প্রথম ;—রাজা কৃষির উন্নতি, এবং ইয়োরোপীয় প্রণালীতে শিল্পশিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ (Agricultural Department) হইয়াছে। কৃষির উন্নতির অনেকগুলি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। শিল্প-শিক্ষার জন্য বোম্বাই নগরে ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Victoria Institute) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ স্থলে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং রুর্কি কলেজের নামও করা যাইতে পারে। যাহা হউক, কৃষি ও শিল্প বিষয়ে, বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।

দ্বিতীয় ;—উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে, দেশজাত সামগ্রী প্রস্তুত করা ; যেমন নীল, শর্করা ইত্যাদি। রাজা বলিয়াছেন যে, দেশের লোক এ বিষয়ে নিযুক্ত হইলে অধিকতর উপকারের সম্ভাবনা। তবে ইয়োরোপীয়গণ এ কার্য্য করিলে শ্রমজীবীদিগের উপকার হইতে পারে। এ বিষয়ে ইয়োরোপীয়েরা অনেক করিয়াছেন। নীল, চা, পাট ও শণ, রেশম, কয়লা, Petroleum, Rhea fibre, কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ইয়োরোপীয়েরা অনেক কারখানা খুলিয়াছেন। আফিং এবং সিন্‌কোনা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব

তৃতীয় ;—যে সকল জমিদারির সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, রাজা তৎসম্বন্ধে কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব (The law of primogeniture) সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। জমিদারির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ, মূলধন সঞ্চয়ের ব্যাঘাত এবং বিস্তৃত আকারে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করার অসম্ভাবনা নিবারণের জন্য, তিনি কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ-পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। রাজার এ পরামর্শ গৃহীত হয় নাই।

প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চতুর্থ ;—প্রজাদিগের অবস্থোন্নতি এবং তাহাদের মূলধনের উপযুক্ত ব্যবহার। রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, প্রজারা জমিদারকে যে খাজনা দিবে, তাহা চিরদিনের জন্য স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে, তাহাদের ভূমির উন্নতিসাধনে উৎসাহ হইবে। তাহারা কৃষি সম্বন্ধে যাহা কিছু উন্নতি সাধন করিবে, তাহা অনায়াসে ভোগ করিতে পারিবে। তাহারা যদি জানে যে, ভূমির বা কৃষির উন্নতি সাধন করিলেই জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করিবেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। রাজা এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আংশিকরূপে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রজাস্বত্ব আইনের (Bengal Tenancy Act) দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ভূমির উপর প্রজার স্বত্ব থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের দারিদ্র্যজনিত ক্লেশ এবং অনেক স্থলে অনাহার কষ্টের জন্য রাজা আন্তরিক দুঃখ পাইতেন।

রাজা এ বিষয়ে দুইটি প্রস্তাব করিতেছেন। প্রথম, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, কিম্বা যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই ভূমির উপর প্রজার দখলীস্বত্ব স্বীকার করা উচিত। প্রজাকে দখলীস্বত্ব দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, প্রজারা রাজাকে অথবা জমিদারকে যে খাজনা দিয়া থাকে, তাহার পরিমাণ চিরদিনের জন্য স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। অর্থাৎ জমিদারের সহিত গবর্ণমেণ্টের যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেইরূপ খাসমহলে প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের এবং অন্যত্র প্রজার

সহিত জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। রাজার মতানুসারে কার্য্য হইলে কৃষকেরা ভূমির স্বত্বাধিকারী হয়। তাহারা বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ করে, এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলে, এদেশে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা শত গুণ বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

পঞ্চম ;—রাজার মতে, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জমিদারি সকলে, বাঙ্গালাদেশের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সকল প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারের মধ্যে যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে, সেইরূপ, জমিদার ও প্রজার মধ্যেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু প্রজারা জমিদারকে যে খাজনা দিবে, তাহার উচ্চতম হার স্থায়ীরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। রাজা বলেন যে, এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্ববিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইবে, বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির শুল্কদ্বারা তাহার পূরণ হইয়া যাইবে। রাজা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রচুর মূলধনের অভাব। এই প্রকার বন্দোবস্ত হইলে, উক্ত অভাব দূর হইবে। রাজার পরামর্শমতে, কার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভালবাসেন না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী হইবার সম্ভাবনা, ইহা রাজা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এ দেশে ইয়োরোপীয় বণিকগণের বাস

রাজা বলিতেছেন যে, যদি সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপীয় বণিকগণ এবং তদ্রূপ অন্যান্য ধনশালী ইয়োরোপীয়গণ গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্ম না করিয়া এ দেশে কোন প্রকার শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত হন, এবং এ দেশেই বাস করেন, তাহা হইলে এ দেশের পক্ষে ভাল হয়। তাহা হইলে, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড যে অর্থ লইয়া যাইতেছেন, তাহার কতক অংশ এ দেশেই থাকে। প্রতি বৎসর এ দেশ হইতে প্রচুর অর্থ ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়াতে দেশের যে ক্ষতি হইতেছে, উক্তরূপ ইয়োরোপীয়গণ এ দেশে বাস করিলে তাহার কতক পূরণ হইতে পারে। কিন্তু রাজা বলেন যে, ইতর শ্রেণীর ইয়োরোপীয়গণ কিম্বা ইয়োরোপীয় শ্রমজীবীরা, এ দেশে বাস করিলে দেশের অনিষ্ট হইবে। রাজা বলিতেছেন যে, ইয়োরোপীয় শ্রমজীবীরা এ দেশে বাস করিলে, এ দেশীয় শ্রমজীবী-দিগের সহিত তাহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। কেননা, ইয়োরোপীয় শ্রম-জীবীদিগের আহার প্রভৃতির ব্যয়, দেশীয় শ্রমজীবীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক।

এ দেশে এক্ষণে অনেক ইয়োরোপীয় আসিয়া বাণিজ্যাদি করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এখানে স্থায়ীরূপে বাস করেন না। প্রচুর ধন অর্জ্জিত হইলে, বৃদ্ধ বয়সে দেশে গিয়া বাস করেন। ইতর শ্রেণীর ইয়োরোপীয়গণ এ দেশে আসিয়া বাস করে নাই বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইতর শ্রেণীর ফিরিঙ্গিগণ রহিয়াছে।

লোকসংখ্যা ও শ্রমজীবীদিগের আয়

শ্রমজীবীদিগের আয়বৃদ্ধির পক্ষে, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি নিবারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই তাহাদের আয়ের হ্রাস হইয়া যাইবে। যুদ্ধ প্রভৃতিদ্বারা

লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়া যায়। ওলাউঠা প্রভৃতি প্রবল হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হওয়াতে, শ্রমজীবীদিগের আয়ের হ্রাস হইতেছে না। বাল্যবিবাহের দ্বারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, আয়ের হ্রাস হইয়া যায়। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন প্রার্থনীয়।

শ্রমজীবী এক্ষণে অনেকে বিদেশে যাইতেছে। ১৮৭১ সালে, বাঙ্গালা দেশের ওলাউঠার মারীভয় মনে করিয়াই রাজা ওলাউঠার কথা বলিয়াছেন।

বিবাহাদিতে অন্যায় ব্যয়

এ দেশের সম্ভ্রান্ত জমিদার ও অন্য অন্য ভদ্রলোকে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি উপলক্ষে যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, রাজা তাহা অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। কৃষিজীবীরা যে অতিরিক্ত অন্যায় ব্যয় করিয়া থাকে, রাজা এ কথা স্বীকার করেন না। রাজা বলিতেছেন যে, কৃষক তাহার সমস্ত ফসল বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাজা মহাজনদিগের বিষয় কিছুই বলেন নাই।

রাজশক্তির বিভাগ

রাজতন্ত্রপ্রণালী বা প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় অধিক কথা বলেন নাই। এ বিষয় যে প্রয়োজনীয় নয়, তিনি এমন মনে করিতেন না। তবে রাজশক্তির বিভাগ, ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া মনে করিতেন।

ব্যবস্থাপক ও রাজকার্য্যনির্ব্বাহকগণের স্বতন্ত্র বিভাগ

রাজা বলিতেছেন যে, প্রধানতঃ রাজশক্তি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম, রাজবিধি প্রণয়ন ক্ষমতা। দ্বিতীয়, রাজবিধি অনুসারে রাজকার্য্যনির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা। রাজার মতে, এই দুই প্রকার কার্য্য বিভিন্ন লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকা আবশ্যক। যাঁহারা রাজবিধি প্রণয়ন করিবেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা বিশেষ আবশ্যক। ব্যবস্থাপকগণ যদি রাজকার্য্যনির্ব্বাহকগণের অধীন হন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্যবস্থাপকদিগের সম্বন্ধে রাজা আর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যবস্থাপকগণ সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ হইবেন।

শাসনকর্ত্তা ও বিচারকদিগের স্বতন্ত্র বিভাগ

রাজকার্য্যনির্ব্বাহকদিগের বিষয়ে রাজা বলিয়াছেন যে, তাঁহারাও দুইভাগে বিভক্ত হইবেন ;—শাসনকর্ত্তৃগণ এবং বিচারকগণ। ইঁহাদের কার্য্য পৃথক থাকিবে। যেমন ব্যবস্থাপ্রণয়ন এবং রাজকার্য্যনির্ব্বাহ, এই দুই বিভাগ স্বতন্ত্র থাকিবে, সেইরূপ ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও বিচারকার্য্যও স্বতন্ত্র থাকিবে। ব্যবস্থাপকগণ ও বিচারকগণ পরস্পর স্বাধীন থাকিবেন।

ব্যবস্থাপ্রণয়ন, রাজ্যশাসন, ও বিচার এই তিন বিভাগের স্বতন্ত্রতা

রাজার মতানুসারে ব্যবস্থাপ্রণয়ন, রাজ্যশাসন, এবং বিচার, মূল রাজশক্তির এই তিন বিভাগ স্বতন্ত্র থাকিবে। যে রাজশাসনপ্রণালীতে এই তিন বিভাগ স্বতন্ত্র থাকে না, এক-ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের হস্তে ঐ তিনপ্রকার শক্তির কার্য্য ন্যস্ত থাকে, তাহাই স্বেচ্ছাচারী

রাজশাসন। উক্তরূপ রাজশাসন একজন রাজার দ্বারা অথবা একাধিক ব্যক্তিদ্বারাই সম্পন্ন হউক, যাহাই কেন হউক না, রামমোহন রায় উক্ত প্রকার রাজশাসনকে মন্দ বলিতেন। রাজা বিশেষ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, কোন রাজ্য একজন রাজার অধীন হইলেও, আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা এমন কতকগুলি লোকের হস্তে থাকা উচিত, যাঁহারা সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতিনিধি। এই প্রকার প্রতিনিধিপ্রণালীর যতই উন্নতি হয়, ততই রাজ্যের কল্যাণ। রাজশাসনের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা যদি সুসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, শাসনপ্রণালী কিরূপ হইল, তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন থাকে না। রাজ্যের শীর্ষস্থানে একজন ব্যক্তি অথবা একাধিক ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাহা দেখা তত প্রয়োজনীয় নহে। যদি ব্যবস্থাপ্রণয়ন-বিভাগ, রাজ্যশাসনবিভাগ, এবং বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র থাকে, এবং ব্যবস্থাপকগণ প্রজাদিগের প্রতিনিধি হন, তাহা হইলেই রাজশাসনের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সম্পন্ন হইল।

উপরি-উক্ত মত সকল অধুনাতন কালের উচ্চতম চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের প্রগাঢ় চিন্তার ফল। কি আশ্চর্য্য! রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে এ সকল মত বা রাজনৈতিক তত্ত্ব সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাকেই বলে অসাধারণ প্রতিভা।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কার্য্যবিভাগ

প্রাচীনকালে, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা বিধিপ্রণয়ন করিতেন এবং ক্ষত্রিয়েরা তদনুসারে কার্য্য করিতেন; অর্থাৎ ঐ সকল বিধিদ্বারা প্রজাপালন ও রাজ্য-শাসন করিতেন। এই প্রণালীদ্বারা সুন্দররূপে কার্য্য চলিয়াছিল। ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও রাজকার্য্যনির্ব্বাহ, এই উভয় অধিকার একস্থানে বদ্ধ ছিল না।

ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা লোপ

এরূপ ঘটিল যে, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অধীনে কর্ম্মস্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের ভৃত্য হইলেন। যাঁহারা ব্যবস্থাপক ছিলেন, তাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক-দিগের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ইহার এই ফল হইল যে, আর শক্তির বিভাগ থাকিল না। একস্থানে সমস্ত শক্তি বদ্ধ হইল; রাজারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থা দিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বাধীনতা চলিয়া গিয়াছিল। মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করিবার পূর্ব্বে ঐ প্রকার ভাবে রাজপুতেরা প্রায় সহস্র বৎসর এ দেশে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। রাজার মতানুসারে এ বিষয়ে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।

অরাজকতা ও রাজবিদ্রোহ

কোনও রাজ্যে অরাজকতা বা রাজবিপ্লব উপস্থিত হইলে, ইহাই প্রকাশ পায় যে, রাজ্যে মূর্খতা প্রবল এবং সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হয় নাই। কোন রাজ্যে সভ্যতা ও জ্ঞানের যত উন্নতি হয়, সেই পরিমাণে, রাজশাসনের স্থায়িত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। রাজা বলেন যে, প্রজাবর্গ যদি সুসভ্য সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারেন না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় ইহাও বলিয়াছেন যে, সকল স্থলে এ কথা খাটে না। যদি রাজা বা রাজপুরুষগণ তাঁহাদের রাজশক্তির অত্যন্ত অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে।

যুক্তরাজ্যের কল্যাণ কিসে হয় ?

যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য একত্র হইয়া একটি রাজ্যে পরিণত হয়, ও সেই রাজ্য-গুলির উপর এক সাধারণ রাজশাসন বিস্তারিত থাকে, রাজার মতে সে স্থলে সেই যুক্ত-রাজ্যের একতার উপরেই রাজ্যের কল্যাণ নির্ভর করে। যেমন আমেরিকার যুক্তরাজ্য। উহার বিভিন্ন প্রদেশ সকলের ঐক্য বা মিলনের উপরেই রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত বৃটিসরাজ্য। ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারলন্ড, এই তিন দেশ একত্র হইয়া এক বৃটিস্‌রাজ্য হইয়াছে। ইহাদের ঐক্যে মঙ্গল, অনৈক্যে অমঙ্গল।

কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্কার

রাজা এ দেশ সম্বন্ধীয় কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন। ১ম, মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করা ; ২য়, সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ইয়োরোপীয়গণকে ভূমি ক্রয় করিয়া এ দেশে বাস করিবার অনুমতি দান ; ৩য়, প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া এবং ভূমির উপরে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের অবস্থোন্নতি সংসাধন করা। এই সকল কার্য্যের জন্য রাজা রাজবিধি প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ভূমি ক্রয় করিয়া ইয়োরোপীয়দিগকে এ দেশে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। প্রজার অবস্থোন্নতির জন্য রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা (The Bengal Tenancy Act.) কতক্‌ পরিমাণে সম্পন্ন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর পার্লেমেণ্টের শাসনের আবশ্যকতা

রাজা আর কতকগুলি রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন। ১ম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপরে পার্লেমেণ্ট মহাসভার শাসন থাকা আবশ্যক। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে যে বোর্ড অব কন্‌ট্রোল সংস্থাপিত হইয়াছিল, রাজা তাহার কার্য্যের অনুমোদন করিতেন। রাজা বলিয়াছেন যে, পার্লেমেণ্ট মহাসভার নিকটে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তাহার কার্য্যের জন্য দায়ী থাকা আবশ্যক। পার্লেমেণ্ট মহাসভাদ্বারা ভারতবাসীগণকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও অন্যান্য বিষয়ে যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-মেণ্টের কোন আইনদ্বারা যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে, এরূপ বিধান থাকা আবশ্যক। এরূপ সকল বিষয় পার্লেমেণ্টের বিশেষ অধিকারে ও ক্ষমতায় থাকা আবশ্যক। যখন সময়ে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ শাসনের জন্য নূতন সনন্দ গ্রহণ করিবেন, তখনই কমিসন নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। রাজা পরামর্শ দিয়াছেন যে, মধ্যে মধ্যে কমিসন নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের অবস্থা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে এ দেশে মহারাণীর খাসে আসার পর, নামে মাত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর পার্লেমেণ্টের শাসন রহিয়াছে। বাস্তবিক ভারতসচিব (Secretary of State) গবর্ণর জেনারেলের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন। পার্লেমেণ্টের নিকট বাস্তবিক দায়িত্ব কিছুই নাই।*

---

* এ বিষয়ে ইউল সাহেবের (Mr. Yule) বক্তৃতা দেখ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ গ্রহণের সময়ে কমিসন নিযুক্ত করিয়া ভারত-বর্ষের বিষয় যে অনুসন্ধান হইত, তাহা এখন আর হইতে পারে না। ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের বৃটিস কমিটি এবং পার্লেমেণ্টকমিটি চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে পার্লেমেণ্টের নিকটে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব নামে মাত্র না থাকিয়া কার্য্যতঃ থাকে।

রাজার সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টরগণ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ, অর্থাৎ গবর্ণর জেনারল হইতে নিম্নতম কর্ম্ম-চারী পর্য্যন্ত, এই সকলের দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহ হইত। রাজা বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডবাসী কর্তৃপক্ষগণের, অর্থাৎ ডাইরেক্টরগণের কর্ত্তব্য যে, ভারতবর্ষস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্যের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করেন।

ভারতীয় প্রজাদিগের রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তি

ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের রাজনৈতিক অধিকারের এই কয়েকটি ভিত্তি। (১) পার্লেমেণ্টের যে সকল আইন ভারতবর্ষীয় প্রজাবর্গকে বিশেষ বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়াছে। (২) যে সকল অধিকার ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ বহুদিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে; যেমন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা, চুক্তি সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা। (৩) কলিকাতা ও অন্য কোন কোন প্রধান নগরে সুপ্রীম কোর্ট সংস্থাপন অবধি তন্নগরবাসীগণ একটি বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ড-বাসী প্রত্যেক ইংরেজের আইনসম্বন্ধীয় যেরূপ অধিকার, কলিকাতা প্রভৃতি নগরবাসীগণ সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন অবধি সেইরূপ অধিকার লাভ করিয়াছেন। আর একটি আইনদ্বারা দেশীয়গণের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। ১৮৩৩ সালের সনন্দ, মহারাণীর ঘোষণাপত্র, ১৮৬১ সালের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাসম্বন্ধীয় আইন (The Indian Council's Act) লর্ড ক্রসের আইন। রাজার পরবর্ত্তী সময়ে এই সকল দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজা বলিয়াছেন যে, যে সনন্দ বা আইনদ্বারা আমাদের স্বাধীনতা ও অধিকার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণরজেনারল কর্তৃক কোনও আইন প্রচারদ্বারা যেন তাহার খর্ব্বতা না হয়। এ বিষয়ে পার্লেমেণ্টের দৃষ্টি ও শাসন থাকা আবশ্যক।

এ সকল কথা রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়ে লিখিয়াছেন। এখন এ সকল কথা খাটে না। এখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কেবল নামে পার্লেমেণ্টের নিকট দায়ী। বাস্তবিক এ দেশের রাজকার্য্য, ভারতসচিব (Secretary of State) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডবাসীগণ ও ভারতবর্ষীয় রাজনীতি

যাহাতে ইংলণ্ডবাসীগণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিষয়ে মনোযোগী হন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, তদ্বিষয়ে রাজা বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য বিচারবিভাগ ও রাজস্ববিভাগ সম্বন্ধীয় তাঁহার মতামত ইংলণ্ডে পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় লোকের কি কি অভাব ও কষ্ট আছে, এবং তাহা নিবারণের উপায় কি, রাজা উক্ত পুস্তকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সাংসারিক ও নৈতিক অবস্থার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কংগ্রেসের ইংলণ্ডীয় কমিটি রাজার দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্যই করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত, পার্লেমেণ্ট ও ইংলণ্ডবাসী-

দিগের কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য কেবল এ দেশ সম্বন্ধে কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে রাজার মত আমরা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

আইন প্রচারের পূর্ব্বে দেশীয় প্রতিনিধিগণের পরামর্শ গ্রহণ

আইন প্রণয়ন ও প্রচার সম্বন্ধে রাজা বলিয়াছেন যে, কোন নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইলে গবর্ণর জেনারল ও তাঁহার কৌন্‌সিলের কর্ত্তব্য যে, সাধারণের প্রতিনিধি-স্বরূপ এ দেশের প্রধান প্রধান দেশীয় লোকের সহিত পরামর্শ করেন। লর্ড ক্রসের ভারতবর্ষীয় সভাসম্বন্ধীয় আইনদ্বারা রাজার এই প্রস্তাব আংশিকরূপে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

বিচারবিভাগ সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ

বিচারবিভাগ সম্বন্ধে রাজা এই কয়েকটি কথা বলিয়াছেন ;—প্রথম, যাঁহারা বিচারক, তাঁহাদের হস্তে আইন প্রণয়ন করিবার শক্তি থাকা উচিত নহে। দ্বিতীয়, যাঁহারা রাজ্যশাসন করিবেন বা ফৌজদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদের হস্তে বিচারকার্য্য থাকা উচিত নহে। তৃতীয়, বিচারকের স্বাধীনতা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। চতুর্থ, ব্যবহার-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি বিচারক হইতে পারিবেন। যিনি দেশের লোকের ভাষা, আচার ব্যবহার ও চরিত্র ভালরূপ জানেন না, এমন ব্যক্তি বিচারক হইবার অনুপযুক্ত। এ দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই রাজা এই সকল কথা লিখিয়াছেন।

আইন সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ

রাজা বলিয়াছেন যে, ফৌজদারী আইন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। উহাতে অপরাধ সকলের পরিষ্কার লক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য। দেওয়ানী আইন সম্বন্ধেও রাজা বলিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের দেওয়ানী আইন ও মুসলমানদিগের দেওয়ানী আইন এবং যে সকল দেওয়ানী আইন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে সমভাবে খাটিয়া থাকে, তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত।

হিন্দু ও মুসলমানজাতির দায়াধিকার

রাজা আশা করিতেন যে, জ্ঞানোন্নতি সহকারে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির দায়াধিকারের নিয়ম এক প্রকার হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় আইনে (The Indian Succession Act) এই প্রকার একটি আদর্শ দেখা যাইতেছে। কিন্তু উহা কখনও সর্ব্ব-সাধারণ লোকের গ্রাহ্য হইবে কি না, বলা যায় না ; যদি কখনও হয়, সে সময় বহুদূরে।

আদালত সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ

রাজা বলিয়াছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হওয়া উচিত। তাঁহার মতে, সুপ্রীম কোর্টের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকাও উচিত নহে। রাজার মতে বিচারবিভাগ ও ফৌজদারী বিভাগ স্বতন্ত্র থাকা কর্ত্তব্য। মাজিস্ট্রেটেরা জজের কার্য্য করিবেন না। জজের কার্য্য, মাজিস্ট্রেটের কার্য্য, এবং কলেক্টরের কার্য্য স্বতন্ত্র থাকিবে। এক ব্যক্তির হস্তে বিচার কার্য্য ও ফৌজদারী কার্য্য থাকিলে, অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

উচ্চতর আদালতের বিচারকদিগের, আইন বিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডীয় আইন (English Law) এবং ব্যবহার শাস্ত্রের (Jurisprudence) বিশেষ জ্ঞানের সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যক।

রাজার মতে ইয়োরোপীয় বিচারকের সহিত দেশীয় বিচারক একত্রে বসিয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তাহা হইলে বিচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ইয়োরোপীয় বিচারকেরা দেশীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার ভালরূপ জানেন না বলিয়া সুবিচারের ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব। সেইজন্য ইয়োরোপীয় ও দেশীয় বিচারক একত্রে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে সুবিচারের অধিকতর সম্ভাবনা। উপযুক্ত ও সম্ভ্রান্ত দেশীয় বিচারক আবশ্যক। দেশীয় বিচারকদিগকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া আবশ্যক।

জুরির বিচার

রাজা জুরির বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের আদালত সকলে জুরির বিচার প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। প্রাচীনকাল হইতে পঞ্চায়তের দ্বারা যে বিচারপ্রণালী চলিয়া আসিয়াছে, তাহা রহিত না করিয়া, জুরির আকারে তাহা প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। রাজা পঞ্চায়ত প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন। বিচার বিষয়ে দেশীয় লোকের কিরূপ ক্ষমতা, তাহা পঞ্চায়ত প্রণালী দ্বারা বুঝা যায়।

রাজার মতে উপযুক্ত আকারে হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইন প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

মোকদ্দমা করিতে লোকের অতিশয় অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা চালান বহু ব্যয়সাধ্য। যাহাতে মোকদ্দমা করিবার ব্যয়ের হ্রাস হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রাজা বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের এরূপ কোন আইন প্রণয়ন করা উচিত নহে, যদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর কার্য্য আদালতের বিচারাধীন না হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজা বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কোন লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলে, উক্ত বিষয়ে জজ আদালতে বিচার হইতে দেওয়া আবশ্যক।

অত্যাচারী বড়লোকের প্রতি ন্যায্য বিচার

অনেক উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন লোকে গুরুতর অপরাধ করিয়া, লোকের প্রতি অত্যাচার, এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া, শাস্তি হইতে অব্যাহতি পায়। এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে এই সকল ধনী ও ক্ষমতাপন্ন লোকের উপযুক্ত বিচার হইতে পারে।

দেশীয়দিগের উচ্চপদ লাভ

যাহাতে দেশীয় লোকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদ সকল প্রাপ্ত হয়, বিচারবিভাগে ও রাজস্ববিভাগে যাহাতে উচ্চপদ লাভ করিতে পারে, রাজা তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। রাজার পরবর্ত্তী সময়ে এ বিষয়ে অনেক উন্নতিও হইয়াছে। এক্ষণে অনেক দেশীয় উপযুক্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেছেন, তবে যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা এখনও হয় নাই।

সিবিলিয়ানদিগের ঋণ গ্রহণ

উৎকোচ গ্রহণ, তোষামোদকারীদিগের প্রতি অনুগ্রহ, অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ শোষণ ও করনির্দ্ধারণের সময়ে অত্যাচার ইত্যাদি যাহাতে নিবারিত হয়, তদ্বিষয়ে রাজা অনেক কথা বলিয়াছেন। রাজা তাঁহার সময়ের সিবিলিয়ানদিগের সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন। সিবিলিয়ানেরা জমিদার ও অন্যান্য ধনীলোকদিগের নিকট অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া ঋণজালে জড়িত হইতেন। ঋণগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের ব্যাঘাত হইত। যে সকল ধনীলোক ঋণ প্রদান করিতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করা সিবিলিয়ানদের পক্ষে কঠিন হইত।

হিন্দু, মুসলমান, ও ইংরেজদিগের সময়ে ভূমির উপর স্বত্বাধিকার

রাজস্ববিভাগ সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন ;—প্রাচীন ভারতে যে সময়ে স্মৃতিসকল লিখিত হইয়াছিল, সে সময়ে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল ; অর্থাৎ রাজা ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। ভূমি ব্যক্তিগত, পরিবারগত, বা গ্রাম্য সম্পত্তি ছিল। ভূমি হইতে যাহা উৎপন্ন হইত, রাজা তজ্জন্য রাজস্ব পাইতেন। অর্থাৎ রাজা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত চতুর্থাংশ কিম্বা ষষ্ঠাংশ পাইতেন। কিন্তু রাজা সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। যে ভূমি পতিত, কিম্বা জঙ্গলদ্বারা পূর্ণ, যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্বত্বাধিকারী ছিল না, তাহাতে রাজার স্বত্ব ছিল। (ইংলণ্ডে এক্ষণে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাজার সম্পত্তি নহে)।

মুসলমানদিগের সময়ে, তাঁহারা বিজয়ী বলিয়া ভূমির উপরে স্বত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ভূমির উপরে কৃষক এবং রাজা উভয়েরই স্বত্ব ছিল। মোগলদিগের সময়ে, কৃষক, জমিদার ও রাজা, ভূমির উপরে তিনেরই স্বত্ব ছিল। কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য জমিদারেরা শতকরা দশ কিম্বা এগারো টাকা পাইতেন।

ইংরেজদিগের অধিকারকালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে করনির্দ্ধারণ, বিভিন্ন প্রকার ভূমির বিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ে যে সকল বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা মোগলদিগের রাজত্বকালেরই সদৃশ। এখন ভূমির উপরে রাজার স্বত্ব অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। মান্দ্রাজ এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, খাসমহল সকলে কৃষকেরা নিজেই গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দেয়। প্রজাদিগের খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভূমির উপরে জমিদারের স্বত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। জমিদার গবর্ণমেণ্টকে যে রাজস্ব দিবেন, তাহা চিরদিনের জন্য স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগকে জমিদারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয় ; ভূমির উপরে তাহাদের স্বত্বাধিকার নাই। খোদকাস্ত রায়তদিগেরও ভূমির উপর স্বত্ব নাই। রাজা বলেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

ভূমির উপর রাজার দখলীস্বত্ব

এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। প্রথম, রাজা বিজয়ী বলিয়া ভূমির উপর রাজার স্বত্বাধিকার অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়, ভূমির উপরে প্রজাদিগের স্বত্ব থাকা উচিত। বিশেষতঃ খোদকাস্ত রায়তদিগের ভূমির উপরে

স্বত্ব থাকা একান্ত ন্যায়সঙ্গত। তাহাদিগের স্বত্বাধিকার স্বীকার করা উচিত। মুসলমান-দিগের সময়েও খোদকাস্ত রায়তদিগের ভূমির উপরে স্বত্ব স্বীকার করা হইত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা কি উপকার হইয়াছে ?

রাজা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে রাজ্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। প্রথম, পতিত, জঙ্গলপূর্ণ, অনাবাদি ভূমি-সকলের কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভূমির উন্নতিসহকারে যে আয়বৃদ্ধি হইবে, তাহার জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে না বলিয়া এ সকল উন্নতি সম্ভব হইতেছে। দ্বিতীয়, মান্দ্রাজ প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যে সকল প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তথায় ভূমির আয় অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয়, যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তথায় ধনবৃদ্ধির জন্য পণ্যদ্রব্যের উপরে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধি হইতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয় কি না ?

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সমভাবে থাকে, বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং রাজস্ব বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন। রাজা এ আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, ভূমির রাজস্ব বিষয়ে যে ক্ষতি হইয়া থাকে, আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের উপরে শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া, এবং অন্যান্য প্রকার কর নির্দ্ধারণ-দ্বারা উক্ত ক্ষতির পূরণ হইয়া থাকে। ইহাতে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ইংলণ্ডে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, রাজা তাহা প্রদর্শন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

রাজা দেখাইয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমিদারেরা উপকৃত হইয়াছেন। যদি প্রজাদিগের সহিতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সকল শ্রেণীর লোক উপকৃত হইতে পারেন। ইহাদ্বারা এ দেশে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাই এ দেশের প্রধান অভাব।

অন্যান্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি

অন্যান্য বিষয়ে যে গবর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা রাজা প্রদর্শন করিয়াছেন। লবণ ও আফিং ব্যবসায়দ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইতেছে। রাজার পরবর্ত্তী সময়ে এ সকলের আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেবল বিলাসসামগ্রীর উপর শুল্কনির্দ্ধারণ

রাজা বলিতেছেন যে, বাণিজ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইতে হইলে, যে সকল সামগ্রী জীবনরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহার উপরে শুল্ক নির্দ্ধারণ না করিয়া, ধনীদিগের বিলাসসামগ্রী ও ভোগের সামগ্রীর উপরে শুল্ক নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

ইয়োরোপীয়ের পরিবর্ত্তে দেশীয়দিগকে রাজকার্য্যে নিয়োগ

গবর্ণমেণ্টের ব্যয় এবং প্রজাদিগের উপরে কর হ্রাস করিবার জন্য রাজা বলিয়াছেন যে, ইয়োরোপীয়ের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে দেশীয়দিগকে

নিযুক্ত করা ভাল। তিনি বলিয়াছেন যে, চারিশত টাকা বেতনে উপযুক্ত দেশীয় লোক কলেক্টরের কার্য্য করিতে পারে। রাজা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মোগল বাদসাহদিগের সময়ে দেশীয় লোকেই রাজস্ববিভাগে কর্ম্ম করিত।

সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে পুংখানুপুংখ জ্ঞান

রাজা এ দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এ দেশের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীদিগের দৈনিক মজুরীর হার দিয়াছেন। দেশের লোকের অবস্থা বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের পরে, দাদাভাই নারোজি এবং দিনশা ইদুলজী ওয়াচা ভিন্ন, সর্ব্বসাধারণের অবস্থা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় বিশেষ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

প্রজার দুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায়

বাল্যবিবাহ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা কিরূপে শ্রমজীবীদিগের দৈনিক মজুরী হ্রাস হইয়া যায়, রাজা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজার মতে, বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ। তিনি বলিয়াছেন যে, ইংরেজদিগের শাসনকালে কৃষিজীবী প্রজা-দিগের অবস্থার উন্নতি হয় নাই। অনেকেই কেবল লবণ দিয়া ভাত খায়, তরকারী খাইতে পায় না। রাজা বলেন যে, যদি জমিদারদিগের সহিত প্রজাদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে; তাহা হইলে তাহারা বৃটিস গবর্ণ-মেণ্টের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাহা হইলে সৈন্যসংখ্যার অনেক হ্রাস করিয়া দিতে পারিবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে জমিদারদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং পতিত ভূমিসকলের আবাদ হওয়াতে, ভূমির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। ব্যবসায় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু গড়ের উপরে শ্রম-জীবী প্রজাবর্গের অবস্থা ভাল হয় নাই; বরং বৃটিস গবর্ণমেণ্ট খোদকাস্ত প্রজাদেব ভূমির উপর স্বত্বলোপ করিয়া,—পূর্ব্বে ভূমির উপরে গ্রাম্য প্রজাদের যে অধিকার ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া এবং পঞ্চায়তদ্বারা বিচাব অগাহ্য করিয়া প্রজাদের অনিষ্ট করিয়াছেন। তবে কয়েকটি বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্টদ্বারা উপকার হইয়াছে। লোকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতেছে; জীবন এবং সম্পত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বহুসংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখিবার অনাবশ্যকতা

সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন যে, বহুসংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহাদ্বারা অনর্থক ব্যয়ভার বহন করা হয়। যদি শ্রমজীবী প্রজাদিগকে ভূমির উপরে স্বত্ব দেওয়া হয়, এবং তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হারের উপরে খাজনা বৃদ্ধি করা না হয়, তাহা হইলে, বহুসংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। বহুসংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাখিতে প্রজাদিগের অর্থ অনর্থক শোষণ করা হইতেছে, এবং উহাদ্বারা ভারতবর্ষের দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিলেই হয়। ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের মধ্যে উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব প্রদেশে যে সকল বীরজাতি রহিয়াছে, তাহাদিগেরদ্বারাই বিপদের সময়ে কার্য্য চলিতে পারে।

মুসলমান ও বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের তুলনা

রাজা তৎপরে মুসলমান ও বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের তুলনা করিতেছেন। প্রথম, মোগল-দিগের সময়ে সৈনিক বিভাগে কিম্বা দেওয়ানী বিভাগে, হিন্দুদিগের রাজনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট বলিয়া, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার এবং জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকারের অনেক সময়ে হানি হইত। জীবন এবং সম্পত্তি, সকল সময়ে নিরাপদ থাকিত না। সকল সময়ে বিচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। দ্বিতীয়, বৃটিস্ রাজশাসনকালে জীবন এবং সম্পত্তি অনেক পরিমাণে নিরাপদ হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বিচারালয় সকলে সুবিচার হইতেছে; উৎকোচগ্রাহিতা এবং অন্যান্য অত্যাচার একেবারে নিবারিত হয় নাই বটে, কিন্তু নিবারিত হইবার আশা আছে। গড়ের উপরে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা এবং জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকার অপেক্ষাকৃত অধিকতররূপে ভোগ করিতেছি। বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টকে যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট বলা যায় না। প্রজাদিগের বিশেষ কোনও শক্তি না থাকিলেও, গবর্ণমেণ্ট যখন আইন অনুসারে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তখন ইহাকে যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট বলা যাইতে পারে না।

রাজার মতে বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের দুইটি বিশেষ দোষ আছে। প্রথম, রাজনৈতিক বিষয়ে, বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের ক্ষতি হইয়াছে। মুসলমান-দিগের সময় সৈনিক বিভাগে এবং দেওয়ানীবিভাগে দেশীয় লোকে যেরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন, এখন তাঁহারা সেরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন না। এ বিষয়ে মুসলমান গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে দেশীয়গণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে উন্নতি হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ইংলণ্ডে ব্যয় হইয়া থাকে। এই অর্থ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে করস্বরূপ দিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের সময়ে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত। এরূপে অর্থহানি হইত না। ভারতবর্ষের কত টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হইয়া থাকে, রাজা তাহার হিসাব দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হ্রাস করিবার উপায়

রাজা অর্থহানি হ্রাস করিবার একটি উপায় বলিয়াছেন;—আপিস্ প্রভৃতির ব্যয় কমাইয়া দেওয়া (Retrenchment of establishments)। রাজা দেশীয়দিগকে উচ্চ-পদে নিযুক্ত করিতে বলেন। তিনি বিশেষ প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কর্ণওয়ালিসের সময়ে যে কর ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা মোগল বাদসাহদিগের রাজত্বকালের নির্দ্দিষ্ট কর অপেক্ষা অল্প নহে, বরং কোন কোন স্থলে অধিক।

রাজার মতে, বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের আর একটি দোষ এই যে, রাজস্ববিভাগে ভূমির উপরে গ্রাম্যলোকদের অধিকার স্বীকার করা হয় নাই। ইহা বড়ই ভুল হইয়াছে, এবং ইহাদ্বারা অনিষ্ট হইতেছে। বিচারবিভাগে এবং গ্রাম্যশাসন সম্বন্ধে পঞ্চায়ত স্বীকার করা হয় নাই। ইহাও একটি বিশেষ দোষ হইয়াছে। এখনও পঞ্চায়তকে জুরির আকারে পরিণত করা যাইতে পারে।

রাজা বলেন যে, মুসলমানদিগের সময়ে যুদ্ধ অধিক হইত, এবং জীবন নিরাপদ ছিল না বলিয়া, এখনকার ন্যায় জনসংখ্যার এত বৃদ্ধি হইত না। এখন সর্ব্বত্র শান্তি

সুরক্ষিত হইতেছে বলিয়া, জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, শ্রমজীবীদিগের মজুরী ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। সুতরাং দরিদ্রতাও ক্রমশঃ বাড়িবে।

ইংরেজরাজ্যে এদেশের কি উপকার হইয়াছে ?

এই সকল অকল্যাণ সত্ত্বেও বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

প্রথম, মোকদ্দমায় সুবিচার, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তি বিষয়ে নিরাপদ অবস্থা, সর্ব্বত্র শান্তি, বৃটিস্‌শাসনে, ভারতে বিশেষরূপে এই সকল লক্ষিত হইতেছে। আর একটি বিষয়ে বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টদ্বারা ভারতের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে। তাহা এই যে, সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের অধীনে আসিয়াছে। ইহাদ্বারা ভারতবাসী-দিগের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের অধীনে পূর্ব্বে প্রায় কখনই ছিল না। হিন্দুরাজত্বকালে অথবা মুসলমানদের রাজত্বকালে ইহা প্রায়ই ছিল না।

রাজা আরও বলিয়াছেন, ইয়োরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্প, রাজনৈতিক উন্নতি, সামাজিক ও নৈতিক জ্ঞান, বাণিজ্য ও বিবিধ কলকারখানা, ভারতবর্ষ ইয়োরোপের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া ভারতে বহু শতাব্দীর পরে স্বদেশানুরাগ পুনরুদ্দীপিত হইতেছে। বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের জন্য ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিলে, উন্নতির পথ সুগম থাকিবে। এতদ্ভিন্ন রাজা বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার আছে, বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের উচিত যে, ভারতবর্ষীয় প্রজাগণকে সেইরূপ অধিকার প্রদান করেন।

রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক আশা

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রাজার এই মনের ভাব ও আশা ছিল যে, এ দেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে উন্নত হইয়া ইংলণ্ডের উপনিবেশসকলের ন্যায় রাজনৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডের উপনিবেশসকলের যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার,—তাঁহাদের সহিত ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সম্বন্ধ, রাজা আশা করিতেন, যে ভারতবর্ষ জ্ঞান ও সভ্যতায় উন্নত হইয়া সেইরূপ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবে, এবং ইংলণ্ডের সহিত উহার সেইরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা রাজার একান্ত বাসনা ও আশা ছিল। তিনি কেনেডা দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন যে, কেনেডার সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সেইরূপ সম্বন্ধ সময়ে নিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যদি কোন কালে, বর্ত্তমান সময়ের চিন্তা বা অনুমানের অতীত, কোন ঘটনাদ্বারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই ভারতরাজ্য সমগ্র আসিয়াখণ্ডে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের উপায়স্বরূপ হইবে। প্রাচীনকালে রোমানেরা তাঁহাদের বিজিত দেশ সকলে রোমদেশীয় সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, ইংরেজদের তদপেক্ষা অধিক করা উচিত। সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যা-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

পরিশিষ্ট

রাজা রামমোহন রায়ের বংশাবলী ও পূর্ব্বপুরুষ

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসের 'নব্যভারত' পত্রিকায় রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

রাজা, রাঢ়ীর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পর কথা,—তিনি কাহার সন্তান? এতদুত্তরে এই মাত্র নির্দ্দেশ করাই পর্য্যাপ্ত যে, তিনি নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান। তিনি সুরাইমেলের কুলীন। এ বিষয়ে তাঁহার নামে যে, এক গান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার একাংশ এই

"সুরাইমেলের কুল,
বাড়ী খানাকুল,
ওঁ তৎসৎ বলে এক
বানিয়েছে স্কুল।
ও সে জেতের দফা
কুলের রফা".........ইত্যাদি।

'রামমোহন রায়, শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় এবং ভট্টনারায়ণের অন্বয়ে সঞ্জাত। এই বংশীয়েরা কতবার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিযাছিলেন, তাহা যাঁহাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য নয়, তাঁহারাই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, বাসস্থান পরিবর্ত্তনের তালিকা দেখুন।

(ক) ১ম, ভট্টনারায়ণ—কনোজ হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালায় সমাগত। ১২ পুরুষ একাদিক্রমে এখানে তদ্বংশীয়দের বসতি ছিল।

(খ) ১৩শ, সঙ্কেত—পূর্ব্ববাঙ্গালার অন্তর্গত বৃহৎ বাঙ্গালপাস-বাসী। এখানে ৫ পাঁচ পুরুষের বাস।

(গ) ১৮শ, গোবিন্দ—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেণীপুর-নিবাসী।

(ঘ) ২৪শ, কৃষ্ণচন্দ্র—খানাকুল-কৃষ্ণনগর মধ্যবর্ত্তী রাধানগর-নিবাসী।

"প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে যে যে অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহাতে উহাদের পরস্পর কত পুরুষের ব্যবধান, তাহারই সূচনা করিয়া দিতেছি। ৪ চারিজন, ৪ বার বাস-ভূমি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, জানা গেল।

"পাঠকগণ, এখন সম্পূর্ণ বংশতালিকা সন্দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ পরিতৃপ্ত করিয়া লউন। আমরা বহুদিনের শ্রমে ও যত্নে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহাতে নিমেষমাত্র দৃষ্টিসঞ্চারণ করিলেই, অতি সুগম উপায়ে অতি দুর্গম বিষয় তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত হইবে।"

অনেকের এই মত, যে রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন ; কিন্তু উহা ঠিক্ নহে। রামমোহন রায়ের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ (ঊর্দ্ধতন পঞ্চম-পুরুষ) পরশুরাম প্রথমে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। কান্যকুব্জ হইতে আগত ভট্টনারায়ণ

হইতে অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎপুত্র কমলমিশ্র, তৎপুত্র রামনাথ তৎপুত্র সুন্দরাচার্য্য, তৎপুত্র পরশুরাম, ইনি রামমোহন রায় হইতে ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ, ইনি প্রথম 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরশুরামের পুত্র শ্রীবল্লভ, শ্রীবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ-চন্দ্র, তৎপুত্র ব্রজবিনোদ, ব্রজবিনোদের দুই পুত্র ;—রামকিশোর ও রামকান্ত, রামকান্তের পুত্র রামমোহন, রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ।

রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে যিনি প্রথম যজন যাজন, সংস্কৃত অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া নবাব সরকারে কর্ম্মগ্রহণ করেন, তিনিই প্রথমে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পঞ্চমপুরুষ প্রথম নবাব সরকারে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরশুরামই পঞ্চম পুরুষ।

ব্রজবিনোদের সাত পুত্র, তন্মধ্যে রামকিশোর দ্বিতীয়, এবং রমাকান্ত পঞ্চমপুত্র।

ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার সাহেব বলেন যে, রামমোহন রায়ের পিতামহ মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার পুত্র রামকান্ত রায় মোগলদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে তথা হইতে চলিয়া আসিয়া বর্দ্ধমান জিলায় গিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল।

কার্পেণ্টার সাহেব রামমোহন রায়ের পিতামহের নাম উল্লেখ করিতেছেন না। বোধ হয়, জানিতেন না। তাঁহার নাম ব্রজবিনোদ রায়। সে সময়ে জিলা বলিয়া কোন প্রদেশের নামকরণ হয় নাই। তখন বর্দ্ধমান চাক্‌লা বা চাক্‌লে ছিল। রামমোহন রায়ের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায়, মোগলদিগের অধীনে কোন কর্ম্মই করিতেন না। তিনি ১১৪৮ সাল হইতে ১১৯৩ সালের ২২শে মাঘ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় বর্দ্ধমান চাক্‌লের অন্তর্গত রাধানগরে প্রথম বাস করেন। তৎপুত্র ব্রজ-বিনোদ রাধানগরেই থাকিতেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মুরশিদাবাদের নবাব সুলতান আজিম্‌ওয়াসান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বর্দ্ধমানরাজ জগৎ রায়ের এক প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; সেই পদের নাম শিকদারী। এখন যাহাকে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌পদ বলে, তখন তাহাকে শিকদারী বলিত।

বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, মুরশিদাবাদের নবাব সুলতান আজিম্‌ওয়াসানের অধীনে বর্দ্ধমানের জমিদারী ইজারা লন। সুতরাং তাঁহাকে কর আদায় দিবার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগরের অনন্তরাম চৌধুরী আবার ইজারা লইয়াছিলেন। এই চৌধুরী তেজস্বী ও প্রতাপশালী লোক ছিলেন। বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে তিনি নিয়মিতরূপে খাজনা দিতেন না। কখন কখন অনিয়মে দিতেন। বর্দ্ধমান-রাজ সেইজন্য নবাবের নিকটে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী প্রার্থনা করিলেন। নবাব স্বীয় অমাত্য ভবানন্দ রায়কে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান করিতে অনুমতি করেন। রায় ভবানন্দ তদনুসারে জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কথা এইরূপ বলিলেন ;—"আমার ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কৃষ্ণ পারসী ও উর্দ্দু উত্তমরূপ জানেন। তিনি ধর্ম্মভীরু, অথচ কার্য্যদক্ষ লোক।" ভবানন্দের প্রস্তাবে কৃষ্ণচন্দ্রই খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রেরিত হইলেন। কথিত আছে যে, কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহার সঙ্গে কতক্‌গুলি শিক্ সৈনা আসিয়াছিল। সেই জন্য বহুদিবস পর্য্যন্ত, রায়বংশীয়েরা, 'শিক্‌দার' নামে পরিচিত ছিলেন। অদ্যাপি 'শিক্‌দার' নামক একটি পুষ্করিণী রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ কার্য্যকারককে শিকদার বলিত।

কৃষ্ণচন্দ্র জাহানাবাদের উপকণ্ঠে গোঘাট নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। (জাহানা-

বাদ তখন বর্দ্ধমান চাক্‌লের, পরে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত, তৎপরে হুগলি জিলার অন্তর্গত হইয়াছে।)

এই সময়ে তাঁহার পিতৃপিতামহের বা পিতামহীর বা মাতার সাম্বৎরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য তিনি অনন্তরাম চৌধুরীকে লোকম্বারা কৃষ্ণনগর হইতে এক অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ পাঠাইবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। উক্ত চৌধুরী হরিচরণ তর্কপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি চৌধুরীর গুরুদেব ইহা অবগত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত বিদায় ও পাথেয় দিয়া স্বস্থানে পাঠাইয়া দিলেন; এরূপ অমত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চৌধুরী কায়স্থ। তিনি কায়স্থের গুরু, শূদ্রযাজী। অতএব, সেরূপ ব্রাহ্মণে, তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। পুনরায় চৌধুরীকে অশূদ্রযাজী বিপ্র প্রেরণার্থে দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন। এইবার নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত হইলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রগাঢ় নিষ্ঠায়, কৃষ্ণচন্দ্র মোহিত হইলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তথায় অভিরাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি পরম পুলকিত হইলেন এবং কৃষ্ণনগরের পরপারে দারকেশ্বর নদের বামকূল রাধানগর গ্রামে বসতি গ্রহণ করিলেন। ইঁহারই পুত্র ব্রজবিনোদ। তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র রামমোহন। এখন বুঝা গেল, তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি রাধানগরে কিছু ছিল কিনা, আর কেনই বা রাধানগরে প্রথম বাস হইল। রামমোহন রায়ের পিতা বা পিতামহ, তথায় প্রথম বাস করেন নাই। তাঁহার প্রপিতামহই রাধানগরের আদি নিবাসী।"

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মাব্দ

রামমোহন রায়ের জন্মাব্দ বিষয়ে তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

আমেরিকা নিবাসী ইউনিটেরিয়ান পাদ্রি ড্যাল সাহেব, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারির 'ইণ্ডিয়ান মিরার' সংবাদপত্রে এক প্রেরিত পত্রে বলেন যে, ১৮৫৮ সালে, রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে কিশোরীচাঁদ মিত্র, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ড্যাল সাহেব উপস্থিত ছিলেন। রমাপ্রসাদবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাঁহার পিতা কোন্ সালে ও মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? রমাপ্রসাদবাবু বলিলেন,—"আমার পিতা কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ইংরেজী ১৭৭২ সালে, মে মাসে, বাঙ্গালা ১১৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন।" ড্যাল্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, জন্ম তারিখ কি? রমাপ্রসাদবাবু উত্তর করিলেন,—"কুষ্ঠি না দেখিয়া বলিতে পারি না। অনেক দিন হইল, এখন কুষ্ঠি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।"

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে কুমারী কলেট্ রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বলেন যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কুমারী কলেট্‌কে এক পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ২২শে মে যে রামমোহন রায়ের জন্মদিন, ইহা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন? কুমারী কলেট্ তদুত্তরে বলেন যে, তিনি, রাজসাহী কলেজের বাবু পি. বি. মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে জানিয়াছেন। পি. বি. মুখোপাধ্যায় উহা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট জানিয়াছেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট জানিয়াছেন। বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ললিতবাবুর নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করাতে ললিতবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার মাতামহ বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার পিতা ৬২ বৎসর বয়সে (sixty second) পরলোক গমন করেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন ; সুতরাং হিসাব করিয়া ১৭৭২ সাল জন্মাব্দ বলিয়া পাওয়া যাইতেছে। ইহার সহিত ড্যাল্ সাহেবের কথা বা রমাপ্রসাদবাবুর কথার মিল হইতেছে। ১৮৩৩ সাল হইতে ৬২ বৎসর অন্তর করিলে, ১৭৭১ হয়, সত্য ; কিন্তু, ২৭শে সেপ্টেম্বর মৃত্যুদিন ধরিয়া হিসাব করিলে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস, বাঙ্গালা ১১৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রামমোহন রায়ের জন্ম, ইহা নিশ্চতরূপে পাওয়া গেল, কিন্তু জন্মতারিখ পাওয়া গেল না। আমরা শুনিয়াছি রমাপ্রসাদবাবুর বাটীতে রাজা রামমোহন রায়ের যে কুষ্ঠি ছিল, ৭।৮ বৎসর হইল উহা জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডফ্ সাহেবকে সাহায্য

ডফ্ সাহেবকে রামমোহন রায় কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থের ২১২ পৃষ্ঠায় বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। ডফ্ সাহেবের স্কুল, রামমোহন রায়ের সাহায্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি এক মাসকাল প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতেন, ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে। এ স্থলে আর একটি কথা বলিব। রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তে, কলিকাতা হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরবর্ত্তী টাকী গ্রামের জমিদার, রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য, কালীনাথ রায়চৌধুরী, তথায় স্কুল সংস্থাপনে ডফ্ সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। তিনি টাকী গ্রামে, স্কুলের বাড়ী ও স্কুলের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন। ঐ স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন ঐ চৌধুরী-পরিবার হইতেই দেওয়া হইত। ঐ স্কুলে বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এইরূপে টাকীতে একটি উন্নতিশীল খ্রীষ্টীয় মিসন স্কুল প্রথম আরম্ভ হয়। ডাক্তার চামার্সের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার জন্য ডফ্ সাহেব, রাজা রামমোহন রায়কে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন ;—"He has rendered me the most valuable and efficient assistance in prosecuting some of the objects of General Assembly's Mission." "ইনি (রামমোহন) আসেম্ব্লির প্রচারকার্য্যসম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় নির্ব্বাহ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ও ফলপ্রদ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।"

রামমোহন রায় ও মহম্মদ

১৮২৬ সালে উইলিয়ম আড্যাম সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় মহম্মদের একটি জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা শেষ করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায় মনে করিতেন যে, শত্রু মিত্র উভয়দ্বারাই মহম্মদ সম্বন্ধে অনেক অমূলক কথা রটনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, যদি মহম্মদের এক-খানি জীবনচরিত রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, উহা যে একখানি অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ হইত, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। একেশ্বরবাদ, মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান মত বলিয়া উক্ত ধর্ম্মের প্রতি রামমোহন রায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। উক্ত ধর্ম্মের একেশ্বরবাদের দ্বারা হিন্দু পৌত্তলিকতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে, এ দেশে যে উপকার

হইয়াছে, তিনি তাহা বিশেষরূপ অনুভব করিতেন। উইলিয়ম আড্যাম সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, কোন প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, রামমোহন রায় আহ্লাদের সহিত মহম্মদের চরিত্র ও উপদেশের পক্ষ সমর্থন করিতেন।

রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প

"তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়ের) স্বজনমধ্যে সর্ব্বপ্রথম তদীয় ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রামমোহন রায় তাঁহাকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন। গুরুদাস মুখোপাধ্যায় কতকটা উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার, তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। রামমোহনের প্রতি তিনি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। একদা কোন লোক রামমোহনের নামে একটা অশ্রাব্য গীত রচনা করে। নিম্নে তাহার অস্থায়ীটী দেওয়া গেল ; অবশিষ্টাংশ অতীব অশ্লীল ও শ্রুতিকটু—"জেতের নিকেস রামমোহন রায়, বিদ্যের নিকেস করেছে,—হুদ্দ এক নিকেসের ফদ্দ উঠেছে" ইঃ—গুরুদাস তাহা জানিতে পারিয়া ঐ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হন। রামমোহন কোন সুযোগে তাহা শুনিতে পারিয়া গুরুদাসকে আপন সন্নিধানে ডাকাইয়া পাঠান। গুরুদাস তখন ক্রোধে কম্পিতকলেবর। রামমোহন তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দিয়া বলিলেন, "দেখ ইংরেজেরা কত শত ভয়ানক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তবে ভারত অধিকারে কৃতকার্য্য হন। আর বিশেষ জানিবে যে, বিপদ সম্পদের মূল, যন্ত্রণা সুখের পথপ্রদর্শক, আলোকময় পথে সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া যিনি যাইতে পারেন, তিনিই মহৎ নামের উপযুক্ত। যে যাহা বলুক না কেন, তাহা শুনিবার প্রয়োজন কি? আপন অভীষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হইলেই হইল।" গুরুদাস এই সকল কথা শুনিয়া ওরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন।"

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।
শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

"একদা এক ব্রাহ্মণ কোন বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া কোন এক দেবীর নিকট ধরনা দেন। তাঁহাকে স্বপ্নে এই আদেশ হয় যে, যদি সে তাহার স্বগ্রামনিবাসী জনৈক নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধতেলীর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে, তবে এ বিষম রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। ব্রাহ্মণ মহা বিপদে পড়িলেন। কিরূপে যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নীচজাতির অন্ন ভক্ষণ করেন, আর হিন্দুসমাজেই বা তাঁহার কি দশা করে? ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক বড় বড় মহানগরের অধ্যাপকের ব্যবস্থা চাহিলেন, কেহই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রামমোহনের নিকট গমন করেন ও আপন বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করেন। রামমোহন সমস্ত অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "ঐ বৃদ্ধ তেলী কি আপনার বিশেষ অনুগত?" ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলেন যে, সে পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের প্রজা ও অতীব অনুগত। রামমোহন পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, ব্রাহ্মণ সংগতিপন্ন লোক কি না? ব্রাহ্মণ তাহাও স্বীকার করেন। তখন রামমোহন বলিলেন, "বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের উপায় এখানে নাই। অবিলম্বে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়া তিনি আপন

অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন।" রামমোহন এরূপ ভাবুক ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে পূর্ণ ছিলেন যে, সকল কার্য্যই তিনি আপন নখাগ্রে দেখিতেন।

"টাকীর প্রসিদ্ধ কালীনাথ মুন্সী রামমোহনকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও তাঁহাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদা কোন ব্যক্তি কালীনাথবাবুর নিকট একটি শঙ্খ বিক্রয়ার্থ আসে। এই শঙ্খের ভয়ানক গুণ। উহা যাহার নিকট থাকে, তাহার আর কিছুরই অভাব থাকে না, কমলা অচলা হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করেন। শঙ্খের এবম্বিধ আশ্চর্য্য গুণ শুনিয়া মুন্সী মহাশয় উহা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। ঐ শঙ্খের পাঁচশত টাকা মূল্যও ধার্য্য হইল। কালীনাথ, শঙ্খবিক্রেতাকে রামমোহনের নিকট লইয়া গেলেন এবং পরম আহ্লাদসহকারে শঙ্খের অদ্ভুতগুণ ও মূল্যের বিষয় সকল কথা শুনাইলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রামমোহন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবগত হইয়া উত্তর করিলেন যে "সমস্ত জগৎ যাহার জন্য হাহাকার করিতেছে, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতার অভীষ্ট দেবী, সেই কমলাকে যদি পাঁচশত টাকার বিনিময়ে দৃঢ়-বন্ধনে গৃহে রাখা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল-মাত্র পাঁচশত টাকা পাইয়াই কেন শঙ্খবিক্রেতা আপন চিরলক্ষ্মী দিতেছে? তবে কি পাঁচ-শত টাকাই অচলা কমলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল?" তখন স্বয়ং মুন্সী ও তাঁহার পারিষদ-বর্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া, তৎক্ষণাৎ অচলা কমলাবিক্রেতাকে বিদায় দিলেন।"

"দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিচিত জনৈক পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ তাঁহার পূজার ফুলের অভাব হওয়ায় তাঁহাকে জানান। দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁহাকে রামমোহন রায়ের পুষ্পোদ্যানে যাইতে বলেন। ব্রাহ্মণ তখন কুপিত হইয়া বলিলেন যে, "সে মহাপাতকী, তাহার নামে পাতক—এমন চণ্ডালের উদ্যানে আমাকে যাইতে বলেন?" পরে দ্বারকানাথ তাহাকে বিশেষ বুঝাইয়া রামমোহনের কথিত উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। এই স্থানে অনেকেই আসিয়া ফুল লইয়া যাইত, কেবল নির্দ্দিষ্ট এক স্থানের ফুল তুলিবার নিষেধ ছিল; ব্রাহ্মণ সেই স্থানেরই পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হন। সেখানে রক্ষকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিলে পর, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন যে, "আমার ন্যায় লোক যে, এই পাতকীটার উদ্যানে পদার্পণ করিয়াছে, ইহাই ধন্য বলিয়া না মানিয়া আবার বারণ করিতেছিস?" অদূরে থাকিয়া রামমোহন সকল শুনিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলেন "কেন ঠাকুর এত উষ্ণ হইয়াছেন? আর বলুন দেখি, আমি কিসে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলাম?" ব্রাহ্মণ সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ, ও অপর পক্ষে রামমোহন; উভয়ের মধ্যে তখন ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল—উভয়েই অনাহারী থাকিয়া বিষম তর্কে সমস্ত দিবস কাটাইলেন। পরিশেষে, ব্রাহ্মণ ফুলের সাজি দূরে নিক্ষেপ করিয়া গুরু সম্বোধনে রামমোহনের পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সশঙ্কিত হইয়া মহাসমাদরে ব্রাহ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক একত্রে ভোজন করিতে গেলেন। অনেকে বলেন, ইনিই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইনিই মৃত্যুকালে ব্রাহ্মসমাজে পাঁচশত টাকা দান করিয়া যান।"

—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

"রামমোহনের আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল। তিনি বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন বটে, ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু ভ্রমেও কখন তিনি আপন সম্পত্তির গৌরবে মুগ্ধ হইতেন না। রাজপ্রাসাদ, পর্ণকুটীর তিনি সমজ্ঞান করিতেন। তাঁহার নিকট দরিদ্র বা ধনীর বিভিন্নতা ছিল না। একদা বর্দ্ধমানের

রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন ; সেই সময়ে তাঁহার আর একটি বন্ধুও উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে, রামমোহন উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল বিনয়ী অমায়িক স্বভাবেই তাঁহাকে সেই ভয়ানক সময়েও সকলের নিকট যশস্বী করিয়া তুলিয়াছিল। রামমোহন বিশেষ জানিতেন যে, ধন-গৌরবে মোহিত হওয়া নীচমনার কাজ, ও ধর্ম্মসংস্কারকগণের পক্ষে উহা সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং এই সকল নীচ প্রবৃত্তি হইতে উচ্চমনা রামমোহন বহুদূরে অবস্থিতি করিতেন।”

—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

গৃহদেবতার একত্ব

“বহুদেবত্ববাদ হইতে কিরূপে একেশ্বরবাদে তাঁহার মতির গতি ধাবিত হইয়াছিল, অধিকাংশ লোকেই তাহা জ্ঞাত নয়। আরিষ্টটলের আরবী ভাষায় অনুবাদ পড়িতে পড়িতে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া, তাঁহার সকল চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য বোধগম্য হইয়াছিল। একেশ্বরবাদের তত্ত্ব যে প্রকৃত, তাহাও উহাতে দূরীভূত না হইয়াছিল, এমন নয়। তৎপূর্ব্বেও যে ঘটনায় একেশ্বরবাদ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা এই ;—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত এক শালগ্রাম শিলা, রায়গোষ্ঠীর কুলদেবতা। শিলার নাম “রাজরাজেশ্বর” বা “রাজাধিরাজ”। এই গোষ্ঠীতে উক্ত দেবতা ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতার সমাদর ছিল না, এখনও নাই। দুর্গাপূজা, শ্যামাদি কোনও পূজার ব্যবস্থা নাই। মাকাল, মনসা, চণ্ডী বিগ্রহ ইত্যাদি পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেববেদীর মধ্যে, এক ঐ শালগ্রাম বীতীত আব কোন দেবতার ঐ বংশে অধিকার নাই। ১লা মাঘে লক্ষ্মীপূজা ব্যতিরিক্ত পৌষাদি নির্দ্দিষ্ট মাসে লক্ষ্মীপূজাও নিষিদ্ধ। অরন্ধনাদি কৌলিক এমন কোন কর্ম্মই নাই, যাহা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। কেহ ভাবিবেন না, দারিদ্র্য-বশতঃ এই গোষ্ঠীতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনেকবার অনেকে লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করিতে মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীণ কর্তৃপক্ষের নিষেধে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। একমাত্র দেবতার অর্চ্চনা যে পরিবারে সম্পাদিত, সেই পরিবারভুক্ত রামমোহন কিশোরেই বুঝিয়াছিলেন—ঈশ্বর এক, বহু নহেন। তিনি বয়োবৃদ্ধি সহকারে বলিতেন, আমাদের গোষ্ঠীর দেবতা একমাত্র হইয়াতে, আমরা বাল্য হইতে বুঝিয়া লইতে পারি—ঈশ্বর একমাত্র। যদি কেহ এ কথায় স্বীকৃত হইতে অসম্মত হন, তাঁহাকে একমাত্র ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—যে বালক, ন্যূনাধিক ষোড়শ বর্ষে ছকেশ্বরবাদিতা প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন, যাঁহার ঐ বয়সে ভোট অর্থাৎ তিব্বত দেশে ভ্রমণাসক্তি বলবতী হইয়াছিল, তাদৃশ কিশোর বা বাল্যাবস্থার পক্ষে উহা কেন অসম্ভব হইবে? আনুমাণিক এই যুক্তিও আমাদের ত্যাজ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার অপলাপ করিবার কান কারণ না পাইলে, উহা কি কারণে অগ্রাহ্য হইব? গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা পারিবারিক সমাচার বিশেষভাবে রাখিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রবন্ধলেখক ও রাজা রামমোহন রায় এক পরিবারভুক্ত, পাঠকগণের গোচরার্থ ইহা জানাইতে বাধ্য হইলাম। অদ্য যে ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল, তৎসমস্ত লেখক আপন পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির নিকট অবগত হইয়াছেন, ইহা বলিবার নিমিত্তই এই পরিচয় দিতে হইল।”

"যে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লিখিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও উহা স্বীকার করিতে শুনিয়াছিলাম।"

—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত।

রাজা রামমোহন রায় ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী

রাজা যখন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে রঙ্গপুরে ছিলেন, তখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। হরিহরানন্দ ও রাজার মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল। হরিহরানন্দ তৎপরে বারাণসীধামে গমন করিয়া তথায় বাস করেন। রাজা বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মজ্ঞান চর্চ্চা ও ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার করিতে লাগিলেন। রাজার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল যে হরিহরানন্দ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্মচর্চ্চা করেন। সেই জন্য তিনি কাশীতে হরিহরানন্দকে পুনঃপুনঃ পত্র লিখিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুরোধানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। রাজা তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত ছিলেন।

তিনি এক দিবস হরিহরানন্দের ভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট শুনিলেন যে, তাঁহাদের বিষয়ঘটিত কিছু গোলমাল আছে। রাজা বলিলেন যে, আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া লন না কেন? বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দের সাক্ষ্য ব্যতীত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হরিহরানন্দ সন্ন্যাসী, কাশীবাস করিতেছেন ; দেশে আসিতে অনিচ্ছুক। রাজা বলিলেন, আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হউক। আদালতের আদেশ অনুসারে হরিহরানন্দ আসিতে বাধ্য হইবেন।

তাহাই করা হইল। আদালতের আজ্ঞানুসারে হরিহরানন্দ আসিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রামমোহন রায়ের কৌশলেই এরূপ হইয়াছে। কলিকাতায় আসিবার জন্য রামমোহন রায় তাঁহাকে পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহা শুনেন নাই বলিয়া, এই প্রকার কৌশল করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনিলেন।

বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসাতে হরিহরানন্দ অতিশয় কষ্টানুভব করিলেন। তজ্জন্য রাজার উপরে বড়ই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি এই প্রকার মনের অবস্থায় রাজার মাণিকতলার ভবনে গমন করিলেন। অত্যন্ত ক্রোধের সহিত চীৎকার করিয়া রাজাকে ডাকিতে লাগিলেন, এবং প্রকাণ্ড একখণ্ড ইষ্টক হস্তে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুই আমাকে এত কষ্ট দিলি, আমি তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" রাজা তখন অতি বিনীতভাবে গললগ্নীকৃতবাসে আসিয়া হরিহরানন্দের পদতলে পতিত হইলেন। বলিলেন, "গুরুদেব, আপনি তো বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ কার্য্যে আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই। আপনাকে পুনঃপুনঃ পত্র লিখিলাম, আপনি আসিলেন না। সুতরাং আমি বাধ্য হইয়া এই প্রকার কৌশল করিয়া আপনাকে আনাইয়াছি। ইহাতে আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই, আপনার নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিব বলিয়াই আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হইয়াছি।" রাজার অনুরোধে হরিহরানন্দ রাজার মাণিকতলার ভবনেই রাজার সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। পাঠকবর্গ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে, হরিহরানন্দ বামাচারী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি রাজার বাটীতে থাকিয়াই তন্ত্রমতে সাধনাদি এবং রাজার সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। হরিহরানন্দ সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটি আমরা ভক্তি-

ভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। রাজনারায়ণবাবু বলেন যে, তিনি উহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছেন।

আন্দোলন ও অত্যাচার

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, সতীদাহনিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য, রামমোহন রায়ের প্রতি গোঁড়া হিন্দুদিগের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সীমা থাকিল না। তাঁহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিবার জন্য গুপ্ত পরামর্শ হইতে লাগিল। তাঁহার জীবন নষ্ট করিবার জন্য সংকল্প হইল।

রামমোহন রায় দিল্লির বাদসার দূত হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার জন্য 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইলে, তিনি মার্টিন সাহেবকে আপনার সহকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই মার্টিন সাহেবের বিষয় আমরা পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই অবগত করিয়াছি। রামমোহন রায় তাঁহাকে জানাইলেন যে, কতক্গুলি লোক গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। মার্টিন সাহেব এই কথা শুনিয়া রামমোহন রায়ের বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায়ের জীবনরক্ষা জন্য বাটীর সকলকে সর্ব্বদা সশস্ত্র অবস্থায় রাখিলেন। বারুদ, বন্দুক ও ছোরা সকল আনাইয়া রাখিলেন। বাটী রক্ষার জন্য বরকন্দাজ সকল নিযুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় যখন বাহিরে গমন করিতেন, তিনি গুপ্তভাবে আপনার বক্ষের মধ্যে একটি ছোরা লইতেন। যে প্রকার যষ্টির মধ্যে তরবাল থাকে, সেই প্রকার একটি যষ্টি হস্তে লইতেন। ইহা ভিন্ন, মার্টিন সাহেব তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহারও সঙ্গে একটি পিস্তল ও একটি তলবারবিশিষ্ট যষ্টি থাকিত। অস্ত্রধারী ভৃত্যগণও সর্ব্বদা ব্যবহারে থাকিত। শুনা গিয়াছে, তাঁহার জীবননাশের জন্য, দুইবার তাঁহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সুবিধা পাইলেই রামমোহন রায়ের প্রাণবধ করিবার জন্য, শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা সর্ব্বদা গুপ্তভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। ঐ সকল লোক তাঁহার গৃহপ্রাচীরে স্থানে স্থানে বাহির হইতে গর্ত্ত করিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, উহা দ্বারা তাহারা রামমোহন রায়কে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন প্রকার কার্য্য করিতে দেখিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যুত করিবে।

ব্রাহ্মসভা মন্দির প্রতিষ্ঠার ছয় দিবস পূর্ব্বে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। ধনীলোকে উভয় সভাকেই সাহায্য করিতেন। উভয় সভাদ্বারাই সংবাদপত্র প্রচারিত হইত। পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, নদীতীরে, বাবুদিগের বৈঠকখানায়, নগরে, পল্লীগ্রামের চন্ডীমন্ডপে, যেখানে সেখানে রামমোহন রায় ও ধর্ম্মসভার কথা লইয়া আন্দোলন। রামমোহন রায়কে বিদ্রূপ করিয়া হাস্যরসাত্মক কবিতাসকল রচিত হইত ও প্রকাশ্য স্থানে আবৃত্তি করা হইত। লোকে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিত। সঙ্গীতসকলও রচিত হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর

"রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর। তাঁহার ইংরেজী হস্তাক্ষর সকলেই না হউক, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহা মুদ্রিতও হইয়াছে।* কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বাঙ্গালা হস্তাক্ষর প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রকাশ করা তো দূরের কথা,

* এই পুস্তকে রাজা রামমোহন রায়ের ছবির নীচে ইংরাজিতে তাঁহার স্বাক্ষর দেখ।

অল্প লোকের ভাগ্যেই তাঁহার হস্তলিপি দেখা ঘটিয়াছে। "শ্রীসহী" এই অংশটুকু দেবনাগর অক্ষরে তিনি লিখিতেন। সুপ্রাচীন সময়েও রামমোহন, সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষার বর্ণমালা লিখনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার সুব্যক্ত নিদর্শন আমরা দেখিতেছি। তাঁহার হস্তাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিলাম। একটি নয়, তাঁহার হস্তাক্ষর আমরা বহু ক্লেশে ৬ ছয়টি সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে তিনটির পরিচয় ও বৃত্তান্তমাত্র এ স্থলে পাঠকের নেত্রপথের পথিক হইবে। ঐ সকলের ভাষার জন্য রামমোহনের কৃতিত্ব বা দায়িত্ব নাই। তাঁহার কর্ম্মচারীদের মূর্ত্তিমতী ভাষাদেবী এখানে সুশোভমানা। এই সূত্রে তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা, বিশেষতঃ জমিদারী সেরেস্তার কেতা ও কায়দার পরিচয় পাঠকগণ বিদিত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল যুগপৎ অনুভব করিতে থাকুন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি সু-ভূম্যাধিকারীই ছিলেন। কিন্তু উৎপীড়ন কি অত্যাচার যে তাঁহার ছিল না, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।"

"যে লিপিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, সেগুলি জরাজীর্ণ, কীটদষ্ট। অতএব তাহাদের সাত্ত্বিকতায় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

"শ্রীশ্রীহরি।

সন ১২০২

শ্রীরামমোহন রায়।

১। "মৌজে সাহানপুরের কর্টাকিনার মোকর্দ্দম কর্ম্মচারী সুচরিতয়ো লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে। রাধানগরের শ্রীনবকিশোর রায়ের জমাই জমী জে আছে ফষল আটক রাখিয়াছ জানাইলেন, খাজনা লইয়া ফসল ছাড়িয়া দিবে। ইতি। সন ১২০২ সাল তারিক ১২ চৈত্রী।"

"শ্রীশ্রীরাম।
সন ১২০৫।
সং ভুরসিট্র

শ্রীরামমোহন রায়।
বিশয়ে তারিক জানিবে।*

২। "সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীঅভয়চরণ দত্ত সুচরিতেষু।

লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে শ্রীযুত মধ্যম জেঠা মহাশয় এখান হইতে ফষল ছাড়া চিঠি

---

* "এটুকু রাজা রামমোহনের হস্তলিখিত নয়। ইহার দুই কারণ। প্রথম কারণ, "বিশয়ে" শব্দে বানান ভুল। দ্বিতীয় কারণ নাম স্বাক্ষরের লেখায় ও এই লেখায় বিশেষ পার্থক্য।"

লইয়া যাইতেছেন মাফিক চিঠি ফষল ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে কোন ওজর না আইসে। ইতি। সন ১২০৫ সাল। তাং ১৯ ফাল্গুন।"

"যে গ্রামের জমি খালাস দেওয়া হয়, পর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা এইরূপ আছে,—

"মহল জায়—

কাবিলপুরে	১
কেদারপুরে	১
ধামলা	১
চিঙ্গড়াদীং	১
৪ চারি মহল।	

শ্রীশ্রীহরি।

সন ১২০৪।

৩। মৌজে কাবিলপুরদিগরের কির্টাকনার মোকদ্দর্ম ও কর্ম্মচারী সুচরিতয়ো।

লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে। সাং রাধানগরের শ্রীরামকিশোর রায় ও শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়-দিগর ইঁহাদের শ্রীশ্রীঈশ্বর সেবার দেবত্তর ও ব্রহ্মত্তর জমি নিজ দরুণ ও খরিদকী দরুণ মৌজে হারে যে আছে বাজে জমির সরওয় মতে হুজুর ইস্তাহারের হুকুম মাফিক গুজস্তা পয়স্তা ভোগ প্রমাণ এ সকল জমির ফষল বৃত্তিভোগীর জিম্মা করিয়া দিবে। জল খরচাদিগর বেমামুল, তলব না করিবে।

ইতি তাং ১২ ফাল্গুন।

জায় মৌজা		জের—	১২
কাবিলপুর	১	সোলা	১
কেদারপুর	১	আস্তা	১
ধাওলা	১	(*)	
শ্রীরামপুর	১	রঞ্জিতবাটী	১
কাট্যাদল	১	জগীকুণ্ডু	১
চক............ .(*)		বাসুচক	
দীখচক	১	দংর্খারদাকি	১
চক্ জয়রাম	১	মড়াখালি	১
গৌরাঙ্গপুর	১	রায়বাড়	১
চিঙ্গড়াদীং	১	আটঘরা	১
লাউসর	১	সুদামচক	১
খাড়গেড়া	১	অযোধ্যা	১
জুগীকুণ্ডু	১	কলাহার	১

তেইশ মৌজা ইতি।"

"এই ক্ষেত্রে একাধিক লিপি—তিনখানি জমিদারি ছাড় চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছি। ১২০২ সাল। ১২০৪ সাল ও ১২০৫ সালের রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষর উহাতে রহিয়াছে।

"প্রথম খানিতে নবকিশোর রায়ের নাম আছে। তিনিই রামমোহন রায় মহোদয়ের জেঠতুতো ভাই। তিনি রামমোহনের বয়োজ্যেষ্ঠও বটেন। এই লিপিখানির বয়ঃক্রম অধুনা শতাধিক বর্ষ, এখন ১৩০৩ সাল চলিতেছে। উহা ১২০২ সালের ; সুতরাং উহার বয়স ১০২ বৎসর হইতেছে।

"তৃতীয় লিপিতে রামকিশোর ও কীর্ত্তিচন্দ্র রায় এই দুই জনের নাম ও প্রসঙ্গ বিদ্যমান। প্রথম ব্যক্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত। দ্বিতীয় ব্যক্তি, এই জ্যেষ্ঠতাতেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই লিপিতে দেখা গেল, যে ২৩ তেইশ খানি গ্রামের ভূমি, রামমোহনের কর্ম্মচারীরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই ২৩ তেইশ হইতেই আবেদনকারিদ্বয় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ইতিপূর্ব্বোল্লিখিত নবকিশোর রায়, এই রামকিশোর রায়ের মধ্যম তনয়।

"দ্বিতীয় লিপিখানি জমিদার সুলভ ভাষায় লিখিত নয়। কারণ এখানে "মধ্যম জেঠা মহাশয়" বলিয়া নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইতেছে। "মধ্যম জেঠা' রামকিশোর রায় মহাশয় কিনা, পাঠকগণ বংশতালিকা তজ্জন্য দেখুন। এখানিতে ৪ খানি গ্রামের জমির কথা আছে। এখানে তাঁহার এক কর্ম্মচারীর নামও অবগত হওয়া গেল। তাঁহার নাম "শ্রীঅভয়চরণ দত্ত।"

"এই সকল লিপিতে বর্ণাশুদ্ধি যথাবৎ রাখিয়া দেওয়া গিয়াছে।"

নব্যভারত হইতে উদ্ধৃত ১৩০৩ সাল, ভাদ্র ও আশ্বিন।

(শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ)

* এ স্থলটি খণ্ডিত, পোকায় কাটিয়া গিয়াছে।

রামমোহন রায় ও আর্নট সাহেব

১৮২২ সালের শেষে গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস ভারতবর্ষের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বিলাত গমন ও তাঁহার পদে লর্ড আমহার্ষ্টের নিয়োগ, এই উভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময়ে, জন আড্যাম প্রতিনিধি গবর্ণর (Acting Governor General) রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে নূতন স্কটল্ণ্ডীয় উপাসনালয়ের আচার্য্য (Minister) ডাক্তার ব্রাইস্, কোম্পানির ষ্টেসনারি ক্লার্কের পদ গ্রহণ করাতে কলিকাতা জরনাল নামক সংবাদপত্রে তাহার সম্পাদক বাকিংহাম লিখিয়াছিলেন যে, উহা উপাসনালয়ের আচার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। এই অপরাধে প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল আজ্ঞা করিলেন যে, দুই মাসের মধ্যে তাঁহাকে এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে হইবে। ঐ দুই মাস শেষ হইলে, তিনি আর এক দিনের জন্যও ভারতবর্ষে থাকিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্টের আদেশে, কলিকাতা জরনাল (Calcutta Journal) পত্রিকা রহিত হইয়াছিল। ১৮২৩ সালে আর্নট সাহেব, কলিকাতা জরনাল পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ধৃত হইলেন। তাঁহাকে একখানি বিলাতগামী জাহাজে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিলে, সেখানে তাঁহার সহিত আর্নট সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব্ব পরিচয়ের জন্য রামমোহন রায় তাঁহাকে আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারিরূপে নিযুক্ত করেন। যে সকল ব্যক্তির কুপরামর্শে রামমোহন রায় বিলাতে বড়মানুষিভাবে, জাঁকজমকে কয়েক মাস ছিলেন, তাহার মধ্যে আর্নট সাহেব একজন। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লেখিকা কুমারী কলেট্ এই ব্যক্তির বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। (He was a low, cunning parasite) রাজার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থশোষণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রাজার যে সকল লেখা প্রকাশ হয়, তাহা যে অনেক পরিমাণে তাঁহার লেখা এই কথা সংবাদপত্রে বলাতে ডাক্তার কার্পেণ্টার প্রভৃতি তাহার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের উত্তরে আর্নট বলেন যে, সেক্রেটারিতে সচরাচর যেরূপ সাহায্য করিয়া থাকে আমি তাহাই করিয়াছি। ইত্যাদি।

রামমোহন রায় ও হরিহর দত্ত

এই গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, সতীদাহ রহিত হইলে, রাজা রামমোহন রায়, কলিকাতা টাউনহলে সভা করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন প্রদান করেন। উক্ত সভায় টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী বা মুন্সী, বাঙ্গালা অভিনন্দন পত্র, এবং হরিহর দত্ত ইংরেজী অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

এই হরিহর দত্ত সম্বন্ধে, এ স্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ইনি হিন্দুকলেজের সর্ব্বপ্রথম ছাত্রগণের মধ্যে একজন। ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী। টাউনহলে ইংরেজী অভিনন্দন পত্র পাঠ করিবার সময়, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সতীদাহ রহিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। ইঁহার পিতার নাম তারাচাঁদ দত্ত। এই তারাচাঁদ দত্তের বাটী, কলিকাতা কলুটোলা, চিৎপুর রোড ফৌজদারি বালাখানার উত্তরে গলিতে। ঐ গলির নাম, Tara Chand Dutt's Lane। টাউনহলের সভায় হরিহর দত্তের বক্তৃতা শুনিয়া কোন ব্যক্তি তারাচাঁদ দত্তের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র টাউনহলের সভায় বলিয়াছে যে, সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। তারাচাঁদ দত্ত এই সংবাদে পুত্রের

উপরে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বাটীর দ্বারবানকে আজ্ঞা করিলেন যে, যখন হরিহর বাটী আসিবে তখন তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে না দেয়। হরিহর যখন বাটী আসিলেন, তখন দ্বারবান দণ্ডায়মান হইয়া কর্ত্তার আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন। হরিহর দ্বারবানকে বলিলেন, তুমি বাবাকে বল, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। দ্বারবান, কর্ত্তার নিকট গিয়া হরিহরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, কর্ত্তা বাহির বাটীর বারেন্দার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হরিহর তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি অপরাধে আমাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন?" তারাচাঁদ তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি টাউনহলের সভায় বলিয়াছ, সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে এদেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে?" হরিহর বলিলেন যে, তিনি তাহা বলিয়াছেন। তখন তারাচাঁদ বলিলেন, "তবে, তুমি আমার বাটীতে স্থান পাইবে না। তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।"

তখন হরিহর মাণিকতলায় রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল ব্যাপার তাঁহাকে জানাইলেন। রামমোহন রায় হাস্য করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তোমার ও আমার এক দশা। আমি পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিলাম, তুমিও তোমার পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে। তবে তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি উত্তম লেখা পড়া জান; আর আমার অনেক বড় বড় সাহেবের সহিত আলাপ পরিচয় আছে। আমি তোমার ভাল চাকুরি করিয়া দিতে পারিব।" পরে রামমোহন রায় হরিহরের একটি ভাল চাকুরি করিয়া দিয়াছিলেন।

ভবানীপুর-নিবাসী অষ্টাশীতি বৎসর বয়স্ক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা উপরি-উক্ত ঘটনাটি অবগত হইয়াছি।

সংবাদ-কৌমুদী

জুলাই ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ—১২২৬ সাল

"লঙ্ সাহেবের সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকাতেই ইহার প্রথম উল্লেখ। ইহা সংস্কৃতপ্রেসে মুদ্রিত হইত। এই "সংস্কৃত প্রেস" কাহার মুদ্রাযন্ত্র, জানিবার যো নাই। তাহাতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা একখানি সমাচারবিষয়িণী পত্রিকা। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রথম প্রকাশ। (১) ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল।(২) বেঙ্গল একাডেমী অব্ লিটরেচারের মতে রামমোহনের মৃত্যুর ২ বৎসর পরে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) ইহা রহিত হয়। লেখক কোন প্রমাণ দেন নাই। কত পূর্ব্বে, জানিবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সামাজিক

---

(১) রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ উহার প্রথম প্রচারারম্ভ লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম বর্ষের (১৩০৩ ফাল্গুন) জন্মভূমিতে "সহমরণ" প্রবন্ধেও ১৮২১ খৃষ্টাব্দ আছে। দুইই ভ্রমমাত্র। যে লঙের লিপি রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশ-দিগের অবলম্বন, তাহাতেও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেরই প্রসঙ্গ অবলোকিত হইতেছে। "কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান অব্ জারভার" পত্রে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিগতজীবন যে সকল পত্রের তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও কৌমুদীর প্রকাশাব্দ ১৮১৯। এতদ্ভিন্ন উহাতে আরও এক ভ্রম বাহির হইয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লঙের তালিকা প্রচারের কথা আছে। ইহাও ভ্রমের কার্য্য। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ তালিকা প্রকাশের কাল।

(২) Christian Observer, February 1840, Reminiscences &c. Vol. I, Page 176.

বিষয়নীতি, সংবাদ ইত্যাদি ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহাদ্বারা অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রবর্ত্তয়িতা ও সম্পাদক ছিলেন, তন্মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ স্মরণীয়। সহকারীদিগের মধ্যে তিনিই প্রধান ও অগ্রগণ্য। রাজা রামমোহন রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা তিনি নিজে ঘোষণা করিতে অভিলাষী ছিলেন না। না থাকুন, লোকে তাঁহাকেই সম্পাদক জানিতেন। "সংবাদ কৌমুদী" প্রচারের দশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতেই রাজা রামমোহন রায় মহোদয় সহমরণ আন্দোলনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এখন তিনি কৌমুদীকে আন্দোলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র জ্ঞান করিলেন। তদ্বিষয়ক প্রবন্ধও "সংবাদ কৌমুদী"তে মুদ্রিত হইতে লাগিল। ইহাতে রামমোহনের প্রাণগত চেষ্টা আছে জানিয়া, ভবানীচরণ "সংবাদ কৌমুদী"কে শৈশবেই—উহার চতুর্থ বৎসর বয়সেই বিসর্জ্জন দিলেন। দুই পালকের অন্যতর ব্যক্তি অর্থাৎ শেষোক্ত ভবানীচরণ, শিশু কৌমুদীর মায়ায় জলাঞ্জলি দিলেন।(৩)

কলিকাতা রিভিউ পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডে সংবাদ কৌমুদীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

ইহাতে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থিত হইত। উন্নত চিকিৎসাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনার্থে ইহার বিলক্ষণ প্রয়াস ছিল।

সংবাদ-কৌমুদীরও প্রচারাব্দ সমাচার দর্পণের ন্যায় মতচতুষ্টয়ে পর্য্যবসিত। যথা—

(১) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ (৪)
(২) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ (৫)
(৩) ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ (৬)
(৪) ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ (৭)

প্রথমোক্ত মত প্রামাণিক। সর্ব্বশেষ লিপিতে প্রথম মতই সমর্থিত হইয়াছে। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে প্রবন্ধরচনার পর, পরিশেষে লঙ্ সাহেব ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ, সংবাদ-কৌমুদীর প্রথম প্রচার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। নিজের প্রথম মত ভ্রান্ত না বলুন, কোন বিচার আচারের অনুষ্ঠান না করুন ধীরে, নীরবে নিজ ভ্রম-দ্রুমের মূলে সাংঘাতিক, মর্ম্মান্তিক তীক্ষ্ণ শাণিত কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

...

মূল সংবাদ-কৌমুদীর সঙ্গ পাইলে প্রাণ মন স্নিগ্ধ হইত; কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

"কলিকাতা রিভিউ" পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডে ১৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কৌমুদী প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যেখানে কি কি প্রমাণে উহা লিখিত হইতেছে, তথায় (অর্থাৎ ১২৪ পৃষ্ঠায়) সংবাদ কৌমুদী সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত, এই উল্লেখ দেখা যায়। কি সামঞ্জস্য! যাহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ জাত,

---

(৩) ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে সমাচার চন্দ্রিকা প্রচারে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রতী হন।

(৪) Long's Descriptive Catalogue of Bengali Books.

(৫) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী।

(৬) জন্মভূমি, ১৩০৩ ফাল্গুন, "সহমরণ" প্রবন্ধ।

(৭) Calcutta Review, Vol. XIII, 1850, pp 157, 160 and The Bengal Academy of Literature, Vol. I, No. 6, p. 2.

একবার বলা হইল, তাহাই আবার ১৮২১ খৃীষ্টাব্দেও জাত। লেখক ১৮২১খৃীষ্টাব্দের প্রকাশিত কৌমুদীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। ফলতঃ এটি মূর্ত্তিমান ভ্রম। দ্বিতীয় ভ্রম এই, চন্দ্রিকার প্রাদুর্ভাব খর্ব্ব করিতে ইহার সূত্রপাত, ইহাও লেখা হইয়াছে। প্রবন্ধ প্রারম্ভেই বলিয়া দিয়াছি যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সংবাদ-কৌমুদীর লেখক ছিলেন। কৌমুদীতে সহমরণ আন্দোলন ব্যাপারের বাড়াবাড়ি হইলে, তিনি কৌমুদীর সম্পর্ক রহিত করিয়া চন্দ্রিকা প্রচারে ব্রতী হইলেন।

১৮২১ খৃীষ্টাব্দের প্রথমাবধি ৮ অষ্ট সংখ্যায় যে যে প্রধান প্রধান প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই ;—

১। প্রথম সংখ্যায়—

অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা। ইহাতে এক কৃপণ রাজার গল্পও ছিল।

২। দ্বিতীয় সংখ্যায়—

(ক) সংবাদপত্রদ্বারা বাঙ্গালীর উপকারিতা প্রদর্শন।

(খ) চিৎপুর রোডে জল-সেচনার্থে চাঁদা তোলার আবশ্যকতা।

(গ) গুরুভক্তি।

(ঘ) পঞ্চদশবর্ষ উত্তরাধিকারের পরিবর্ত্তে দ্বাবিংশ বৎসর হওয়ার জন্য ইঙ্গিত।

(ঙ) যে সকল বাবু কৃপণ ; সেইরূপ অদাতাদের প্রতি বিদ্রূপোক্তি। অথচ তাঁহাদের পরলোকে অজস্র ধন ব্যয়িত হয়।

৩। তৃতীয় সংখ্যায়—

(ক) শবদাহার্থে অধিকতর প্রশস্ত স্থানের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন ও খৃীষ্টান-দের সমাধি স্থান বিশালতর করিবার চেষ্টা।

(খ) তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধের নিমিত্ত আন্দোলন ; কেননা ইহাই হিন্দুর খাদ্য।

(গ) দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে বিনামূল্যে ডাক্তারি-চিকিৎসার নিমিত্ত রাজপুরুষ-গণের নিকট প্রার্থনা।

(ঘ) দেবপ্রতিমা বিসর্জ্জনকালে ইয়োরোপীয়গণের বেগে শকট চালনার তীব্র প্রতিবাদ।

৪। চতুর্থ সংখ্যায়—

(ক) নেটিভ ডাক্তারের তনয়গণ, ইয়োরোপীয় ডাক্তার কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, এতদ্বিষয়ে উত্তেজনা।

(খ) কুলীনদের পরিণয়ের দোষ।

(গ) ধনবান্ বাবুদের অর্থের অপব্যয় ও শিক্ষায় স্বল্পমাত্র ব্যয়।

৫। পঞ্চম সংখ্যায়—

(ক) অচিরোদ্ভাবিত নাটকের অসৎপথে প্রবর্ত্তন।

(খ) কাপ্তেন বাবুদের অপকীর্ত্তি।

৬। ষষ্ঠ সংখ্যায়—

(ক) স্বদেশ গমনোদ্যত প্রধান বিচারপতির সম্মানার্থে চন্দ্রকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক নৃত্য ও ভোজের বর্ণনা।

(খ) পঞ্চমবর্ষীয় হিন্দুবালকের ইংরেজী ও বাঙ্গালায় পারদর্শিতা।
(গ) বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা কি কি?
(ঘ) আগরার তাজের বিবরণ।
(ঙ) সত্যপরায়ণতা।
(চ) ইয়োরোপীয় চিকিৎসকদিগের সমীপে বাঙ্গালী-যুবকগণের শিক্ষানিবিশ।
(ছ) দীনহীনের শবদাহার্থে চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব।
(জ) অসহায়া হিন্দু-বিধবাদের আনুকূল্য জন্য অর্থসঞ্চয়ের অনুষ্ঠান।

৭। সপ্তম সংখ্যায়—

(ক) শবদাহ-ঘাটে এক তস্করের অত্যাচার।
(খ) ভৃত্যদিগকে প্রশংসাপ্রদান প্রসঙ্গ।
(গ) কাষ্ঠের দুর্ম্মূল্যতা। কিছুকাল পূর্ব্বে টাকায় দশ মণ জ্বালানি কাষ্ঠ বিক্রয় হইত—প্রবন্ধে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে।
(ঘ) ইংরেজী পাঠের পূর্ব্বে বাঙ্গালী বালকদের ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৮। অষ্টম সংখ্যায়—

(ক) পক্ষীকর্ত্তৃক মানবশিশু অপহরণ।
(খ) হিন্দুদিগের স্থাপত্যশিল্প।
(গ) কলিরাজার যাত্রা নামক নূতন নাটকের অভিনয়।
(ঘ) অভয়চরণ মিত্রের স্বীয় অভীষ্টদেবকে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা প্রদান।
(ঙ) কলিকাতাস্থ ধনাঢ্য বাবুদের নিকট কোন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের অসমসাহসিক কার্য্য।

বিবাদভঞ্জন নামে একটি প্রবন্ধ ১৮২৩ সালে সংবাদ-কৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় যত বিবরণ ছিল, তন্মধ্যে "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে ;—

(ক) এক চর্ম্মকার-বনিতা, এককালে তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিল। ইহাতে সম্পাদক বিস্ময়ান্বিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, তীর্থপর্য্যটন ও ব্রতনিয়মোপবাসদ্বারা শরীর জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া, কত কত সম্পত্তিশালীরা বিফলাশ হইয়া থাকেন। তদবস্থায় তাঁহারা পোষ্যপুত্র গ্রহণে বাধ্য হন। সেই সময়ে বর্দ্ধমান রাজমহিষী সমত্ত্বাবস্থাপন্না ছিলেন। তাঁহার পুত্রোৎপাদনের কাল নির্ণয়ার্থে দুই জ্যোতির্জ্ঞ রাজনিকেতনে নিয়োজিত হন। উভয়েই পৃথক্ পৃথক্ সময় গণনা করেন।

(খ) চিৎপুরে এক রমণীর বৃত্তান্ত অপর প্রস্তাবে নিবদ্ধ ছিল। কামিনী, সন্ন্যাসিনী—সন্ন্যাসীর পত্নী। লোকান্তরিত ভর্ত্তার সহিত জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করার বিবরণ, এই প্রবন্ধে বিবৃত হয়। তৎকালে নাকি সন্ন্যাসীদের ঐ প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল।

(গ) কোন বাঙ্গালীর অষ্টাদশবর্ষীয়া এক তনয়া নিমতলাঘাটে সন্তরণদ্বারা ভাগীরথী পার হইয়াছিল।

(ঘ) শ্রীরামপুরে এক ব্রাহ্মণ, লোকের ভাগ্য গণনার জন্য সমাগত হন। তিনি গুপ্তরত্নোদ্ধারে সমর্থ, ইহাও বলেন। এতদর্থে তাঁহাকে বিংশতিমুদ্রা পুরস্কার দিতে হইয়াছিল। তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলে, ব্রাহ্মণ পিত্তলের

একখানি রেকাব মাটির ভিতর পুতিয়া ফেলিলেন। তথায় সাহেবেরাও সমাগত হইয়াছিলেন। গণকম্বিজ, সাহেবকে ঐ পিত্তলের রেকাবটিই গুপ্তধন নির্দ্দেশ করিলেন। অন্যেরা কিন্তু তাঁহার চাতুরী ধরিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই নিমেষপূর্ব্বে উহা মাটিতে পুতিয়াছিলেন, তাহা প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া পথে ফেলিয়া দিল।

(ঙ) হাতপুর পরগণায় এক ভুজঙ্গম ধৃত হয়। তাহার গর্জ্জনে তরুতলা কম্পিত হইত।

(চ) তারকেশ্বরে এক সন্ন্যাসী এক নরহত্যা করেন। কেননা সেই লোকটি, তদীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল।

(ছ) কলিকাতা জগন্নাথ-ঘাটে এক সন্ন্যাসী দক্ষিণ চরণ ঊর্দ্ধ্বে স্থাপন করিয়া অহোরাত্র তদবস্থায় অতিবাহিত করেন। ইহা সামান্য কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার নয়। এই জগন্নাথঘাট সন্ন্যাসীদের এক আশ্রয় স্থান।

বিষয়	খ্রীষ্টাব্দ
১। প্রতিধ্বনি	১৮২৪
২। অয়স্কান্ত বা চুম্বকর্ম্মণি	"
৩। মকর মৎস্যের বিবরণ	"
৪। বেলুনের বিবরণ	"
৫। মিথ্যাকথন	"
৬। বিচারবিজ্ঞাপক ইতিহাস	"
৭। ইতিহাস	"

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাশিত "বঙ্গীয় পাঠাবলীর" তৃতীয় ভাগে এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এনট্রেন্সের বাঙ্গালা পাঠ্য-পুস্তক হইতে যে বিষয়গুলির সংকলন করিতে পারিলাম, তাহার তালিকা উপরে লিখিত হইল। যে বিবাদভঞ্জন প্রবন্ধটি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও পাঠাবলী ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

উপরোক্ত তালিকা পাঠ করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মিবে, সকলগুলিই সম্পাদকীয় সন্দর্ভ। উহার মধ্যে সংবাদ, প্রেরিতপত্র ইত্যাদি সমাচারপত্রের অঙ্গীভূত অবশ্যপ্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের নির্দ্দেশ বা নিদর্শন নাই। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরাবৃত্ত-সমন্বিত লোকোপকারক বিষয়ের সন্নিবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষাম্বারা সংবাদকৌমুদীর কলেবর পূর্ণ থাকিত। ইহার অখন্ডনীয় প্রমাণপ্রয়োগ ঐ প্রবন্ধাবলী প্রদান করিতেছে। "জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায়, গদ্য রচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম, প্রথম নির্দ্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে তাঁহাকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে।" (১)

সংবাদ-কৌমুদীতে সহমরণ সংবাদ নামে যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, পশ্চাৎ তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ইন্ডিয়া গেজেটে প্রশংসা সহকারে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় ;—

---

(১) বাবু ঈশানচন্দ্র বসুজ প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ৮১১ ও ৮১২।

"আমরা জানিলাম, সহমরণ সংক্রান্ত এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালা গ্রন্থখানি কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের এই পুস্তকের দ্বিতীয়বার প্রকাশে জনসাধারণের মহোপকার সাধিত হইবে।"

এ স্থলে যে বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকার সংবাদ পাঠক পাইতেছেন, তাহার নাম "সংবাদ কৌমুদী"।...

এই "সংবাদ-কৌমুদী"র নামের শেষার্দ্ধ "কৌমুদী" এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" শব্দের প্রথমার্দ্ধ লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "তত্ত্বকৌমুদী" নাম্মী ব্রাহ্ম-পত্রিকার নামকরণ হইয়াছে। উহার প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রথম সংখ্যাতেই তাহা লিখিয়া দিয়াছেন।"

("জন্মভূমি" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ)

একটি অন্যায় আইনের পাণ্ডুলিপির জন্য পার্লেমেণ্টে আবেদন

সতীদাহ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া রাজা রামমোহন রায় আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ১৮২৮ সালের ১৮ই আগষ্ট দিবসে জে ক্রফোর্ড সাহেবকে তিনি একখানি পত্র লেখেন, ও তাহার সহিত হিন্দু ও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র পার্লেমেণ্টের দুই বিভাগে অর্থাৎ লর্ড সভায় ও কমন্স সভায় উপস্থিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আবেদনপত্রের উদ্দেশ্য এই যে, বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি উইন্ সাহেব একটি আইনের এইরূপ পাণ্ডুলিপি করেন যে, হিন্দু কিম্বা মুসলমানের বিচারে, খ্রীষ্টিয়ান, (তিনি ইয়োরোপীয় হউন বা দেশবাসী হউন) জুরি হইয়া বিচার করিতে পারিবেন, কিন্তু দেশবাসী কোন ব্যক্তি, হিন্দু বা মুসলমান, দেশীয় সমাজে তাঁহার যত উচ্চপদ কেন হউক না, তিনি যত বড় সম্ভ্রান্ত লোক কেন হউন না, তিনি খ্রীষ্টিয়ানের বিচার, এমন কি, জুরি হইয়া দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদের পর্য্যন্ত বিচার করিতে পারিবেন না। আইনের উক্ত পাণ্ডুলিপিতে ইহাও ছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান, গ্রাণ্ড জুরিতে আসন প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের সমধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিচার করিতে পারিবেন না।

১৮২৯ সালের ৫ই জুন এই আবেদনপত্র পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করা হয়।

রামমোহন রায়ের দৈনিক জীবন

জি. এন. ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পিতার নিকট রামমোহন রায়ের দৈনিক জীবন সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, একখানি পত্রে তাহা কুমারী কলেট্‌কে লিখিয়া পাঠান। আমরা তাহা হইতে কয়েকটি কথা গ্রহণ করিলাম।

"স্নানের পূর্ব্বে, দুই জন স্থূলকায় ব্যক্তি, রামমোহন রায়কে তৈল মর্দ্দন করাইতেন। এই সময় রাজা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র সকল প্রতিদিন পরে পরে আবৃত্তি করিতেন। স্নানের পর, তিনি ঘরের মেজেতে পা গুটাইয়া বসিয়া দেশীয় প্রণালীতে আহার করিতেন। তাঁহার সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে দেশীয় খাদ্য সকল থাকিত। এই সময় ভাত ও মৎস্য, এবং সম্ভবতঃ দুগ্ধ আহার করিতেন। পূর্ব্বাহ্ন ও সায়াহ্নভোজনের মধ্যে আর আহার করিতেন না। তিনি বেলা দুইটা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন। অপরাহ্নে ইয়োরোপীয় বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতে যাইতেন। ৭টা ও ৮টার মধ্যে সায়াহ্ন-

ভোজন করিতেন। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যসকল মুসলমান প্রণালীতে রন্ধন হইত। পোলাও, কোপ্তা, কোর্ম্মা ইত্যাদি আহার করিতেন।"

রাজা রামমোহন রায়ের ভৃত্য রামহরি দাস বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বর্দ্ধমানে মহারাজার দেলখোসবাগের কর্ত্তারূপে (Head Gardener) নিযুক্ত হন। রামহরি দাস এক দিবস মহারাজার সভাপণ্ডিত স্বর্গীয় তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন যে, গৃহপ্রাচীরে রামমোহন রায়ের একখানি ছবি লম্বমান রহিয়াছে। ছবিখানি দেখিয়া রামহরি অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ছবির প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া গভীর ভাবের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আহা! মহাপুরুষ! মহাপুরুষ!" যে প্রভুর উপরে ভৃত্যের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি, সে প্রভু যে কিরূপ মহৎ চরিত্রের লোক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গ্রন্থকার এই ঘটনাটির বিষয় স্বর্গীয় পণ্ডিতবর তারকনাথ তত্ত্বরত্নের পুত্র গ্রন্থরচয়িতার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার মহাশয়, বর্দ্ধমানে ১৮৬৩ সালে, উপরি-উক্ত রামহরি দাসের নিকট রামমোহন রায়ের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়াছিলেন ;— "রামমোহন রায় প্রত্যহ শেষ রাত্রি চারিটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া কাফি পান করিতেন। তাহার পর কয়েক জন লোকের সহিত একত্রে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন। সচরাচর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তিনি বাটীতে ফিরিতেন। তৎপরে প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্যসকল করিবার সময়, গোলক দাস নাপিত তাঁহাকে সংবাদপত্র সকল পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাহার পর, চা পান করিতেন। তাহার পর ব্যায়াম করিতেন। তাহার পর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চিঠিপত্র পাঠ করিতেন। তৎপরে, স্নান করিতেন। বেলা দশ ঘটিকার সময় ভোজন করিতেন। ভোজনের সময় কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র পাঠ করিতেন, তিনি শ্রবণ করিতেন। আহারের পর একটা টেবিলের উপর এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন। তৎপরে, কাহারও সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন, অথবা কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেন। বেলা ৩টার সময় জলযোগ করিতেন। অপরাহ্ন ৫টার সময় ফলভোজন করিতেন। সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইতেন। রাত্রি দশটার সময় ভোজন করিতেন। তাহার পর, নিশীথকাল পর্য্যন্ত বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন চলিত।

এই দুটি প্রাত্যহিক বিবরণের মধ্যে কিছু অমিল দেখা যাইতেছে। কিন্তু গড়ের উপর মিল আছে।

রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পুস্তক লেখকের কয়েকজন বন্ধু একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাদের নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন ;—

"আমি মাণিকতলায় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যান বাটিকাতে প্রায়ই গমন করিতাম। হেদুয়ার নিকটস্থ রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্র ছিলাম। রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সহিত এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। প্রায় প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে পর, আমি রমাপ্রসাদের সহিত রাজাকে দেখিতে যাইতাম। রাজার উদ্যানে একটি বৃক্ষের শাখায় একটি দোল্‌না ছিল। রমাপ্রসাদ এবং আমি উহাতে দুলিতাম। কখনও কখনও

রাজা আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়া, তিনি দোল্‌নার উপর উঠিয়া বসিতেন, এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।"

এইস্থলে উপস্থিত ভদ্রলোকেরা মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তখন আপনার বয়স কত ছিল?" মহর্ষি উত্তর করিলেন, "তখন আমার বয়স কত ছিল, ঠিক বলিতে পারি না। তখন আমি স্কুলের বালক ছিলাম। তখন আমার বয়স আট কিম্বা নয় বৎসর হইবে।"

"রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকটে যাইতে পারিতাম। কখনও কখনও পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার আহারের সময়ে যাইতাম। তিনি সচরাচর উক্ত সময়ে মধু দিয়া রুটী খাইতেন। একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার আহারের সময়ে মধু দিয়া তিনি রুটী খাইতে খাইতে আমাকে বলিলেন, "বেরাদার, আমি মধু ও রুটী খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে, আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।" কোন কোন দিন আমি রাজার স্নানের সময়ে তাঁহার বাটীতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তিনি স্নানের পূর্ব্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিতেন। তাঁহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশী সকল শক্ত ছিল। তৈলমর্দ্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতুষ্পার্শ্বে এক-খণ্ড বস্ত্রমাত্র; তাঁহার এই প্রকার মূর্ত্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার মনে ভীতি-সঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া, বলপূর্ব্বক পদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে, তিনি একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি এক ঘণ্টারও অধিক কাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতাসকল আবৃত্তি করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি এই সকল কবিতার ভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় ভাবের সহিত যে সকল কবিতা উচ্চারণ করিতেন, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। আমার এখন বোধ হয় যে, উহাই রাজার উপাসনা ছিল।

"রাজার পালিতপুত্র রাজারাম বড় দুষ্ট ছিল। রাজার সহিত অনেক প্রকার দুষ্টামি করিত। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন না। বাস্তবিক আমি এ পর্য্যন্ত যত লোক দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায়, সুমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই। একদিবস মধ্যাহ্নে আমি রাজার বাটীতে গমন করিলাম। রাজা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাজারাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটা তামাসা দেখিবে তো এস।" আমি তাহার সহিত গমন করিলাম। রাজারাম ধীরে ধীরে রাজার শয্যার নিকটে গমন করিল, এবং হঠাৎ রাজার বক্ষঃস্থলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল। রাজা জাগ্রৎ হইলেন, এবং 'রাজারাম' 'রাজারাম' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"একদিন রমাপ্রসাদের সহিত আমি রাজার বাটীতে গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার ঘরে একখানি খাট ছিল। আমরা তাঁহার নিকটে যাইবামাত্র, তিনি রমাপ্রসাদকে তাঁহার প্রিয় সংস্কৃত সংগীত "অজরমশোকং জগদালোকং" গান করিতে বলিলেন। রমাপ্রসাদ বড়ই লজ্জায় পড়িলেন। তিনি গান করিতেও পারেন না, আবার তাঁহার পিতার আজ্ঞা অগ্রাহ্যও করিতে পারেন না। তিনি আস্তে আস্তে খাটের নীচে গিয়া বসিলেন, এবং তথায় করুণাব্যঞ্জকস্বরে গান আরম্ভ করিলেন—

"অজরমশোকং
জগদালোকং"।

"রাজা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অল্প বয়সে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রাজার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজা যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যখন রাজার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন। কিন্তু পূজার অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র, আমার পিতার নিকটে সংবাদ যাইত যে, তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন। রাজার বন্ধুদিগের উপরে তাঁহার এই প্রকার প্রভাব ছিল।

"তোমরা দেখিতেছ যে, আমার পিতার কথা না বলিয়া, আমি রাজার কথা বলিতে পারি না। রাজার সম্বন্ধীয় আমায় স্মৃতি আমার পিতার স্মৃতির সহিত জড়িত। আমি আশা করি, তোমরা ইহাতে কিছু মনে করিবে না।

"আমাদের বাটীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি একবার রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলাম। আমি আমার পিতামহের প্রতিনিধিস্বরূপ গিয়াছিলাম। চলিত প্রণালী অনুসারে আমি রাজাকে বলিলাম, রামমণি ঠাকুরের বাড়ীতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ। রাজা ব্যগ্রভাবে উত্তর করিলেন, "আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?" সেই স্বর আমি যেন এখনও শুনিতেছি। তিনি আমার উপর বিরক্ত হন নাই। আমার প্রতি তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকিতেন। রাজা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে, তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাচ লোকে তাঁহাকে দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। যাহা হউক, রাজা বুঝিলেন যে, ইহা সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তিনি আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের নিকট যাইতে বলিলেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতায় রাধাপ্রসাদের কোন আপত্তি ছিল না। সুতরাং তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং আমাকে কিছু মিষ্টান্ন ও ফল খাইতে দিলেন।

"ফলের কথা বলাতে আমার স্মরণ হইল যে, রাজার মাণিকতলার বাগানে অনেক উত্তম উত্তম ফলের গাছ ছিল। এই সকল ফলের লোভে আমি অনেক সময়ে সেখানে যাইতাম। আমি লিচুফল অতিশয় ভালবাসিতাম। আমি সেখানে অনেক সময়ে লিচুফল খাইতে যাইতাম। যখন রাজা দেখিতেন যে, আমি বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ রৌদ্রতাপে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, "বেরাদার, এখানে এস, তুমি যত লিচু চাও, আমি দিব। রৌদ্রে বেড়াইতেছ কেন?" তখন তিনি মালীকে আমার জন্য সুপক্ক লিচু সকল আনিতে বলিতেন।

"আমার স্মরণ হয়, রাজা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি মাংসাহার করি কি না? তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি তোমার পিতাকে বলিও যে, প্রতিদিন তোমার আহারের সময়ে তোমাকে কিছু মাংস দেওয়া হয়। রাজা বলিতেন যে, বৃক্ষমূলে জলসেচন করা আবশ্যক; নতুবা বৃক্ষ যথোপযুক্তরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এই দেহের সম্বন্ধেও সেইপ্রকার; বাল্যকাল হইতেই দেহকে উপযুক্ত আহার দেওয়া প্রয়োজন। রাজা আপনার শরীরকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। শরীরকে পরমেশ্বরের মূল্যবান্ দান বলিয়া মনে করিতেন।

"সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ও স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। অসংখ্য লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। অনেকে তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক করিতে আসিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত তর্ক করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি প্রায় কেহই আসিতেন না। তাঁহারা তাঁহার সহিত বিশৃঙ্খল ও অসম্বন্ধ কথা সকল বলিয়া তর্ক করিতেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও কখনও চলিয়া যাইতে বলিতে পারিতেন না। তিনি সকলের কথা ভদ্রভাবে মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন। যখন তিনি দেখিতেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বড়ই নির্ব্বোধের মতন কথা বলিতেছে, যখন উহা তাঁহার আর ভাল লাগিত না, তখন তিনি তাঁহাকে বলিতেন, "আপনি কি বলেন, এখন বাগানে একটু বেড়াইলে হয় না?" তখন তাঁহার সহিত বাহির হইতেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় এরূপ দ্রুতবেগে চলিতেন যে, অন্য ব্যক্তি তাঁহার সহিত চলিতে অক্ষম হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইতেন। রাজার চলিবার শক্তি আশ্চর্য্য ছিল।

"রাজার এই বাগান, তাঁহার মালী রামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল। রামদাস রাজাকে বড় ভালবাসিত। রামদাস রাজার সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিল। এই রামদাস আমার অধীনেও কিছুদিন চাকুরি করিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রামদাস বর্দ্ধমানের মহা-রাজার গোলাপবাগের প্রধান মালী (Head Gardener) ছিল। বোলপুরের শান্তি-নিকেতনের আমার বাগান রামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল।

"রাজার এমন এক শক্তি ছিল, যদ্দ্বারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল, যে আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আকৃষ্ট হই নাই। রাজার একখানি অতি সামান্য ভাঙ্গা গাড়ী ছিল। ঘোড়ার উপযুক্তরূপ সাজ ছিল না, এবং উপযুক্ত লাগামের পরিবর্ত্তে অনেক সময় দড়ি ব্যবহার করা হইত। কখন কখন এমন ঘটিত যে, রাজা গাড়ী করিয়া বাহির হইয়াছেন, পথে গাড়ী ছাড়িয়া ঘোড়া তফাতে চলিয়া গিয়াছে। গাড়ীর কম্পাস্ খুলিয়া গিয়াছে। কখনও কখনও গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাইত। পথে অনেক লোক জমা হইত, এবং রাজা গাড়ী ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেন। একবার পথে রাজার গাড়ী ভাঙ্গিয়া গেলে, রাজা হাঁটিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, "আমার ঘোড়া ও গাড়ীর জন্য আমাকে সং হইতে হইয়াছে।"

"আমি প্রায়ই রাজার গাড়ীতে রাজার সহিত যাইতাম। তখন রাজার সহিত আমার প্রায়ই কোনও কথাবার্ত্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখের প্রতি আমি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম। রাজার সহিত গাড়ীতে বেড়াইবার সময়ে আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। রাস্তায় কি হইতেছে, সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতাম না। আমি পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় একপ্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম।

"আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমি তাঁহাকে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে গেলে, কি হইয়াছিল। তিনি কেমন বলিলেন, "আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?" তিনি যখন এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, ভাবেতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। আমার জীবনে চিরকাল উহার আশ্চর্য্য প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলাম। ঐ

কথাগুলি এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনে ঐ কথাগুলি আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে।

"ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ একত্রে গান করিতেন। গোলাম আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। "বিগতবিশেষং" সঙ্গীতটি রাজার অতি প্রিয় ছিল। বিষ্ণু ঐ সঙ্গীতটি মধুর স্বরে গান করিতেন। ঐ প্রিয় পুরাতন সুর এখনও আমার কানে বাজিতেছে।

"তখন ব্রাহ্মসমাজে বেঞ্চ ও কেদারা ছিল না। কার্পেটের উপর সাদা চাদর বিস্তৃত থাকিত। তাহাতেই সকল লোক গিয়া বসিতেন। রাজা একটি ছোট মোড়ার উপরে বসিতেন।

"সমাজের দিনে রাজার বন্ধুগণ, তাঁহার মাণিকতলার বাটীতে আসিয়া মিলিত হইতেন। তাহার পরে, তাঁহারা দলবন্ধ হইয়া যোড়াসাঁকোর সমাজে গমন করিতেন। তিনি বলিতেন, যখন এ দেশের লোক কোন তীর্থস্থানে যায়, কেহ গাড়ী করিয়া যায় না। আমরা আমাদের ঈশ্বরের দরবারে গাড়ী করিয়া কেন যাইব? আমরা পদব্রজেই যাইব। যদিও রাজা সমাজে পদব্রজে যাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও ধুতি চাদর পরিয়া যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময়ে, পোষাক পরিয়া যাইতেন। মুসলমানদিগের বাহ্য আচার ব্যবহারের প্রতি রাজার বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্তরূপ পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত। রাজরাজেশ্বরের দরবারে, তাঁহার সম্মুখে, উপস্থিত হইতে হইলে, উপযুক্ত ভাবে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। রাজা এই ভাবটি মুসলমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রাজার সকল বন্ধুগণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পরিয়া সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থল ছিলেন। তিনি সমাজে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া গমন করিতেন। রাজা ইহা পছন্দ করিতেন না। আমার পিতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি তেলিনীপাড়ার জমিদার, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেন। অন্নদাপ্রসাদবাবুর সহিত রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া কিছু বলিলে, তিনি তাঁহাকে স্পষ্টই বলিতেন যে, মহাশয়ই নিজে কেন বলুন না? যাহা হউক, অন্নদাপ্রসাদবাবু এ কথা আমার পিতাকে বলিতেন। কিন্তু আমার পিতা সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন যে, সমস্ত দিন আপিসের পোষাকে থাকিয়া আবার সন্ধ্যার সময়ে পোষাক পরিধান করিবার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিলে, অতি সামান্য পরিচ্ছদেই আসা উচিত।"

রাজার সহিত মহর্ষির সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন ;—

"রাজার সহিত আমার এক নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। তিনি আমাকে কখনও, কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই। তখন আমি বড় ছোট ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাই। তথাচ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। যে কার্য্যের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। ইংলণ্ডগমন করিবার সময়ে, রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ,

রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দ্দন না করিয়া তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দ্দন করিয়া ইংলণ্ডযাত্রা করিলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে, উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

"যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহাদ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।

"ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার পর, তিনি এক বৎসরমাত্র কলিকাতায় ছিলেন। তিনি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন, এবং রাজা রামমোহন রায়কেও প্রীতি করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি প্রেম, তাঁহার হৃদয় ও চরিত্রে একত্র জড়িত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইবে বলিয়া কোন আশা ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসকমণ্ডলী ছিল না বলিলেই হয়। বৃষ্টি বাদল হইলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে উপাসক এবং আচার্য্য দুইয়ের কার্য্য একাকী করিতে হইত। যে সকল ধনী লোক রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় আসিলে পরেই, তাঁহারা সমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী লোক সমাজে আসিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে পথের লোক আসিয়া বসিত। কেহ কেহ বাজার করিয়া যাইবার সময়ে, বাজারের ধামা হস্তে সমাজে প্রবেশ করিত। কেহ কেহ টেয়াপাখী হস্তে লইয়া সমাজে আসিত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একখানি তক্তাপোষের উপর বসিতেন। শতরঞ্চের উপর চাদর বিছান থাকিত, তাহাতেই অন্যলোক বসিতেন। এক্ষণে সমাজগৃহ সংস্কার হইতেছে। সংস্কারকার্য্য শেষ হইলে, আমি পূর্ব্বের ন্যায় বন্দোবস্ত করিব। এই সকল বিষয়ে আমি রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজকে আমরা ইংরেজদিগের গির্জ্জার ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি। ইহার সংশোধন হওয়া উচিত। উপাসনার সময়ে জুতা বাহিরে রাখা উচিত। আমাদের সমাজকে ইংরেজদের গির্জ্জার ন্যায় করা উচিত নহে।"

[১৮৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের 'কুইন' পত্রিকা ('The Queen') হইতে অনুবাদিত।]

রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত

রাজা যখন ইংলণ্ডগমন করেন, তরঙ্গসঙ্কুল আকুলসাগরবক্ষে রাজার অনুচর রামরত্ন মুখোপাধ্যায় একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই সঙ্গীতটি প্রকাশ করিলাম।—

"ওহে কোথায় আনিলে,
আনিয়ে জলধিমাঝে তরঙ্গে তরি ডুবালে।
কোথা রইল মাতাপিতা, কে করে স্নেহ মমতা,

প্রাণ-প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে,
চতুর্দ্দিক নীরাকার, নাহি দেখি পারাপার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।"

অনেকে মনে করেন যে, এই সঙ্গীতটি রাজা রামমোহন রায়ের নিজের রচিত। কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমাত্র। উহা রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ইংলণ্ডযাত্রা কালে সাগরবক্ষে রচনা করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের মস্তক সম্বন্ধে ফ্রেনলজিষ্টদিগের মত

১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় পরলোক যাত্রা করেন। তৎপরে ১৮৩৪ সালের জুন মাসের Phrenological Journal পত্রিকায় ফ্রেনলজি মতে তাঁহার চরিত্র ও মানসিক শক্তি সকলের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালে, রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় প্রথম সিবিলিয়ান ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উহা পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট উহা পাঠাইয়া দেওয়াতে আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

"The Raja's large head was of extraordinary size, the head of very few men in Europe being found of superior volume. The dimensions of the cast and the cerebral development are as follows :—

Greatest circumference of head. Demensions in inches	24½
From occipital spine to Individuality overtop of the head	15
From Ear to Ear vertically overtop of the head	14⅜
Development in the fraction of	20
Intellectual.	
Language. . rather large	17
Causality "	17
Comparison "	17
Individuality "	17
Concentrativeness. . Full	15
Moral.	
Benevolence. . large	18
Conscientiousness. . very large	20
Self-esteem. . very large	20
Veneration. . full	14
Wonder. . rather full ..	12
Social and Domestic.	
Love of approbation, very large	20
Adhisiveness. . large	18
Acquisitiveness. . full	14

Secretiveness. .large	18
Imitation. .rather large	16

Engergy and Will.

Combativeness. .large	18
Firmness. .very large	20
Cautiousness. .large	19

The department of the brain most largely developed is the Posterior Superior Region occupied by Firmness, Conscientiousness Self-esteem, and Love of Approbation,—the size of these four organs is very extraordinary. Firmness and fortitude were prominently displayed throughout his whole life.

. . . .

His strong conscientiousness, self-esteem and love of approbation fitted him to embark on the work of Reform and account for that powerful sentiment of individual dignity, evinced in his conversation, actions and deportment &c.

His large adhisiveness accords with his affectionate disposition. His English friends bear testimony to the power the Raja had shown of inspiring warm personal affection. It is no small testimony to his character that even a slight acquaintance with him was enough to stir stolid and phlegmatic Englishmen to something very nearly a passion of love for him. There must have been much love in the man to evoke such devotion.

Acquisitiveness is much inferior to benevolence and conscientiousness. The Raja was liberal, disinterested and careless of pecuniary sacrifices.

Without a tolerable endowment of combativeness as well as of self-esteem and firmness, he could not have acted with the boldness and decision for which he was remarkable.

Of the intellectual organs, the largest are individuality, language, comparison and causality. They are all well illustrated by his recorded character. His love of knowledge and his literary acquirements show the strength of individuality and language. The releavancy and acuteness of his reasonings resulted from causality and comparison, combined with language and individuality.

The development of the Raja's veneration and wonder affords the key to his religious character; while it is apparent that these

organs are inferior to benevolence and conscientiousness, an inferiority which accords well with his roll as a religious reformer. His head and history concur in showing that, intellect, Justice and independence had with him complete control over the sentiment of veneration. He seems never to have venerated except in accordance with intellect and conscientiousness. The whole tendency of his mind was opposite to superstition and religious fanaticism. Wonder had but little sway. He submitted everything to test of consisteney and reason, while conscientiousness restrained him from running to wild and impracticable extremes in his projects of reform. On the whole, it seems that the science of Phrenology acquires no slight accession of strength form the illustrations deduced from the cerebral traits of this remarkable man.